বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-সঙ্গম

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-সঙ্গম

সুনীলকুমার নাগ

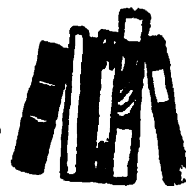
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ :
১৯৬০

প্রচ্ছদসজ্জা :
বিশ্বনাথ দাস

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : নিরঞ্জন বোস,
নর্দার্ন প্রিণ্টার্স, ৩৪।২ বিডন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬



উৎসর্গ

পরমারাধ্য পিতৃদেবের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে



পথ আমারে পথ দেখাবে
এই জেনেছি সার।

এই বই প্রসঙ্গে

কিশোর বয়সে 'গালিভার্স ট্রাভেলস্', 'রবিনসন ক্রুশো' প্রভৃতি সচিত্র কাহিনী পড়তে পড়তেই বিদেশী সাহিত্যের প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ করতাম। তারপর থেকে ঐ পড়াশুনোর ঝোঁকটা ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। কিন্তু তা নেহাত এলোপাতাড়ি ভাবেই চলতো। লেখার চর্চা আরম্ভ করবার বহুদিন পরে পর্যন্ত কখনো ও-সমস্ত সম্পর্কে লেখার কথা আমার মনে হয়নি। এ বিষয়ে 'মাসিক বসুমতী'-সম্পাদক অগ্রজ সাহিত্যিক প্রাণতোষ ঘটক মহাশয়ের কাছে আমি ঋণী। তিনিই প্রথম আমাকে বিদেশী সাহিত্য সম্পর্কে লেখার পরামর্শ দেন এবং ক্রমাগত উৎসাহিত করতে থাকেন।

বর্তমান গ্রন্থের মোট সাতাশটি প্রবন্ধের বেশির ভাগই বিভিন্ন সময়ে 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল, কয়েকটির অংশ বিশেষ 'বসুধারা', 'গল্প-ভারতী', 'যুগান্তর সাময়িকী', 'লোক-সেবক রবিবাসরীয়' এবং 'দৈনিক বসুমতী সাহিত্য বাসর'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। বলাই বাহুল্য, প্রতিটি রচনাই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করবার পূর্বে পরিমার্জিত হয়েছে।

প্রবন্ধগুলি যখন একটির পর একটি প্রকাশিত হতে থাকে, তার পরে অনেকেই আমাকে নানাভাবে উৎসাহ জুগিয়েছেন; তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন অধ্যাপক রতনলাল ঘোষ, অধ্যাপক মণিমোহন সেন, শুভার্থীগণ বিনয়জীবন ঘোষ, গিরিজানাথ সিংহ ও ব্রজকিশোর বসু, সুহৃদবর্গ প্রশান্তকুমার সেন, পূর্ণেন্দুবিকাশ সেনগুপ্ত, কালাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়, মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ রায় ও সুসাহিত্যিক অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অজিতকৃষ্ণ বসু, শিশু-সাহিত্যিক যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মাসিক বসুমতী'র সহকারী সম্পাদকদ্বয় কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এবং স্বর্গত রাধেশচন্দ্র রায় ও দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল। এঁদের উদ্দেশে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এই ধরনের গ্রন্থে যাঁদের বিষয় কিছু রচনা থাকা অবশ্যই উচিত ছিল, তাঁদের অনেকের সম্বন্ধে লেখা তৈরীও ছিল, যেমন—ম্যাক্সিম

গোর্কি, আন্তন চেখভ, বোরিস পাস্তেরনাক, লুইগি পিরান্দেলো, ডি. এইচ. লরেন্স, জেমস জয়েস, মরিস মেতরলিঙ্ক, পার্ল বাক, অগাস্ট স্ট্রীণ্ড্‌বার্গ প্রভৃতি। কিন্তু গ্রন্থের ক্রমবর্ধমান আয়তন দেখে শেষ পর্যন্ত ঐ লেখাগুলি আর সন্নিবিষ্ট করিনি। বাংলা দেশের পাঠক সমাজের যদি বর্তমান আকারের এই গ্রন্থটি ভালো লাগে এবং তার ফলে ভবিষ্যতে কখনো নতুন সংস্করণ প্রকাশের সুযোগ আসে, তা' হলে এ ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা অবশ্যই করবো। ত্রুটি অবশ্য আরো অনেকই রয়েছে, যেমন বিদেশী লোক বা জায়গার নামের উচ্চারণে। ইংরেজরা জার্মানদের জার্মান বলে, তাই আমরাও বলি, কিন্তু জার্মানরা নিজেদের যা বলে' পরিচয় দেয় তার উচ্চারণ-ধ্বনিটা অন্য রকম। এ সমস্ত এবং আরো অনেক জানা-অজানা ত্রুটির জন্য আমি পাঠকবর্গের কাছে মার্জনা-প্রার্থী।

এ ধরনের গ্রন্থের বাজার অনিশ্চিত জেনেও প্রকাশন-কর্তৃপক্ষের শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত জয়ন্ত বসু মহোদয়গণ যে ঝুঁকি নিলেন, সে-জন্য বাংলা সাহিত্যের নানাভিমুখী শ্রীবৃদ্ধিকামীদের তাঁরা ধন্যবাদ-ভাজন। ব্যক্তিগতভাবে আমার দিক থেকে সহস্র ধন্যবাদও তার তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হবে।

আজ বিশেষভাবে স্মরণ করছি তাঁর কথা, দুর্লভ মনুষ্যত্বের প্রকাশে যিনি আমার বিস্ময়ের বস্তু, যাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা এ গ্রন্থ প্রকাশের গোড়ার কথা, যাঁর স্নেহ আমার প্রতিদিনের পাথেয়, তাঁকে প্রণাম জানাই—তাঁর জীবন শান্তিপূর্ণ হোক। ইতি—

সুনীলকুমার নাগ

রচনা-পরিচিতি

পূর্বাভাষ

এক

চতুর্দশ লুই প্রকাশ্যেই বলতেন যে জনগণ কি ভাবলো বা না ভাবলো তাতে ফরাসী জাতির কিছুই আসে যায় না ; ফ্রান্সে রাজপুরুষের মতামতই চরম এবং পরম সত্য। ফ্রান্সের জনসাধারণ নিশ্চয়ই মনেপ্রাণে তাঁদের রাজার মতে বিশ্বাসী ছিলো না। কিন্তু তবু, অন্ততঃ অর্ধশতাব্দী কাল এ জাতীয় উক্তির কোনো বলিষ্ঠ প্রকাশ্য প্রতিবাদও হয়নি। এর থেকেই বোঝা যায় যে সেদিনের ফ্রান্সের জনসাধারণের ব্যক্তিত্ববোধ তথা আত্মমর্যাদাবোধ কতো সীমাবদ্ধ ছিলো। পরবর্তীকালে, ফরাসী জাতির যে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস, তার সূত্রপাত কিন্তু চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকালের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের দ্বারাই হয়েছিল। Corneille, Racine এবং Moliere যাঁদের প্রতিনিধি-স্থানীয় ছিলেন।

সমাজের প্রকৃত অবস্থা বুঝে উঠতে জনসাধারণের বিলম্ব হতে পারে, কিন্তু বুঝতে তারা পারেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসী জনগণের কার্যকলাপই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অত্যাচারিত ও অবহেলিত ফরাসী জনগণের মনে যাঁরা আত্মমর্যাদাবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের কাছে, অর্থাৎ ভল্টেয়ার, দিদেরো, বোমার্শে এবং রুশোর কাছে শুধু ইয়োরোপই নয়, গোটা পৃথিবীর মানুষই ঋণী। রাষ্ট্র-বিপ্লবের যে দাবানল ক্ষয়িষ্ণু সমাজের স্থবিরতাকে ভস্মস্তূপে পরিণত করে' নবজীবনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, তার প্রথম বহ্নিমালা ব্যক্তি-মানসেই প্রজ্বলিত হয়।

১৭৫৩ থেকে ১৭৬২ সালের মধ্যে রুশোর Discourse on the Origin of Inequality, The New Heloise, Social Contract এবং Emile প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থগুলির ভাবধারা শুধু যে ফরাসী বিপ্লবকে সম্ভব করে তুলেছিল তাই নয়—দেশ-দেশান্তরের মানব চিত্তেও আলোড়ন এনেছিল।

পরবর্তী একশ' বছর পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবেই হোক আর পরোক্ষভাবেই হোক, ইয়োরোপের সর্বশ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে রুশোর প্রভাব কমবেশী পরিলক্ষিত হয়। রুশো সম্বন্ধে এ যুগে রাসেল বলেছেন "...he was stripped

not only of his clothes, but also of his skin." বস্তুতঃপক্ষে শাসকগণের শোষনের ফলে গোটা ফ্রান্সের জনগণেরও তখন ঐ অবস্থা। রাজার মুণ্ডচ্ছেদ ঘটানো মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীকৃত তিক্ততার অনিবার্য প্রকাশ এইভাবেই হ'য়ে থাকে।

অশেষ প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পদশালী নিত্যনূতন উপনিবেশ দখলকারী সেদিনের উদারনৈতিক (?) ইংলণ্ড তখন মার্ক্সের ভাষায় Proletarian Bourgeoisie সৃষ্টি করতে ব্যস্ত। জনসাধারণ নানা আশা-আশঙ্কায় বিভ্রান্ত, চিন্তানায়কগণ ফ্রান্সের পরিবর্তনশীল ঘটনাবলীর দর্শক মাত্র।

কিন্তু জর্মন চিন্তাধারায় অবিলম্বেই প্রগতিশীল ফ্রান্সের কার্যকলাপ তথা ভাবধারণার প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। কাণ্ট, লেসিং, ক্লপষ্টক, হ্বিয়েল্যাণ্ড, গ্যয়টে ও শিলারের মানস গঠনে ফরাসী চিন্তার প্রভাব অনস্বীকার্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স পৃথিবীর চিন্তাধারায় অগ্রগণ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ফ্রান্সের এই একাধিপত্য কখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। কারণ এই সময়ের মধ্যেই যদিও জর্মনীর হাইনে, শোপেনহ্যর, ফিক্‌টে, হেগেল, শ্লিয়ারমেকার, শেলিং প্রভৃতি; রাশিয়ায় গগোল এবং ইংলণ্ডে অষ্টেন, স্কট এবং ডিকেন্স প্রভৃতি নানা ধরণের নূতন বিষয়বস্তুর অবতারণা করে চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধশালী করেছিলেন, কিন্তু ফ্রান্সও নিজেকে নিঃশেষ করেনি। কারণ, এই সময়ের মধ্যেই ফ্রান্সেও দেখা দিয়েছিলেন ব্যালজাক, হুগো, বোদলেয়ার, স্তাঁ প্রভৃতি। ১৮৪৮ সালে মার্কস ও এঙ্গেলসের Manifesto of the Communist Party এবং প্রায় এগার বছর পরে প্রকাশিত ডারউইনের Origin of Species ইয়োরোপের চিন্তাধারার মোড় সম্পূর্ণরূপে ঘুরিয়ে দিলো। (*The Origin of Species by means of Natural Selection* (1859) : That epoch-making work was received throughout Europe with the deepest interest, was violently attacked and energetically defended, but in the end succeeded in obtaining recognition (with or without certain reservations) from all competent biologists.) ইতিহাস পাঠকের হঠাৎ মনে হয় যে ১৭৪৯ সালে রুশোর আবির্ভাব (যে বছর Discourse on Arts and Sciences প্রকাশিত হয়) থেকে ১৮৪৮ সালে মার্কসের আবির্ভাব পর্যন্ত

একশটি বছর ইয়োরোপকে যেন ক্রমাগত একটি তপ্ত কড়াইতে এপিঠ-ওপিঠ করা হচ্ছিলো। এবার একেবারে উনানে প্রবিষ্ট হ'ল। জার্মানী, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নানাবিধ চিন্তার গোলকধাঁধা থেকে মার্কসই সর্বপ্রথম সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণাবলীর একটি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি উপস্থাপিত করলেন। আর ওদিকে ডারউইন শুধু যে মানুষের দেবতার অংশ হ'তে বাধ সাধলেন তাই নয়, দেবত্বলাভের আশা-মূলেও ঘুণ ধরিয়ে দিলেন। স্বর্গদেশের প্রবেশ-পথে বাইরে থেকে অর্গল পড়ে গেলো। এতদিনে মানুষ শুধুমাত্র 'জীবে' পরিণত হ'ল। এখন হ'তে মানুষ হলো শুধু নিছক মানুষ। যার একমাত্র বিচরণ ক্ষেত্র হ'তে পারে মাটির পৃথিবী—যে পৃথিবীকে শৈশবে মাতৃবক্ষের মতো সে এতকাল শুধুই জৈবিক তাড়নায় প্রয়োজন মতো শোষণ ক'রে এসেছে; পরিণত বয়স্কের যুক্তি, বিবেক ও ঋণবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কোনো দিন ভালোবাসেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ইয়োরোপের ভাবধারার ইতিহাস তাই প্রধানতঃ নানাবিধ Realism ও Romanticism-এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস। না-দেখা সুন্দরীর আকর্ষণের মতো স্বর্গলোকের আকর্ষণও এযুগের মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, আবার পরক্ষণেই হয়ত পায়ের নীচের পৃথিবীর কাঁটার খোঁচায় স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, উপেক্ষিতা পৃথিবী তথা উপেক্ষিত জীবনের কথা মনে পড়ে যায়। গ্যয়টে মনে করতেন যে, বায়রন ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলী এতো দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রকৃতির হয়ে উঠলো যে, কোনো একটি সুরই, তা বায়রনেরই হোক আর শেলীরই হোক, কিংবা হুগো বা স্বয়ং গ্যয়টেরই হোক, অধিক কাল ঝঙ্কৃত হতে পারলো না।

ওঁদের সঙ্গীত সম্পূর্ণ গীত হবার পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন নীটশে, ভার্লেন, টলস্টয়, তুর্গেনিভ, চেকভ, জোলা, ফ্লোবেয়ার, মোপাসাঁ, ইবসেন, আনাতোল ফ্রান্স প্রভৃতি। এঁরা সকলেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁদের কাজ সমাধা করেন নি তা' ঠিক, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সূচনার পূর্বেই এঁরা মানুষের ভাব-লোকে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। জীবন সম্বন্ধে, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে তথা সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি সম্বন্ধে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকে যে নূতন মূল্যায়ণের প্রয়াস বিশ্বব্যাপী দেখা দিয়েছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেই তার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছিলো।

দুই

যুগে যুগে মানুষ দলগত, দেশগত এবং জাতিগত গণ্ডীর সীমানার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখবার জন্যে সব রকমেই চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু পারেনি। আজো পারছে না। বাধাটা বাইরে থেকে আসেনি কখনো। এসেছে মানুষের নিজেরই ভেতর থেকে। সজ্ঞানে মানুষ নিজের পায়ে শিকল পরিয়েছে এবং নিজের অজানিতে সে-শিকল নিজেই সে খুলে ফেলেছে। মানুষের শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে এ একটা বহুকালের পুরনো বিস্ময়, আজো যার কোনো সন্তোষজনক বৈজ্ঞানিক উত্তর পাওয়া যায়নি। তবে মোটামুটিভাবে এ কথা মনে করা যেতে পারে যে উচ্চতর রুচি এবং আদর্শের প্রতি মানুষের নিশ্চয়ই একটা সহজাত প্রবণতা রয়ে গেছে। তাই রাজনীতিবিদ্‌গণের সমস্ত আদেশ-উপদেশ-নির্দেশ ভুলে, দৈনন্দিন সামাজিক জীবন পরিচালনা করে যে বাস্তববুদ্ধি তাঁকে ফাঁকি দিয়ে, মানুষ কখন যে জাতি-ধর্মের শিকল ছিঁড়ে বিশ্বমানবতাবোধের সহজাত টানে, এমন কি শত্রুরও উচ্চতর শিল্পসাহিত্যের ভক্ত হয়ে ওঠে, তা সে নিজেও টের পায় না।

দু'টি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মানী, আর দ্বিতীয়তঃ উনবিংশ শতাব্দীর ভারত। গ্যয়টের আত্মজীবনীতে দেখা যায় রাজনীতি ও সামরিক শক্তিতে ফ্রান্সের নিকট পরাজিত জার্মানী ফ্রান্সেরই কাব্য ও নাটক থেকে প্রেরণালাভের জন্যে উন্মুখ—যদিও রাজনীতিক্ষেত্রে ফ্রান্সের নাগপাশ ছিন্ন করবার জন্যেও জার্মানগণ অধীর। ভারতবর্ষের বেলাতেও দেখা গেছে যতোটা উত্তেজনার সঙ্গে আমরা ইংরেজের সাম্রাজ্য-বাদের বিরোধিতা করেছি, প্রায় ততোটা উৎসাহ নিয়েই অন্যদিকে আমরা ইংরেজের সাহিত্য আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করেছি। রাজনৈতিক শত্রুতা সত্ত্বেও এরকম ঘটেছে—রাজনৈতিক শত্রুতার অবকাশ যেখানে আদৌ নেই, সেক্ষেত্রে উচ্চতর রুচি এবং আদর্শের এক দেশের সাহিত্য যে আরো সহজে অন্যদেশের শ্রদ্ধার সামগ্রী হয়ে উঠবে তা খুব স্বাভাবিক। উচ্চতর এবং পূর্ণতর সৃষ্টির কাছে মানুষ স্বেচ্ছায় মাথা নোয়ায়—মাথা নোয়াতে পেরে সে নিজেকে ধন্য মনে করে।

রাজনীতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে উত্তর ইয়োরোপ আজকের পৃথিবীতে কোনো শক্তিই নয়। অথচ তারই কাছ থেকে দেখা যায় এ শতাব্দীর সমস্ত সভ্যসমাজ অনেক কিছুই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে; এবং গ্রহণ

করে প্রত্যেকটি দেশের সাহিত্যসেবীই তাঁর নিজের দেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বর্তমান আলোচনায় উত্তর ইয়োরোপ বলতে আমরা ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড এবং ইস্‌ল্যাণ্ড—এই পাঁচটি দেশকে বুঝবো। বিগত কয়েকশ' বছর ধরেই এই পাঁচটি দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে যদিও প্রচুর পরিবর্তন ঘটে গেছে, কিন্তু সংস্কৃতির দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে মনে হবে এই পাঁচটি দেশ যেন একই সূত্রে গাঁথা।

প্রথমেই বলতে হয় হ্যামলেটের দেশ ডেনমার্কের কথা। ডেনমার্ক অ্যাণ্ডারসনের দেশও বটে। উত্তর ইয়োরোপ যে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে তার সূত্রপাত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই। ডেনমার্কের অদ্বিতীয় দার্শনিক সোরেন কির্কেগার্ড (১৮১৩—৫৫) মাত্র কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে যে মৌলিক চিন্তার সৃষ্টি করে গেছেন, পরবর্তীকালে এমনকি আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে জার্মানী এবং ফ্রান্সের দার্শনিক এবং সাহিত্যিক মহলে তার প্রভাব দেখা যায়। বর্তমান যুগে অস্তিত্ববাদ (Existentialism) বলতে যা বোঝায় তার পথপ্রদর্শক ছিলেন কির্কেগার্ড। জার্মানীতে দার্শনিক হাইডেগ্‌গার এই অস্তিত্ববাদেরই একজন ব্যাখ্যাতা। বর্তমান সময়ের ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক জঁা পল সার্ত্র্-ও কির্কেগার্ডের একজন উত্তরসূরী। আলবেয়ার কামু্ আবার ছিলেন চিন্তাধারার দিক দিয়ে সার্ত্র্'র শিষ্য। কাজেই কির্কেগার্ড অল্পবয়সে মারা গেলেও কিভাবে তাঁর ভাবধারা বর্তমান যুগকে প্রভাবিত করেছে এবং সার্ত্র্, কামু্ প্রভৃতির মাধ্যমে আজও করে চলেছে, তা সহজেই বোঝা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে টলস্টয় তাঁর *What is Art* রচনা করেছিলেন। এ বইয়ের এক জায়গায় নিতান্ত আক্ষেপের সঙ্গে টলস্টয় বলেছিলেন: "...novels, poems and verses, invariably transmit the feeling of sexual love in different forms. Adultery is not only the favourite, but almost the only theme of all the novels. A performance is not a performance unless under some pretext women appear with naked busts and limbs." টলস্টয় যে-সময়ে এ কথা বলেছেন, সে-সময়কার ইয়োরোপের শুধু ঔপন্যাসিকই

নয়, বেশিরভাগ সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষেই কথাটা প্রযোজ্য। যে সামান্য কয়েকজন প্রথম সারির স্রষ্টার রচনায় এর ব্যতিক্রম ঘটেছে তার মধ্যে আমরা উত্তর ইয়োরোপের একটি শক্তিশালী লেখক-গোষ্ঠীকে পাই—যার শীর্ষস্থানীয় ছিলেন নরওয়ের হেনরিক ইবসেন।

সাহিত্যে যুগ-প্রবর্তক ইবসেন পরলোকগমন করেন ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। ক্লাসিক ধর্মী, ঐতিহাসিক, সামাজিক—নানা ধরনের নাটক উনি রচনা করে গেছেন। তার মধ্যে 'ক্যাটিলিনা', 'রসমারস্‌হল্‌ম', 'পীয়ার গিণ্ট', 'এ ডলস্ হাউস', 'ঘোস্টস', 'মাস্টার বিল্ডার', 'অ্যান এনিমি অব দি পীপল', 'পিলারস অব সোসাইটি'—নাট্য-সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছে। শেষোক্ত পাঁচখানি নাটক যখন ইয়োরোপের বিভিন্ন শহরের মঞ্চে প্রথম অভিনীত হচ্ছিলো—সে হ'ল উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের কথা—তখন গোটা ইয়োরোপের শিক্ষিত সমাজে রীতিমতো তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছিলো। শ্রেণী-দ্বন্দ্ব ছাড়াও যে সমাজে দ্বন্দ্ব আছে, ধনতন্ত্রী সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ যে কী মারাত্মক—ফ্রান্সে হুগো, ফ্লবেয়র, জোলা, রুশিয়ার ডস্টয়েভস্কি এবং ইংলণ্ডে ডিকেন্স এবং অস্কার ওয়াইল্ডের পর নরওয়েতে ইবসেন সেই কথাটাকেই অত্যন্ত জোরালো ভাবে মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। তা' ছাড়া নাটকে গদ্যরীতির প্রবর্তক হিসেবেও ইবসেন বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে শেক্‌সপীয়ার এবং মলিয়েরের পর ইবসেনের সমকক্ষ নাট্যকার আর কেউ পৃথিবীতে জন্মাননি। বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে নাট্যকার হিসেবে পৃথিবীর কোনো দেশেই এমন কেউ নেই যাঁকে সম্পূর্ণভাবে ইবসেনের প্রভাবমুক্ত বলা যেতে পারে,—এমন কি রবীন্দ্রনাথও নন। কারো ওপর ইবসেনের প্রভাব পড়েছে সরাসরি, কারো ওপর বা অন্য কোনো মাধ্যমে। সরাসরি যাঁরা ইবসেনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই ইংলণ্ডের পিনেরো এবং শ-কে, ইতালীর পিরান্দেলোকে এবং আমেরিকার ইউজেনী ও'নীল এবং টেনেসী উইলিয়ামসকে। প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে দেখা যায় সমারসেট মম সরাসরি ইবসেনকে চাক্ষুষ দেখে এবং তাঁর নাটকের অভিনয় দেখে এবং পড়ে সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন।

বয়সে ইবসেনের চাইতে একুশ বছরের ছোট সুইডেনের অগাস্ট স্ট্রীণ্ডবার্গও বিংশ শতাব্দীতে নাট্যকার হিসেবে একজন প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টা বলেই স্বীকৃতি-

লাভ করেছেন। ওঁর 'কনফেসনস্ অব এ ফুল' এবং 'মিস জুলিয়া' আত্ম-বিশ্লেষণধর্মী নাটক-রচনার আদর্শ-বিশেষ। ইবসেনের চাইতে মাত্র চার বছরের ছোটো ছিলেন তাঁর দেশের স্বনামধন্য কবি ও ঔপন্যাসিক বিয়ার্নসন। ওঁর 'আর্নে', 'ইন গড্‌স ওয়ে' এবং 'দি ফিশার মেডেন' যুগান্তকারী উপন্যাস। কেন, সেকথা আমরা পরে আলোচনা করবো। সুইডেনের মহিলা ঔপন্যাসিক সেলমা লেগারলফ ইবসেনের চাইতে তিরিশ বছরের ছোটো ছিলেন। ওঁর দু'খানি উপন্যাস 'গোস্টা বারলিংগস সাগা' (১৮৯৮) এবং 'জেরুজালেম' (১৯০৩) বিশ্বসাহিত্যের দু'খানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। নরওয়ের ন্যুট হামসুন লেগারলফের চাইতে এক বছরের ছোটো ছিলেন। ওঁর 'হাঙ্গার' প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে।

এই পর্যন্ত এসেই আমরা উত্তর ইয়োরোপের সাহিত্য ও তার চিন্তাধারার যেটুকু পরিচয় লাভ করি তাতেই দেখা যায় যে, পাঁচজনে মিলে যেন চিন্তাজগতে তথা সাহিত্যজগতে একটা বিপ্লব সাধিত করলেন।

এই পাঁচজনের মধ্যে একজন দার্শনিক কির্কেগার্ড, মেটাফিজিক্স ছাড়াও, ইতিহাস এবং নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁর মৌলিক চিন্তার যথাযথ ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত হয়নি। দু'জন নাট্যকার, ইবসেন এবং স্ট্রীণ্ড্‌বার্গ—যাঁদের মতো নাটক লিখতে পারলে আজকের উদীয়মান নাট্যকারগণও আত্মতৃপ্তিতে ভরে ওঠে মানব-জীবন সার্থক বোধ করবেন। আর তিনজন হলেন ঔপন্যাসিক—বিয়ার্নসন, লেগারলফ এবং হামসুন।

দর্শনের যে প্রভাব তা সাধারণ মানুষকে ততোটা প্রভাবিত করতে পারে না, গল্প বা উপন্যাস যতো সহজে এবং যতটা ব্যাপকভাবে পারে। নাটকও পারে কিছুটা। কির্কেগার্ড, ইবসেন বা স্ট্রীণ্ড্‌বার্গের প্রভাব যে বাস্তবিকপক্ষে কতোখানি সাধারণের মধ্যে, সে-সম্বন্ধে ধারণা আজও তাই যথেষ্ট স্পষ্ট নয়—বেশ কিছুটা পুঁথির থিয়োরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু উপন্যাসের বেলায় তা নয়। বরং ঠিক বিপরীত। পূর্বোক্ত তিনজন ঔপন্যাসিকের রচনায় বিভিন্ন দেশের পূর্বসূরীদের চাইতে যে ব্যতিক্রম দেখা গেলো, সে হলো বিষয়বস্তুর নতুনত্ব। টলস্টয় যাকে জলো প্রেম বা অশ্লীলতা বলেছেন তার উর্ধ্বে উঠে আমরা দেখতে পাই উত্তর ইয়োরোপের এই তিনজন ঔপন্যাসিক সমাজ এবং জীবনের একটা নতুন দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। সে হলো সাধারণ মানুষের কথা। জেলে, মুটে, মজুর এবং

কৃষক-সম্প্রদায়ের কথা। প্রধানতঃ কৃষক-সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা, তাদের জীবনের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা—এক কথায় সব কিছুকেই এমন ভাবে চিত্রিত করতে আরম্ভ করলেন এঁরা যে, এঁদের যে-কোনো একখানা বই পড়া শেষ করলে বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত পাঠকের মনে হবে যে সে যেন পুরনো পরিচিত পৃথিবী ছেড়ে কিছুকালের জন্যে সর্বৈব কৃষকদের নিয়ে গড়া কোনো পৃথিবীতে চলে গিয়েছিলো। যতো শিক্ষিতই হোক না কেন, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যেই এমন কতকগুলি জানবার এবং বুঝবার বিষয় আছে যা সম্ভবতঃ সমাজের আর কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায় না। নৃতত্ত্বগতভাবে বিচার করলে সহজেই বোঝা যাবে কৃষকের জন্যে এবং তার মাধ্যমে মানুষ যতো মাটি অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে আছে ততো আর কিছুতেই নয়। তাই আজকের দিনের বিজ্ঞানীদেরও দেখা যায় কোনো বিশেষ সমাজের ধর্ম, নীতিবোধ বা শিল্পবোধকে বুঝতে হলে, সবার আগে তাঁরা সেই সমাজের কৃষক-সম্প্রদায়কে বুঝবার চেষ্টা করেন।

উত্তর ইয়োরোপের এই তিনজন ঔপন্যাসিক বেশ কিছুটা নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের দেশের কৃষক-সমাজকে বুঝবার চেষ্টা করলেও রচনা যা করলেন তা বিশুদ্ধ সাহিত্য, সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে লেখা। যদিও প্রতিক্ষেত্রে মালমশলা যা সংগ্রহ করা হ'ল তা যে-কোনো সাধারণ নৃবিজ্ঞানীকে হার মানায়।

কৃষকের ব্যক্তিগত তথা গোষ্ঠীগত জীবনকে কেন্দ্র করে সাহিত্য-রচনার এই যে পথ দেখালেন বিয়ার্নসন, লেগারলফ এবং হামসুন, বিংশ শতাব্দীর উপন্যাসের ইতিহাসে তা' একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ, পরবর্তীকালে দেখা গেলো দেশে দেশে এবং পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই কৃষক-সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে, তার জীবনের কোনো-না-কোনো দিককে উপজীব্য করে গল্প এবং উপন্যাস রচনার রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো। ইতালীতে গ্রাজিয়া দেলেদ্দা, পোল্যাণ্ডে স্তাডিসলাস রেমণ্ট এবং রুশিয়ায় আইভান বুনিন, ম্যাকসিম গর্কি, আমেরিকায় পার্ল বাক, উইলা ক্যাথার এবং স্টাইনবেক সরাসরি উত্তর ইয়োরোপীয় ঔপন্যাসিকগণের অনুপ্রেরণাতেই নিজ নিজ দেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের জীবন চিত্রিত করতে আরম্ভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে একমাত্র পার্ল বাক-ই

ব্যতিক্রম। ঘটনাচক্রে কিশোরী বয়স থেকে দেশের বাইরে সুদূর চীনে থাকতেন বলে উনি আমেরিকান কৃষক-সমাজের চিত্র না এঁকে লিখলেন চীনা কৃষকের কথা—'দি গুড আর্থ'। স্টাইনবেকের 'দি গ্রেপস অব র‍্যাথ', 'ইন ডুবিয়াস ব্যাটল' এবং 'টু এ গড আননোন'-এ আমেরিকান ফল-চাষী তথা কৃষক-সমাজের একটা দিকের চমৎকার চিত্র পাওয়া যায়। রেমণ্টের চার খণ্ডের 'দি পেজাণ্টস' কৃষক-জীবনের মহাকাব্য-বিশেষ। এঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কতটা সফলতা অর্জন করেছিলেন তা এঁদের প্রত্যেকের জনপ্রিয়তা থেকে তো বোঝা যায়ই; তা ছাড়াও একটি কথা আছে, নোবেল পুরস্কার লাভ করে, এঁদের মধ্যে পাঁচজন—রেমণ্ট, বুনিন, দেলেদ্দা, বাক এবং স্টাইনবেক—তাঁদের কৃষক-সম্প্রদায়ের কাহিনীর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও লাভ করেছেন।

'কৃষক' কথাটি এক্ষেত্রে একটু ব্যাপক অর্থেই প্রযুক্ত হচ্ছে। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের পরে কৃষিজীবী সম্প্রদায় ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। সংখ্যার দিক থেকে যেমন, প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকেও তেমনি। পৃথিবীর সব দেশেই শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রধানতঃ কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মোটামুটি একই অবস্থা হয়ে ওঠে। স্থির নিশ্চিত ভাবে শিল্পশ্রমিক হবার পূর্ব পর্যন্ত কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের যে সদা পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে কাটে—তাদেরও সকলকে 'কৃষক' বলে অবিহিত করা হ'চ্ছে। জমির সঙ্গে সম্পর্কে একবার ছেদ পড়লে কদাচিৎ তা আর ফিরে আসে। বোধ করি সেই জন্যই গোল্ডস্মিথ লিখেছিলেন:

But a bold peasantry, their country's pride,
When once destroyed, can never be supplied.

The Deserted Village (1770)

এখন পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করলাম তাতে দেখা যাচ্ছে: কির্কেগার্ড, ইবসেন, স্ট্রীণ্ড্বার্গ, বিয়ার্নসন, লেগারলফ এবং হামসুন—মোটামুটিভাবে এই ছ'জন উত্তর-ইয়োরোপীয় লেখক যাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ মৌলিকতা নিয়ে চিন্তা তথা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকে বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বিশ্বসাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করলেন—কোথাও সরাসরি ভাবে, কোথাও অন্য কারো মাধ্যমে; যথা: পিনেরো, শ, ও'নীল, উইলিয়ামস, হাইডেগ্গার, সার্ত্র,

কামু, পিরান্দেলো, দেলেদ্দা, রেমণ্ট, বুনিন, গর্কি, ক্যাথার, পার্ল বাক এবং স্টাইনবেক প্রভৃতি।

উত্তর ইয়োরোপ কি অপরকে প্রেরণা দিয়েই নিজেকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেললো? না, তা' মোটেই নয়। তার নিজের সাধনা সমান তালেই চলতে লাগলো—প্রধানতঃ ঐ কৃষক-সম্প্রদায়ের জীবনকে কেন্দ্র করে। কারণ, ওদের পরে আবির্ভাব ঘটতে লাগলোঃ নরওয়েতে জোহান বয়ার ও ট্রিগবি গুলব্রানসেন। বয়ারের 'দি গ্রেট হাঙ্গার', 'লাস্ট অব দি ভাইকিংস' এবং 'দি এভারলাষ্টিং ষ্ট্রাগল' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে তিনি স্থায়ী আসন করে নিলেন। বয়ারের রচনায় কৃষকের সঙ্গে জেলের জীবনও স্থান পেলো। গুলব্রানসেনের উপন্যাসে সাধারণ কৃষকের সঙ্গে সাহিত্যের দর্পণে পাহাড়ী অঞ্চলের শিকারী সম্প্রদায়ের ছায়া পড়তে লাগলো। ওর 'বিয়ণ্ড সিং দি উড্‌স' এবং 'দি উইণ্ডস ফ্রম দি মাউণ্টেনস' সুখপাঠ্য রচনা। হামসুনের 'গ্রোথ অব দি সয়েল' বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দর্শকের রচনা। সুইডেনে আবির্ভাব ঘটলো উইলিয়াম মলবার্গ, ভার্নার ভন হাইডেনস্ট্যাম, গুস্তাভ হেলস্টাম এবং সর্বোপরি সিগ্রিড উনসেট-এর। উনসেট বিশ্বসাহিত্যে একজন বিস্ময়কর শক্তির অধিকারিণী ঔপন্যাসিক। পৃথিবীর কোনো দেশেই ওঁর যোগ্য পূর্ববর্তিনী কাউকে বলা যায় কিনা সন্দেহ—জর্জ এলিয়ট, জর্জ স্যাণ্ড, মিসেস স্টাওই এবং সেলমা লেগারলফের কথা স্মরণ রেখেই বলছি। পরবর্তিনীদের মধ্যে অবশ্য পার্ল বাককে একজন যোগ্য শিষ্যা বলা চলে। উনসেট সমসাময়িক কাল পেছনে ফেলে অনেকদূর এগিয়ে গেলেন। উনি স্বদেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের চিত্র আঁকতে আরম্ভ করলেন সেই ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে —এ বইয়ের নাম 'দি এক্স'; ওঁর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ক্রিষ্টিন লাভরান্সডাটার' তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ সুবিশাল রচনা। এর পটভূমিকা চতুর্দশ শতাব্দীর সুইডিস কৃষক-সমাজ। উনসেটও তাঁর রচনার স্বীকৃতি হিসেবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তারপর বলতে হয় ফিনল্যাণ্ডের অন্ততঃ দুজনের কথাঃ আনটো সেপানেস এবং ফ্রাঞ্জ এমিল সিলানপার কথা। সিলানপার 'মেড সিলজ' এবং 'মিক হারিটেজ' ফিনল্যাণ্ডীয় কৃষক-সমাজের ওপর লেখা অনবদ্য উপন্যাস। উনিও নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। ডেনমার্কের মার্টিন অ্যাণ্ডারসন নেক্সো, জোহানেস জেনসেন

এবং জোহানেস অ্যাঙ্কার-লারসেনও প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেছেন।

সবশেষে ইস্‌ল্যাণ্ড সম্বন্ধে কয়েকটি কথা অবশ্যই বলতে হবে। কারণ ইস্‌ল্যাণ্ডের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্ততঃ তিনজন প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টা হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেছেন: গুনার গুনারসন, ক্রিস্টম্যান গুডমুণ্ড্‌সন এবং হ্যালডোর ল্যাক্‌সনেস। এঁদের মধ্যে ল্যাক্‌সনেস নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। ল্যাক্‌সনেসের 'সালকা ভালকা', 'দি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পীপ্‌ল' এবং 'দি হ্যাপি ওয়ারিয়র্‌স' বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী সংযোজন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সাহিত্যে বিষয়বস্তুর যে দৈন্য ছিল এবং তার ফলে আদিরসের যে বিকৃত পরিবেশন হতো, তা' দেখে টলস্টয় আক্ষেপ করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই প্রধানতঃ উত্তর-ইয়োরোপীয়গণের নতুন নতুন সৃষ্টির ফলে বিশ্বসাহিত্যে বিষয়বস্তুর একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেলো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যসেবীগণ বলবার মতো অনেক নতুন বিষয়ের সন্ধান পেলেন—প্রত্যেকের সামনে যেন এক একটি নতুন মহাদেশের প্রকাশ ঘটলো। এই শতাব্দীর শুরু থেকেই অর্থনীতির ক্ষেত্রে শিল্প-নির্ভরতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেও তার ছায়া অনিবার্যভাবেই পড়তে আরম্ভ করলো।

মানুষ যদি তার সৃজনী-প্রবণতাকে স্তব্ধ করে রাখে, কেবলই আদিরসের ঘোলা জলে ডুবিয়ে উদ্ভাবনের দক্ষতায় মরচে ধরায়, তা হলে তাকে রক্ষা করতে পারে কে? নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার পর আসুন আমরা বয়ারের নায়কের মতো অনুভব করবার চেষ্টা করি "...let there be light...and more and more it came to me that it is man himself that must create the divine in heaven on earth that that is his triumph over the dead omnipotence of the universe...Man can be greater than his fate."—

(*The Great Hunger*)

হেনরিক ইবসেন

প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে ইবসেন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে জর্জ বার্নার্ড শ একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন। প্রশ্নটি হলো এই যে, শেক্‌সপীয়ার বা মলিয়ের-এর নাটকগুলি তাঁদের সময়ে লোকে পড়েছে এবং দেখেছে আবার আজকের দিনেও দেখছে বা পড়ছে ; এই দেখা বা পড়ার ফলে পাঠক বা দর্শকের মনে বৈপ্লবিক কোনও আলোড়ন তাঁদের সময়ে যেমন হতো না, তেমনি আজকের দিনেও হয় না। যদিও একটা অনাবিল তৃপ্তি এবং আনন্দ দর্শক বা পাঠক সবসময়েই পেয়েছেন। আর ইবসেন কিংবা টলস্টয়, ভাগনার বা স্ত্রীণ্ড্‌বার্গ, গোর্কি বা চেকভের যে-কোন পাঠক তাঁর ভেতরে একটা এমন আলোড়ন অনুভব করেন যা অনেক সময়ে তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বাকেই নাড়া দিয়ে যায়। এর কারণ কি? এঁরা কেউ যে শেক্‌সপীয়ার, মলিয়ের, ডিকেন্স বা ডুমার চাইতে শ্রেষ্ঠতর স্রষ্টা শ তাও মানতে নারাজ। শেক্‌সপীয়ার বা মলিয়েরের সঙ্গে তুলনাটা একদিক থেকে একটু অসমীচীন হয়, কারণ, ওঁরা অনেক আগের ; তাই বয়সে মাত্র পনরো-ষোলো বছরের বড়ো ডিকেন্সের সঙ্গে ইবসেনের তুলনা করে শ বলছেন যে, বহির্বিশ্বকে দেখবার বা তাকে বুঝবার ক্ষমতা ইবসেনের নিশ্চয়ই ডিকেন্সের চাইতে বেশি ছিলো না। কিন্তু এ হেন যে ডিকেন্স যাকে সবদিক দিয়েই একেবারে আধুনিক বলা চলে, তাঁর রচনা পড়েও পাঠকের মনে এরকম কোনো আলোড়ন সৃষ্টি হয় না ঠিক যেমনটি ইবসেনের পাঠকের হয়। কারণ কি? শ বলছেন যে এর কারণ হলো এযুগের লেখকগণ মনে হয় তাঁদের পূর্ববর্তীগণের তুলনায় আত্মিকশক্তিতে অধিকতর বলীয়ান। (It is as if these modern men had a spiritual force that was lacking in even the greatest of their forerunners—*The Quintessence of Ibsenism.*)

শ-য়ের এই যে শেষোক্ত অভিমতটি, এর সঙ্গে বেশির ভাগ পাঠকই যে একমত হবেন, এ-কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য কেউ যদি শ-য়ের এ কথা স্বীকার না করেন এবং তাঁর নিজস্ব বলবার মতো কোনো কথা থাকে, তা'ও নিশ্চয়ই ভেবে দেখতে হবে। আমরা কেউই ঐ 'আলোড়ন' অনুভব করবার কারণটি সম্পর্কে অভ্রান্ত না হ'তে পারি। কিন্তু ইবসেন তথা এ যুগের আরো অনেকের রচনা পাঠ করলে আমাদের মনে যে একটা

নতুন ধরণের আলোড়ন সৃষ্টি হয়—আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিক ধারণা ও বিশ্বাস, সমাজ, সংসার এবং জগৎ সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় ভাবধারণায় একটা যে দারুণ নাড়া দেয় এ-কথা অস্বীকার করা যায় না—ঠিক যে রকমটি আগে কখনো হতো না। এই ব্যাপারটা অন্ততঃ ইবসেন সম্পর্কে শ-ই প্রথম লক্ষ্য করেন এবং নানা প্রবন্ধ এবং আলোচনার মাধ্যমে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। ইবসেন-ব্যাখ্যাতা হিসাবে শ-য়ের স্থান যে প্রথম সারিতে এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। ব্র্যাণ্ডেস-এর সঙ্গে যেখানে শ একমত হতে পারেন নি, সেক্ষেত্রেও শ-য়ের অভিমতই অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে হয়। কাজেই বর্তমানের আলোচনায় ইবসেনকে কিছুটা আমাদের শ-য়ের দৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে। অবশ্য আমরা আমাদের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি দিয়েও এই বিরাট মহান এবং কালজয়ী সাহিত্যস্রষ্টাকে বুঝবার চেষ্টা করবো।

ইয়োরোপ যে দীর্ঘকাল ধরে প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই পৃথিবীতে নেতৃত্বের আসন দখল করে রয়েছে, কেউ যদি মনে করেন যে শুধুমাত্র নিত্যনতুন মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করাবার শক্তিই এর কারণ তা' হলে খুব সম্ভবত সত্য কথা বলা হবে না এবং প্রকৃত কারণও আমরা বুঝতে পারবো না। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় যে একটা আশ্চর্য প্রাণশক্তির প্রেরণায় ইয়োরোপ সর্বক্ষণ জীবনে সমস্ত বিষয়ে পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জনে ব্যস্ত। যেদিন ইয়োরোপ জেগেছে, সেই আড়াইহাজার কি তিনহাজার বছর আগের কথা, সেদিন থেকে কখনোই ইয়োরোপ আর ঘুমিয়ে পড়ে নি, মাঝে মাঝে দু'-একটা শতাব্দীতে হয় তো দেখা গেছে তার ব্যস্ততা কিছুটা কম; কিন্তু একেবারে স্তব্ধ সে কখনো হয় নি। ইয়োরোপের তুলনায় ভারত, এশিয়া-মাইনর বা চীন অনেক আগে জেগেছে—সে হয় তো চার কি পাঁচহাজার বছর আগের কথা; কিন্তু তারপর থেকে কতোবারই না আমরা ঝিমিয়ে পড়লাম বা একেবারে ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রাণশক্তির এই যে কৃপণতা, বলতে গেলে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত অঞ্চলের মানুষ কম বেশী কখনো-না-কখনো যা অনুভব করেছে, সমগ্রভাবে ইয়োরোপের কখনোই সে জিনিসটির অভাব হয় নি। ফলে আমরা দেখছি, গত আড়াই হাজার বছর ধরেই দেখছি ইয়োরোপের এক-একটি দেশ এক এক সময় বলতে গেলে পৃথিবীর নেতৃত্ব করছে —এ নেতৃত্ব শুধু সামরিক শক্তির নয়; সমস্ত কিছু সম্পর্কেই—সমাজ,

ধর্ম, নীতি, অর্থনীতি, শিল্প-সাহিত্য, কিছুই এর আওতার বাইরে নয়। যে সমস্ত দেশে এই সমস্ত দিকে সাফল্য রাজনৈতিক তথা সামরিক শক্তির সাফল্যের সঙ্গে যুগপৎ ঘটেছে তাদের প্রভাব দেখা দিয়েছে খুবই ব্যাপকভাবে এবং কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে। প্রাচীন গ্রীস, রোম, স্পেন বা গত একশ' দেড়শ, বছরের মধ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং জার্মানীকে আমরা যেমন দেখেছি। কিন্তু এমনও দেখা গেছে যে কোনও দেশের রাজনৈতিক অবস্থায় যখন অধঃপতনের সূচনা হয়েছে বা চরম অধঃপতন ঘটে গেছে, সে অবস্থাতেও সে দেশের মানুষ সৃজনধর্মী কাজে সক্ষম হয়েছে, বিশেষ করে সাহিত্যক্ষেত্রে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সাহিত্য যেন কিছুটা প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে দেখা দেয়। যেমন ঘটেছিল ফ্রান্স, রাশিয়া বা আয়ারল্যাণ্ডে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক থেকে ইয়োরোপের সাহিত্যের আসরে নরওয়ের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তেমনি চমকপ্রদ। আকস্মিক, কারণ, যে-কোন বৃহৎ ঘটনার পূর্বে যে ছোটো ছোটো এক-আধটা লক্ষণ দেখা যায় এ সময়ে তা দেখা যায় নি এবং নরওয়ের মতো একটা দেশের কাছ থেকে কারো কিছু আশা করবার ছিলো বলেও হয় তো কেউ মনে করতো না। নরওয়ের আবির্ভাব বলতে আমরা ইবসেনের আবির্ভাব বোঝাতে চাই। এ আবির্ভাব প্রকৃতই চমকপ্রদ। কারণ, প্রথম আবির্ভাবেই এই দেশটি বিশ্বসাহিত্যে নিজের স্থায়ী আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছে। এ সম্পর্কে একটি কথা আমাদের সর্বক্ষণ মনে রাখা দরকার। তা' হলো এই যে, সাহিত্যক্ষেত্রে ইবসেনের অর্থাৎ নরওয়ের যে সাফল্য তা একান্তভাবেই সাহিত্যিক সাফল্য। কারণ নরওয়ের যেমন কখনই উল্লেখযোগ্য কোনো রাজনৈতিক প্রভাব দেখা যায় নি; ব্যক্তিগতভাবে ইবসেনও তেমনি দীর্ঘকাল স্বদেশের শাসনকর্তাদের বিষ-নজরে থেকেই সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন।

প্রথম জীবন—হেনরিক ইবসেন (Henrik Johan Ibsen, March 20, 1828—May 23, 1906) ছিলেন এক ব্যবসায়ীর ছেলে। চৌদ্দ বছর বয়সে কিশোর ইবসেনের জীবনে দেখা দিলো এক দারুণ সঙ্কট। মাত্র কয়েক মাস কবিতা লিখতে শুরু করেছেন, স্কুলের পড়ার ফাঁকে ফাঁকে করতে হচ্ছিল কাজটা। কত দিনে স্কুলের পড়াশুনো শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনো শুরু করবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আধুনিক' পরিবেশে, শিক্ষিত এবং সমঝদার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান ক'রে কাব্যচর্চায় পুরোপুরি

আত্মনিয়োগ করতে পারবেন এই যখন ছিলো তাঁর একমাত্র চিন্তা, ঠিক সেই সময়েই তাঁর জীবনে দেখা দিলো এক নিদারুণ সমস্যা। যে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা একটু বেশি বয়সে সকলকেই করতে হয়—অর্থাৎ জীবনধারণের রসদ সংগ্রহের সমস্যা, অর্থোপার্জনের সমস্যা। চলছিলো ভালোই, ওঁর বাবার ব্যবসাটি ছোটো হ'লেও অন্তত কুড়ি বছর তিনি এই ব্যবসায়ের ওপর নির্ভর ক'রেই চলতে পেরেছিলেন। কিন্তু এবার একেবারেই অচল হ'য়ে গেলো। পর পর তিন বছরের লোকসান ছোট প্রতিষ্ঠান সামলাতে পারলো না, ইবসেনের বাবা ব্যবসা তুলে দিয়ে বেকার হ'য়ে বাড়ি এসে বসলেন। মানসিক অবস্থার সঙ্গে তাঁর শরীরটাও বেশ কিছুদিন ধরে ভালো যাচ্ছিল না, এ অবস্থায় ক্রমাগত অর্থচিন্তা করতে হ'লে বাবা যে আর বেশিদিন বাঁচবেন না এ কথা ইবসেন বুঝতে পারলেন। তাই তিনিই প্রস্তাব করলেন যে, অবিলম্বে একটা রোজগারের পথ করবেন নিজের জন্যে, তাতে যদি প্রয়োজন হয় কিছুদিনের জন্যে পড়াশুনো বন্ধই থাকবে। এ সময়ে ছেলের এই প্রস্তাবেই রাজী হওয়া ছাড়া ইবসেনের বাবার আর কিছু করবার ছিলো না। বাবার এক বন্ধুর সুপারিশেই ইবসেন একটা ওষুধের দোকানে সামান্য একটা চাকরি জোগাড় করলেন।

এই ওষুধের দোকানের মালিক ভদ্রলোকটি ছিলেন একটু সদাশয় প্রকৃতির। নানা বিষয়ে কিশোরের উৎসাহ এবং আগ্রহ দেখে তিনি প্রথম থেকেই খুব খুশি ছিলেন। এবার ওদের পরিবারের কিছুটা আকস্মিক আর্থিক দুর্বিপাক এবং তার ফলে অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে কিশোরের পড়াশুনোটাও বন্ধ হ'য়ে গেছে একথা জেনে তিনি ব্যথিত হলেন। যাতে অন্ততঃ ওর পড়াশুনোটা চলতে পারে চাকরি বজায় রেখে, তার জন্যে বিশেষ বন্দোবস্ত করে দিলেন। এইভাবেই ইবসেন স্কুলের পড়াশুনো কোনমতে চালাতে লাগলেন। তারপরে, ওষুধের দোকানের মালিক ভদ্রলোকের পরামর্শ মতোই ইবসেন মনস্থ করলেন যে ডাক্তারী পড়বেন। কাজেই ডাক্তারীতে ভর্তি হবার জন্যে যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হয় তার জন্যে তৈরি হ'তে লাগলেন। কিন্তু এ পরীক্ষায় ইবসেন পাশ করতে পারলেন না। ওষুধের দোকানের চাকরীটি এ সময় পর্যন্ত বজায় ছিলো। ইবসেনের তখন বয়স ঠিক একুশ। মালিক বললেন আবার পরীক্ষার জন্যে তৈরি হ'তে। কিন্তু ততদিনে ডাক্তার হবার বাসনা ইবসেনের মন থেকে চলে গিয়েছিলো।

তার বদলে মনে ওঁর দানা বেঁধে উঠছিলো অন্য বৃহৎ একটা কল্পনার—একটা মহান্ কিছু সৃষ্টি করবার বাসনা।

বলাই বাহুল্য, কাব্যচর্চা এবং সাহিত্যের নানা বিষয়ে পড়াশুনো সেই যে শুরু হয়েছিলো তা আর বন্ধ হয় নি, বরং অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে চলছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো না করতে পারার ঘাটতিটা ইবসেন ভালো ভাবেই পুষিয়ে নিচ্ছিলেন। ওঁর জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এরকম অনেকেই বলেছেন যে, ডাক্তারীতে ভর্তি হবার পরীক্ষা দিতে গিয়ে ইবসেন যে ফেল করেছিলেন তার একমাত্র কারণ হলো ওঁর সাহিত্যপাঠের নেশা। আসলে পরীক্ষার জন্যে নির্দিষ্ট বইগুলি উনি পড়বার সময় পেতেন কি না সন্দেহ। পড়ে থাকলেও এ সমস্ত পড়াশুনোয় ওঁর মন যে আদৌ বসতো না, তা তো পরীক্ষার ফল দেখেই বোঝা গিয়েছিলো।

এই পরীক্ষায় ফেল করবার খবর জানবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইবসেন মনস্থ করে ফেলেছিলেন যে, শিল্পের সাধনাতেই জীবনটা কাটাবেন। লেখার চর্চা যে অনেক আগেই শুরু হয়েছিলো সে কথা আমরা আগেই বলেছি। এইবার ইবসেন এক বন্ধুর সঙ্গে মিলে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করলেন। একখানা সাহিত্য-পত্রিকা চালাতে হলে যে আর্থিক সঙ্গতি, ছোটোবড়ো নানা শ্রেণীর লেখকদের সহযোগিতা, বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করা তথা প্রচারের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন—এর কোনদিকেই ইবসেন বা তাঁর বন্ধু কারুই কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিলো না। কাজেই পত্রিকা বের করে' উভয়েই যাকে বলে ফাঁপরে পড়ে গিয়েছিলেন। প্রায় ন' মাস চলেছিলো, অর্থাৎ চালানো হয়েছিলো; তারপর বন্ধ হ'য়ে গেলো। পত্রিকা চালাতে গেলে নিজের লেখার খুবই ক্ষতি হয়। ন' মাস পত্রিকা চালিয়ে এ বিষয়ে ইবসেনের ধারণা হ'য়ে গিয়েছিলো বলেই পরবর্তী জীবনে অনেকে প্রচুর টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য করতে ইচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও উনি কখনো আর নিজে পত্রিকা চালাবার ঝুঁকি নেন নি, যদিও লেখক হিসাবে অনেক পত্রিকাই ওঁর সহযোগিতা পেয়েছে।

সাহিত্য সাধনার শুরু—পত্রিকার ব্যাপার নিয়ে প্রায় বছর খানেক কাটবার পর ইবসেন আবার নতুন করে নিজের লেখা এবং পড়ায় মনোনিবেশ করলেন। এবার বিশেষ করে নাটকের দিকে ওঁর ঝোঁক দেখা গেলো। প্রাচীন আধুনিক কিছুই বাদ দিতেন না। বিশেষ করে

ইসকাইলাস, ইউরিপিদেস, সোফোক্লেস, আরিস্তোফানেস, কালদেরন, শেক্‌সপীয়ার এবং মলিয়েরের সমস্ত রচনা একাধিকবার পড়ে ফেললেন ইবসেন। বালক এবং কিশোর ইবসেনকে যাঁরা জানতেন তাঁরা অনেকদিন ধরেই আশা করেছিলেন ছাপার অক্ষরে ওঁর কিছু বই দেখবার জন্যে। কিন্তু বছরের পর বছর চলে যায়, বয়স কুড়ি পার হয়ে গেলো অথচ একখানাও বই বেরুলো না দেখে অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে লেখা বা পড়াটা ওঁর একটা খেয়াল। আসলে লেখক হবার কোন বাসনা ওঁর নেই।

লেখার চর্চা অনেকদিন থেকে করলেও ইবসেনের প্রথম বই প্রকাশিত হয়েছিলো ওঁর ঠিক বাইশ বছর বয়সে। ওঁর প্রথম বইয়ের নাম 'ক্যাটিলিনা'—একখানি নাটক। লুসিয়াস সেগিয়াস ক্যাটিলিনা রোমান রাজনীতির একটি অতি জটিল চরিত্র। দীন-দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও ক্যাটিলিনা নিজের যোগ্যতার জন্যে অল্পবয়সেই সরকারী চাকরি লাভ করেন এবং এক সময়ে আফ্রিকায় রোমের শাসনাধীন সমস্ত অঞ্চলের গভর্ণর পর্যন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তারপর সিসেরো এবং অন্য কয়েকজন প্রভাবশালী সিনেটারদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার জন্যে অকালেই তাঁর পতন হয়। একাধিক ইতিহাসকার ক্যাটিলিনাকে একজন 'হিরো' শ্রেণীর চরিত্র হিসেবে দেখিয়েছেন। ইবসেনও সেইভাবেই তাঁর নাটকখানি রচনা করলেন। এ নাটক পদ্যে রচিত। প্রথম মঞ্চস্থ হবার পরে সাহিত্য হিসেবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ক্যাটিলিনার প্রচুর সুখ্যাতি হলো। কিন্তু দর্শকমহল খুব ভালভাবে নিলো না। এর একটি প্রধান কারণ হলো একটানা দীর্ঘ, প্রায় বক্তৃতার মতো কথোপকথন। মঞ্চে ক্যাটিলিনার আশানুরূপ সফলতা না দেখে ইবসেন মনস্থ করলেন যে, নাটক লেখার সঙ্গে সঙ্গে নাটক মঞ্চস্থ করবার কলাকৌশলও শিখবেন।

একটানা আট বছর চাকরি করবার পর এবার ওষুধের দোকান থেকে বিদায় নেবার সময় এলো। মঞ্চের প্রয়োগকৌশল শেখবার বাসনা জন্মালেও ঠিকমতো যোগাযোগ হয়ে উঠছিলো না। কিন্তু একটা কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরি যোগাড় হয়ে গেলো। ওষুধের দোকানের মালিক ভালো মনেই ছেড়ে দিলেন ইবসেনকে। সম্পর্কটা মালিক এবং কর্মচারীর হলেও উভয়ে উভয়ের প্রতি মানুষ হিসেবে খুবই প্রিয় ছিলেন, আর তা' ছাড়া এইখানে কর্মরত অবস্থাতেই বাস্তব এবং ব্যবহারিক জীবনের অনেক কিছু

সম্পর্কেই প্রচুর জ্ঞানলাভ করেছিলেন ইবসেন, নানা ধরনের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়ে। তাই জীবনের বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের দিকে পা বাড়াতে হলেও ইবসেন এই ছোটো ওষুধের দোকানটি ছেড়ে আসবার সময় ব্যথিত হয়েছিলেন।

দু' বছর সাংবাদিকতার পরে ইবসেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত একটা কাজ পেলেন একটা থিয়েটারে। প্রথমে সহকারী পরিচালক, তারপর পরিচালকের কাজ। এটা হলো বার্গেনের একটা থিয়েটার। এর পর ক্রিশ্চিয়ানার ন্যাশন্যাল থিয়েটারেও পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন ইবসেন। ১৮৫৩ থেকে ১৮৬২, মোট এই ন' বছর দু'টো থিয়েটারের সঙ্গে পরিচালক হিসেবে যুক্ত থাকবার সুযোগ পেয়ে এবার মঞ্চের ওপর নাটকের সফলতা অর্জনের জন্য যাবতীয় খুঁটিনাটি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করলেন ইবসেন। ক্যাটিলিনা প্রকাশিত হয় ১৮৫০ সালে; তারপর থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত আর যে ক'খানি নাটক ইবসেন রচনা করলেন তার প্রত্যেকটিই মঞ্চেও অভাবিত জনপ্রিয়তা অর্জন করলো এবং দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে ইবসেন স্বীকৃতিলাভ করলেন। 'লেডী ইনগার অব অসট্রাট', 'দি ভাইকিংস অব হেলগেল্যাণ্ড' ও 'দি রাইভাল কিংস'। এ তিনখানা নাটকের উপজীব্যই হলো উত্তর ইয়োরোপ অর্থাৎ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাসের ছায়ানুসরণে রচিত কাহিনী। এ পর্যন্ত নাট্যকার হিসেবে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার বাইরে ইবসেনের তেমন কিছু পরিচিতি ঘটে নি। যদিও জার্মানীতে তাঁর দু'খানা নাটকের অভিনয় হয়েছিলো।

এই সময় অর্থাৎ ১৮৬৪ সালে একটা ব্যাপার ঘটলো যে জন্যে ইবসেন দেশত্যাগী হলেন। কয়েকটি দ্বীপের মালিকানা তথা সীমান্ত নিয়ে ডেনমার্কের সঙ্গে জার্মানীর সৃষ্টি হলো বিরোধ। ক্ষুদ্র ডেনমার্ক জার্মানীর সঙ্গে পেরে উঠবে কেন একা, তাই সে চাইলো নরওয়ের সাহায্য। কিন্তু নরওয়ে এগুতে সাহস পেলো না। জাতীয় সরকারের এই দুর্বলতা দেখে ক্ষুব্ধ হলেন ইবসেন। নরওয়ে, সুইডেন এবং ডেনমার্কের অধিবাসীরা সংস্কৃতিগতভাবে বলতে গেলে একই। রাজনীতির টানাপোড়েনে কখনো কখনো এই তিনটি অঞ্চলের অধিবাসীরা পরস্পর থেকে শাসকের প্রয়োজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও নরওয়ের একজন সাধারণ মানুষ ডেনমার্কের একজন সাধারণ মানুষকে বরাবরই একান্ত আপনার মনে করে। দেশের সরকারের দুর্বলতার তীব্র প্রতিবাদ করলেন

ইবসেন প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে, তারপর দেশত্যাগী হলেন। দীর্ঘ আটাশ বছর (১৮৬৪-৯২) ইবসেন দেশের বাইরে কাটিয়েছেন। এই আটাশ বছর জার্মানী এবং ইতালীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন ইবসেন। রোম, ড্রেসডেন এবং মিউনিখে কয়েক বছর করে বাস করেছেন। বিদেশে অর্থকষ্টে কাটাচ্ছেন স্বদেশের দু' একটি পত্রিকায় এ সংবাদ বেরোবার পরেই নরওয়ের সরকার ইবসেনের জন্যে একটা মাসিক ভাতার বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন। এটা ১৮৬৬ সালের কথা। এরপর ইবসেন আরো চল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন ; এবং নাম, খ্যাতি ও উপার্জনের দিক থেকে ওঁর তখন প্রকৃতই সুসময়।

১৮৬৪ সালে ইবসেন যখন দেশত্যাগী হলেন তখন থেকে ওঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু বলা যেতে পারে। এই পর্বভাগটা আমরা ইবসেনকে বুঝবার সুবিধের জন্যেই করছি। ১৮৬৪ থেকে ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত এই দ্বিতীয় পর্বের কার্যকাল বলে আমরা মনে করবো। ১৮৭৭ থেকে ইবসেনের জীবনের তৃতীয় পর্বের শুরু বলে আমরা মনে করবো। কারণ ঐ বছরই তাঁর সমাজসমস্যামূলক বাস্তবধর্মী গদ্য নাটকগুলির প্রথমটি—'দি পিলারস অব সোসাইটি' প্রকাশিত হয়েছিলো।

জীবনের দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখতে পাই নাটক রচনার ব্যাপারে ইবসেনের দক্ষতা যেমন প্রাচীনপন্থী যে কোনো নাট্যকারের দক্ষতার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এইরকম উচ্চমানে উন্নীত হয়েছিলো, ঠিক তেমনি যে কোনো নাটকের মঞ্চ-সাফল্যের জন্যে প্রয়োগ-কৌশল সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান নিখুঁত হয়ে উঠেছিলো। রোমে আসবার পর অনেক তরুণ নাট্যসম্প্রদায়ের উৎসাহী শিল্পীরা আসতেন মঞ্চ-প্রয়োগকৌশল সম্বন্ধে ইবসেনের কাছ থেকে শেখবার জন্যে এবং বুঝবার জন্যে। ড্রেসডেন এবং মিউনিখেও ঠিক একই অবস্থা হতো। বলাই বাহুল্য, তরুণ নাট্যকার এবং শিল্পীরা সবসময়ই ইবসেনের কাছ থেকে পরামর্শ পেতেন। দ্বিতীয় পর্বে ইবসেন মোট তিনখানি নাটক রচনা করেছিলেন—'ব্র্যাণ্ড' (১৮৬৬) ; 'পীয়ার গিণ্ট' (১৮৬৭) এবং 'এমপারার এণ্ড গ্যালীলিয়ান' (১৮৭৩)। পদ্যে রচিত ক্লাসিকধর্মী এই নাটক তিনখানিকে প্রাচীনপন্থী ভাববিলাসী ইবসেনের কাব্য ও নাট্যপ্রতিভার পরিণত প্রকাশ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কেন, আমরা একে একে এবং সংক্ষেপে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করবো।

দেশত্যাগ করবার সময় নাট্যকার হিসেবে ইবসেনের স্বীকৃতি প্রধানতঃ নরওয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু ব্র্যাণ্ড প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইবসেন গোটা ইয়োরোপে একজন প্রথম শ্রেণীর নাট্যস্রষ্টা হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন। ব্র্যাণ্ড নাটকে কবি হিসেবে যেমন ইবসেনের প্রতিভা পাঠককে মুগ্ধ করে, বিষয় নির্বাচনও তেমনি অনায়াসেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুরাতনের খোলস বজায় রেখেই যে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যায় ব্র্যাণ্ড তারই প্রমাণ।

ব্র্যাণ্ড—ব্র্যাণ্ড একজন পাদ্রী। সজ্ঞানে কোনোপ্রকার অন্যায় না করতে ব্র্যাণ্ড দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু তার এই দৃঢ়তা একাধিকবার একাধিকজনের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ালো। কোনটা অন্যায়? কি কাজ করলে ন্যায় হয়, কি করলেই বা অন্যায় হয়? ব্র্যাণ্ড তার নিজস্ব কতকগুলি ধারণার দ্বারা আগাগোড়া পরিচালিত। ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে তার নিজস্ব ধারণা আছে এবং সেই ধারণানুযায়ী কেনো অবস্থাতেই সে কোনোপ্রকার অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করে চলে না। ব্র্যাণ্ড যেমন পরিশ্রমী তেমনি দুঃসাহসী। কোনো অবস্থাতেই কর্তব্যকর্ম থেকে কেউ তাকে বিচ্যুত করতে পারে না, এমন কি নিজের মৃত্যুভয়ও না। একদিনের ঘটনা:

ব্র্যাণ্ডের কানে গেল যে একটি কৃষকের মেয়ে মৃত্যুশয্যায়। কাজেই সেখানে অবিলম্বে ব্র্যাণ্ডের উপস্থিতি প্রয়োজন। কারণ, জায়গাটা ব্র্যাণ্ডের গীর্জার অঞ্চলভুক্ত। কৃষকটি নিজে বার বার ব্র্যাণ্ডকে বারণ করতে লাগলো যে, এই দুর্যোগের মধ্যে বের হবেন না। কারণ, একে তো দারুণ কুয়াশা পড়ছে, দু'গজ দূরেরও কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তারপর সেখানে গিয়ে পৌছতে হলে একটা নদী পেরুতে হবে—যে নদীর জল খুব সম্ভব এতক্ষণে জমতে আরম্ভ করেছে নিদারুণ ঠাণ্ডায়। জমতে আরম্ভ করেছে কিন্তু একেবারে জমে নি; অর্থাৎ নদীর নীচের জল এখনো তরল, কিন্তু ওপরের অংশ জমতে আরম্ভ করেছে। তার ফলে ওপরের তুষারখণ্ডগুলি এখন রীতিমতো সঞ্চরণশীল। তার ওপর দিয়ে না চলে হাঁটা, না চালানো যাবে নৌকো সে নদীতে—কাজেই সে নদী পার হওয়া অসম্ভব। নিজের কন্যার মৃত্যুকালীন পাদ্রীদর্শন এবং পাদ্রীর মুখের পুণ্যবাণী শ্রবণের চাইতে পাদ্রীর জীবনরক্ষার সৎ পরামর্শ দেওয়া কৃষক অধিকতর প্রয়োজনীয় মনে করলো। কিন্তু ব্র্যাণ্ড ভিন্নজাতের মানুষ। কর্তব্যের চাইতে বড়ো তার কাছে কিছুই নয়। তাই দেখা যায় জীবনের

অনিত্যতা, তুচ্ছতা এবং সহস্র ত্রুটির কথা উল্লেখ করে, জোরদার একটা বক্তৃতা দিয়ে ব্র্যাণ্ড কৃষকটিকে ঠেলে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লো তার দুঃসীম কর্তব্যসাধনের জন্যে। আর একদিনের ঘটনা :

ব্র্যাণ্ড একটা ফিওর্ডের (পর্বতসংকুল তীরভূমির মধ্যে ঢুকে-পড়া সমুদ্রের ফালি) পাড়ে দাঁড়িয়ে। এখুনি অবিলম্বে তাকে ওপারে যেতে হবে। কেন না তার কাছে খবর এসেছে, একটি লোক যে বেশ কয়েকটা খুনজখম করেছে সে বর্তমানে মৃত্যুশয্যায়। পাদ্রী ব্র্যাণ্ডের মুখের দু' চারটি পূত-পবিত্র সান্ত্বনা-বাক্য না শুনে সে মরতে পারছে না, কাজেই এখুনি ব্র্যাণ্ডের ওপার যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যাওয়া যাবে কি করে? কোনো মাঝি বর্তমানে এই ফিওর্ডের মধ্য দিয়ে নৌকো চালাতে রাজী নয়। কারণ, প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে। বাতাসের যে তীব্রতা তাতে দম নেওয়াই দুষ্কর, এর মধ্যে কি আর নৌকো চালানো সম্ভব? ব্র্যাণ্ড অনেক করে জেলেদের বোঝাবার চেষ্টা করলো, তারা ব্র্যাণ্ডের মস্তিষ্কের স্থৈর্য সম্পর্কেই সন্দিহান হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত একটি মহিলা ব্র্যাণ্ডের আদর্শবাদে মুগ্ধ হয়ে রাজী হলো ওকে সাহায্য করবার জন্যে। নারী ধরলো হাল আর ব্র্যাণ্ড পালের দড়ি ধরলো। প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে ব্র্যাণ্ড রওনা হলো তার কর্তব্য সমাধা করবার জন্যে। এই রমণীকেই পরে ব্র্যাণ্ড তার স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে। কারণ, নিজেকে যেমন ব্র্যাণ্ড আদর্শ পুরুষ হিসেবে মনে করে, এই রমণীর মধ্যে তেমনি আদর্শ নারীর সমস্ত গুণের লক্ষণ সে দেখতে পেলো। যথা সময়ে একটি ছেলে হলো ওদের। দু'জনেই সুখী ওদের সন্তান নিয়ে। কিছুকাল পরে মারা গেলো ছেলেটি দারুণ ঠাণ্ডায় ভুগে। ব্র্যাণ্ডের স্ত্রী মৃতসন্তানকে কোলে করে বসে কাঁদছে, এমন সময় ওদের সামনে এলো একটি জিপসী—তার উলঙ্গ শিশুটি ঠাণ্ডায় জমে যায় আর কি। ব্র্যাণ্ড নির্দেশ দিলো স্ত্রীকে তার মৃতসন্তানের জামাটা খুলে জিপসীকে দিতে। কয়েকটা জামা ওর গায়ে ছিলো। শোকে বিহ্বল নারী একটি বাদে আর সব ক'টা জামাই তার মৃতশিশুর গা থেকে খুলে জিপসীকে দিয়ে দিলো। ঐ একটি ছোট্ট জামা ও রেখে দিতে চায় তার সন্তানের স্মৃতিস্বরূপ। কিন্তু ব্র্যাণ্ড বললো, না, তা' চলবে না। এটা আদর্শের প্রশ্ন। জিপসীর সন্তানকে বাঁচাবার সমস্ত চেষ্টাই করা দরকার। কাজেই স্মৃতির ভুয়ো প্রশ্ন তুলে ঐ জামাটাও রাখা চলবে না। স্ত্রী স্বামীর নির্দেশ মেনে চললো। কিন্তু এতে শোকের তীব্রতা এতই বেড়ে গেলো যে তার নিষ্প্রাণ দেহ লুটিয়ে পড়লো।

কিন্তু ব্র্যাণ্ড তবু কর্তব্যে অটল। এমনিধারা একটির পর একটি ঘটনার দ্বারা ব্র্যাণ্ডের চরিত্র যেভাবে প্রকটিত হলো তাতে সাধারণের কাছে ও একজন সন্ত হিসেবে খ্যাত হলো। নবনির্মিত ছোটো গির্জাটিতে আর লোক ধরে না ব্র্যাণ্ডের উপদেশ শোনবার জন্যে। বাইরে দারুণ ঠাণ্ডা, :তুষারপাত হচ্ছে। তারই মধ্যে ব্র্যাণ্ড আহ্বান জানায় সবাইকে—এখানে এই ছোটো জায়গায় কি আর ঈশ্বরের কথা বলা যায়, না শোনা যায়। চলো আমরা সবাই ঈশ্বরের নিজস্ব ভূমিতে ঐ সুউচ্চ পাহাড়ের ওপর উঠে গিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করি। এই বলো ধর্মোন্মাদ ব্র্যাণ্ড বেরিয়ে এগুতে লাগলো পাহাড়ের দিকে। কিন্তু পাহাড়ের গা বেয়ে খানিকটা এগুবার পরই স্খলিত হিমানী স্তূপের মধ্যে তার দেহ হারিয়ে গেলো।

ব্র্যাণ্ডের চরিত্র যা ইবসেন এঁকেছেন তা' যে রীতিমতো Heroic সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু, পাদ্রী না বানিয়ে ইবসেন তাকে অন্য কিছুও বানাতে পারতেন। ধর্মে নিষ্ঠার নামে এই যে গোঁড়ামি বা গোঁয়াতু‍র্মি এটা ইবসেন ধর্মের বিরুদ্ধতা করবার জন্যে বিদ্রূপ করেই করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। শ-য়ের ভাষায় পাদ্রী ব্র্যাণ্ড is a villain by virtue of his determination to do nothing wrong.

পীয়ার গিণ্ট—ইবসেনের সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয় সৃষ্টি হলো 'পীয়ার গিণ্ট' (১৮৬৭)। 'পীয়ার গিণ্ট' প্রায় পৌনে তিন শ' পৃষ্ঠার একখানি বিরাট নাট্যকাব্য। পাঁচ অঙ্কে মোট পঁয়ত্রিশটি দৃশ্যে এই নাটকখানি রচিত হয়েছে। এর স্থান নির্বাচনেও ইবসেন আন্তর্জাতিকতার পরশ দেবার চেষ্টা করেছেন। নরওয়ের একটি পার্বত্য অঞ্চলে এ নাটকের শুরু এবং আর একটি পার্বত্য অঞ্চলে এর শেষ দৃশ্য রচিত—কিন্তু এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই নায়ক পীয়ারকে কখনো মরক্কোতে, কখনো সাহারায়, কখনো বা কাইরোর পাগলাগারদে। জীবনের প্রথম দু'টি পর্বের মধ্যে 'পীয়ার গিণ্ট' যে ইবসেনের শ্রেষ্ঠকীর্তি এ বিষয়ে সমস্ত দেশের সমালোচকগণই একমত। তবে কেন ইবসেন এ নাটকখানি রচনা করেছিলেন সে সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত আছে।

রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর জীবদ্দশায় জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে বিচার করলে শরৎচন্দ্রের কাছে হার মানতেন, পীয়ার গিণ্ট-এর প্রকাশ পর্যন্ত স্বদেশে

ইবসেনেরও অনেকটা সেই রকম অবস্থা ছিলো। ইবসেনের নামোল্লেখেই সবাই মাথা নোয়াতো, কিন্তু সে হলো না বুঝে শ্রদ্ধা প্রদর্শন—একটা বিরাট কিছু একথা সবাই বলছে, কিন্তু তাঁর বিরাটত্বকে বুঝবার কষ্টটা সাধারণ পাঠকেরা কেউ বড়ো একটা করতে রাজী নয়—কাজেই জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে দেখা যেতো বিয়র্নস্টার্ণ বিয়ার্নসন সকলের ওপরে। বিয়ার্নসন ছিলেন প্রধানতঃ গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক। ওঁর 'আর্নে' এবং 'ইন গডস ওয়ে' নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টি। বিয়ার্নসনকে নোবেল পুরস্কারও দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু তবু আজকের দিনে এ কথা সকলেই স্বীকার করে থাকেন যে কি বিষয়বস্তু নির্বাচন আর কি গভীরতাবোধ বা জীবনের ব্যাপকতাবোধ, ইবসেনের সঙ্গে বিয়ার্নসনের কোনো তুলনাই হয় না—যেমন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের তুলনা করা চলে না। আর তা' ছাড়া, বয়সে ইবসেন মাত্র চার বছরের বড়ো হলেও বিয়ার্নসন নিজে বুঝতেন যে ইবসেন কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী। তাই দেখা যায় 'পীয়ার গিণ্ট' প্রকাশিত হবার পরে স্বদেশের একখানি মাসিকপত্রে বিয়ার্নসন এ রচনার আলোচনা করে নানা কথার পরে বলছেন :

'নরওয়েজীয়ানদের যা কিছু দোষ, তাদের অতিমাত্রায় অহংবোধ, সঙ্কীর্ণতা, আত্মসন্তুষ্ট ভাব—এ সব কিছুরই চমৎকার শ্লেষপূর্ণ রচনা পীয়ার গিণ্ট। এর রচনাশৈলীতে আমি মুগ্ধ, অন্তরে আমি বার বার লেখককে আমার শ্রদ্ধা জানিয়েছি—এবং এখন প্রকাশ্যে আর একবার জানাচ্ছি।'

কিন্তু ডেনমার্কের প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক জর্জ ব্রাণ্ডেস বলেছেন : 'জার্মানীর সাহিত্যরসিকমহলে সকলের ধারণা যে বিয়ার্নসন নরওয়ের যে যুবসমাজের জয়গানে মুখর, যাদের কোনো দোষ তাঁর চোখে পড়ে নি, ইবসেন ঠিক তাদেরই দুর্বল দিকটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন এ নাটকে ; কাজেই সজ্ঞানভাবে তাঁকে বিয়ার্নসনের বিরোধিতায় নামতে হয়েছে।

এক সময়ে যে ইবসেন স্বদেশে তাঁর যথাযোগ্য জনপ্রিয়তা লাভ করেন নি, এটাও তার একটা কারণ। প্রখ্যাত ফরাসী সমালোচক অগাস্ট এরহার্ডও এই মত পোষণ করতেন। এ সমস্ত ধারণার মধ্যে যে কতটা সত্যতা আছে তা' আজকের দিনে বুঝতে যাওয়ার অনেক বাধা আছে। এ নাট্যকাব্য রচনার মূল প্রেরণা ইবসেন যেথান থেকেই পেয়ে থাকুন না কেন, কিছুটা অগোছালো

ভাবে ছড়ানো এ নাটকের নানা গভীরতত্ত্ব সযত্ন অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। যাঁদের এ নাটক ভালো লাগে নি তাঁরাও ইবসেনকে বুঝবার জন্যে এ নাটকখানির বিশেষ গুরুত্ব দেন। যাঁদের ভালো লেগেছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ। শ-য়ের মতে 'পীয়ার গিণ্ট' সমস্ত দিক দিয়েই ব্র্যাণ্ডের পরে একটা লক্ষণীয় অগ্রগতি। যাদের ভালো লাগে নি তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জর্জ ব্রাণ্ডেস (ইবসেন ব্যাখ্যাতা হিসেবে এঁর স্থান শ-য়ের চাইতে কমত নয়ই; বরং অধিকতর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। ব্রাণ্ডেস তাঁর তুলনামূলক সাহিত্যালোচনার বই "ইবসেন এণ্ড বিয়ার্নসন"-এ পীয়ার গিণ্ট সম্বন্ধে লিখেছেন:—

'কি বিরাট এবং মহান্ সৃষ্টি-শক্তি একটা মাথামুণ্ডুহীন রচনা তৈরির জন্যে অপচয় করা হয়েছে। আত্মার অবমাননা এবং মানবতার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা—এর 'ওপর ভিত্তি করে 'কখনো সাহিত্য রচিত হতে পারে না।' ব্রাণ্ডেস ইবসেনের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। ব্রাণ্ডেস-এর স্বভাবই ছিলো স্পষ্ট করে খোলাখুলি ভাবে নিজের মত প্রকাশ করা। ব্রাণ্ডেস-এর উক্তির ফলে ইবসেনের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো তা জানা যায় না।

কিন্তু সে সময়কার ডেনমার্কের আর একজন বিখ্যাত সমালোচক ক্লেমেন্স পেটারসেন যখন একটা পত্রিকায় লিখলেন যে:

'বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটা দৃশ্য পীয়ার গিণ্টের মন্দ হয় নি, কবিতা হিসেবেও দু'একটা লাইন মন্দ নয়, কিন্তু সমগ্রভাবে রচনাটি একটি নিকৃষ্ট কীর্তি' —তখন দেখা গেলো ইবসেন ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এই সময়ে বিয়ার্নসনকে একখানি চিঠিতে ইবসেন লিখেছিলেন:

'পীয়ার গিণ্ট একখানি খাঁটি কাব্য। এ কথা এখনই স্বীকৃত না হলেও, পরে প্রমাণিত হবে। আপনারা দেখতে পাবেন, আমাদের দেশের অর্থাৎ নরওয়ের কবিতা ও কাব্যের বিচারে 'পীয়ার গিণ্ট'ই ভবিষ্যতে মানদণ্ড হিসেবে গণ্য হবে।'

ইবসেনের এ ধারণা তাঁর জীবদ্দশাতেই সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো। এ ছাড়াও দেখা যায় ইবসেন তাঁর প্রকাশককে পীয়ার গিণ্টের প্রথম তিনটি দৃশ্যের পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিয়ে একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন:

'এই রচনাটিতে হাত দেওয়ার পর থেকেই মনে আমার একটা নতুন ধরনের অনুভূতি বোধ করছি, লেখা যতোটুকু হয়েছে তাতেই আমার

নিজের বিশ্বাস যে মনে মনে আমি ঠিক যা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম, তা করতে পেরেছি, আপনার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।'

পীয়ার গিণ্ট প্রকাশিত হবার পরে প্রথম যে নিন্দা এবং প্রশংসার ঝড় উঠেছিলো তার প্রায় দশ বছর পরে ইবসেন তাঁর বন্ধু সমালোচক ব্রাণ্ডেসকে লিখেছিলেন :

'পীয়ারকে কি আপনার ভালো লাগে নি? আমার ধারণা এ একটি উৎকৃষ্ট চরিত্র। আর পীয়ারের মা? এ রকম একজন মাকে কার না ভালো লেগে পারে? সে যে আমারও মা। আমারও বাবা পীয়ারেরই মতো খুব অল্পবয়সে বিত্তহীন অবস্থায় মারা যান···।'

ইবসেনের এই চিঠি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে পীয়ার গিণ্ট নাট্যকাব্যে তাঁর নিজের জীবনের বেশ খানিকটা রয়ে গেছে। এবং সেই জন্যেই সমগ্রভাবে ইবসেনকে বোঝবার জন্যে পীয়ার গিণ্ট একখানা অবশ্যপাঠ্য রচনা।

হ্যামলেট, ফাউষ্ট বা প্যারাসেলসাস যেমন শেক্‌স্‌পীয়ার, গ্যয়টে বা ব্রাউনিং-এর পূর্ব থেকেই কিংবদন্তীতে খুবই জনপ্রিয় ছিলো, 'পীয়ার গিণ্ট'ও অনেকটা সেই রকম। প্রাচীন ভাইকিংদের যুগের অবসানের পরে ইয়োরোপের উত্তরাঞ্চলে এমন কি মধ্য ইয়োরোপেরও পার্বত্য অঞ্চলে একশ্রেণীর লোক দেখা যেতো—তারা ছিলো শিকারী। এদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সাধারণের কখনই খুব বেশি কিছু জানা সম্ভব হয় নি। কখনো কখনো লোকালয়ের সংস্পর্শে যখন এরা এসে পড়ে তখনই সাধারণ মানুষের এদের সম্পর্কে জানবার সুযোগ হয়। আর তা ছাড়া অপেশাদার শিকারীদের মুখ থেকেও এদের সম্পর্কে নানা কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক শ' বছর থেকে নরওয়েতে এমনই একটি শিকারীর কাহিনী লোকের মুখে মুখে শোনা যায়। সেই হলো এই 'পীয়ার গিণ্ট'। ইবসেন এই কিংবদন্তীমূলক চরিত্রটিকে নিয়েই তাঁর 'পীয়ার গিণ্ট' নাট্যকাব্য রচনা করলেন। বলাই বাহুল্য ইবসেন তাঁর রচনায় যে কাহিনী পরিবেশন করলেন তা যেমন তাঁর নিজস্ব, নাটকের যা বক্তব্য তা'ও তাঁর নিজস্বতায় ভাস্বর।

'পীয়ার গিণ্ট' একজন ভাববিলাসী যুবক, ব্র্যাণ্ডের মতো ভুল সে করে না। নিজের আদর্শ রূপায়ণের জন্যে সে ব্র্যাণ্ডের মতো কঠোর বা

দৃঢ়চেতা নয়। ব্র্যাণ্ডের বেলায় দেখা গেছে তার আদর্শ সে জবরদস্তি করে নরনারী নির্বিশেষে সকলের ওপর চাপাচ্ছে, কিন্তু পীয়ার তা করে না। পীয়ার তার আদর্শকে একান্তই তার নিজস্ব বলে মনে করে এবং তার আদর্শের গোপনীয়তাও রক্ষা করতে চেষ্টা করে। এ্যাডভেঞ্চারই হলো পীয়ারের জীবনাদর্শ। পীয়ার পাহাড়ের ওপর তার কুটিরের দরজায় লিখে রেখেছে: 'পীয়ার গিণ্ট, এমপারার অব হিম্‌সেল্‌ফ।' নানা উপায়ে শিকারের নানা পদ্ধতি পীয়ার ক্রমাগতই উদ্ভাবনের চেষ্টা করে। কখনো বা দেখা যায় অতি-প্রাকৃত উপায়ও সে অবলম্বন করছে। একসময় ওদের অঞ্চলে নবাগত একটি পরিবারের সঙ্গে পীয়ারের পরিচয় হয়, তাদের একটি মেয়ে সোলভেগ এর সঙ্গে পীয়ারের প্রণয়ের লক্ষণ প্রকাশ পেলো। কিন্তু অকস্মাৎ দেখা গেলো পীয়ার একসময় আমেরিকায় এসে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করলো। তারপর আমেরিকা থেকে আফ্রিকা আসবার সময় পীয়ারের হলো এক দুর্বিপাক—যে ছোট্ট জাহাজে করে ও এসেছিলো সেখানা করলো একজনে চুরি, কিন্তু তারপরে চোখের ওপরই দেখলো বয়লার ফেটে ছোট্ট জাহাজখানা ধ্বংস হয়ে গেলো। এরপর দেখা যায় পীয়ার একটা সাদা ঘোড়ার সওয়ার হয়ে চলেছে তার এ্যাডভেঞ্চার স্পৃহা চরিতার্থ করবার জন্যে। মরু অঞ্চলে এক আরব উপজাতি থাকে। তাদের চোখে সাদা ঘোড়ার সওয়ার মানেই ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ। তারা সেইভাবেই পূজো করতে লাগলো পীয়ারকে। পীয়ার এতদিনে বুঝলো যে সে তার অন্তর্নিহিত গুণের জন্যেই সমাদর পাচ্ছে (যদিও আসলে তা নয়, আরবদের কুসংস্কারই হচ্ছে এর কারণ)। কিন্তু এই ধর্মগুরুগিরি পীয়ারের বেশিদিন করা হলো না। এক নর্তকীর প্রেমে পড়লো ও। কিন্তু এই নর্তকী ওর সাদা ঘোড়াটি চুরি করে চরম বিপদে ফেললো পীয়ারকে। ঘুরতে ঘুরতে পীয়ার স্ফিনক্স-এর কাছে এসে পৌঁছলো। সেখানে পরিচয় হলো এক জার্মানের সঙ্গে। এই জার্মানটি পীয়ারকে নিয়ে এলো কাইরোর পাগলা-গারদে। এখানকার পাগলেরা তাদের রক্ষীদের বন্দী করে নিজেরা স্বাধীনভাবে হুল্লোড়ে মেতে উঠেছে। এই পাগলেরা পীয়ারকে পেয়ে খুবই খুশী—তাদের সম্রাটপদে অভিষিক্ত হলো পীয়ার। এইভাবে নিজের খেয়াল এবং এ্যাডভেঞ্চারের নেশা চরিতার্থ করতে করতে পীয়ার এক সময় আবার স্বদেশে তার প্রথম

প্রণয়িনীর কাছে ফিরে এলো। এখন পীয়ারও প্রৌঢ়, নারীও প্রৌঢ়া—সমস্ত জীবনটাই যে একটা খেয়ালের ওপর কেটে গেলো এতদিনে পীয়ার তা উপলব্ধি করলো। পীয়ার নিজের বাস্তব জীবন পর্যালোচনা করে দেখতে পারলো যে, তার আদর্শ কোথায়ও কখনো পূর্ণ হয় নি, উপরন্তু নানা ঘটনার প্রবাহে তার নিজেরই প্রকৃতি গেছে পাল্টে। তাই পীয়ার সোলভেগ-এর কল্পনায় এখনো যে যুবক 'পীয়ার-এর' স্মৃতির পরশ পায় তার মধ্যেই দেখতে পায় আদর্শ পীয়ার গিণ্টকে।

দ্বিতীয় পর্বের তৃতীয় 'এম্পারার এণ্ড গ্যালিলীয়ান' 'পীয়ার গিণ্ট'-এর ছ'বছর পরে প্রকাশিত। আয়তনে বিরাট এ নাটকখানির মধ্যে বাস্তবিকপক্ষে হু'খানা নাটকের মালমসলা রয়েছে। 'জুলিয়ান এণ্ড দি ক্রাইস্ট' নামেও কেউ কেউ নাটকখানির অনুবাদ করেছেন। যীশুর আবির্ভাব এবং তার ফলে রোমান সাম্রাজ্যে যে নানা পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিলো এই সুবৃহৎ নাটকে ইবসেন তারই কিছু কিছু দেখাবার চেষ্টা করেছেন। ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে এর মূল্য সর্বজনস্বীকৃত। খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে ইবসেনের নিজস্ব ব্যাখ্যাও এ নাটকের অন্যতম সম্পদ।

সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজের পরিবর্তন ঘটানো জীবনের যে কোনোদিকেই অত্যন্ত অসাধারণ ব্যাপার সন্দেহ নেই। একজন সাহিত্যিকের পক্ষে এ জিনিসটা আরো বেশী কষ্টকর ব্যাপার। কারণ, কিছুদিন লেখার চর্চা করার পরে দেখা যায় প্রত্যেক লেখকেরই একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠে এবং প্রকৃতই অসাধারণ স্রষ্টা ব্যতীত, অর্থাৎ অফুরন্ত ভাবধারণার উৎস যাঁদের মধ্যে রয়েছে তাঁরা ব্যতীত, নিজের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরে যেতে পারেন না বা মূল বক্তব্য কিংবা ভাবের দিক থেকে ভিন্ন ধরনের সৃষ্টিও করতে পারেন না। প্রথম যৌবনে ইবসেন সুন্দর সুন্দর প্রেম-কাহিনীর নাটক রচনা করলেন, পরিণত বয়সে তিনিই সমাজসংস্কারমূলক, চাই কি সামাজিক সম্বন্ধে আমূল পরিবর্তন ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে বৈপ্লবিক চিন্তাধারাপূর্ণ নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন। সেও একখানা বা হুখানা নয়; একটির পর একটি করে মোট বারোখানা। এ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়েই চেস্টারটন লিখেছিলেন:

Ibsen, in his youth, wrote almost classic plays about Vikings; it was in his old age that he began to break windows and throw fireworks.

সাহিত্য সাধনার পরিণত রূপ—নাট্যসাহিত্যে যুগপ্রবর্তক হিসেবে ইবসেনের যে খ্যাতি তা প্রধানতঃ জীবনের তৃতীয় পর্বে রচিত এই বারোখানা গদ্যে রচিত সামাজিক নাটকের জন্যে। এ পর্বের শুরু ১৮৭৭ সালে এবং শেষ ১৯০০ সালে। ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয় 'দি পিলার্স অব সোসাইটি' এবং ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয় ইবসেনের শেষ রচনা 'হোয়েন উই ডেড এ্যায়োকেন'। এ ছাড়া অন্য নাটকগুলির নাম হলো 'এ ডল্‌স হাউস' (১৮৭৯); 'গোস্টস' (১৮৮১); 'এ্যান এনিমি অব দি পিপল' (১৮৮২), 'দি ওয়াইল্ড ডাক' (১৮৮৪); রসমার্সহল্‌ম (১৮৮৬); 'দি লেডী ফ্রম দি সী' (১৮৮৮) 'হেড্ডা গ্যাবলার' (১৮৯০); 'দি মাস্টার বিল্ডার' (১৮৯২); 'লিট্‌ল ইয়লফ' (১৮৯৪); 'জন গ্যাব্রিয়েল বর্কম্যান' (১৮৯৬)।

নাট্যকার হিসেবে ইবসনের জীবনের শুরু অর্থাৎ 'ক্যাটিলিনা' থেকে আরম্ভ করে এখন পর্যন্ত আমরা তাঁর যতোগুলি নাটকের নাম পেয়েছি তা ছাড়াও আরো দু'খানা নাটক ইবসেন রচনা করে গেছেন। তার এক-খানির নাম 'লাভস কমেডি' (১৮৬২) এবং অন্যটির নাম 'দি লীগ অব ইয়ুথ' (১৮৬৯)। রচনাকাল থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এর প্রথমখানা ইবসেনের জীবনের প্রথম পর্বে রচিত এবং দ্বিতীয়খানা দ্বিতীয় পর্বে রচিত। কিন্তু প্রথম বা দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় আমরা এ নাটক দু'খানার উল্লেখ এই জন্যে করি নি যে, নাট্য-সাহিত্যে আধুনিকতার জনক হিসেবে ইবসেনের যে খ্যাতি, অর্থাৎ জীবনের তৃতীয় পর্বের যে বারোখানি সামাজিক গদ্য নাটক তার কিছুটা আভাস এই দু'টি নাটকে পাওয়া যায়। কাজেই ভাবের দিক থেকে, অনেক আগের রচনা হলেও, নাটক দুখানা ইবসেনের সাহিত্যসাধনার তৃতীয় পর্বের সঙ্গেই যুক্ত।

তৃতীয় পর্বের মোট বারোখানা নাটক সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করবো। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে, বা তারও দশ কি পনরো বছর আগে থেকে বিশ্বের সাহিত্যক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিলো —তার জন্যে বেশ কিছুটা কৃতিত্ব যে একা ইবসেনের, তৃতীয় পর্বের এই দু'খানা নাটকের আলোচনার ফলে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এ ডল্‌স্ হাউস—প্রথমেই বলতে হয় 'এ ডল্‌স্ হাউস্'-এর কথা। এ নাটকের কাহিনী সংক্ষেপে এই রকম :

মিঃ হেলমার, তার স্ত্রী নোরা এবং তাদের তিনটি সন্তান এই নিয়ে একটি ছোট্ট কিন্তু সুন্দর গোছানো সুখের সংসার। পরস্পরের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক একদিকে যেমনই মধুর এবং আন্তরিক, অন্যদিকে তেমনি সরলতায় ভরা। পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়াটা এককথায় যাকে বলে চমৎকার। বলতে গেলে একটা আদর্শ সংসার। মিঃ হেলমার যেমন স্বামী এবং বাপ হিসেবে আদর্শস্থানীয়, নোরাও ঠিক তেমনি স্ত্রী এবং মা হিসেবে। কিন্তু কয়েকটি ছোট ছোট ঘটনা ওদের সংসার ভেঙেচুরে তচনচ করে দিলো। তার মূল কারণ অন্য কেউ বা বাইরের কিছু ততোটা নয় যতোটা তারা নিজেরা, বিশেষ করে নোরা নিজে। নোরা তার জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে জীবনের, বিশেষ করে সংসারের ভিত্তি রচনা করবার জন্যে অনেক সময় যে ভুয়ো এবং মিথ্যা ধ্যান-ধারণার ওপর নির্ভর করে চলতে হয়, তার অসারতা বুঝতে পারে।

স্বামী অসুখ থেকে সেরে উঠেছে, সবাই বলে বায়ুবদল করতে পারলে ভাল হবে, তাড়াতাড়ি শরীর ঠিক হবে। কিন্তু সংসার ওদের ঠিক ততটা সচ্ছল নয়। অথচ স্বামীর বায়ুবদল অবশ্যই দরকার। তাই নোরা টাকা সংগ্রহ করলো। স্বামীকে সে জানালো যে ওর বাবা টাকাটা দিয়েছেন, কাজেই এটা নিতে দোষ নেই। মিঃ হেলমার নিলো সে টাকা। কিন্তু এই ঘটনা থেকেই নাটকে জটিলতা দেখা দিলো। কারণ, বাস্তবিকপক্ষে নোরার বাবা কোন টাকা দেন নি। টাকাটা নোরা নিজেই সংগ্রহ করেছে একজন সুদখোর মহাজনের কাছ থেকে হ্যাণ্ডনোট দিয়ে। তা'ও নিজের হ্যাণ্ডনোট নয়। মহাজন জানালো যে, নোরার বাবা হ্যাণ্ডনোটে সই দিলে সে টাকা ধার দিতে পারে, তা' না হলে নয়। নোরা বললো, বাবার সই সে এনে দেবে। হ্যাণ্ডনোটের কাগজে নোরার বাবার নামের যে সই পড়লো তা আসলে নোরার হাতের। মহাজন ব্যাপারটা যে একেবারে বুঝলো না তা' নয়; কিন্তু অন্য কাউকে ও কিছুই বুঝতে দিলো না। কারণ, ও জানে যে অনেক সময় খাঁটি সইতে লোকে ধার শোধ না করলেও জাল সইয়ের জন্যে করে থাকে। তাই সে টাকা দিলো নোরাকে।

কিছুদিন পরের কথা। মিঃ হেলমার যে ব্যাঙ্কে চাকুরি করতো, যোগ্যতা এবং সততার জন্যে ও সেইখানেই ম্যানেজারের পদ লাভ করলো।

সুদখোর মহাজনটি কিছুকাল ধরেই ঐ ব্যাঙ্কে একটা ভালো মাইনের চাকুরির জন্যে চেষ্টা করছিল। এতদিনে মিঃ হেলমার ঐ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হওয়াতে ওর মনে হলো যে, এবার নিশ্চয়ই পদটি লাভ করা যাবে, কেন না জাল সইয়ের ভয় দেখিয়ে নোরাকে দিয়ে তার স্বামীকে প্রভাবিত করা সম্ভব হবে বলে ও মনে করলো। কিন্তু কার্যত তা হলো না। নোরা হেসেই উড়িয়ে দিলো লোকটার ভয় দেখানোকে। ও বললো, বাবার সই আমি জাল করে থাকলেও তাতে কিছুই আসে যায় না যে পর্যন্ত তুমি টাকা পাচ্ছো। নোরা আন্তরিক ঘৃণা করতো এই লোকটাকে, যে জন্যে স্বামীর কাছে ওর বিষয়ে সুপারিশের কথা ও মনেও আনলো না। কিন্তু এর মধ্যে একটা ব্যাপার ঘটে গেলো। মহাজনের আবেদন মিঃ হেলমার তো প্রত্যাখ্যান করলোই, উপরন্তু পূর্বে একসময় ঐ লোকটি যে একটা দলিল জাল করেছিল সে সম্পর্কে তীব্র ভাষায় বললো নোরাকে। জাল করা বা মিথ্যা সম্পর্কে স্বামীর এই জোরালো উক্তি শোনবার পরে এতদিনে নোরার টনক নড়লো। ওর একটা ধারণা ছিলো যে, বাবার সইটা আমি মেয়ে হয়ে জাল করেছি তাতে এমন আর কি হয়েছে। কিন্তু এবার বুঝলো, না, ব্যাপারটা অতো ছেলেখেলা নয়। মিঃ হেলমার আরো উক্তি করলো যে, ব্যবহারিক জীবনে মানুষের অসাধুতার সূত্রপাত হয় মায়ের দোষে। নোরা এরপর থেকে নিজের সম্পর্কে ক্রমশঃ কঠোর হয়ে উঠতে আরম্ভ করলো। সন্তানদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবার পক্ষে ক্রমশঃ যেন নিজেকে অযোগ্য বলে মনে হতে লাগলো। শুধু যে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাসি বা খেলা করলে বা ওদের ভালোভাবে সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখলেই কর্তব্য সমাধা হয়ে যায় না, বা এইগুলিই যথেষ্ট নয়, এ কথা নোরা প্রতিমুহূর্তেই মর্মে মর্মে অনুভব করতে লাগলো। জাল হ্যাণ্ডনোটের বাকী টাকাটা শোধ করবার জন্যে নোরা মনস্থ করলো ওর স্বামীর এক বন্ধুর কাছ থেকে টাকাটা ধার নেবে। স্বামীর সঙ্গে নোরার সম্পর্ক খুবই মধুর। প্রত্যেক সংসারেই দেখা যায় স্বামীর কাছ থেকে আকাঙ্ক্ষিত কিছু আদায় করবার জন্যে প্রত্যেক স্ত্রীই তার নিজস্ব একটা পন্থা উদ্ভাবন করে নেয়। কোথাও রাগ, কোথাও অভিমান, কোথাও বা অন্য কোনো উপায়। নোরারও একটা নিজস্ব পদ্ধতি ছিলো। ঘটনা-

চক্রে দেখা যায়, সম্পূর্ণ নিজের অজ্ঞাতসারে নোরা তার স্বামীর বন্ধুর সঙ্গেও টাকা ধার করবার ব্যাপারে ঠিক সেই ভাবে কথা বলতে আরম্ভ করেছে, ঠিক সেইরকম ছোট ছোট চাতুরীর আশ্রয় নিচ্ছে—যে রকমটি সাধারণতঃ ও স্বামীর সঙ্গে করে থাকে। কিন্তু তার ফল হলো অতি মারাত্মক।

হেলমারের বন্ধু নোরার চালচলনকে পূর্বরাগের লক্ষণ মনে করে নিজেই প্রেম নিবেদন করে বসলো। নোরা, সরলপ্রকৃতি মা এবং স্ত্রী নোরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো যে নিজের নির্বুদ্ধিতাই স্বামীর বন্ধুকে পরোক্ষভাবে প্রেম নিবেদন করতে তাকে প্ররোচিত করেছে। এই সঙ্গে আর একটি জিনিস যা নোরা বুঝতে পারে তাও কম লজ্জাকর নয় ওর পক্ষে—ও বুঝতে পারলো যে স্বামীর কাছ থেকে যখনই ও যা কিছু আদায় করেছে, তার পেছনে আসলে কাজ করেছে স্বামীর যৌনক্ষুধার তাড়না। ব্যক্তি হিসেবে, মানুষ হিসেবে সে সমস্তের মধ্যে নোরা সাফল্যের কিছুই দেখতে পায় না। তাই নোরা মনস্থ করলো সংসার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, বাস্তব জগতের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে নিজেকে মানুষ করে তুলবে—এবং এটা যতদিন করা সম্ভব না হচ্ছে ততদিন স্বামী এবং সন্তানদের কাছ থেকে নিজেকে দূরেই সরিয়ে রাখবে। মিঃ হেলমার সব ব্যাপারটা জানতে পেরে এবং স্ত্রীর মানসিক যন্ত্রণা বুঝতে পেরে প্রস্তাব করলো যে, অন্ততঃ সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করা এবং লোকনিন্দার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে একই জায়গায় যা হোক করে থাকা যায় কি না। কিন্তু যা মিথ্যা, যা অলীক তাকে বাঁচাতে একটা 'শো' বজায় রেখে চলবার কোনো আকর্ষণই নোরা আজ আর বোধ করছে না। তাই স্বামীর এ প্রস্তাব সে মানলো না এবং গৃহত্যাগ করলো।

বিবাহিত এবং ঘরোয়া জীবনের ঠুনকো দিকগুলি সম্বন্ধে 'এ ডল্‌স হাউস'-এ ইবসেন অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার প্রয়াস পেলেন। এ বিষয়ে যে ইবসেন যথেষ্ট সাফল্যলাভ করলেন সে সময়কার পত্র-পত্রিকাদিতে অসংখ্য সক্রোধ আক্রমণ এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-মূলক আলোচনা ও প্রবন্ধ তার সাক্ষ্য বহন করে। পারিবারিক এবং সামাজিক ব্যাপারে রক্ষণশীল বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁরা হয়ে উঠলেন মারমুখো। যাঁরা উদারনৈতিক, তাঁরা বললেন :

নাট্যকারের বক্তব্যের মধ্যে প্রচুর ভাববার কথা আছে, কারো কারো

ভালো লাগছে না বলেই কথাগুলি অসার বা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয় না। যাঁরা প্রগতিশীল, তাঁরা বিনা আলোচনাতেই ইবসেনের বক্তব্যের সবটুকুই অভ্রান্ত বলে মেনে নিলেন।

গোস্টস্—ইবসেন তাঁর পরবর্তী নাটক 'গোস্টস্' রচনা করলেন যেন এ ডলস্ হাউস-এর ফলে যে বিরোধী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল তাদের চোখ ফোটাবার জন্যেই। কোন্‌টা আসল? সামাজিক এবং পারিবারিক বন্ধন না মানুষের জীবন? এই রূঢ় কিন্তু বাস্তব প্রশ্নটি নানাভাবে ভেবে দেখবার জন্যে একটি অতিশয় সুপরিকল্পিত কাহিনী পল্লবিত হলো 'গোস্টস্' নাটকে। মিসেস আলভিং একজন আদর্শ স্ত্রী এবং আদর্শ জননী। স্বামী এবং সন্তানের জন্যে ও নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করছে সর্বক্ষণ। নিজের যে কোনো পৃথক সত্তা আছে সেই সত্যটাই যেন অনেক সময় ওর মনে থাকে না। মিঃ আলভিং বেশ কিছুটা ভোগপ্রিয় মানুষ। সমাজে প্রকাশ্যভাবে যৌন যথেচ্ছাচার অনুমোদন লাভ করে না, তাই মিঃ আলভিংকে গোপনতার আশ্রয় নিতে হয় তার অতিমাত্রায় যৌনক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্যে। বিয়ের পূর্ব থেকেই মিঃ আলভিং এমনিধারা অভ্যাসের দাস হয়ে পড়েছে। বিয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মিঃ আলভিং একটা দারুণ অস্বস্তিবোধ করতে আরম্ভ করলো, তার কারণ নববধূর আন্তরিকতা, স্বামীকে সমস্ত বিষয়ে খুশী করবার জন্যে তার সর্বক্ষণের জন্যে একটা অক্লান্ত আগ্রহ। কিছুদিন পরেই দেখা যায় সংসারের সমস্ত দায়িত্ব, এমন কি পারিবারিক ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্বও স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে মিঃ আলভিং আমোদ ফুর্তিতে মেতে উঠেছে। মদ্যপান, নভেল পড়া এবং ঝি-চাকরদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করে কাটানোটাই তার একমাত্র কাজ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে একটি ঝির সঙ্গে ওর সম্পর্কটা একটু বেশিদূর অবধি গড়াতে লাগলো। ইতিমধ্যে একটি ছেলে হয়েছে মিসেস আলভিং-এর। কাজেই সবকিছু বুঝতে পেরেও স্বামীর জন্যে, সন্তানের জন্যে এবং সংসারের জন্যে তাকে মুখ বুজে থাকতে হয়। প্রায় সময়ই মনের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিলেও মাত্র একবার ব্যতীত মিসেস আলভিং তা প্রকাশ করে না। একবারই মাত্র দেখা যায় যে তার মধ্যে যেন কিছুটা ব্যক্তিসত্তা এখনো অবশিষ্ট আছে।

ওদের বিয়েটা স্বাভাবিকভাবে পূর্ব-মেলামেশার পরিণতি হিসেবে হয় নাই। মিসেস আলভিং প্রাক-বিবাহিত জীবনে এক পাদ্রীকে

ভালোবাসত। পাদ্রী ম্যানডারস্ একজন প্রকৃত সৎ আদর্শবাদী কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ। পরিবারের কর্তাব্যক্তিরা যখন মিঃ আলভিং-এর সঙ্গে বিয়ের বন্দোবস্ত করলেন, মিসেস আলভিং তখন সেটাকে একটা পবিত্র কর্তব্য হিসেবেই স্বীকার করে নিয়ে বিয়েতে রাজী হয়েছিল। কিন্তু একে একে স্বামীর স্বরূপ প্রকটিত হবার পরে একদিন দেখা গেলো বাড়ি ছেড়ে ও চলে এসেছে পাদ্রী ম্যানডারস্-এর কাছে আশ্রয়ের আশায়। কিন্তু ধর্মভীরু কর্তব্যনিষ্ঠ প্রণয়ীর কাছে ও আকাঙ্ক্ষিত আশ্রয় পেলো না। উপরন্তু ম্যানডারস্ পারিবারিক জীবনের ভালোর দিকটার কথা তুলে মিসেস আলভিংকে হাল্কা করবার চেষ্টা করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত তুললো পৃথিবীতে মানুষের কর্তব্যের কথা। কি আমাদের ভালো লাগে বা না লাগে তার চাইতে অনেক বেশি মূল্যবান কাজ যে বিনা প্রতিবাদে কর্তব্য করে যাওয়া, পাদ্রীর এ কথা মিসেস আলভিং মেনে নিতে বাধ্য হলো। তাই দেখা যায় আবার বাড়ি ফিরে এসে ও লম্পট স্বামীর সংসার গোছাবার দায়িত্ব নিলো।

মিসেস আলভিং এমন যোগ্যতার সঙ্গে ঘরে বাইরের সমস্ত কাজকর্ম চালিয়ে যেতে লাগলো দিনের পর দিন যে, কারো পক্ষেই ভেতরের কোনো ব্যাপার অর্থাৎ স্বামীর কোনো কুকীর্তি বুঝতে পারবার কোনো সম্ভাবনা রইলো না। ক্রমশঃ মিসেস আলভিং নিজেকে তিলে তিলে বিলিয়ে দিতে লাগলো।

স্বামী যদি বাইরে যথেচ্ছভাবে মদ খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় মাতলামি করে বেড়ায় তা' হ'লে লোকে হাসবে। তাই দেখা যায়, ঘরেই স্বামীকে প্রাণভরে মদ খাবার সমস্ত বন্দোবস্ত করলো মিসেস আলভিং; চাই কি মাঝে মাঝে নিজেও স্বামীর পান-বিলাসে সঙ্গদান করতে লাগলো। এখানে সেখানে মেয়েমানুষের পিছু পিছু ঘুরলে স্বামীর বদনাম হবে, কাজেই মিসেস আলভিং স্বামীকে সুযোগ করে দিলো বাড়ির মধ্যেই তার প্রিয় ঝিয়ের সঙ্গে যাতে অবাধ মেলামেশা করতে পারে। কিছুদিন বাদে স্বামীর ঔরসে ঐ ঝির যখন একটি মেয়ে হলো, মিসেস আলভিং তাকেও পরিবারের মধ্যেই রেখে দিলো। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এই মেয়েটিও পরিবারের একজন ঝি হয়ে গেলো। এদিকে ছেলে বড়ো হয়ে উঠছে, কাজেই যে সংসারটা পাপের বাসা হয়ে উঠেছে তার হাত থেকে একমাত্র

সন্তানকে রক্ষা করবার জন্যে মিসেস আলভিং ওকে দূরে সরিয়ে দিলো। প্যারিসে থেকেই ও পড়াশুনো করবে, সেই রকমই বন্দোবস্ত করলো মিসেস আলভিং।

পাদ্রী ম্যানডারস্ মিসেস আলভিং-এর এই কর্তব্যনিষ্ঠায় পরিচালিত সংসারযাত্রা দেখে খুবই খুশী। ও নিজে যে ক্রমশঃ ক্ষয়ে যাচ্ছে সেদিকে ম্যানডারস্-এর কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। ও যে একটা আদর্শ বিবাহিত জীবনযাপন করছে, খ্রীষ্টধর্ম একেবারে কাঁটায় কাঁটায় মেনে চলছে, তার প্রশংসাতেই পাদ্রী পঞ্চমুখ। কিছুদিন পরে মিঃ আলভিং মারা গেলো। পাড়াপড়শী সকলের কাছে সুনাম বজায় রেখেই মারা গেলো। স্বামী মারা যাবার পরে মিসেস আলভিং-এর মনে হলো যে এখন ছেলেকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা চলে—কারণ, এখন তো আর বাপের অধঃপতিত কার্যকলাপ চোখে পড়বার আশঙ্কা নেই। তাই ছেলেকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হলো। বর্তমানে ও যৌবনে পা দিয়েছে। ছেলেটির নাম অসওয়াল্ড।

অসওয়াল্ড বাড়ি ফেরবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মিসেস আলভিং বুঝতে পারলো যে তার দুর্ভাগ্যের শেষ তো হয় নি, বরং এবার বৃহত্তর আঘাত আসছে। স্বামীর সব দোষই সন্তানের মধ্যে দেখে মায়ের বুক ভেঙ্গে গেলো। সেই মদ্যপান, সেই অকারণ অর্থহীন ভাবে কথা বলা, সর্বোপরি মেয়েদের দিকে ঝোঁকটাও তার বাপেরই মতো। অসওয়াল্ডও বাড়ির ঝিয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়লো। মিসেস আলভিং জানে এ ঝি-টি তারই বাপের ঔরসজাত। তাই অসহায়তা প্রতি মুহূর্তেই বাড়তে লাগলো। এখন কি উপায়? মিসেস আলভিং-এর মনে হলো কাউকেই জবরদস্তি করে তার নিজের পথ থেকে ঘুরিয়ে এনে ভাল করা যায় না, বা সুখী করা যায় না। তাতে বরং তার কষ্ট বাড়ে, ভোগান্তি বাড়ে। প্রথম দিকে স্বামীর ওপর জবরদস্তি ক'রে নিজের আদর্শ চাপাতে গিয়ে বেচারাকে গোপন উদ্দেশ্যে বাইরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিলো। সেজন্যে দুরারোগ্য যৌনব্যাধিও তার হয়েছিল। জোর করে ছেলেকে ভালো করতে গেলে যদি সে-ও বাইরে যায় এবং ঐ ব্যাধির শিকার হয়? তা'হলে ওর তো জীবনটাই পণ্ড হয়ে যাবে। স্বামীকে নষ্ট হয়ে বয়ে যেতে দেখে মিসেস আলভিং-এর মনে দুঃখ কিছুই হয় নি, কিন্তু তার সম্ভাবনা ছেলের মধ্যে দেখে ও আঁতকে উঠলো। কারণ, ছেলেকে ও সত্যি ভালোবাসে—অসওয়াল্ড ওর

বুভুক্ষু হৃদয়ের যাবতীয় সঞ্চিত স্নেহ-ভালোবাসার একমাত্র পাত্র। সেই ছেলেকে কি জোর করে ভালো করতে গিয়ে অসুখী করা যায়, না কি ঘর ছেড়ে তাকে বাইরের নোংরামির মধ্যে ঠেলা দেওয়া যায়!

অসওয়াল্ড কথায় কথায় একদিন মাকে জানিয়ে দিলো যে, বাপের কুৎসিত রোগ ওর মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে এবং প্যারিসের এক ডাক্তার ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে ভবিষ্যতে উন্মাদ বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত ওকে হতেই হবে। জীবনের সেই অসহ অবস্থা যদি কখনো এসেই পড়ে, তা'হলে সেই মুহূর্তে জীবনেঃ শেষ করবার জন্যে যে ও পকেটে একটা বিষের শিশি রেখে দেয় তা-ও জানালো মাকে।

মিসেস আলভিং আর সময় নষ্ট না করে মনস্থ করলেন যে ঝিয়ের সঙ্গেই ছেলের বিয়ে দেবেন—হোক না সে সৎ বোন, তবু তার ছেলে, তার স্নেহের একমাত্র পাত্র সুখী হোক। কিন্তু ঝি-ই অসওয়াল্ডকে বিয়ে করতে রাজী নয় দেখা গেলো। কারণ, সে জানতে পেরেছে ওর রোগের কথা এবং ও পালিয়ে গেলো বাড়ি থেকে।

নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যায় বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। মা আর ছেলে একটা ঘরে বসে নিজেদের নিরানন্দময় জীবনের কথা ভাবছে। এমন সময় অসওয়াল্ড বিষের শিশিটা চাইলো মায়ের কাছে, বললো, দাও একটু নাড়াচাড়া করি। মিসেস আলভিং তাকালো ছেলের দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো যে আশঙ্কিত রোগের লক্ষণ ফুটে বেরুচ্ছে ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

ইয়োরোপের কয়েকটি রাজধানীতে 'গোস্টস্' মঞ্চস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে বলতে গেলে সারা ইয়োরোপের শিল্প-সাহিত্যমহলে তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছিলো। কোনো কাগজ লিখেছিলো—এতো নাটক নয়, একটা খোলা নর্দমা। কেউ বলেছিলো, আশা করি ভবিষ্যতে আর কোনোদিন এই কদর্য জিনিসটা মঞ্চস্থ হবে না। আবার অনেক পত্রিকা অবিলম্বে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলো নাট্যকারকে শায়েস্তা করবার জন্যে এবং এ নাটক যারা মঞ্চস্থ করতে সাহায্য করেছে তাদের নোংরামির দায়ে অভিযুক্ত করবার জন্যে।

ঢিলটা যে ঠিক মৌচাকেই পড়েছিলো তা মৌমাছিদের ভ্যানভ্যানানিতেই বোঝা গিয়েছিলো। সে সময়ে ইয়োরোপে যৌনব্যাধি একটা মারাত্মক

আকার ধারণ করতে চলেছিলো। কাজেই ইবসেন একটা বাস্তব সমস্যাকে চোখের সামনে তুলে ধরে নোংরামি কিছুই করেন নি, বরং সমাজ সেবাই করেছেন। আর সেই সঙ্গে স্থচনা করে দিয়েছেন বিংশ শতাব্দীর শিল্পসাহিত্যের নতুন পথের। সমাজের নানা দিক—ধর্ম, নীতিবোধ, কর্তব্য, ব্যক্তিগত রুচি, নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ক—এ সমস্ত কিছু সম্পর্কেই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে সারা পৃথিবীতে যে শত শত নাটক রচিত এবং মঞ্চস্থ হয়েছে এবং হচ্ছে, তার মূলে প্রেরণা জুগিয়েছে ইবসেনের এই হু'খানি নাটক—'এ ডলস্ হাউস' এবং 'গোস্টস্'।

'গোস্টস্' নাটক প্রকাশিত হবার পরে অনেক পত্র-পত্রিকা—মিথ্যাচার এবং অজ্ঞানতাই যাদের একমাত্র মূলধন, সাধারণের মধ্যে প্রচলিত কিন্তু ক্ষতিকর কুসংস্কার জিইয়ে রাখবার জন্যে নিত্য নূতন চটকদার বাক্য রচনা করাই হচ্ছে যাদের একমাত্র কাজ, তারা ইবসেনকে আখ্যা দিলেন জনগণের শত্রু বলে। ইবসেনও ঠিক তাদের কথাটা তুলে এনেই নিজের পরবর্তী নাটকের নামকরণ করলেন—জনগণের শত্রু (অ্যান এনিমি অব দি পীপ্‌ল, ১৮৮২)। কিন্তু জনগণ কারা? জনগণের শত্রুরই বা প্রকৃত রূপ কি?

এ নাটকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে একটি নূতন ধরনের কাহিনীর মধ্য দিয়ে ইবসেন এ যুগের একটি সর্বজন মনোহরণকারী প্রায়-অর্থহীন বিষয় 'গণতন্ত্রে'র সমালোচনা করেছেন:

একটি ছোটো শহর। দূর দূর জায়গা থেকে মানুষ আসে এ শহরে এখানকার জলে স্নান করবার জন্যে। এখানকার হোটেলের সুখাদ্য খাবার জন্যে। কিন্তু কিছুদিন হলো রাস্তার নর্দমার নোংরা জল এখানকার পানীয় এবং স্নানের জলের সঙ্গে মিশে গেছে। স্নানাগারের মালিক, তথা হোটেল মালিক সবাই ব্যাপারটা জানে এবং জেনে না-জানবার ভান করে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায়। কারণ, তা হলে আর লোক আসবে না এ শহরে, তাদের স্নানাগারে এবং হোটেল রেঁস্তোরায়, কাজেই তাদের ব্যবসার নামে হীন উপায়ে অর্থোপার্জন যাবে বন্ধ হয়ে। কিন্তু একজন ডাক্তার যখন জোর গলায় বলতে লাগলো সত্য কথাটা, তখন ব্যবসায়ীরা, যারা সংখ্যায় বেশি তাকে আক্রমণ করলো 'জনগণের শত্রু' বলে। সংখ্যায় বেশি হলেই যে তাদের মত বা পথ কিছু অভ্রান্ত হয়ে যায় না,

এবং সংখ্যায় বেশি বলেই তারা যা করে তাতে সকলের মঙ্গল হ'তে পারে না—এই সূক্ষ্ম জিনিসটার দিকে মনোযোগী পাঠক এবং দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিলো এ নাটকের উদ্দেশ্য। এ দিক দিয়ে ইবসেন যে খুব সফল হয়েছিলেন তা বলা যায় না। কারণ 'গণতন্ত্রে'র স্তোকবাক্যের দিকে সাধারণ মানুষের ঝোঁক ক্রমশঃই বাড়ছে ছাড়া কমছে না। শ দুঃখের সঙ্গেই বলেছিলেন যে, এককালে রাজাদের পূজো করাটা যেমন অন্যায় এবং ভুল হয়েছিলো, একালে গণতন্ত্র বা এইরকম গালভরা নামওয়ালা 'পাবলিক অরগানাইজেশন'-গুলির কাছে বিনা বাক্যব্যয়ে মাথা নোয়ানোও ঠিক তেমনি ভুল কাজ হচ্ছে।

মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস, তা যে কোনো দিকেই হোক না কেন, আলোচনা করলে দেখা যাবে যে পরিবর্তন অর্থাৎ উন্নতিটা সবসময়েই ব্যক্তি বিশেষের চিন্তার ফল—কোনও গোষ্ঠীর আবিষ্কার বা উদ্ভাবন হিসেবে তা কখনই দেখা দেয় না।

মানুষের প্রবর্তিত যে-কোনও অনুশাসনের অনেক উর্ধ্বে যে মানুষের জীবন—প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে যে তার নিজস্ব একটা আদর্শ থাকা প্রয়োজন এবং সেইটেই স্বাভাবিক অগ্রগতির লক্ষণ—ইবসেনের পর থেকে এ কথা আজ আর কারুর বলতে বা এই বক্তব্যকে উপজীব্য করে সাহিত্য সৃষ্টি করতে বাধে না।

যে আর্থিক কাঠামোর ওপর সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে, বিগত দুই শতাব্দী ধরে ক্রমশঃ তার পরিবর্তনের ফলে বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই দেখা গিয়েছিলো মানুষের নতুন চেহারা। মিসেস ভার্জিনিয়া উল্‌ফের অনন্যকরণীয় ভাষায় বলতে গেলে: all human relations have shifted—those between masters and servants, husbands and wives, parents and children. And these changes have brought about further changes in religion, conduct, politics, and literature.

—(Mr. Bennett and Mrs. Brown)

এই যে পরিবর্তন, এটা নিঃসন্দেহে অনেক জনের নানা বিচিত্র চিন্তা এবং কর্মের ফলেই সম্ভব হয়েছে। এবং সাহিত্যস্রষ্টাগণের মধ্যে এককভাবে ইবসেন এই পরিবর্তন যতোটা প্রভাবিত করেছেন, ততোটা বোধহয় আর কেউ করতে সক্ষম হন নি।

বিয়ার্নসন

বিংশ শতাব্দীতে গোটা পৃথিবীর সব দেশেই সাহিত্যের উন্নতি হয়েছে বিস্ময়করভাবে। এমন কোনো দেশ বা ভাষা-গোষ্ঠী পাওয়া যায় না যেখানে কিছু-না-কিছু কালজয়ী সৃষ্টি না হয়েছে বা নতুন ধরনের সৃষ্টি না হয়েছে। সাধারণভাবে এ কথাটা পৃথিবীর সব দেশের পক্ষেই কমবেশি সত্য। কিন্তু কতকগুলি আবার এমন দেশ রয়েছে মৌলিকতার দাবিতে যে সমস্ত দেশের সাহিত্যিকদের সৃষ্টি অগ্রগণ্য।

নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক এবং ইস্‌ল্যাণ্ড রাজনৈতিক ব্যাপারে আজকের দিনে আলাদা আলাদা পাঁচটি দেশ হলেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বলতে গেলে প্রায় এক। সেইজন্যেই দেখা গেছে বিগত দেড় শ' কি দু'শো বছরে এখানকার রাজনৈতিক মানচিত্রে বহুবার পরিবর্তন হয়ে গেছে। কখনো দু'টো কখনো বা তিনটে দেশ মিলে একটি রাষ্ট্রের পত্তন করেছে, কখনো বা আবার সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেছে। যেমন এখন হয়ে রয়েছে। একটু তলিয়ে দেখলে কারোই বুঝতে বাকি থাকে না যে, একত্র যখনই হয়েছে জনগণের ইচ্ছাতেই হয়েছে, কারণ সহজ-সরল পথে চলবার জন্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে সব সময়েই একটা স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু পৃথক যখনই হয়েছে প্রত্যেকবারই সমাজের উর্ধ্বতন শ্রেণী, তথা শাসনযন্ত্রের ক্ষমতাপ্রিয় ছোটো ছোটো দলের প্রচার ও প্ররোচনার বিষেই হয়েছে। কারণ একটা কি দু'টো সরকার ভেঙ্গে চারটি কি পাঁচটি করতে পারলে একদিকে যেমন শাসিতেরা থাকে দুর্বল হয়ে, তেমনি বড়ো বড়ো পদের সংখ্যা যায় বেড়ে। এইখানেই হলো দেশের উঁচুতলার স্বার্থ।

যাই হোক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক এবং ইস্‌ল্যাণ্ড এই যে পাঁচটি দেশ, সাংস্কৃতিক দিক থেকে এরা এক। এদের সবাইকে নিয়ে যদি একটি গোষ্ঠী ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে পৃথিবীর যে কোনো দেশ বা ভাষা-গোষ্ঠীর চাইতে এই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান গোষ্ঠীর সৃষ্ট সাহিত্য বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে আছে। ইংরেজী (আমেরিকানসহ), ফরাসী বা রুশ সাহিত্য পরিমাণের দিক থেকে অনেক বেশি সন্দেহ নেই, কিন্তু গুণগতভাবে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সাহিত্য

অদ্বিতীয় বলেই মনে হয়। এই শ্রেষ্ঠতার কারণ শুধু নোবেল প্রাইজ পাবার জন্যেই নয়। (এই অঞ্চলের নয়জন এখন পর্যন্ত সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, যদিও যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ইবসেন, তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় নি।) বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গী তথা শিল্পানুভূতির মৌলিকতাই এই অঞ্চলটিকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছে। ইবসেন, বয়ার, হামসুন, বিয়ার্নসন, লেগারলফ, উনসেট, সিলানপা, নেক্সো, জেনসেন, লী, কেলান, ল্যাক্সনেস—এঁদের প্রভাব আজকের পৃথিবীতে খুবই ব্যাপক। কোথাও এঁরা সরাসরি অন্য লেখককে প্রভাবিত করেছেন, কোথাও বা অন্য কোনো লেখকের মাধ্যমে।

প্রথম জীবন—নরওয়ের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা বিয়ার্নসন (Bjornstjerne Bjornson, 1832-1910) সাহিত্যের প্রায় প্রত্যেক দিকেই স্থায়ী সৃষ্টি করে গেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে ইবসেন বা সুইডেনের স্ট্রীণ্ড্‌বার্গের সঙ্গে বিয়ার্নসনের অনেক বিষয় মিল ছিলো; যথা, প্রথম জীবনে নানা বাধা-বিপত্তি, থিয়েটারের পরিচালকের কাজ বা সাংবাদিকতা প্রভৃতি। অন্যদিকে তেমনি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমও ছিল, সে হলো বিয়ার্নসনের রাজনৈতিক জীবন। সুইডিশ রাজপুরুষগণের শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে নরওয়ে যে সুইডেন থেকে পৃথক হয়ে নূতন একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিলো তার পেছনে বিয়ার্নসনের ব্যক্তিগত কৃতিত্বও কম ছিলো না। কারণ নরওয়ের যে রিপাবলিকান পার্টি এই আন্দোলন চালিয়ে আসছিল, ধর্মযাজকের পুত্র বিয়ার্নসন একাদিক্রমে তিরিশ বছর সেই পার্টির নেতৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ ব্র্যাণ্ডেস বলে গেছেন যে নরওয়ের কোনো জনসমাবেশে নরওয়ের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হ'লে উপস্থিত সকলের মনে যে আশা, আনন্দ ও উদ্দীপনার ভাব পরিলক্ষিত হ'ত, শুধুমাত্র বিয়ার্নসনের নাম উচ্চারিত হ'লেও উপস্থিত সকলের মনে সেই প্রতিক্রিয়াই দেখা যেত। এর ফলে এ কথা মনে হওয়া খুবই সঙ্গত যে, বিয়ার্নসন নিজে নিশ্চয়ই একজন গোঁড়া জাতীয়তাবাদী ছিলেন। বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি যেমন জাতীয়তাবাদের সৈনিক ছিলেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি তিনি জাতীয়-প্রীতির মূর্ত প্রকাশ রূপেই স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন এবং এইটেই বিয়ার্নসনের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এটা দোষ না গুণ, বিশেষ করে সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে, তা' নিয়ে অবশ্য মতভেদ আছে, কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি তার জাতীয় শিক্ষা,

শিল্প, সংস্কৃতি বা মনোবৃত্তিকে বিশ্বসৃষ্টির পরম কারণ ধরে নিয়েও প্রকৃতই প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হন, তা'হলে আর তার ব্যক্তিগত জীবনের ও ভাবধারণার ক্ষুদ্রতাগুলি পাঠক সাধারণের বিরক্তির কারণ হবে কেন? মিলটন কি ইংলণ্ডকে কোন ইংরেজ অপেক্ষা কম ভাল-বাসতেন, না কি হুগো প্যারিস সম্পর্কে কোন ফরাসীর চাইতে কম গর্ববোধ করতেন? যদিও মাত্র দু'জনের নাম করা গেল কিন্তু এ রকম শত শত উদাহরণ দেওয়া যায় যাঁরা যাঁদের হৃদয়ে সুগভীর জাতিপ্রেম তথা জাতীয়তা-বাদের প্রতি নিষ্ঠাপূর্ণ সমর্থন থাকা সত্বেও সার্বিক আবেদনপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিয়ার্নসনের বেলায়ও ঠিক সেই কথাই প্রযোজ্য বলে আমাদের বিশ্বাস। জাতীয় সঙ্কীর্ণতায় পরিপূর্ণ বলে বিয়ার্নসনের গ্রন্থাবলীর যে বিরূপ সমালোচনা অনেক সমালোচকই করে গেছেন, সেটা বহুলাংশে উনবিংশ শতাব্দীর সার্বিকতার হুজুগের ফল এবং পাঠক সাধারণের মধ্যে এ ধারণাটা বদ্ধমূল ক'রে দেবার জন্যে অনেক সমালোচকই ইবসেনের পাশাপাশি বিয়ার্নসনের রচনাবলীর তুলনা করে থাকেন।

সাহিত্যসাধনার শুরু—ইবসেন বিয়ার্নসনের সমসাময়িক ছিলেন। বিয়ার্নসন ইবসেনের চার বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তার মৃত্যুও হয় ইবসেনের মৃত্যুর চার বৎসর পরে, অর্থাৎ দু'জনেই সমান আয়ু পেয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এঁদের দু'জনেরই প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয় একই বৎসর—১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। ইবসেনের 'লেডী ইনগার অব অসট্রাট' এবং বিয়ার্নসনের 'বিটুইন দি ব্যাটেলস্'। ১৮৫৫ থেকে আরম্ভ করে ১৮৭৬ পর্যন্ত অর্থাৎ 'দি পিলারস অব দি সোসাইটি' প্রকাশিত হবার পূর্ব পর্যন্ত ইবসেনের রচনাবলীও intensely national ছিলো এবং একমাত্র 'পীয়ার গিণ্ট' ব্যতীত আর কোন রচনাই যুগে যুগে পাঠক সমাজকে আনন্দদানে সক্ষম হবে না। কিন্তু পরের যুগের সমাজসমস্যামূলক নাটকাবলীর অন্তর্নিহিত সত্যদৃষ্টি দীর্ঘকাল মানুষকে মহত্তর আদর্শের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করবে সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। জাতীয় সীমার বাইরে সর্বজনগ্রাহ্য রসসৃষ্টির যে ক্ষমতা ইবসেন অর্জন করেছিলেন, তাঁর প্রকাশ পায় খুবই ধীরে ধীরে। কাজেই নূতন দৃষ্টিকোণের পথ-প্রদর্শক হিসেবে ইবসেনের যে স্বীকৃতি, ইবসেন তা লাভ করেন শেষ বয়সে। কিন্তু বিয়ার্নসন তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ এবং প্রথম উপন্যাস (Arne, 1858)

প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অদ্বিতীয় নরওয়েজীয় লেখক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং তাঁর প্রভাব ও জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। নরওয়ের কৃষকজীবনের যে প্রতিচ্ছবি অতঃপর বিয়ার্নসন আঁকলেন ছ'খানা উপন্যাসে (এ হ্যাপি বয়, ১৮৬০ ; দি ফিশার মেইডেন ১৮৬৪) এবং ছ'খানা নাটকে (লেম হুল্ডা, ১৮৫৮ ; সিগুর্ড দি বাস্টার্ড, ১৮৬২) তার সৌন্দর্যসুষমা ও রসমাধুর্য নিঃসন্দেহে সর্বজনীন। যে কারণে 'টম জোনস,' 'গিল ব্লাস', 'ক্যাপ্টেইন্স ডটার' বা টলস্টয়ের 'দি কসাক্স' কিংবা বুনিনের 'এ ভিলেজ' সব দেশের পাঠক সমাজেরই ভালো লাগে, ঠিক সেই কারণেই বিয়ার্নসনের প্রথমজীবনের কবিতা তথা উপন্যাস অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিলো। এবং অন্ততঃ নরওয়ের সীমিত পাঠক সমাজে আজও সে জনপ্রিয়তা বিদ্যমান।

মানব মনের যে দোষ বা গুণাবলী দেশকালের সীমা ছাড়িয়ে সাধারণ ভাবে সর্বকালের সর্বদেশের সর্বজনের মধ্যে ক্রিয়াশীল, বিয়ার্নসনের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস ছ'খানা (Arne ; Sigurd the Bastard) সেই উচ্চমার্গের রসসৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলো। এ প্রসঙ্গে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, মূল চরিত্র বাদ দিয়েও মার্গিট যে কোনো দেশের যে কোনো ভাষার মাতৃ-চরিত্রের সমতুল্য, স্কেডার যে কোনো দেশের উচ্ছৃঙ্খল পিতার প্রতিরূপ, ক্রিস্টেন বিশ্বসাহিত্যের যুবক বন্ধুর চরিত্রের পাশাপাশি দাঁড়ালে ম্লান হয়ে পড়বার আশঙ্কা নেই, নায়িকা এলির পক্ষেও একথা সমানভাবেই প্রযোজ্য। এই সবকটি চরিত্রকেই শুধু নরওয়েজীয় বা ইয়োরোপীয় বলেই নয়, এমন কি বাঙালী চরিত্র বলেও অনায়াসেই চালিয়ে দেওয়া যায়। অথচ কাহিনীর পটভূমি নরওয়ে এবং চরিত্রগুলি নরওয়ের কৃষক-সমাজের অন্তর্ভুক্ত। বিয়ার্নসনকে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী বলে যাঁরা নস্যাৎ করে থাকেন (প্রধানতঃ সমালোচকগণের প্রভাবাধীন হ'য়ে) তাদের পক্ষে এ উপন্যাস ছ'খানা অবশ্য পঠনীয়। এই বই ছ'খানা একই সময়ে কৃষক তথা সাধারণ মানুষকে জানবার, বুঝবার ও সাধারণ মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পবিত্র আনন্দ ও রসোপলব্ধিতে সাহায্য করে।

সাহিত্যসাধনার পরিণত রূপ—বিয়ার্নসনের রচনাবলীর দ্বিতীয় পর্যায়কে ছ'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ পাঁচখানি নাটক—সিগুর্ড দি ক্রুশেডার, ১৮৭২ ; দি এডিটর, ১৮৭৪ ; বিয়ণ্ড হিউম্যান পাওয়ার,

১৮৮৩ ; লেবরেমাস, ১৯০১ ; ড্যাগলানেট, ১৯০৪ ; এবং দু'খানা উপন্যাস দি হেরিটেজ অব দি কুরট্‌স, ১৮৮৪ ; ইন গডস্‌ ওয়ে, ১৮৮৯। এর মধ্যে বিয়ণ্ড হিউম্যান পাওয়ার এবং ইন গডস্‌ ওয়ে বহুল প্রচারিত রচনা।

গ্যয়টে পরলোক গমন করেন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এবং সেই বৎসরই বিয়ার্নসন জন্মগ্রহণ করেন। ইবসেনের মতো বিয়ার্নসনও ইয়োরোপের নানা দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। তৎকালীন ইয়োরোপে, ফাউস্টীয় চিত্তচাঞ্চল্যের প্রভাব থেকে কেউই সর্বৈব মুক্ত ছিলেন না। ইবসেনের ওপর ফাউস্ট পাঠের প্রতিক্রিয়ার ফলে পীয়ার গিণ্ট সৃষ্টি হয়, আর বিয়ার্নসনের ক্ষেত্রে বিয়ণ্ড হিউম্যান পাওয়ার। ইবসেন-মানসের সূক্ষ্ম মিস্টিক গঠনের ফলে পীয়ার গিণ্ট প্রকাশিত হবার পর থেকেই নাটকখানা সাধারণ পাঠকের আয়ত্তের বাইরে রয়ে গেলো। কিন্তু বিয়ণ্ড হিউম্যান পাওয়ার নাটকে জীবনের নানা জটিল সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতির অবতারণা সত্ত্বেও, অধ্যাত্ম তথা নৈতিক জীবনসম্পর্কে অপেক্ষাকৃত সবল ও সুস্পষ্ট ধারণার পোষক হওয়ার দরুন বিয়ার্নসন সাধারণের কাছে অধিকতর আদরণীয় হয়ে উঠেছিলেন।

ইন গডস্‌ ওয়ে বিয়ার্নসনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এ উপন্যাসে উনি নরনারীর মনোবিশ্লেষণের ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা যে কত ব্যাপক ও অন্তর্দৃষ্টি যে কত গভীর তা'ও সপ্রমাণ করেছিলেন। বিয়ার্নসন নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে।

নূট হামস্থন

নূট (কৃনূট) হামস্থন ছিলেন নরওয়ের অধিবাসী। বাস্তবধর্মী সাহিত্যের স্রষ্টা হিসেবে হামস্থনের সমকক্ষ কাউকে আজ পর্যন্তও বেশি দেখা যায় নি। তাঁর আগে ত' নয়ই, পরেও নয়।

হামস্থনের সাহিত্য আলোচনার পূর্বে তাঁর জীবনের কয়েকটি দিক্ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করা দরকার। কারণ, ব্যক্তিকের কিছুটা জানা থাকলে তাঁর সৃষ্টির রসগ্রহণে সুবিধে হয়।

প্রথম জীবন—নূট হামস্থন (Knut (Pedersen) Hamsun; 4. 8. 1859—19. 2. 1952) ছিলেন একটি কৃষক-পরিবারের ছেলে। এই পরিবারটির কয়েক পুরুষের কুলপঞ্জী আছে। শতাধিক বছর ধরে কৃষিকর্ম ছিলো এই পরিবারের একমাত্র উপজীবিকা। কাজেই মাটির সঙ্গে যোগটা যে এঁদের কতো গভীর ছিলো তা সহজেই অনুমেয়।

অল্পবয়সে পিতৃহীন হয়ে পড়বার ফলে হামস্থনের দেখাশুনো এবং তাঁকে মানুষ ক'রে তোলবার দায়িত্ব এসে পড়েছিলো এক কাকার ওপর। এঁদের পদবী ছিলো পেডারসেন। 'হামস্থন' ছিলো ওঁদের খামারটার নাম। কিশোর বয়স থেকেই নূট খামারটার নামই নিজের পদবী হিসেবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিলেন। প্রথমে সবাই ব্যাপারটাকে বালকের খেয়াল ব'লে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নি; কিন্তু পরে এইটেই স্থায়িভাবে তাঁর পদবী হয়ে পড়েছিলো।

লেখাপড়ার দিকে পেডারসেন পরিবারের কারোই বিশেষ আগ্রহ ছিলো না। ছেলেরা সবাই যাতে গায়ে-পায়ে খেটে খেতে পারে, বড়োরা সেইদিকেই লক্ষ্য রাখতেন। হামস্থনও স্কুলে পড়াশুনো করবার সুযোগ পান নি কোনোদিন। ওঁর কাকা একেবারে বালক বয়সেই হামস্থনকে এক মুচির কাছে দিয়েছিলেন কাজ শেখবার জন্যে। এই মুচিটি ছিলো বিশেষ অবস্থাপন্ন এবং কারিগর হিসেবেও নিপুণ। শহরের জ্ঞানী, গুণী এবং অবস্থাপন্নদের অনেকেই মাঝে মাঝে আসতেন জুতো এবং চামড়ার তৈরি বিভিন্ন জিনিসের অর্ডার দিতে। তাঁদের পোশাক-আশাক তথা মার্জিত কথাবার্তা বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতো হামস্থনকে। বিশেষ করে এঁদের সান্নিধ্যে এসেই হামস্থনের মনে বাসনা জাগে কিছু লেখাপড়া শেখবার জন্য। অক্ষর পরিচয়টা অবশ্য আগেই হয়েছিলো।

এবার প্রথম কিছুদিন চললো এলোপাতাড়িভাবে পড়াশুনো। হাতের কাছে যা পেতেন তাই পড়বার চেষ্টা করতেন হামসুন। মাসকয়েক এইভাবে কাটবার পরে উনি নিজেই বুঝতে পারলেন যে মোটেই এগোনো যাচ্ছে না। কারণ, যা পড়ছেন তার বেশির ভাগই বুঝতে পারছেন না। তারপর একটা স্কুলের সিলেবাস সংগ্রহ করে সেই মত পড়াশুনো আরম্ভ করলেন। এতে আশ্চর্য ফল দেখা গেল। প্রতি বছরে তিন বছরের পঠনীয় বই পড়ে শেষ করতে লাগলেন হামসুন। সতেরো বছর বয়সের সময় হামসুন একটা দোকানের কেরানীর কাজ শুরু করলেন এবং বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই করতে লাগলেন। কিছুদিন এই চাকুরিটা করবার পরে হামসুন ব্যবসা করবার প্রচেষ্টায় কয়েকটা মাস নষ্ট করলেন। তারপরেই দেখা যায় ওঁকে একটা স্কুলে শিক্ষক হিসেবে। স্কুলের পাঠ্যসূচী অনুসারে পড়াশুনো শেষ করবার পর থেকেই বিশেষ করে সাহিত্যবিষয়ক বইপত্র পড়তে আরম্ভ করেছিলেন উনি। ক্রমশঃ এই পড়ার দিকেই ঝুঁকে পড়লেন এবার। প্রায় এক বছর শিক্ষকতার পরেই দেখা যায় হামসুন আবার অন্য একটা চাকুরিতে ঢুকেছেন এবং দু-একটা সাময়িক পত্রিকায় কিছু কিছু লেখা, প্রধানতঃ কবিতা পাঠাচ্ছেন। এর মধ্যে কয়েকটা ছাপাও হলো। হামসুন উৎসাহিত বোধ করলেন। মনস্থ করলেন লেখক এবং সাংবাদিক হিসাবেই জীবিকা নির্বাহ করবেন। এতদিন নরওয়ের উত্তরাঞ্চলে ছোট একটা শহরে ছিলেন উনি, এবার তাই দক্ষিণে চলে এলেন। রাজধানী অসলো এবং ক্রিশ্চিয়ানা প্রভৃতি সব বড়ো বড়ো শহরই দেশের দক্ষিণ দিকে।

কিন্তু বড়ো শহরে এসেও আলোর মুখ দেখতে পেলেন না হামসুন। কোনো কাগজে চাকুরিও জুটলো না, বা লিখেও তেমন কিছু রোজগারের সম্ভাবনা দেখা গেল না। তাই আবার কিছুদিন ছোটখাটো কাজ ক'রেই জীবিকা অর্জন করতে হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এভাবে চলতে চলতে সত্যি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন হামসুন। স্বদেশে থেকে নিজের স্বপ্নকে কোনদিনই সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা যাবে না মনে হলো। তাই ভাগ্য-পরীক্ষার জন্যে হামসুন সাগরপাড়ি দিলেন। চলে এলেন আমেরিকায়। আমেরিকায় এসেও জীবিকা অর্জন করতেই হামসুনকে এতটা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে হলো যে, সাহিত্য-সাধনা প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। কখনো ফলের বাগানের মজুর, কখনো গমের খেতের মজুর, কখনো

বা ট্রামের কণ্ডাক্টরের কাজ করতে হয়েছে হামসুনকে। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে কিছুদিন জেলের কাজও করেছেন উনি।

ট্রাম-কণ্ডাক্টরের কাজ থেকে হামসুন যেভাবে বরখাস্ত হয়েছিলেন, তাই থেকেই বোঝা যায় স্কুল-কলেজের লেখাপড়ায় বঞ্চিত হলেও হামসুন কতো নিরলসভাবে পরিশ্রম করতেন নিজেকে শিক্ষিত করে তুলবার জন্যে। একখানা বই ওঁর পকেটে সব সময়েই থাকতো। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কখনো পাঁচ মিনিট ফুরসত এসে গেলেও হামসুন সেই সময়টায়, এক পৃষ্ঠা কি দু' পৃষ্ঠা নিদেন কয়েকটা লাইন হলেও একটু পড়ে নিতেন। গ্রীসের প্রাচীন কাব্য, নাটক এবং ইতিহাস হামসুন এইভাবেই পড়ে শেষ করেছিলেন।

একদিনের কথা বলি। ট্রাম চলছে, চলন্ত ট্রামের ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে বই পড়ছেন হামসুন। একটি স্টপে এসে থামলো ট্রামটা। একজন যাত্রী ওঠবার সময়ে বাধা পেলেন উনি ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যে। একটা ধমক দিয়ে ভদ্রলোক সীটে গিয়ে বসলেন। হামসুন নিজের ত্রুটির জন্যে মার্জনা চাইলেন। সেইদিনই ডিউটির শেষে টাকাকড়ি জমা দেবার জন্যে অফিসে গিয়ে শুনতে পেলেন তাঁর সম্বন্ধে অভিযোগের কথা। সেদিনের যাত্রীটি তো নালিশ করেছেনই, তাঁর আগে আরো কয়েকজন একই নালিশ জানিয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে—ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে থেকে প্রায় সময়ই বই পড়ে কণ্ডাক্টর হামসুন। আর তারই ফলে যাত্রীদের ওঠা-নামায় বাধার সৃষ্টি হয়।

ট্রাম কোম্পানীর অফিসার বললেন—কি পড়ছিলে তুমি অতো তন্ময় হয়ে?

—আজ্ঞে মিডিয়া।

—মিডিয়া? সে আবার কি বাপু?

—মিডিয়া, মিডিয়া, মিডিয়া জানেন না? ইউরিপিদেসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক, অবশ্য অলকেশটিসও কম যায় না, তবে মিডিয়ার মতো অতোটা...।

—চোপ রও ছোকরা, এটা অফিস, তোমার নাটকের কথা বলবার জায়গা নয়; ঠিক আছে, কাল থেকে তুমি যাতে শুধু নাটকই পড়তে পারো, তার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

অর্থাৎ কি না চাকুরিটা গেলো হামসুনের। এইভাবে কখনো এটা কখনো সেটা ক'রে বছর দুই আমেরিকায় কাটিয়ে দেশে ফিরে এলেন হামসুন। কিন্তু দেশেও ভাগ্য ফেরাবার কোনো কৌশল উদ্ভাবন

করতে পারলেন না। তাই নানা হয়রানির পরে আবার বছর দুই বাদে আমেরিকাতেই গেলেন। এবারও কাটলো দু' বছর আমেরিকাতে, তারপর আবার দেশে ফিরলেন।

এটা ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। উনিশ বছর থেকে আরম্ভ ক'রে এই দশটা বছর বলতে গেলে একটানা অনিশ্চিত অবস্থায় নিদারুণ কষ্টের মধ্যে কাটলো হামসুনের।

সাহিত্য-সাধনার শুরু—ছাপার অক্ষরে প্রথম বই অবশ্য এর আগেই প্রকাশ করেছিলেন হামসুন; একখানি ছোট্ট উপন্যাসিকা। কিন্তু সে বই প্রকাশ করে প্রকাশকের গিয়েছিলো লোকসান হয়ে, তাই সহসা আর কিছু প্রকাশ করবার সুযোগ-সুবিধেও করে উঠতে পারছিলেন না, যদিও একাধিক পাণ্ডুলিপি তাঁর তৈরি ছিলো। দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে ফিরে হামসুন তাই আর গোটা বই ছাপাবার চেষ্টা না করে একখানা উপন্যাসের কাহিনীকে সংক্ষেপিত আকারে লিখে ডেনমার্কের একটি মাসিক পত্রিকায় ছাপাবার জন্যে পাঠালেন। এই রচনাটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে গোটা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় হামসুন রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। এই রচনাটি বিখ্যাত 'হাঙ্গার'-এর সংক্ষিপ্তরূপ। এটা ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। এর পর থেকে জীবিকার জন্যে লেখা ছাড়া কখনো আর কিছু করতে হয় নি হামসুনকে। পরিণত বয়সে, ষাটের কোঠায় পা দিয়ে (অর্থাৎ নোবেল প্রাইজ পাবার পরে) পৈতৃকবৃত্তি কৃষিকর্মের দিকে হামসুন একবার মন দিয়েছিলেন বটে, তবে সে নেহাত খেয়ালের বশে; প্রয়োজনের তাগিদে নয়।

হামসুনের রচনাবলীর মধ্যে প্রধান হচ্ছে তেরোখানি উপন্যাস—হাঙ্গার; শ্যালো সয়েল; গ্রোথ অব দি সয়েল; প্যান; ড্রিমার্স; মিস্ট্রিজ; দি উওম্যান এ্যাট দি পাম্প; চ্যাপ্টার দি লাস্ট; ভ্যাগাবণ্ডস্; অগাস্ট; দি রোড লীডস্ অন; দি রিং ইজ্ ক্লোস্ড এবং লুক ব্যাক অন হ্যাপিনেস।

হামসুনের সাহিত্যের মধ্য থেকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর চরিত্র আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। প্রথমতঃ যে জাতীয় জীবনধারার সঙ্গে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে এবং তার ফলস্বরূপ অতিমাত্রায় সংবেদনশীল, জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত কিছুটা অসামাজিক বা সমাজ-বিরোধী টাইপ। এরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অনিশ্চিত অবস্থায় বেঁচে থাকে,

ভবঘুরের জীবনে বাধ্য হয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অপরের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মিটমাট করে চলতে অনভ্যস্ত। যেমন দেখা যায় হাঙ্গার, ভ্যাগাবণ্ডস্ প্রভৃতি উপন্যাসে। আর দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে আর একশ্রেণীর চরিত্র যারা সমাজের আর পাঁচজনের সঙ্গে মানিয়ে চলবার জন্যে সদাই আগ্রহশীল। জীবনের পরিস্থিতির সঙ্গে আপোস করে চলাই যাদের প্রকৃতি— অর্থাৎ সাধারণ মানুষ। এ জাতীয় চরিত্র হামস্থনের লেখায় সবচাইতে ভালোভাবে ফুটেছে 'গ্রোথ অব দি সয়েল'-এ। আমরা তাই হামস্থনকে বুঝবার সবচাইতে নিশ্চিত উপায় হিসেবে দুই জাতীয় দু'খানা বই— হাঙ্গার এবং গ্রোথ অব দি সয়েল নিয়ে আলোচনা করবো।

হামস্থনের জীবনের মোটামুটি যে আভাষটুকু আমরা পেয়েছি, তা' থেকেই বোঝা যাবে যে, 'হাঙ্গার'-এর কাহিনীভাগ হামস্থনের নিজেরই জীবনের একটি খণ্ডচিত্র। প্রথমবার কিংবা দ্বিতীয়বার দেশ ছেড়ে আমেরিকা যাবার পূর্বে অস্‌লো এবং ক্রিশ্চিয়ানাতে লিখে জীবনে দাঁড়াবার চেষ্টায় যে মারাত্মক এক্সপেরিমেণ্ট হামস্থনকে করতে হয়েছিল, হাঙ্গার যে তারই অশ্রুসজল বেদনাবিক্ষুব্ধ বাস্তব কাহিনী—এ কথা মনে করবার একাধিক কারণ আছে।

সাহিত্য-সাধনার পরিণত রূপ—হাঙ্গার—হাঙ্গার-এর কাহিনী 'আই' অর্থাৎ আমির জবানিতে লেখা। আলোচনার প্রয়োজনে এই 'আমি'কে আমরা হামস্থনই বলবো।

কাহিনীর শুরুতে একেবারে প্রথম তিন লাইনেই হামস্থন বলছেন :

'…সেই সময়কার কথা বলছি যখন আমি ক্রিশ্চিয়ানাতে অনশনক্লিষ্ট ছন্নছাড়ার মতো অনিশ্চিতভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াতাম; ক্রিশ্চিয়ানা, ওঃ কি অদ্বিতীয় এক নগরী! যে কেউ একবার এ নগরীতে এসে পড়েছে, সেই দেখবে যাবার সময় এ নগরী তার মনে কি ক্ষত সৃষ্টি করেছে!'

ভোর হয়েছে। চাই কি বেশ একটু বেলাই হয়েছে। হামস্থন বুঝতে পারছেন বিশ্বজগৎ কোলাহলমুখর হয়ে উঠেছে; সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। শুধু ওঁরই কোনো কাজ নেই। হামস্থন বেকার যুবক। দীর্ঘদিন বেকার। তাই জেগেও শুয়ে রয়েছেন বিছানায়। আর মনে হচ্ছে, আগামী দিনের জন্যে উৎফুল্ল হবার কোনো কারণ আছে কি? সহস্র প্রশ্নেও সম্মতিসূচক কোনো জবাব আসে না ভেতর থেকে।

'...বিছানা ছেড়ে উঠলাম, বিছানার এককোণার দিকে একটা বাণ্ডিল পড়েছিলো, খাবার মতো যদি কিছু পড়ে থাকে ওর মধ্যে এই আশায় হাত বাড়ালাম। কিন্তু নাঃ কিছু নেই!'

অসংখ্য জায়গায় চাকুরির জন্যে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন হামসুন—কোথাও সরাসরি এবং স্পষ্ট 'না' শুনেছেন, কোথাও বৃথা আশ্বাস দিয়ে লোকে হয়রান করেছে; কোথাও বা চাকুরি একটা হতে পারতো এক ঘণ্টা কি দু'ঘণ্টা আগে গিয়ে পৌঁছতে পারলে। কোথাও নগদ সিকিউরিটি রাখবার অক্ষমতার জন্যে চাকুরি জোগাড় হলো না—এই রকম সব। শেষ পর্যন্ত একদিন বেপরোয়া হয়ে ফায়ার ব্রিগেডের কর্মী হবার জন্যে আরো অনেকের পাশে বুক ফুলিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন উনি। কিন্তু এক্ষেত্রেও হলো না কিছু। অফিসার জানালেন যে চোখ খারাপ। পরদিন হামসুন চশমাটা পকেটে পুরে আবার এসে লাইনে দাঁড়ালেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অফিসারই আজও এলো এবং একনজর দেখেই চিনতে পারলো। সে আগের দিনই জেনেছে যে হামসুনের চোখ খারাপ, কাজেই কিছুই হলো না।

সর্বত্র এইভাবে ব্যর্থমনোরথ হ'তে হ'তে শেষ অবধি হামসুন নিজেই বুঝতে পারলেন যে, বুকের সাহস আর মনের বল কি ভীষণভাবে কমে গিয়েছে; তা ছাড়া ভদ্রভাবে কারো সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মতো জামা-কাপড়েরও অভাব দেখা দিলো।

'...রাস্তায় রাস্তায় অনিশ্চিতভাবে ঘুরতে লাগলাম, কখনো একটানা চলছি, কখনো বা এখানে-সেখানে থামছি। দেখছি একবার এদিক-ওদিক, আবার চলছি...মহাশূন্যটা স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল, আমার মাথার মধ্যেটাও যেন অমনি ফাঁকা হয়ে গেছে।'

সেদিন হামসুন ওঁর ওয়েস্টকোটটা এক মহাজনের কাছে বন্ধক রেখে কয়েকটি টাকা সংগ্রহ করে আশ্রয়ে ফিরলেন।

'...আমার কেবলই মনে হতে লাগলো যে স্বয়ং ভগবান আমার পেছনে লেগেছেন...যখন যেখানে যাই শুধুই হতাশা আর হতাশা!'

ওয়েস্টকোট বেচা টাকা ক'টি সম্বল করে একটি প্রবন্ধ রচনার কাজে উঠে-পড়ে লেগে গেলেন হামসুন। একটা কাগজের সম্পাদকের খুবই ভালো লাগলো রচনাটি। তাই নগদ কয়েকটি টাকা দক্ষিণাও দিলেন।

কিন্তু তারপরে বেশ কিছুদিন চেষ্টা করেও আর যেন মনের মতো লেখা তৈরি হচ্ছে না দেখা গেলো। তবু বারকয়েক ঘোরা-ফেরা করলেন সম্পাদকের কাছে। এই সম্পাদকমশাই তরুণের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন, নানাভাবে অনুপ্রাণিত করবার চেষ্টা করলেন হামস্থনকে। ওঁর ব্যবহার এতই ভদ্র এবং শিষ্ট ছিলো যে, ওঁর কাছে হাত পেতে সাহায্য চাইতেও পারলেন না হামস্থন। এদিকে অন্য দু-একটি কাজের সম্ভাবনা দেখা দিয়েও শেষ পর্যন্ত জুটলো না। কাজেই আবার শুরু হলো অনশন। দিনের পর দিন চলতে লাগলো একইভাবে।

যে ঘরটায় রাত কাটাতেন হামস্থন—এক বাড়িওয়ালীর ভাঙা-চোরা পরিত্যক্ত একখানা ঘর, তারও ভাড়া বাকি পড়ে গিয়েছিলো বেশ কিছুদিন ধরে। বাড়িওয়ালী ছিলেন কিছুটা ভদ্র প্রকৃতির। শিক্ষিত বেকার যুবকের দুর্দশাটা যে কোন্ স্তরে গিয়ে পৌঁছেচে তা বুঝতেন। তাই বড়ো একটা তাগাদা দিতেন না। কিন্তু হামস্থনের বিবেক এবং বিচারবোধ এখনো যথেষ্ট শক্তিশালী রয়েছে। ক্ষুধার তাড়না মাঝে মাঝে তাঁকে উন্মাদপ্রায় করে তুললেও এখনো বেশির ভাগ সময়েই তিনি সৎ এবং স্বাভাবিক চিন্তাই ক'রে থাকেন। কোথাও কিছু পাবার সম্ভাবনা দেখা দিলেই বাড়িওয়ালীকে কিছু দেবার সদিচ্ছা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে বসেন। বাড়িওয়ালী বুঝতে পারেন যুবকের বাস্তববুদ্ধির অভাবের কথা। কাজেই কথামতো টাকা না পেলেও কিছু বলেন না। বাড়িওয়ালীর এই ভদ্র-ব্যবহারের ফলে হামস্থনের মনে দেখা দেয় আরো লজ্জা। লজ্জা এবং ধিক্কার। নিজের কাছে মরমে মরে যান হামস্থন। কখনো মনে হয় নিজেকে অযোগ্য বলে, কখনো মনে হয় যেন গোটা দুনিয়াটা, ভগবান পর্যন্ত যেন ষড়যন্ত্র করেছেন ওঁকে তিলে তিলে মেরে ফেলবার জন্যে।

একবার কথামতো বাড়িভাড়া না দিতে পারার লজ্জায় হামস্থন আর বাড়িতেই ফিরবেন না ঠিক করলেন। শেষ পর্যন্ত দারুণ শীতের তাড়নায় বাইরে টিকতে না পেরে যদিও ফিরলেন কিন্তু দেখা গেলো চাবিটা হারিয়ে গেছে। এতো রাতে দরজা ভাঙা ঠিক হবে না মনে করে শুয়ে রইলেন এক পার্কে গিয়ে। কিন্তু এখানেও স্বস্তি নেই। পুলিস এসে ধরে নিয়ে গেলো থানায়, ওঁকে গৃহহীনদের একজন মনে করে। কিন্তু হামস্থন নিজেকে এখনো গৃহহীনদের সামিল মনে করতে পারেন না।

এখনো জীবন সম্পর্কে তিনি একেবার হতাশ হন নি। তাই থানার অফিসারের কাছে নিজেকে একজন সাংবাদিক বলে মিথ্যে পরিচয় দিলেন।

সাংবাদিক শুনেই রাতের মতো ভালো শোবার বন্দোবস্ত হলো কিন্তু খাবার কিছু পাওয়া গেলো না—কারণ, অফিসার মনে করলো উনি তো আর প্রকৃত অভাবগ্রস্ত নন; কোনো কারণে সময় মতো বাড়ি ফিরতে পারেন নি। ওঁকে কি আর গৃহহীনদের খাবার দেওয়া যায়। সকালেও ঠিক সেই অবস্থাই হলো। সব গৃহহীনরাই খেতে পেলো হামসুন বাদে। হামসুন বোধ করতে লাগলেন শরীরের ভেতরটা যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে—একটু একটু করে পুড়ে নিঃশেষ হচ্ছে।

আবার রাস্তা। এ রাস্তা যেন অফুরান।

'···বেঁচে থাকবার জন্যে অর্থসংগ্রহের সমস্তরকম পরিচিত উপায়েই আমার চেষ্টা করা হয়ে গেছে। সব দিকেই অসাফল্য। কে যেন আমার বুকের ভেতর বলতে শুরু করলো: আ রে নির্বোধ, তুই যে মরতে চলেছিস।···'

'···পথ চলতে চলতে চোখে পড়ল একখানা ছোট্ট নুড়ি পাথর। সেখানা কুড়িয়ে নিলাম। কোটের ওপর একটু বুলিয়ে সাফ করে নিয়ে পুরলাম মুখে—কিছু একটা না চুষতে পারলে গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছিলো।···'

···'বুঝতে পারছিলাম আমার চোখ দু'টো ক্রমশঃ মাথার মধ্যে বসে যাচ্ছিলো।···'

কিছুদিন আগে একটি মেয়েকে পথ চলতে দেখে ভালো লেগেছিলো হামসুনের। একদিন আবার দেখা হয়ে গেলো তার সঙ্গে। হামসুন বুঝতে পারলেন যে মেয়েটিও চায় ওঁকে। কিন্তু নিজের সীমাহীন দারিদ্র্যের জন্যে নিজেই পিছিয়ে এলেন।

একদিন এক কসাইয়ের দোকানের কাছে এসে থামলেন হামসুন।

'···একখানা হাড় দিতে পারেন দয়া করে? আমার কুকুরটার জন্যে শুধু একখানা হাড় হলেই চলবে।···'

কসাই দিলে একখানা হাড়। হাড়ের গায়ে কিছুটা মাংসও লেগেছিলো।

'···আমার বুকের ভেতরটা সজোরে দপ্ দপ্ করতে লাগলো। হাড়খানা কোটের তলায় লুকিয়ে নিয়ে একটা নির্জন সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লাম।···

কোনো আস্বাদ পেলাম না।...উপরন্তু কাঁচা রক্তের গন্ধে গা গুলিয়ে উঠলো। তারপরই মুহুর্মুহুঃ বমি।...'

কোন সভ্য মানুষ যে এ-হেন দুর্দশায় কখনো পড়তে পারে, তা যেন দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েই প্রায় দেড়শ' বছর আগে রুশো লিখেছিলেন: There is a stage of degradation which robs the soul of its life, and the inner voice cannot be heard by one where mind is bent on getting food.—(*Emile*) বিস্ময়কর মানসিক শক্তির অধিকারী হামস্থনের অন্তর এবং বাহির যখন এই রকম শূন্যতায় ছেয়ে গেল, তখন ওঁর জীবন রক্ষা হলো বলতে গেলে দৈবক্রমে।

একদিন পথে এক জাহাজীর সঙ্গে আলাপ হলো হামস্থনের। না চাইতেও সে ওঁর অবস্থা বুঝে কয়েকটা টাকা গুঁজে দিলো পকেটে। উনি সেই টাকা সম্বল করে উঠলেন গিয়ে এক পান্থশালায়। এবার একটা কিছু লিখে ফেলতেই হবে মনস্থ করলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন দুঃখকষ্টের ফলে মগজে যেন আর কিছু নেই। লেখা বেরুতেই চায় না। এদিকে টাকাও ফুরিয়ে আসতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত আবার রাস্তা।

এমনিধারা একটানা সংগ্রাম করতে করতে শেষ পর্যন্ত জাহাজঘাটায় এক ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পরিচয় হলো হামস্থনের। এই ক্যাপ্টেন রাজী হলো তার জাহাজে ওঁকে কাজে নিতে। এইভাবে আপাততঃ রক্ষা পেলেন হামস্থন।

গ্রোথ্ অব দি সয়েল—'হাঙ্গার' যেমন একক মানুষের দুঃখকষ্ট আর ব্যর্থতার কাহিনী, 'গ্রোথ্ অব দি সয়েল'-এ আমরা তেমনি সুখসমৃদ্ধ এবং সমাজবদ্ধ মানুষের সংগঠনী শক্তি এবং সৃজনী প্রতিভার সাফল্যের স্বাদ পাই।

আইজাক একজন শ্রমজীবী কৃষক। নগরসভ্যতায় বিরক্ত হয়ে চলে যায় প্রায়-নির্জন একটা গ্রামে। সেখানে গিয়ে শুরু করে চাষ-আবাদ। ক্রমে সম্পূর্ণ নিজের কায়িকশ্রমের ওপর নির্ভর করে ওর অবস্থা ফিরলো। নিজেই খেতখামার করে বসলো। কুঁড়ে ভেঙে তৈরি করলো বাড়ি। প্রথম বছরের শীতকাল পর্যন্ত দেখা যায় আইজাকের সঙ্গী বলতে শুধু তিনটি ছাগল। বসন্তকালে আইজাকের একজন সঙ্গী জুটলো। পাশের একটা গ্রামে বেড়াতে গিয়েও নিয়ে এলো একটি মেয়েকে। নাম তার ইঙ্গার। ইঙ্গার তরুণী, কিন্তু তবু তখন পর্যন্ত সে ছিলো অবিবাহিতা। বিয়ের তার

কোনো সম্ভাবনাও ছিলো না। কারণ তার মুখে ছিলো একটা খুঁত। ওপরের ঠোঁটখানি ঠিক নাকের তলার দিকে ছিলো চেরা—অনেকটা খরগোসের মতো। এ রকম মেয়েকে আর কে বিয়ে করবে? ইঙ্গার চলে এলো আইজাকের সঙ্গে। দু'জনে মিলে নতুন উদ্যমে ঘর বাঁধলো ওরা। ইঙ্গারের ঠোঁটের খুঁতটা সবাই পরিহাসের দৃষ্টিতে দেখলেও আইজাক সহানুভূতির সঙ্গেই দেখতে আরম্ভ করেছিলো একেবারে প্রথম থেকে। স্বভাবতঃই আইজাক ছিলো কিছুটা সদয় প্রকৃতির মানুষ। ক্রমে ওরা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেললো। ওরা দু'জনে মিলে অবিশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করে সংসার সচ্ছলতায় পূর্ণ করে তুললো। যথাসময়ে ওদের প্রথম সন্তান হলো—একটি ছেলে। ছেলেটির বয়স যখন একবছর পূর্ণ হলো তখন ওরা একদিন পাশের গ্রামের গির্জায় এলো। ছেলের নামকরণের জন্যেও বটে, তা'ছাড়া আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের বিয়েটাও সেরে নেওয়া দরকার।

ওদের সংসারের ওপর অকস্মাৎ যেন শনির দৃষ্টি পড়লো। ইঙ্গারের এক বর্ষীয়সী বিধবা আত্মীয়া ওদের সুখ-সমৃদ্ধি দেখে ঈর্ষায় জ্বলে উঠলো। ইঙ্গার নিজের মুখের খুঁত সম্বন্ধে সবসময়েই সচেতন। প্রতিটি সন্তানের জন্মের পরে ও সতর্ক দৃষ্টি রাখে ওর খুঁতটা তাদের কারো মধ্যে বর্তায় কি না দেখবার জন্যে। প্রথম দু'টি সন্তান নিখুঁত হলো। কিন্তু তৃতীয় সন্তানটি জন্মের সময় ঐ বিধবা আত্মীয়া ইঙ্গারের মনকে এমনভাবে প্রভাবিত করলো যে, তার মধ্যে মায়ের খুঁত দেখা দিলো। সারাজীবন ধরে মানুষের উপহাসের পাত্র যাতে না হয়ে থাকতে হয়, সেইজন্যেই ইঙ্গার তার শিশুকে নষ্ট করবে মনস্থ করে বেরিয়ে গেলো ঘর ছেড়ে। অলিভ নামে ঈর্ষাকাতর আর একটি লোক ব্যাপারটা সবাইকে জানিয়ে দিলো। ইঙ্গারকে আইজাক মার্জনা করলো বটে, কিন্তু দেশের আইন মার্জনা করলো না। আট বছরের জন্যে জেলের হুকুম হলো তার। কিন্তু আইজাক-পরিবারের একজন প্রকৃত বন্ধু গেইসলারের তদ্বিরের ফলে বছরখানেক বাদেই ইঙ্গার ছাড়া পেলো। জেলে যাবার সময় ও ছিলো অন্তঃসত্ত্বা। জেল থেকে ফিরলো একটি নবজাত শিশু নিয়ে। এটি একটি মেয়ে। ঐ বিধবা আত্মীয়ার প্রভাবটা এক্ষেত্রেও কাজ করেছিলো। মেয়েটিরও ওপরের ঠোঁট দু'খানি খরগোসের মতো কাটা। কিন্তু এবার বিজ্ঞান এগিয়ে এলো ওদের সাহায্য করবার জন্যে। একটা অপারেশন করে কাটা ঠোঁট স্বাভাবিক করা হলো।

জেলে কিছুকাল থাকবার ফলে ইঙ্গারের মধ্যে অবশ্য কয়েকটি পরিবর্তন দেখা দিয়েছিলো। চাষবাস এবং পাড়াগাঁয়ের ঘর গৃহস্থালি এখন তার আর ভালো লাগে না।

আইজাকের বড়ো ছেলে এলিসিয়ুস এক এঞ্জিনীয়ারের নজরে পড়ে গাঁ ছেড়ে চলে এলো শহরে। চাষবাস তারও ভালো লাগে না। শেষ পর্যন্ত ও আমেরিকা চলে গেলো এবং সেখানেই স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করলো।

এদিকে আইজাকের জমির তলায় তামার খনি আবিষ্কৃত হলো। তার ফলে আর্থিক অবস্থা গেলো আরো ভালো হয়ে। ক্রমে এ গ্রামে অন্যান্য লোকজনও এসে জুটলো বসবাসের উদ্দেশ্যে। আইজাক এ-অঞ্চলের মধ্যমণি হয়ে উঠেছিলো। নতুন যারা এসে খেতখামার পত্তন করলো তাদের একজনের নাম এক্সেল। এক্সেল বারব্রো নামে একটি তরুণীকে নিয়ে এলো কাজকর্মের সাহায্যের জন্যে। ওরাও স্বামী-স্ত্রীর মতোই চলতে লাগলো। বারব্রোর ছেলে হলো যথাসময়ে। বারব্রো হলো শহর-ঘেঁষা মেয়ে। শহরের এক বাড়িতে একসময় কাজও করেছে ও। কাজেই কোনোরকম ভারবোঝা বাড়াতে ও রাজী নয়। সেই জন্যেই দেখা যায় নিজের শিশুকে ও ডুবিয়ে মারে। কিন্তু ভান করে যেন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। পুলিস হেফাজতে বারব্রো চলে যাবার পরে মামলা শুরু হলো শিশু-হত্যার জন্যে। কিন্তু মহিলা নেতা মিসেস হেয়ারফলের নিপুণ ওকালতির জন্যে বারব্রো বেকসুর খালাস পেলো। বারব্রোকে তিনি নিজের কাছে নিয়ে যেতেও চাইলেন। কিন্তু বারব্রো গেলো না। সে যে আবার সন্তানসম্ভবা।

এক্সেল কিছুটা নিস্পৃহের মতোই গ্রহণ করলো বারব্রোকে। ওর শুধু দুশ্চিন্তা একটা বিষয়ে। সে বিষয় পারিবারিক নয়, অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর কোনো সমস্যা নয়, বারব্রো যদি আবার মারে তার সন্তানকে—তাও নয়। এক্সেল একান্তভাবেই অর্থ-সম্পদের শক্তিতে বিশ্বাসী। ওর শুধু চিন্তা এবার ফসলের কাজে আর স্ত্রীর সাহায্য পাওয়া যাবে না। একাই করতে হবে সব কিছু। ওর কাছে মানুষের যা কিছু মূল্য সে শুধু সম্পদ উৎপাদনের শক্তির জন্যে।

হাঙ্গার এবং গ্রোথ অব দি সয়েল স্পষ্টতঃই ভিন্নমুখী দু'টি রচনা। দু'টি পৃথক জগৎ। একটি নগরসভ্যতার নানা সমস্যায় জর্জরিত লোকারণ্যে নিঃসঙ্গ অসহায় মানুষের ছবি; অন্যটি প্রাকৃতিক পরিবেশে সবল, শ্রমজীবী মানুষের বিজয়গাথা।

হাঙ্গারে নায়ক ব্যতীত আরো বারো-চৌদ্দটি চরিত্র আছে। তাদের মধ্যে দু'জন বাদে আর প্রায় সকলেই যেন একটা মিছিলে চলছে, একবার দেখা দিয়েই হারিয়ে যাচ্ছে। নায়কের সমস্যাটাকে একটু বাড়িয়ে দিয়ে বা একটু অন্যদিকে মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গ্রোথ অব দি সয়েল-এ তা নয়। প্রতিটি চরিত্র আসছে যেমন শ্লথগতিতে, সরেও যাচ্ছে ঠিক তেমনি। এ যেন আমাদের পরিচিত সভ্যজগতের বাইরের কোনো জায়গা—কিংবা বলা চলে আধুনিক সভ্যতার সৃষ্টির পূর্বের কোনো গোষ্ঠীর কাহিনী।

শিল্পনৈপুণ্য—হাঙ্গার এবং গ্রোথ অব দি সয়েল—এই দু'খানা উপন্যাসেই হামসুন তাঁর বাস্তববাদকে এমন প্রকট করে এঁকেছেন যে পাঠকমাত্রেরই মনে একটা স্থায়ী ছাপ থেকে যায়। এ দু'খানা বইতেই সাধারণতঃ যাকে 'নগ্নতা' বলা হয় তা বহুক্ষেত্রেই রয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত নগ্নতাও হামসুনের সংবেদনশীল শিল্পবোধের জন্যে শিল্পই হয়েছে—নগ্নতা হয় নি। আইজাক এবং ইঙ্গার; এক্সেল এবং বারব্রো যে হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে যাবার পর থেকেই সামাজিক রীতিনীতির কথা ভুলে গিয়ে একসঙ্গে বাস করতে আরম্ভ করলো—বা তাদের সন্তান হতে লাগলো, এগুলি আপাতদৃষ্টিতে নগ্নতা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মনোযোগী পাঠক বুঝতে পারবেন এবং তিনি উপলব্ধি করবেন যে, নিছক নগ্নতা হতে হতেও ব্যাপারগুলি যেন কেমন ঊর্ধ্বলোকে উঠে যাচ্ছে। এ ঠিক স্বর্গীয় প্রেম নয়, অথচ সমাজ-বিরোধীও কিছু নয় (তারাই যে সমাজপ্রতিষ্ঠার বীজ বপন করছে), বরং বলা চলে যেন কিছুটা বুনো। আদম এবং ঈভের নগ্নতা যেমন একটা প্রাকৃতিক সুষমায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো, এও যেন অনেকটা তাই। নগ্ন কিন্তু অশ্লীল নয়।

ঠিক তেমনি হাঙ্গারেও অন্ততঃ দু'টি জায়গা আছে যা চূড়ান্ত অশ্লীল হতে পারতো, কিন্তু হামসুন তাঁর শিল্পগুণ দিয়ে সবকিছু ঢেকে ফেলতে পেরেছেন।

দু'টি নরনারী পরস্পরের প্রতি যখন গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তখন উভয়েই কিছুক্ষণের জন্য বেশ কিছুটা পরিবেশের চেতনাহীন হয়ে যায়, তখন যা ঘটে তা প্রাকৃতিক নির্দেশেই ঘটে; মানুষ সেখানে অসহায়। তাই দেখা যায়, হামসুন যেদিন ইলাজালির ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, শরীরটা তাঁর ক্ষুধাজর্জর হলেও মনে তাঁর মুক্তির আস্বাদ।

হাঙ্গারের অন্য একটি জায়গাতে দেখা যায়, যে পান্থশালায় হামস্থন আশ্রয় নিয়েছিলেন তার কর্ত্রী একজন বোর্ডারের সঙ্গে পৈশাচিক আনন্দে লিপ্ত। ঐ কর্ত্রীর স্বামী নিজেই হামস্থনকে ডেকে দেখালো দৃশ্যটা দরজার একটা ফুটো দিয়ে। হামস্থন দেখলেন বন্ধ ঘরটার মধ্যে বসে আছে কর্ত্রীর পঙ্গু এবং বুড়ো বাপ। আর একেবারে তার চোখের সামনেই ঘটছে ব্যাপারটা। এ যে শুধু অর্থকষ্টের ফল নয় তা হামস্থন বুঝলেন, এ হচ্ছে আরো অর্থের নেশা। এ যে নরকের চাইতেও ঘৃণ্য। হামস্থন ঘৃণায় শিউরে উঠে চোখ সরিয়ে নিলেন। মনে মনে শুধু প্রার্থনা করলেন যেন বুড়োটা এখুনি মারা যায়। হ্যাঁ, এখুনি।

চরম বাস্তবচিত্র এঁকেও হামস্থন তাঁর এই ধরনের সূক্ষ্ম শিল্পবোধের জন্যেই সাহিত্যে অমরত্বের অধিকারী।

আনাতোল ফ্ঁাস

পৃথিবীর অবাক্‌-করা দেশগুলির অন্যতম হলো ইয়োরোপের ফ্রান্স। কি রাজনীতিতে, কি শিল্প-সাহিত্যে, প্রাণচাঞ্চল্যে ফরাসী দেশ গত কয়েক শতাব্দী ধরেই সদা ব্যস্ত। নিত্য নূতন চিন্তাভাবনা, মননপদ্ধতি ও জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করবার প্রচেষ্টা ফরাসীদের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বস্তুতঃ পক্ষে এই এগিয়ে ভাবা ও এগিয়ে চলার স্বভাবের জন্যই ফ্রান্স অনায়াসে গত কয়েক যুগ ধরে ইউরোপের শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আজকের দিনে ফ্রান্সের এ শ্রেষ্ঠত্ব বজায় আছে কি না—সে সম্বন্ধে হয়ত মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু এ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত ফ্রান্সের জুড়ি কেউ ছিল না একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আনাতোল ফ্রাঁস (Jacques Anatole Thibault, 1844—1924) এই অবাক্‌-করা ফ্রান্সের এক অত্যাশ্চর্য প্রতিভা।

ফ্রাঁসকে কেউ র‍্যাবলের সঙ্গে তুলনা করেছেন, কেউ ভলটেয়ারের সঙ্গে, কেউ বা ডিকেন্সের সঙ্গে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে দখল, পাণ্ডিত্য, উদ্ভাবনী শক্তি প্রভৃতি যে কোন দিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন ওঁদের সঙ্গে ফ্রাঁসের তুলনা করলে কারো ওপর অবিচার করা হয় না, কিন্তু ব্যাপারটা বোধ হয় খুব সঙ্গত হয় না এই জন্য যে এ যুগের সাহিত্যের একটি যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ অর্থাৎ বিশ্লেষণ ও টেকনিক, সেদিক থেকে বিচার করলে বক্তব্য যাই হোক না কেন, শিল্পচাতুর্যে ফ্রাঁস ওঁদের প্রত্যেকের চাইতেই বড় এবং অনায়াসেই আজকের দিনের যে কোন পাঠকের অধিকতর মনোহরণ করতে সক্ষম। এদিক থেকে বিচার করেই বলতে হয় আনাতোল ফ্রাঁস বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লেখকগণের অন্যতম।

প্রথম জীবন—প্যারিসের একজন বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা এবং দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের উৎসাহী সংগ্রাহকের একমাত্র পুত্র ছিলেন ফ্রাঁস। যথাসময়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন উনি। এবং খুব অসাধারণ কিছু কৃতিত্ব স্কুলের পড়াশুনোর সময় দেখাতে না পারলেও যোগ্যতার সঙ্গেই স্কুলের পাঠ

শেষ করেছিলেন। স্কুলে অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের চাইতে প্রাচীন গ্রীক এবং ল্যাটিন সাহিত্য সম্বন্ধে ওঁর বেশি আগ্রহ দেখা গিয়েছিলো।

কিন্তু যথার্থভাবে শিক্ষা বলতে যা বোঝায় ফ্রাঁস তা স্কুলে লাভ করেন নি। প্রথমতঃ বাবার বইয়ের দোকান এবং বইয়ের সংগ্রহশালায় এবং দ্বিতীয়তঃ বাড়িতে প্রাত্যহিক সান্ধ্য বৈঠকে যে শিল্পী, সাহিত্যিক, সমালোচক, গ্রন্থ-বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষিত সংস্কৃতিপ্রিয় বিশিষ্টজনের সমাগম হতো তাঁদের আলাপ-আলোচনা শুনে এবং আলোচনায় ক্রমশঃ একটু একটু করে অংশগ্রহণ করে ফ্রাঁস নানা বিষয়ে নিজেকে সুশিক্ষিত করে তোলেন। বলাই বাহুল্য ওঁর বাবার বিদ্যোৎসাহীতার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল।

ফ্রাঁসের বাবা লেখক ছিলেন না বটে কিন্তু অনেক লেখককেই তিনি বিভিন্ন সময়ে নানা ভাবে প্রেরণা জুগিয়েছেন। একমাত্র পুত্র তাঁর বড় হয়ে পৈতৃক ব্যবসায় দেখাশোনা করবে এইটেই সবাই আশা করেছিলেন। কিন্তু, কিশোর বয়স থেকে ফ্রাঁসের সাহিত্যানুরাগের তীব্রতা দেখে অন্ততঃ কেউ কেউ এটা অনুমান করতে পেরেছিলেন যে পৈতৃক ব্যবসায়ের গণ্ডীর মধ্যে ওঁর কর্মজীবন সীমাবদ্ধ থাকবে না। বাস্তবিক তাই হলো। একুশ-বাইশ বছর বয়সে ফ্রাঁস এমন দুটি কবিতা লিখলেন যে অনেকেই ওঁর কাব্যশক্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। একটু অতি-মাত্রায় প্রগতিপন্থী এই কবিতা দু'টি একটি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পরে সরকারী রোষে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। সঙ্গে সঙ্গে আনাতোল ফ্রাঁস নামটিও সাহিত্যরসিক মহলে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলো।

ভবিষ্যৎ জীবনে পারিবারিক ধারা বজায় রেখে ফ্রাঁস যাতে একজন গোঁড়া ক্যাথলিক এবং রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন বাবার তরফ থেকে তার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও, যৌবনে পা দিতে না দিতেই দেখা গিয়েছিল ফ্রাঁস দু'টি মত এবং পথেরই ঘোরতর বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। বাবার দোকানের এবং সংগ্রহশালার অসংখ্য বইয়ের মধ্য থেকে বেছে বেছে প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্য, ইতিহাস এবং আত্মজীবনী-মূলক রচনা খুব অল্প বয়স থেকে যে ফ্রাঁস পড়তে শুরু করেছিলেন, অনেকের ধারণা যে প্রচলিত বিশ্বাসের বিরোধী তিনি তার ফলেই হয়ে উঠেছিলেন। যাই হক, ফ্রাঁসের বাবা ওঁর স্বাধীন মতে কখনো প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতেন না।

সাহিত্যসাধনার শুরু—সতরো আঠারো বছর বয়সে ফ্রাঁসের জীবনে সাহিত্যসাধনার যে শুরু হয়েছিল, বলতে গেলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিলো। ওঁর প্রথম প্রকাশিত বই হলো একখানি কবিতা সংকলন; প্রকাশিত হয়েছিলো ওঁর উনত্রিশ বছর বয়সে। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা বলতে যা বোঝায় তা এসেছিল আরো আট বছর বাদে ওঁর প্রথম উপন্যাস 'দি ক্রাইম অব সিলভেস্টে বনার্ড' প্রকাশিত হবার পরে

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাদিতে ছোট বড়ো নানা নিবন্ধ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনামূলক রচনা সাহিত্যসাধনার শুরু থেকেই ফ্রাঁস নিয়মিত লিখে চলছিলেন। এবং ফরাসী সাহিত্য-মহলে ফ্রাঁস একজন অত্যন্ত চিন্তাশীল এবং প্রভাবশালী সাহিত্য সমালোচক হিসেবে গণ্য হতেন।

বুদ্ধিদীপ্ত অথচ কাব্যসুষমা-মণ্ডিত একটি নতুন গদ্যরীতি প্রবর্তনের জন্য ফ্রাঁস 'সিলভেস্ট্রে বনার্ড' প্রকাশিত হবার পর থেকেই নিজস্বতায় ভাস্বর হয়ে উঠেছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে প্রাজ্ঞতা তথা সাহিত্য সেবার জাতীয় স্বীকৃত স্বরূপ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঁস আকাডেমীর অন্যতম সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সাহিত্যসাধনার পরিণত রূপ—গল্প, উপন্যাস, কবিতা, সাহিত্য-সমালোচনা, জীবনী, সব মিলিয়ে ফ্রাঁসের বইয়ের সংখ্যা প্রায় সত্তরখানা। তার মধ্যে প্রায় চল্লিশখানার ইংরেজী অনুবাদ হয়েছে। এর মধ্যে অন্ততঃ সাতখানা—The Red Lily ; Thais ; Penguin Island ; Balthasar ; At the Sign of the Reine Pedauque ; The Gods are Athirst এবং The Human Comedy—বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী সংয়োজন বলে সমালোচকগণ স্বীকার করেছেন।

অনেকেই মনে করেন যে At the Sign of the Reine Pedauqueই ফ্রাঁসের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। ভলটেয়ারের 'কাঁদিদ' এর প্রেরণায় লিখিত এ উপন্যাসের কাহিনী অংশে দেখা যায়:

ছোট একটা হোটেল মালিকের ছেলে মেনেট্রিয়ার দোকানে বসেই পড়াশুনা করে। জেরোম কয়গমার্ড নামে তার একজন শিক্ষক নিযুক্ত হলো। জেরোম নিজের বৃত্তান্ত দিতে গিয়ে জানালেন কি ভাবে জীবনে দাঁড়াবার জন্য তিনি প্রতি পদে আঘাত পেয়ে আসছেন। হেন কাজ

নেই যা তিনি করেন নি, কিন্তু কোথাও শেষ পর্যন্ত তিনি টিকে থাকতে পারেন নি ; আর দু'বার সম্পূর্ণ অকারণে দু'টি মহিলার জন্য তাঁকে অশেষ দুর্ভোগের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে।

একদিন মেনেট্রিয়ার তার মাষ্টার মহাশয় ও মা-বাবার সঙ্গে হোটেলে বসে রাতের খাবার খাচ্ছিলো। এমন সময় একজন আধপাগলা লোক এলো সেখানে। ক্রমে জানা গেল লোকটি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। পরদিন সকালে মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে ঐ পণ্ডিত অর্থাৎ দাস্তার‍্যাক-এর বাড়িতে এসে বোঝা গেল যে, উনি প্রকৃতই একজন অসাধারণ ব্যক্তি। বিশ্ব-রহস্যের মূল তত্ত্বের সন্ধানে উনি সর্বদা আত্মনিয়োগ করে আছেন। মাষ্টার মহাশয়কে উনি তৎক্ষণাৎ একটা কাজে নিযুক্ত করে দিলেন। কাজটি হলো গ্রীক ভাষা থেকে একখানা বইয়ের ল্যাটিন অনুবাদ করা। দাস্তার‍্যাকের বিশ্বাস যে ঐ প্রাচীন বইখানার মধ্যে বিশ্ব-রহস্যের অনেক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে। মাষ্টার মহাশয়কে তাঁর কাজে সাহায্য করবার কিছুটা দায়িত্ব নিলো মেনেট্রিয়ার। এইভাবেই গেল কিছুদিন।

এদিকে মেনেট্রিয়ার ছেলেবেলা থেকে একটি অত্যন্ত দুঃস্থা বালিকার সঙ্গে পরিচিত ছিল। মেয়েটির নাম ক্যাথারিন, বর্তমানে তরুণী রূপসী। হঠাৎ একদিন গাড়ী করে ক্যাথারিন মেনেট্রিয়ারের কর্মস্থলে অর্থাৎ দাস্তার‍্যাকের বাড়ির কাছে এসে হাজির। ও আবেগভরে জানায় যে অবস্থা-বিপাকে কোন এক ধনীর রক্ষিতা হয়ে থাকলেও এখনো ও মেনেট্রিয়ারকে ভালবাসে। কিন্তু আসলে এ মেয়েটি যে কাকে ভালবাসে তা' হয়ত ও নিজেও জানে না।

ফ্রাঁসকে যে কেন র‍্যাবলের সঙ্গে তুলনা করা হয় তা' বোঝা যায় বিশেষ করে এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করে যে বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ করা হয়েছে তা দেখে। উচ্ছৃঙ্খলতা ও নগ্নতার চরম পরিবেশ সৃষ্টি হয় এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করে। এটা যে ফ্রাঁস স্বদেশের নৈতিক মানের ক্রমাবনতির দিকে লক্ষ্য রেখে করেছেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না।

মেনেট্রিয়ার তার মাষ্টার মহাশয়ের সমভিব্যাহারে ক্যাথারিন, ক্যাথারিনের তিনজন প্রণয়ী ও অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তারপর একদিন একটি ঈর্ষাপরায়ণ ইহুদী মাষ্টার মহাশয়কে দারুণ আঘাত করলো, যার ফলে কয়েকদিন পর মাষ্টার মহাশয় দেহত্যাগ করলেন। মৃত্যু শয্যায়

মাষ্টার মহাশয় তাঁর ছাত্রকে যে কথাক'টি বললেন তা' যেমন তেমন একটা দার্শনিক তত্ত্ব। অনেক কথার মধ্যে তিনি বললেন: "এতদিন আমি যা পড়িয়েছি সব ভুল, সমস্ত জীবন ধরে যা বুঝেছি তা'ও ভুল। কারণ বই আর স্ত্রীলোক এ দু'টো বস্তু ছাড়া আমি আর কিছুই জানি না, আর এ দু'টো জিনিসই মানুষকে কুটিল ও সংকীর্ণ করে দেয়—প্রাকৃতিক পরিবেশে সহজ সরল জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন।"

মেনেট্রিয়ার শেষ পর্যন্ত স্বগৃহে ফিরে এলো। তারপর একদিন একটা দুর্ঘটনার ফলে দাস্তার‍্যাকের বাড়িটাও পুড়ে গেল। মেনেট্রিয়ার মনে মনে বুঝতে পারলো যে মানুষের শক্তি কতো সীমাবদ্ধ।

এ যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনেক বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তি বিস্ময়ের সঙ্গে এটা লক্ষ্য করেছেন যে সাহিত্যস্রষ্টারা গুণগতভাবে দু'ভাগে বিভক্ত। এক হলেন যাঁরা বক্তব্যটাই প্রধান মনে করেন; আর, দ্বিতীয় হলেন যাঁরা মনে করেন বক্তব্যটা গৌণ, বলার বিশিষ্ট ভঙ্গী, পরিবেশনের শিল্প-চাতুর্যে পাঠকের মনোহরণ করা, তাকে আনন্দ দেওয়াটাই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। ফ্রাঁস সাহিত্যের এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী ছিলেন। এবং সেই জন্যেই তাঁর রচনা অসাধারণ শিল্পগুণ সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কিছুটা যেন অবাস্তব, অতিমাত্রায় কল্পনাশ্রয়ী বলে মনে হয়।

আনাতোল ফ্রাঁস সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে।

আঁদ্রে জিদ্

বিশ বছরেরও বেশি ফ্রান্স তথা ইয়োরোপের বিদগ্ধ মহলে প্রায় একঘরে হয়ে জীবনযাপন করবার পরে ১৯৫১ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী জিদ্ যেদিন দেহত্যাগ করলেন, তারপর থেকে কয়েকটা মাস চলেছিলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাদিতে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির নবমূল্যায়ন। কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ্ জিদের বিভিন্ন রচনার গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নি, এ রকম ব্যক্তির সংখ্যা ছিল খুবই কম—অন্ততঃ বিখ্যাতদের মধ্যে। বর্তমানে আমরা এইরকম মাত্র একজনেরই একটি রচনার কয়েকটি ছত্র উল্লেখ করবো। ইনি হলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ফরাসী দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক তথা দার্শনিক জঁা-পল সাত্র́। সাত্র́ লিখলেন :

'এই বুড়ো মানুষটি, বয়স আশীর ওপর হয়ে গেছে, লেখা বলতে গেলে একরকম ছেড়েই দিয়েছেন বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই, অথচ মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কি ভীষণভাবে প্রভাবিত করে রেখেছিলেন আমাদের সাহিত্যকে, ভাবলে বিস্ময় মানতে হয়!...জিদ্‌কে আমরা অনেকেই ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারি নি বলেই আমার বিশ্বাস।...জিদ্ তাঁর সমস্ত জীবন সভ্যতার পক্ষে অপরিহার্য কতকগুলি বিষয়ের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ঘটাবার জন্যে চেষ্টা করে গেছেন। চলমান জীবনের পরিবর্তনশীল আচার-বিচার, সামাজিক অনুশাসন-এর সঙ্গে মানুষ হিসেবে আমাদের যে সমস্ত কাল-নিরপেক্ষ আশা-আকাঙ্ক্ষা তার বোঝাপড়া; গোঁড়া প্রোটেস্ট্যাণ্টবাদের সঙ্গে শিথিল যৌবনতন্ত্রের বোঝাপড়া; অভিজাত বুর্জোয়া গোষ্ঠীর গর্বিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের সঙ্গে মার্ক্সবাদের বোঝাপড়া এবং এইরকমই আরো অনেক পরস্পর-বিরোধী বিষয়ের বোঝাপড়া ঘটাতে চেয়েছিলেন উনি।'

একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে, জিদ্ তাঁর সময়কার মানুষের প্রায় সমস্ত প্রধান সমস্যা সম্পর্কেই সজাগ ছিলেন। রুচির বিশিষ্টতার জন্যে পাঠক যেমন জিদের প্রতি আকৃষ্ট হন, তেমনি তাঁর রচনার আপাতশুষ্কতা, খ্রীষ্টধর্মের প্রতি সুগভীর অনুরক্তি এবং সেই সঙ্গে সুতীব্র যৌনবোধ মনোযোগী পাঠককে বিস্মিত করে।

প্রথম জীবন—পরস্পর-বিরোধী কতকগুলি চিন্তা ও বিষয়বস্তুর যে সংঘাত জিদের ব্যক্তিগত জীবন তথা রচিত সাহিত্যের বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে, তার সূত্রপাত বলতে গেলে একেবারে শৈশবেই হয়েছিল। একটি অত্যন্ত গোঁড়া খ্রীষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আঁদ্রে জিদ্ (Andre Zide, 22nd Nov., 1869—19th Feb., 1951)। জিদ্ পরিবারের স্থায়ী বসবাস প্যারিসেই ছিল। জিদের বাবা ছিলেন আইনের অধ্যাপক। সাধারণভাবে পরিবারের অন্যান্যেরাও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। কাজেই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই পরিবারের বড়োদের মধ্যে থেকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবার জন্যে জিদ্ যে জিনিষটি পেলেন তা' হলো প্রথমতঃ ধর্ম এবং দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানার্জনের বাসনা। নিয়মমাফিক পড়াশুনা ওঁর যথাসময়েই শুরু হয়েছিল। কিন্তু কখনো বড়োদের পছন্দ হতো না বলে, কখনো বা বালক জিদেরই ভালো লাগ্‌তো না বলে একাধিকবার স্কুল বদলাতে হয়েছিলো। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তরুণমহলে যে উৎকট ধর্ম-বিরোধিতা দেখা দিয়েছিলো তার কবল থেকে জিদ্‌কে রক্ষা করবার জন্যে বয়স্ক আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে উৎকণ্ঠার অবধি ছিলো না। এর ফলে সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশার অবাধ স্বাধীনতা বাল্যে বা কৈশোরে জিদ্ তেমন পান নি এবং এই সমস্ত নানা ব্যাপারে জিদের প্রথম জীবন এমনভাবে কেটেছে যে, অনেকের মতেই তাঁর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত নজর দেওয়া হয়েছিলো।

কিন্তু সুখের বিষয়, মাত্রাতিরিক্ত নজরের ফলে সাধারণত ছেলেরা যে-রকম নষ্ট হয়ে যায়, জিদের বেলায় তা' হয় নি! বড়োরা ঠিক যে রকমটি চেয়েছিলেন জিদ্ ঠিক তেমনি ক্রমশঃ গোঁড়া ধার্মিক এবং বিদ্যানুরাগী হয়ে উঠলেন। এবং এ-দু'টো এমনই প্রবল হয়ে উঠেছিলো যে, একুশ বছর বয়সে জিদ্ যখন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ করলেন তখন তরুণমহলে সকলের কাছে তাঁর নানা গুণ, জ্ঞানের গভীরতা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রীতিমত আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল।

কেউ বলতো—আঁদ্রে জিদ্, সে কে? ও, বুঝতে পেরেছি সেই যে যুবকটি সবসময় বগলে বাইবেল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কারো কাছে জিদের প্রধান পরিচয় এই ছিল যে, একেবারে প্রথম থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত ফরাসী-সাহিত্যের যে-কোনো শ্রেষ্ঠ কবিতা, এমন কি নাটকের কথোপকথন পর্যন্ত বেশ কয়েক লাইন জিদ্ টানা মুখস্থ বলে যেতে পারতেন।

এর জন্যে তাঁর বিশেষ কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন হতো না। কারো কাছে জিদের প্রধান পরিচয় ছিলো তাঁর অতিমাত্রায় ভদ্রতা এবং শিষ্টাচারবোধ। অস্কার ওয়াইল্ড এক সময় জিদ্‌কে বলেছিলেন: 'আপনার ঠোঁট দু'খানা আমার একদম পছন্দ হয় না। কারণ, এমন সরল রেখার মতো আপনার ঠোঁট দু'খানি যে দেখলেই মনে হয় এ লোক কখনো মিথ্যে কথা বলে নি।'

সাহিত্যসাধনার শুরু—সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছেলেবেলা থেকে থাকলেও নিজে কিছু সৃষ্টি করবার যে অত্যুগ্র বাসনা তার জন্যে জিদ্ বোধ হয় ম্যালার্মের নিকটই সর্বাধিক ঋণী। যদিও ব্যক্তিগতভাবে ম্যালার্মের সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই জিদ্ তাঁর প্রথম বই প্রকাশ করেছিলেন এবং ম্যালার্মে ও মেতরলিঙ্ক সে রচনার প্রশংসাও করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়বার পরেই জিদ্ ম্যালার্মের গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে গেলেন এবং তাঁরই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ কিছুদিনের মধ্যেই উনি ছোটো একটি কাহিনী রচনা করলেন—'দি ইম্‌মরালিষ্ট'।

ইতিমধ্যে জিদের বাবা মারা গেলেন টি-বি-তে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যুবক জিদের এই রকম একটা ধারণা সৃষ্টি হলো যে, উনিও অকালে টি-বি-তেই মারা যাবেন। এ ধারণাটা ওঁর মধ্যে সে সময়ে এতই প্রবল হয়ে উঠেছিলো যে বড়োরা রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। অনেকে পরামর্শ দিলেন কিছুদিনের জন্যে বাইরে কোথাও ঘুরে আসবার জন্যে। আর ঠিক সেই সময়ই জিদের এক শিল্পীবন্ধু যাচ্ছিলেন আফ্রিকায়। জিদ্‌ও তাঁর সঙ্গ নিলেন। আফ্রিকায় এসে প্রথম কিছুদিন ওঁরা টিউনিসের বিভিন্ন জায়গায় বেড়িয়ে বেড়ালেন, তারপর বিস্‌ক্রায় এসে স্থায়ী আস্তানা করে নিলেন। বিস্‌ক্রায় ওঁদের বাসস্থানের নিকটেই ছিলো একটি মরূদ্যান। দুই বন্ধুতে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই স্থানীয় লোকজনের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠলেন এবং জিদের মধ্যে দেখা দিলো কবিতা রচনার জন্যে একটা প্রেরণা। অল্প কয়েক-দিনের মধ্যেই উনি কয়েকটি কবিতা রচনা করেও ফেললেন।

কিন্তু শরীরের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হলো না ব'লে কিছুদিনের জন্যে জিদ্ একটা স্যানাটোরিয়ামে আশ্রয় নিলেন; যদিও টি-বি হয়েছে এমন কথা নিশ্চয় করে কোনো ডাক্তারই কখনো বলেন নি।

বৎসরাধিককাল বাইরে কাটাবার পরে জিদ্ যখন প্যারিস ফিরে এলেন

তখন ওঁর মন শহুরে কৃত্রিমতার ঘোরতর বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলো। তাই আবার চলে গেলেন আফ্রিকায়।

এবার প্রথমে টিউনিসিয়া এলেন না জিদ্। এলেন আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে। এইখানেই কয়েকদিন পরে ঘটনাচক্রে জিদের পরিচয় হয়ে গিয়েছিল অস্কার ওয়াইল্ডের সঙ্গে। অস্কার ওয়াইল্ড সে সময়কার ইয়োরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে সর্বত্র স্বীকৃত ছিলেন। একটা বিশেষ ধরণের যৌনতার প্রবক্তা বলে তাঁর অখ্যাতিও কম ছিলো না। ওয়াইল্ডের সঙ্গে যে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হতে পেরেছিলেন এটাকে জিদ্ ওঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য বলে মনে করতেন।

কয়েক সপ্তাহ আলজিয়ার্সে কাটাবার পরে আবার ঘুরতে ঘুরতে জিদ্ বিস্ক্রাতেই চলে এলেন এবং এবার ঠিক করলেন যে, বিস্ক্রাতেই সারাজীবন কাটাবেন। এটা মনস্থ করেছিলেন বলেই বিস্ক্রার মরূদ্যানের সন্নিকটে একখণ্ড জমি কিনলেন জিদ্ এবং ছোট একটি কুটির তৈরি করে সাহারার শোভা দেখে বেড়াতে লাগলেন। অনেকদিন বাদে এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন জিদ্‌কে যে সাহারা তো মরুভূমি, তার আবার শোভা কি ? জিদ্ সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিলেন যে, প্যারিসের কৃত্রিমতার চাইতে মরুর শূন্যতাও ভালো।

যেখানে সারাজীবন কাটাবেন বলে জিদ্ জায়গা কিনে কুটির তৈরি করে বসবাস শুরু করলেন, সেখানে বছর খানেকের বেশি থাকা হলো না ওঁর। একদিন ফ্রান্স থেকে টেলিগ্রাম গেলো বিস্ক্রায়: 'মা মৃত্যুশয্যায়, অবিলম্বে চলে এসো।' ছেলেবেলায় জিদ্ অতিমাত্রায় বাধ্য ছিলেন মায়ের। বাবার মৃত্যুর পরে ওঁর মা একাই মা এবং বাবা দু'জনের কাজ করে চলেছিলেন। বিস্ক্রার আস্তানা গুটিয়ে অবিলম্বে জিদ্ স্বদেশে ফিরে এলেন মায়ের ডাকে। মা মারা গেলেন কয়েকদিন পরেই। যে মায়ের মাত্রাতিরিক্ত নজর জিদ্ একেবারে শৈশব থেকে পেয়ে আসছিলেন তার শেষ হলো এতদিনে। মা অবশ্য প্রচুর সম্পত্তি রেখে গেলেন জিদের জন্যে।

বারো বছর বয়স থেকে একটি মেয়ের সঙ্গে জিদের বিয়ে ঠিক হয়েছিলো। মায়ের মৃত্যুর কিছু পরেই এবার সেই মেয়েটিকেই বিয়ে করে আবার আফ্রিকা চলে এলেন জিদ্। এটা ১৯০৫ সালের কথা। তিন বছর আগে যে কবিতাগুলি রচনা করেছিলেন এবার আফ্রিকা এসেই সেগুলির পরিমার্জন করলেন।

১৯০৭ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো এই কবিতাগুলি। কয়েক বছর আগে প্রকাশিত 'দি ইম্‌মরালিস্ট' রচনায় জিদ্ যেমন দেহ ও মনের তাগিদের সংঘাত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন, এবার এই কবিতাগুচ্ছের মধ্যে তেমনি সমাজ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্ব ফুটে বেরুলো।

এরপর প্রায় পাঁচবছর জিদ্ ছোটো ছোটো প্রবন্ধ রচনায় ব্যাপৃত রইলেন। ফ্রান্সের সমস্ত প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক তথা মাসিক পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাগণ সাগ্রহে অপেক্ষা করতেন জিদের লেখার জন্যে। তা ছাড়া কিছু কিছু দেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও এরই মধ্যে অর্জন করেছিলেন উনি। জার্মানী, ইতালী, স্পেন, গ্রীস, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের তরুণ সাহিত্যসেবী মহলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠলেন জিদ্। এই সময়েই একবার ইয়োরোপ ভ্রমণ করতে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তখন অল্প কিছুদিনের আলাপের ফলেই জিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট হৃদ্যতা হয়েছিল। যার সূত্র ধরে কয়েক বছর পরে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর 'গীতাঞ্জলি'র ফরাসী অনুবাদ করাবেন ঠিক করেছিলেন (এটা রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাবার পূর্বের কথা), তখন এক কপি গীতাঞ্জলি উনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন জিদের কাছে ডাকযোগে। সঙ্গে একখানি পত্র, একখানি অনুরোধ পত্র যেন জিদ্ তাঁর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে তাঁর পছন্দসই কাউকে দিয়ে কবিতাগুলির (ইংরেজী) একটা ফরাসী অনুবাদ করিয়ে দেন। কয়েকদিন পরে রবীন্দ্রনাথের মন খুশীতে ভরে উঠেছিল যখন উত্তরে জিদ্ জানিয়েছিলেন যে, উনি নিজেই গীতাঞ্জলির ফরাসী অনুবাদ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

এই সময়ের মধ্যে জিদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজ হলো একখানি সাহিত্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠা। জিদের নাম এর সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে যদিও ছিলো না—কিন্তু তবু সকলেই জানতেন যে জিদ্ই ছিলেন এর প্রাণ। রচনা নির্বাচন, অযোগ্য রচনার মধ্যেও কিছু সম্ভাবনার লক্ষণ দেখলেই তার পেছনে নিজে খেটে তাকে ছাপাবার উপযুক্ত করে এবং ছাপিয়ে তরুণ লেখকদের উৎসাহিত করা, নিত্যনূতন লেখক খুঁজে বের করা এবং এই ধরণেরই কাজে জিদ্ নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেন কয়েকটা বছর। বছর ঘুরে না আসতেই পত্রিকাখানি সে সময়কার ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পরবর্তীকালে ফরাসী সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন

করেছিলেন এ রকম অন্ততঃ বিশজন সাহিত্যিকের সাহিত্যসাধনার শুরু জিদের এই পত্রিকার মাধ্যমেই হয়েছিল। এঁদের মধ্যে কয়েকজন—রজার মার্টিন দ্য গার্ড এবং ককটোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। মার্টিন দ্য গার্ড তো তাঁর সাহিত্যসাধনার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিস্বরূপ নোবেল পুরস্কারই লাভ করেছিলেন (১৯৩৭ সালে)।

সাহিত্যসাধনার পরিণত রূপ—এই সময়েই, অর্থাৎ ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে জিদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'স্ট্রেট ইজ দি গেট' প্রকাশিত হলো এবং এখন থেকে লেখক তথা পাঠকমহল স্বীকার করলেন যে, আঁদ্রে জিদ্ শুধু একজন প্রথম শ্রেণীর সমালোচক, পণ্ডিত প্রবন্ধকার বা রুচিবাগীশ কবিই নন, একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকও বটে।

'স্ট্রেট ইজ দি গেট'-এর বিষয়বস্তু যেমন অভিনব, জিদের রচনাশৈলীও তেমনি আকর্ষণীয়। এর কাহিনীভাগে দেখা যায় নানা বিচিত্র ঘটনা তথা অভিনব মানসিকতার সমাবেশ :

একজন বিত্তশালী ব্যাঙ্ক মালিক স্ত্রীর প্রতি আন্তরিক অনুরক্ত, কিন্তু স্ত্রী তার প্রতি মোটেই কর্তব্যপরায়ণা নয়। তাই দেখা যায় যদিও সে একাধিক সন্তানের জননী, কিন্তু তবু স্বামী এবং সন্তানদের মায়া কাটিয়ে একদিন সে নিজের স্বতন্ত্র পথ বেছে নিলো। ব্যাঙ্ক মালিকের বড়ো মেয়ে এলিসা কিশোরী বয়স থেকেই একটি তরুণকে ভালোবাসে। তার নাম জেরোম। জেরোম এবং এলিসা উভয়েরই বিশ্বাস যে যথাসময়ে ওদের বিয়ে হবে। নিজের সংসার গড়ে তুলবার নানা রঙিন স্বপ্নও এলিসা দেখে থাকে। কিন্তু ক্রমশঃ ঘটনার আবর্ত কিছুটা ভিন্নতর অবস্থার সৃষ্টি করতে লাগলো। এলিসা বাপের বড়ো মেয়ে। স্ত্রী চলে যাবার পর থেকে এলিসাই বলতে গেলে বাপের একমাত্র বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি সংসারে। মা চলে যাবার পর থেকে স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত বাপের মানসিকতায় যে কি পরিবর্তন প্রত্যহ হতে আরম্ভ করলো, তা এলিসা নিজের বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে বুঝতে লাগলো। প্রায় সর্বক্ষণ বিষণ্ণ বাপের সান্নিধ্যে থাকতে থাকতে এলিসার মানসিকতারও বেশ লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটতে লাগলো। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ক্রমশঃ এলিসা নতুনভাবে ভাবতে শুরু করলো। কি হবে বিয়ে করে? জেরোম কি সুখী হবে আমাকে নিয়ে? দেহগত এ প্রেমের শেষ কোথায়? যে প্রেমের শেষ

আছে, সে কি প্রকৃত প্রেম ? না, তা' হয় কি ক'রে ? প্রেম যে স্বর্গীয় বস্তু, স্বর্গীয় বস্তুর কি কখনো শেষ থাকে ? কিন্তু বাবার তা' হ'লে আজ এ অবস্থা কেন হ'লো ? সর্বক্ষণ বিষণ্ণ আর আক্ষেপে ভরা কেন তার চোখ-মুখ ? তরুণী এলিসা নিজের মনে মনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু আলোচনা করে. সব কিছুই বুঝবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। কোনো প্রশ্নেরই দ্ব্যর্থহীন সদুত্তর নিজের মনে জেগে ওঠে না।

এই রকম একটা মানসিক অবস্থাতেই দেখা যায়, এলিসা একদিন নিজের মনে সিদ্ধান্ত ক'রে ফেললো যে, জেরোমকে বিয়ে ক'রে প্রেমের সমাধি ও রচনা করবে না—বরং জেরোমের প্রতি ওর ভালোবাসাকে অমর করবার জন্যে তাকে দেহের প্রয়োজনের উর্ধ্বে স্থান ক'রে দেবে। এই মনস্থ ক'রে এলিসা ক্রমশঃ সুপরিকল্পিতভাবে এমন সব কাজ করতে লাগলো, জেরোমের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে লাগলো যাতে ওর প্রতি জেরোমের মন বিরূপ হয়ে ওঠে। সাধারণতঃ দেখা যায় তরুণ বয়সে এই সমস্ত পরিকল্পনা খুব বেশিদূর গড়ায় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেখা গেলো তার ব্যতিক্রমই হলো। এলিসা জেরোমকে নিজের প্রতি বেশ খানিকটা বিরূপ ক'রে তুলতে সমর্থ হলো এবং তারপর যখন ওদের বিয়ের প্রস্তাব প্রকাশ্যে আলোচনার সময় এলো তখন এলিসা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলে সে প্রস্তাব। বললো যে জেরোমের বরং জুলিয়েটকে (এলিসার ছোট বোন) বিয়ে করা উচিত, কারণ জুলিয়েট ওকে ভালোবাসে।

এলিসার পরামর্শে অবশ্য জেরোম কান দিলো না। তখনকার মতো জেরোম ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় নিয়ে ভাবতে লাগলো কি ব্যাপার—এলিসার ঠিক এতখানি পরিবর্তনের কি কারণ থাকতে পারে ?—যে ক্ষেত্রে দশ-বারো বছরের বেশি ধরে মেলামেশা চলছে। কিছুদিন ধরে অবশ্য এলিসার অনেক কিছুই ভাল লাগছে না, ওর চাল-চলনের ভেতর কেমন যেন একটা দুর্বোধ্যতাও দেখা দিয়েছে, সে কথাও ঠিক ; কিন্তু তার মানে ত' আর এ নয় যে দীর্ঘ বারো বছরের সম্পর্কটা মুছে যাবে ? জুলিয়েটকে বিয়ে করবার অনুরোধটা এলিসা মুখে আনলো কি করে ? একটুও কি বাধলো না ?—এই রকমই সাত-পাঁচ ভাবতে লাগলো জেরোম। কয়েকটা দিন এই ভাবেই চললো, তারপর একদিন এলিসার এক আত্মীয়ার সঙ্গে দেখা হলো জেরোমের। তিনি বললেন যে আসল ব্যাপার হচ্ছে বুড়ো বাপকে নিতান্ত

অসহায় অবস্থায় ফেলে এবং ছোট অবুঝ বোনকে বাপের ওপর ছেড়ে দিয়ে এলিসা বিয়ে করতে চাইছে না। তোমাকে (অর্থাৎ জেরোমকে) প্রত্যাখ্যান করবার জন্যে ওর নিজের মনেও নেহাত কম বাজে নি—কিন্তু বাপের জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে নিজের কর্তব্য করতে এলিসা সত্যি বদ্ধপরিকর।

ইতিমধ্যে আর একটা ব্যাপার ঘটে যেতে জেরোম এলিসাকে পাবার জন্যে আবার কিছুটা আশান্বিত হয়ে উঠলো। কারণ, ওর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু এবেল-এর সঙ্গে জুলিয়েটের একটু একটু ক'রে ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হ'তে লাগলো। এবং তারপর উভয়েই প্রকাশ্যে ঘোষণা করলো যে পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসে এবং ওরা বিয়ে করবে। জেরোম মনে করলো এবার নিশ্চয়ই এলিসা আর কোনই আপত্তি তুলবে না বিয়ের বিরুদ্ধে। কারণ ছোট বোনেরও বিয়ের বন্দোবস্ত হয়ে গেলো, আর তা' ছাড়া বুড়ো বাপকেও বিয়ের পরে সবাই মিলে দেখাশুনোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে।

কিন্তু বাস্তব ঘটনা আবার অন্যদিকে মোড় ফিরলো। একদিন নানা কথাবার্তার মধ্য দিয়ে এবেল ধরে ফেললো যে, একসময় জুলিয়েট জেরোমকেই ভালোবাসতো, কিন্তু জেরোম বরাবরই ওকে কিছুটা অনুকম্পা, কিছুটা বা অবজ্ঞার চোখে দেখে এসেছে। এবেল যখন আরো প্রশ্ন করতে লাগলো, তখন অপরিণতবুদ্ধি জুলিয়েট খোলাখুলিই স্বীকার করলো যে, জেরোমকে ও এখনো ভালোবাসে মনে মনে। এরপর এবেল আর জুলিয়েটকে বিয়ে করতে রাজী হলো না। জেরোমকেই ও অনুরোধ করলো জুলিয়েটকে বিয়ে করবার জন্যে; কিন্তু জেরোমও কর্ণপাত করলো না সে কথায়। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল রাগে, দুঃখে, অভিমানে এবং নিজের প্রতি চরম অশ্রদ্ধায় জুলিয়েট এমন একজনকে বিয়ে করলো যাতে তার বাবা, দিদি, জেরোম এবং এবেল সকলেই কম-বেশি দুঃখিত এবং আশ্চর্য হয়ে গেলো। জুলিয়েট বিয়ে করলো বয়সে নিজের চাইতে অনেক বড়ো অবস্থাপন্ন সুরা ব্যবসায়ী এডওয়ার্ডকে—শিক্ষা-দীক্ষা-রুচি বলে যার কিছু নেই।

এদিকে জেরোম ধীরে ধীরে লক্ষ্য করতে লাগলো যে, এলিসার মধ্যে যেন একটা আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ঘটছে! চিঠি দিলে যে ভাব এবং ভাষায় এলিসা উত্তর দেয় সে যেন সাধুসন্তদের ভাষা। ঠিক এই সময় দেশের জরুরী অবস্থার জন্যে জেরোম সামরিক বিভাগে ঢুকতে বাধ্য হলো।

জেরোম যখন লড়াই থেকে ফিরে এলো, তখন ওর চিন্তাধারা এবং এলিসার ভাবধারণায় অনেক দূরত্বের সৃষ্টি হয়ে গেছে। জেরোম নিজে কিছুটা ধর্মভীরু প্রকৃতির ছিল আগে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং দেশ-বিদেশের নানা মানুষের সঙ্গে মেলামেশা প্রভৃতির ফলে ও কার্যতঃ নাস্তিক হয়ে উঠেছে, আর এলিসাকে দেখা গেল ও রীতিমতো গোঁড়া ধার্মিক হয়ে উঠেছে। সাহিত্য-বিষয়ক বইপত্র যা পড়াশোনার ভীষণ নেশা ছিল ওর, এখন দেখা গেল সে সবের নাম পর্যন্ত শুনতে রাজী নয়। ধর্মের বই ছাড়া আর কিছু ওর পড়তে ভালো লাগে না বা পড়েও না। ধর্ম বিষয় ছাড়া আর কিছু আলোচনা করতেও ওর কিছুমাত্র আগ্রহ নেই।

কিন্তু এত বৈষম্যের মধ্যেও একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা গেলো। সে হলো জেরোম যতটা তীব্রভাবে এলিসাকে চায়, এলিসাও আসলে জেরোমকে তার চাইতে কম চায় না। কিন্তু তফাত হলো এইখানে যে, জেরোম তার আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে—সে সমস্তভাবে নিজেকে ব্যক্ত করতে উদগ্রীব, আর এলিসা এক তো প্রকাশ্যে একথা কখনোই বলে না, আর দ্বিতীয়তঃ ও যে জেরোমকে চায় সেজন্যে অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে নিজের সঙ্গেও ওকে প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয় সর্বক্ষণ। বুকের ভেতর থেকে যখনই একটা তীব্র বাসনা ওর সত্তাকে নাড়া দেয় প্রেমের পার্থিব রূপকে গ্রহণ করবার জন্যে, তখনই এলিসা তার সজ্ঞান মন দিয়ে ধর্মের পুঁথিপত্রের চাপে অন্তরের ক্ষুধাকে দলে-পিষে মারতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। ফলে ওর মধ্যে চলতে থাকে অবিশ্রান্ত একটা সংঘাত এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্বের জ্বালায় দীর্ঘকাল জ্বলতে জ্বলতে এলিসা যে কখন কি ভাবে রোগের শিকার হয়ে পড়েছিল, তা কেউই বুঝতে পারে নি। জেরোম যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরবার পরে যখন একদিন জোরের সঙ্গে এলিসাকে বলতে লাগলো, আজেবাজে আধ্যাত্মিক চিন্তায় অসময়ে ব্যস্ত না হয়ে বিয়েটা চুকিয়ে নিয়ে সংসার পাতবার কথা, ঠিক সেই সময়েই জানা গেল চিকিৎসার জন্যে অবিলম্বে এলিসাকে একটা নার্সিং হোমে যেতে হবে। এলিসা নার্সিং হোমে গেল এবং সেখানেই অকস্মাৎ একদিন তার মরদেহ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

একটি মেয়ের শৈশব থেকে শুরু করে পরিণত তরুণ বয়সের মাঝামাঝি পর্যন্ত নানা মানসিক অবস্থার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ জিদ্ তাঁর এ

উপন্যাসে করেছেন। বর্তমানের বস্তুতান্ত্রিক জগতে এ ধরনের বিষয়বস্তু, অর্থাৎ পার্থিব সুখ এবং অপার্থিব পূর্ণতা—এ ধরনের জিনিসের আলোচনা বা তার সার্থকতা কি সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। এ সম্পর্কে জিদ্ নিজেই একসময়ে বলেছিলেন যে, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে মানুষ দিন দিন যতই বস্তুতান্ত্রিক হয়ে উঠুক না কেন, তার মানসিক প্রয়োজনেই সে অপার্থিব কোন বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে পার্থিব সুখ-সুবিধার তুলনা করবে।

জিদের পরবর্তী বিখ্যাত উপন্যাস 'দি ভ্যাটিকান সুইণ্ডল্' প্রকাশিত হয় পাঁচ বছর পরে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে। মানুষের ধর্মের প্রতি ক্ষুধা এবং অন্যদিকে বাস্তব জীবনের সংঘাতশীলতা, কঠোরতা এবং রূঢ়তা এইসবের নানা বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষের মনে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্যার উদ্ভব হয়, এ উপন্যাসের তাই উপজীব্য। কাউন্ট জুলিয়াস, তার সৎ ভাই লাফকাডিয়ো, বোন ভেরোনিকা এবং ভগ্নীপতি এনথিম—এরাই হলো এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। এর কাহিনীভাগ নানা শাখা-উপশাখা বিস্তার করে রয়েছে—তবে মূল কাহিনীর প্রধান সূত্রটিকে এইভাবে রূপ দেওয়া যেতে পারে:

এনথিমের একটি পা খোঁড়া, বাতে পঙ্গু। ও একজন বিজ্ঞানী এবং গবেষক এবং বলাই বাহুল্য একজন ঘোর নাস্তিক। ভার্জিন মেরীর একটি মূর্তির সামনে ওর স্ত্রী স্বামীর রোগমুক্তির জন্যে প্রার্থনা করছে দেখে রাগে এবং ঘৃণায় ও একটা ক্রাচ ছুঁড়ে মারলো স্ত্রীর দিকে। ক্রাচটা গিয়ে পড়লো মেরীর প্লাষ্টিক মূর্তির ওপর। ফলে মূর্তির একখানি হাত ভেঙে গেলো। সেইদিনই রাতে এনথিম স্বপ্ন দেখলো যেন মেরী তার পায়ের ব্যথার জায়গায় হাত বুলোচ্ছে। ঘটনাচক্রে পরদিন ঘুম থেকে জেগে এনথিম দেখতে পেলো, সত্যি সত্যি আর কোনো রকম ব্যথা ওর পায়ে নেই। ক্রাচ ছাড়াই সে হাঁটাচলা করতে পারছে। এর পর ঘোরতর নাস্তিক, বিজ্ঞানী এবং গবেষক এনথিম ধর্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলো এবং নতুন করে দীক্ষিত হলো একটা গির্জায় গিয়ে। খবরটা রটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এনথিমের গবেষণায় যে সমস্ত লোকজন অর্থ সাহায্য করতেন, তাঁরা তাঁদের সাহায্য বন্ধ করে দিলেন। ফলে এনথিমের আর্থিক সঙ্কট দেখা দিলো। আর্থিক সঙ্কট দেখা দেওয়া মানেই বিজ্ঞান সাধনা অসম্ভব হয়ে ওঠা। অল্প কিছুদিনের

মধ্যেই সমস্ত ব্যাপারটা (অর্থাৎ নিজের জীবনের) এনথিমের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো। বাতের ব্যথার উপশম হয়েছে বলেই যদি ভগবানের মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়, তা'হলে কি ভগবানকেই ছোট করা হয় না ? আর তা' ছাড়া একটা স্বপ্ন দেখা বা ব্যক্তিবিশেষের বাতের ব্যথার উপশম হলেই তার ফলে ভগবানের সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায় না। এনথিমের সত্যানুসন্ধানী মন নানারকম চিন্তার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে লাগলো। অবশেষে একদিন ওর মনে হলো, মধ্যে কিছুদিন বাতের ব্যথাটা প্রায় সেরে যাবার মতো হয়ে থাকলেও আবার যেন একটু একটু করে শুরু হলো ব্যথাটা। তারপর একদিন দেখা গেলো বাতের ব্যথাটা পুরোপুরিই ফিরে এসেছে। নিজের কাছেই নিজেকে নিতান্ত ছোটো মনে হলো এনথিমের। সত্য যে কোনো ব্যক্তিগত লাভ-লোক-সানের ঊর্ধ্বে সে কথাটা আর একবার মর্মে মর্মে অনুভব করলো ও এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করলো যে: 'কিছুদিনের জন্যে একটা ভ্রান্তির কবলে পড়েছিলাম, ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোনো বৈজ্ঞানিকের কাছেই সত্য হতে পারে না। আমার কাছেও নয়।' এইকথা বলে এনথিম আবার নতুন করে তার ল্যাবরেটরি সাজাতে আরম্ভ করলো। আবার পূর্ণোদ্যমে শুরু হলো গবেষণা, আর এক দিকে চলতে থাকলো ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম, নিদারুণ কায়িক কষ্ট স্বীকার। কিন্তু তবু এনথিম এবার সুখী, কারণ সে আত্মপ্রতারণা করছে না। নিজের বিবেকের কাছে সে আর ছোটো বোধ করে না, কারণ যা সত্য বলে তার ধারণা সেই মতো সে চলছে।

ইয়োরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জিদের পত্রিকাখানি বন্ধ হয়ে গেলো। কারণ লেখকগোষ্ঠীর প্রায় সকলেই কোনো-না-কোনো সামরিক বিভাগের কাজে যোগদান করতে বাধ্য হলো। জিদ্ নিজেও। জিদ্ নিজে গেলেন বেলজিয়াম সীমান্তে উদ্বাস্তু হয়ে যারা বাইরে থেকে আসছে —জার্মান সীমান্ত থেকে যাদের সরিয়ে আনা হচ্ছে নিরাপত্তার কারণে তাদের সুখ-সুবিধা দেখাশোনার জন্যে। প্রায় দেড় বছর নিরলসভাবে জিদ্ এদের মধ্যে কাটালেন। আর তারই ফলে তাঁর নিজের ভাবধারণাতেও একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন দেখা দিলো। বেশ কিছুটা মরমিয়াপন্থীর লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগলো জিদের কথাবার্তায়, লেখায় এবং চাল-চলনে। মানুষের অপার দুঃখে এক এক সময় অন্তরাত্মা ওঁর কেঁদে উঠতো। এই সময়েই জিদ্ নতুন ধরনের একটা রচনায় হাত দিলেন—'ডায়ালগস্ উইথ ক্রাইস্ট'।

জিদের বহুমুখী প্রতিভার নানা বৈশিষ্ট্য—প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে সব মিলিয়ে দেখা গেলো আঁদ্রে জিদ্‌ই ফরাসী সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখক—আনাতোল ফ্রাঁস সে সময় বেঁচে, কিন্তু তবু জনপ্রিয়তা যে জিদেরই সব চাইতে বেশি ছিলো তার কারণ তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিগতভাবে যাদের সৌভাগ্য হতো জিদ্‌কে জানবার তারা দলমতনির্বিশেষে এমনই মুগ্ধ হয়ে যেতো যে, স্বেচ্ছায় উচ্ছ্বসিতভাবে বলতো জিদের মহত্ত্ব এবং প্রতিভা বৈশিষ্ট্যের কথা। ফলে দেখা গিয়েছিলো অনেক প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যসেবীর ভাগ্যে সমস্ত জীবন এবং মৃত্যুর একশো বছর পরেও যতোটা আলোচনার বিষয় হবার সুযোগ না ঘটে, জিদ্ তাঁর জীবদ্দশাতেই, মৃত্যুর অন্ততঃ ত্রিশ বছর পূর্বেই সাহিত্যরসিক সাধারণ পাঠক তথা সাহিত্যসেবী মহলে তার চাইতেও বেশি আলোচিত হচ্ছেন।

কারো ভাগ্যে অতিমাত্রায় জনপ্রিয়তা লাভ হলে আর একদল অনেক সময় ঈর্ষাবোধ করে এবং এই ঈর্ষার তাড়নায় তাকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবারও চেষ্টা করে থাকে। জিদের ভাগ্যেও ঘটনাচক্রে সেই রকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হলো। কয়েকজন ধুরন্ধর সাংবাদিক এবং সাহিত্যসমালোচক জিদের বিরুদ্ধে দল পাকালো। একেবারে প্রথম থেকে আরম্ভ করে জিদের সমস্ত লেখা তন্ন তন্ন করে খুঁজে খুজে কখনো দু'টি লাইন, কখনো বা বিচ্ছিন্ন-একটি লাইন তুলে দিয়ে তারা বলতে আরম্ভ করলো যে, জিদ্ ফরাসী দেশের জন সাধারণের নৈতিক ধারণা নিয়ে খেলা করছেন। সমাজবদ্ধজীবনে যে ন্যূনতম সুরুচির প্রয়োজন—বিশেষ করে যৌন সম্পর্কে, জিদ্ তা মানেন না, ইত্যাদি। কেউ বা এনথিমের চরিত্রটি সামনে রেখে লম্বা-চওড়া একটি প্রবন্ধ রচনা করে উপসংহার টানলেন যে, জিদ ধর্ম নিয়েও পরিহাস করছেন।

এ সমস্ত ব্যাপারের ফলে প্রথম দিকে জিদ বেশ কৌতুকবোধ করতেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। সমস্ত রকমের বিরুদ্ধবাদীদের জবাবে একখানি ছোটো বই প্রকাশ করলেন জিদ্ 'করিডন'.। আত্মজীবনী লিখলেন—'ইফ ইট ডাই'। তা' ছাড়া একখানি উপন্যাস 'দি কাউণ্টারফিটার্স'-এর পাণ্ডুলিপিখানা এক প্রকাশক বন্ধুর হাতে তুলে দিয়ে রাগে দুঃখে অভিমানে জিদ্ দেশত্যাগী হলেন। এটা ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। দেশত্যাগী হবার আগে তাড়াতাড়ি করে এমন একটা কাজ করলেন জিদ যে, তার ফলে বিরোধীপক্ষেরও অনেকে পরে দুঃখ প্রকাশ করেছিলো। জিদ্ তাঁর সমস্ত

বিষয়সম্পত্তি জলের দামে বিক্রি করে দিলেন। এমন কি বহু বছর ধরে বহু আয়াসে সংগৃহীত মূল্যবান লাইব্রেরীটির সমস্ত বইও বিক্রি করে দিলেন।

আফ্রিকার প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ জিদ্ একেবারে তরুণ বয়স থেকেই বোধ করতেন। ফ্রান্স ছেড়ে তাই আবার আফ্রিকাতেই চলে এলেন জিদ্। তবে এবার আর টিউনিসিয়া বা আলজিরিয়া নয়, এবার চলে এলেন মধ্য আফ্রিকাতে—প্রথমে এলেন কঙ্গোতে। দেশ ছাড়বার উদ্দেশ্যটা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন জিদ্—'সভ্য সমাজে সব কিছুই কৃত্রিম, যেমন শহরের বাড়িগুলো—আলো নেই, হাওয়া নেই, কিম্ভুতকিমাকার দেখতে—তেমনি মানুষের মন—জটিলতায় ভরা—আমি আফ্রিকায় যাবো—প্রকৃতি যেখানে এখনো পুষ্ট নয় সভ্য (?) মানুষের স্থূল হস্ত অবলেপনে, মানুষের মন যেখানে এখনো স্বার্থবুদ্ধির পঙ্কিলতায় বিবর্ণ হয়ে ওঠে নি…।'

বেলজিয়ান কঙ্গোতে এসে প্রকৃতির শোভা জিদ্ অবশ্যই দেখলেন। কিন্তু সে ক'দিন মাত্র। যে বিস্ফারিত চোখ নিয়ে জিদ্ প্রকৃতিকে দেখতে লাগলেন সেখানে যেন অকস্মাৎ কাঁটা ফুটলো। নজরে এলো স্থানীয় অধিবাসীদের দুর্দশা। শ্বেতকায়গণ কর্তৃক কৃষ্ণকায়দের শোষণ—নানাভাবে, নানা ছলে কি ভাবে ইয়োরোপ, বিশেষ করে বেলজিয়াম এবং ফ্রান্স আফ্রিকাকে শোষণ করছে, দিনের পর দিন জিদ্ তারই বিস্তারিত বিবরণ পাঠাতে লাগলেন বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রাদিতে।

জিদের প্রতিভার দীপ্তি এবং ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত বিরোধীচক্র ওর দেশত্যাগের সময় যাঁরা উল্লসিত হয়েছিলেন এই কথা মনে করে যে, জিদকে তাঁরা 'খতম' করে দিতে সক্ষম হয়েছেন, স্তব্ধ করে দিতে পেরেছেন তাঁর বিস্ময়-করা বাকপটুতাকে, এবারে তাঁরা আবার নতুন করে প্রমাদ গণলেন—বছর ঘুরে না আসতেই। কঙ্গো থেকে প্রেরিত জিদের লেখাগুলিতে এমন একটা সুর ধ্বনিত হলো ঠিক যে-রকমটি এর আগে কেউ দেখে নি। কৃষ্ণকায়দের শ্বেতকায়রা তো শোষণ করবেই এজন্যে আবার দুঃখ করবারই বা কি আছে? এইটেই তো স্বাভাবিক, চিরকাল এইরকমই তো হয়ে আসছে—এইটেই তো হওয়া উচিত, ভাবলেন ওঁরা। তবে কি জিদ্ রুশিয়ার বেয়াড়া লোকগুলির মতাবলম্বী হয়ে উঠলেন? (মাত্র সাত বছর আগে রুশিয়াতে ঐতিহাসিক অক্টোবর বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল।) জিদের জনপ্রিয়তায় যেন নতুন করে বান ডাকলো এর ফলে। এই তো গেল একদিক। জিদের

প্রতিভার অর্থাৎ তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার নতুনতর বিকাশও ঘটলো এই সময়ে—দেশত্যাগের সময় যে পাণ্ডুলিপিখানা রেখে এসেছিলেন এক প্রকাশক বন্ধুর কাছে, সেখানাও ছেপে বেরুল—দি কাউন্টারফিটার্স। ফ্রান্স বা গোটা ইয়োরোপে যারা জিদ্‌পন্থী তাঁরা তো বটেই, এমন কি বিরোধীচক্রেও যেসব সমালোচকগণের মধ্যে অন্ততঃ সাহিত্যের প্রতি কিছুটা সততা অবশিষ্ট ছিল তাঁরাও ঘোষণা করলেন—এখন পর্যন্ত বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত পৃথিবীর যে কোনো ভাষার উপন্যাসের মধ্যে 'দি কাউন্টারফিটার্স' অন্যতম শ্রেষ্ঠ।

এটা ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার ও সমালোচক আঁদ্রে জিদ্ 'ন্যাশন্যাল হিরো' হয়ে উঠলেন। এক বছর বাদে দেশে ফিরে এসে জিদ্ তাঁর ঔপনিবেশিকতা-বাদ সম্বন্ধে লেখাগুলি পুস্তকাকারে বের করলেন—ট্রাভেলস্ ইন কঙ্গো! এ বই প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন ফরাসী সরকার জিদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেন। অন্ততঃ পাঁচ বছর ধরে জিদ্ অবিশ্রান্তভাবে সরকারের ঔপনিবেশিক পলিসির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা চালাতে লাগলেন এবং এই সময়ের মধ্যেই যে বিষয়টা সম্পর্কে এতদিন ওপর-ওপর একটু পড়াশুনা ছিল, এবার তার সম্পূর্ণটা পড়ে ফেললেন জিদ্—সে হলো মার্কস-লেলিন প্রভৃতির রচনাবলী।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে জিদ্ প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী—সমাজব্যবস্থা হিসাবে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার সমর্থক (কারণ তা' ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ এবং সভ্যতার অন্যান্য কালিমা দূর হতে পারে না)। তিন বছর পরে কমিউনিজমের তীর্থক্ষেত্র সোভিয়েত রাশিয়া পরিদর্শনে গেলেন জিদ্। খাস রাশিয়ায় এসে কমিউনিস্ট্ থিয়োরীর যেভাবে রূপদান হচ্ছিলো তা' দেখে কিন্তু জিদের অন্তরে আর একটা বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গেল। আজীবন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিপোষক অবস্থার মানুষ এবং তার প্রবল সমর্থক জিদ্ সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোতে যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল তা' দেখে, বিশেষ করে লাল সরকার কর্তৃক সাধারণ মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ তথা কালেকটিভ ফার্মিং প্রবর্তনের ব্যাপারে সরকারী ব্যবস্থাকে জিদের সরকারী অনাচার, অত্যাচার এবং উৎপীড়ন মনে হওয়াতে উনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। এই সময়কার মানসিক অবস্থায় রচিত 'দি গড্ ছাট ফেইল্ড'-এ জিদের প্রবন্ধ সারা ইয়োরোপের বিদগ্ধ-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

ধনতন্ত্রী সমাজের সমস্ত ব্যাধির দূরীকরণের জন্যে বুঝে বা না-বুঝে যাঁরা রাশিয়ার দিকে তাকাতেন, তাঁরা আবার নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করলেন কমিউনিজম সম্পর্কে।

কয়েক বছর পরে স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় জিদ্ নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ ক'রে রাজতন্ত্রীদের সাহায্য করলেন—যদিও বহুদিন ধ'রে খাস ফ্রান্সের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময়ে জিদ্‌কে তাদের নিজ নিজ দলে টানবার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা ক'রেও ব্যর্থ হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার পূর্ব থেকেই জিদের ঘোরতর ফ্যাসিবিরোধিতা দেখে অনেকেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। হিটলার এবং মুসোলিনিকে জিদ্ ইয়োরোপের অনেক পেশাদার রাজনীতিবিদের চাইতেও অনেক আগে চিনতে পেরেছিলেন।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও একেবারে বাল্যকাল থেকে জিদ্ বরাবরই একক, একান্ত নিঃসঙ্গ—প্রায় সর্বদাই একেবারে কাছের মানুষটিও জিদ্‌কে সঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। যাদের ভাবধারণা সময়কে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলে তাদের বোধ হয় সারাজীবনই জিদের মতো ভুগতে হয়—প্রতিভার চমকে আকৃষ্ট হ'লেও তাঁর বিরাটত্বে কিছুটা ভীত এবং বিস্মিত হয়ে যায় সাধারণ মানুষ। এ ভয় নিজেকে হারিয়ে ফেলবার ভয়।

জিদের অন্যান্য বিখ্যাত রচনার মধ্যে উপন্যাস হিসেবে প্রমিথেউস ইলবাউণ্ড (১৯১৯), দি প্রডিগ্যাল সন (১৯২৮), দি স্কুল ফর ওয়াইভ্‌স (১৯২৯) প্রভৃতি বিশেষ জনপ্রিয়। জিদের প্রতিভা বহুমুখী সে কথা আমরা আগেই বলেছি। জিদের দু'খণ্ডে সমাপ্ত 'জার্নালস' এক বিচিত্র সৃষ্টি। কতকগুলি ছোট ছোট রচনার সমষ্টি হলো এই জার্নালস। কোনোটি হয়তো একটি শব্দ-চিত্র, প্রাকৃতিক শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে রচনা করেছেন জিদ্, এ জাতীয় রচনাগুলি কাব্যরসে পরিপূর্ণ। কোনোটি হয়তো ডায়েরীর আকারে রচিত নেহাত তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কোনো নিতান্ত সাধারণ ঘটনা বা বস্তু কেন্দ্র করে লেখা। আবার কোনোটি হয়তো একটা পুরাদস্তুর ছোটো গল্পই হয়ে গেছে। শ্লেষাত্মক রচনাও আছে কিছু-কিছু। বিশুদ্ধ সাহিত্য সমালোচনা আছে, আবার আধ্যাত্মিকতায় ভরা কিছু নিবন্ধও স্থান পেয়েছে জিদের এ জার্নালস-এ। সব মিলিয়ে যা দাঁড়াচ্ছে তা' হলো এই যে, অল্প সময়ের মধ্যে জিদের সম্বন্ধে যদি কারো মোটামুটি একটা ধারণা করতে হয় তা হ'লে অন্য সব বই বাদ দিয়ে এই 'জার্নালস' পড়লেই তা লাভ করা সম্ভব। জাত

প্রাবন্ধিক হিসেবেও জিদের সমকক্ষ খুব বেশি লেখকের আবির্ভাব হয় নি এ যুগে। প্রবন্ধের বই হিসেবে অস্কার ওয়াইল্ড (১৯০৫), ডস্টয়েভস্কি (১৯২৫), এসেজ অন মঁতেইন (১৯২৯), দি লিভিং থট্স অব ম্যান (১৯৩৯) প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ। রিটর্ন ফ্রম দি ইউ. এস. এস. আর. (১৯৩৬) ভ্রমণকাহিনী হিসেবে ততোটা উল্লেখযোগ্য নয়, যতোটা মার্কসবাদের সমালোচনা হিসেবে।

সবার শেষে এবার আমরা জিদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'দি কাউণ্টারফিটাস' সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলবো। কারণ, এ বই সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু না বললে জিদ্ সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই সম্পূর্ণ হ'তে পারে না।

জিদের রচনায়নীতিবোধের অভাব দৃষ্ট হয় বা প্রচলিত নৈতিকবুদ্ধির তিনি বিরোধিতা করে থাকেন—এ জাতীয় অভিযোগ কমবেশি জিদের সমালোচক-মাত্রেই করেছেন। আমরা সর্বপ্রথম এই প্রসঙ্গেই কিছু বলবো। প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক আর্নল্ড বেনেট জিদের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। উনি এক জায়গায় বলেছেন ঃ

জিদ্ একজন নীতিবাগীশ শিল্পী, তাঁর প্রত্যেকটি রচনার প্রেরণা কোনো-না-কোনো নীতিবোধ থেকে। নৈতিক সমস্যা শুধু যে তাঁর লেখার পটভূমিকা রচনা করে, তাই নয়, তাঁর রচনায় আজকের নৈতিক সমস্যাসঙ্কুল জীবনে সরলতা ও সুষ্ঠুতা আনবার জন্যে সমাধানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও থাকে।

জিদ্ তাঁর ক্ষুদ্র-বৃহৎ যে-কোনো রচনাতেই ব্যক্তিসত্তার ওপর বিশেষ নজর দিয়ে থাকেন। ব্যক্তিকে বন্দী ক'রে সমষ্টির মুক্তির যে কথা, এটাকে জিদ্ নেহাত বাকচাতুরী মনে ক'রে থাকেন। জিদ্ নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে অত্যন্ত অকপটভাবে বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীতে প্রত্যেকেরই পথ ভিন্ন, যেমন প্রত্যেকটি ব্যক্তি ভিন্ন এবং প্রত্যেকেই যে তার নিজ নিজ পথে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করতে পারে এবং তাই ক'রে থাকে—এ বিষয়েও জিদ্ দৃঢ় মত পোষণ ক'রে থাকেন। কাজেই এর থেকে এটা একান্ত পরিষ্কার হয়ে যায় যে, প্রত্যেকটি মানুষ যদি ভিন্ন হয়, প্রত্যেকের চলার পথ এবং জীবনের উদ্দেশ্য যদি ভিন্ন হয়, তা' হলে নীতিবোধটাও ব্যক্তি নির্বিশেষে এক হতে পারে না।

কাউণ্টারফিটিং বলতে জিদ্ কি বলতে চান তা একটু ভেবে দেখবা।র

মতো। জিদ্ বলেন যে, মানুষমাত্রেই আদর্শ পাগল, কিংবা হাল্কাভাবে বলা যায় যে, উদ্দেশ্য পাগল। একটা কিছুর জন্য সে সর্বদাই ছুটছে; অক্লান্তভাবে অবিশ্রান্ত ছুটছে। তার লক্ষ্যটা তার পক্ষে বাস্তব; এই বাস্তবকে তার নিজের পক্ষ থেকে নতুন করে নিজস্ব রূপদানের যে চেষ্টা, অর্থাৎ বাস্তবকে 'কপি' করবার বা অনুসরণ করবার যে চেষ্টা তা কার্যতঃ 'কাউন্টারফিটিং' হয়ে দাঁড়ায়। মানবজীবনে এটা একটা স্থায়ী সমস্যা—অর্থাৎ এই আদর্শে পৌছবার কাজটা।

'দি কাউন্টারফিটার্স'-এর কাহিনী অংশে দেখা যায় কয়েকটি তরুণ পরস্পর পরস্পরের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ছে এবং প্রায় সর্বদাই প্রতিটি তরুণ কোনো-না-কোনো বয়স্ক চরিত্রের আওতায় কাটাচ্ছে। (বয়স্ক চরিত্রটি এখানে আদর্শ এবং তরুণটি তার সব কিছু কপি করতে গিয়ে যা করছে সেইটেই কার্যতঃ কাউন্টারফিটিং হয়ে দাঁড়াচ্ছে।)

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এডোয়ার্ড (জিদ্ নিজে) ঔপন্যাসিক। একদিন লরা নামে একটি বিশেষ পরিচিত তরুণীর চিঠি পেয়ে এডোয়ার্ড প্যারিস চলে এলো। কি ব্যাপার? না ও প্রতারিত হয়েছে। লরা বিবাহিতা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ও একটি তরুণকে ভালোবেসে ফেলে এবং ওদের এই মেলামেশার ফলে লরা আজ গর্ভবতী; অথচ এদিকে সেই তরুণটিও (ভিনসেণ্ট) উধাও। এডোয়ার্ড প্যারিসে এসে খোঁজ খবর নিয়ে জানলো যে ভিনসেণ্ট (এডোয়ার্ডের আত্মীয়) কাউন্ট পাঁসাভা নামে একজন বড়লোকের সঙ্গে মেলামেশা করছে—একাধিক রমণীর বিলাস-ব্যসনের চাহিদা যিনি হাসিমুখে মিটিয়ে থাকেন। এই কাউন্টের প্রণয়িনীদের পাল্লায় পড়েই ভিনসেণ্ট ওর সব টাকাকড়ি অপব্যয় করে ফেলে এবং সেইজন্যে যথাসময়ে ও লরাকে সাহায্য করতে পারে নি। এডোয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলবার পরে ভিনসেণ্ট নিজের কৃতকর্মের জন্যে মর্মাহত হলো এবং মনে মনে ঠিক করলো যে, সব নষ্টের মূল কাউন্টের অন্যতম প্রণয়িনী লিলিয়ানকে ও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে। কয়েকদিন নিবিড় প্রেমের অভিনয় করে ভিনসেণ্ট লিলিয়ানকে নিয়ে বেড়াতে এলো আফ্রিকায় এবং এখানেই হত্যা করলো ওকে। এর প্রতিক্রিয়া খুব সত্বর দেখা দিলো ভিনসেণ্টের ওপর। ও বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে গেলো।

দূরসম্পর্কের একটি তরুণ, অলিভিয়ার, এডোয়ার্ডের প্রতি এতই আকৃষ্ট

যে, অন্য কারো সম্পর্কে এডোয়ার্ডের কিছুমাত্র সময় বা শক্তি ব্যয় হোক তা ও সহ্য করতে পারে না।

এডোয়ার্ড এবং লরা পরস্পরকে ভালোবাসে—সে কথা বার্নাড এডোয়ার্ডের স্যুটকেশে একখানা ডায়েরী এবং চিঠির বাণ্ডিল থেকে ধ'রে ফেলে। কিন্তু ওদের মিলনের কোনই সম্ভাবনা নেই।

অলিভিয়ার অতিমাত্রায় সংবেদনশীল এবং ঈর্ষাপরায়ণ—এডোয়ার্ডের দিক থেকে সামান্যতম নজরের অভাব ও সহ্য করতে না পেরে বকাটে কাউন্ট পাঁসাভার অনুচর হয়ে গেলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ বয়স কিছু বাড়বার পরে আবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে এডোয়ার্ডের কাছেই ফিরে এলো। কিন্তু কাউন্ট বিত্তশালী ব্যক্তি, নিত্য নতুন তরুণমতি কিশোর এবং যুবকদের আকৃষ্ট করবার নানা উপায় এবং সহায় তার আছে।

মন্দ দিকে কেন্দ্রবিন্দু হলো কাউন্ট এবং ভালোর দিকে আদর্শস্থানীয় হলো এডোয়ার্ড। মোটামুটিভাবে এই দু'জনকে কেন্দ্র করেই কতকগুলি তরুণ চরিত্রের ক্রমবিকাশ—এই হলো জিদের এ উপন্যাসের উপজীব্য। কাউন্টের যেমন একমাত্র লক্ষ্য হলো কি করে লোককে বকানো যায়, এডোয়ার্ডের তেমনি একমাত্র উদ্দেশ্য হলো কি করে আরো একজনকে ভ্রান্ত পথ থেকে, ভুল আদর্শ থেকে উদ্ধার করে প্রকৃত সুখের সন্ধান দেওয়া যায়।

কোনো চরিত্রের ওপর জিদ্‌কে (অর্থাৎ এডোয়ার্ডকে) বিরক্ত হতে দেখা যায় না। কারণ এডোয়ার্ড জানে যে প্রত্যেকেই, যে যা করে, না করে পারে না বলেই করে থাকে! কাজেই তাকে বুঝবার জন্যে সব সময়ই এডোয়ার্ডের একটা সুতীব্র বাসনা দেখা যায়—যা পাঠককে বিস্মিত করে দেয়।

নানা বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তরে এক সময় নিজের সম্বন্ধে যে কথা জিদ্‌ বলেছিলেন তা বিশেষ প্রনিধানযোগ্য :

আমার বিশেষ চলার ভঙ্গির জন্যে প্রায় সময়ই আমাকে গাল-মন্দ শুনতে হয়, কারণ আমি একটু ঝুঁকে চলি কি না! কিন্তু বলতে পারেন হাওয়াটা যখন বিপরীতমুখী তখন ঝুঁকে না চলে উপায় কি? আপনারা যাঁরা হাওয়ার দিকে গা এলিয়ে দিয়েছেন বা একেবারেই উবে গেছেন, তাঁরা তো আমার সমালোচনা করবেনই, আমি যে হাওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে এখনো সংগ্রাম করছি।

জাঁ-পল সার্ত্র

দার্শনিক চিন্তার জন্য আজ অবধি পৃথিবীতে মানুষ যতো সময় এবং শক্তি ব্যয় করেছে, খুব সম্ভব জ্ঞান-বিজ্ঞানের আর কোন বিভাগ সম্পর্কেই ততোটা করে নি। যে বিজ্ঞানের আজ এতো জয়-জয়কার চারদিকে, বলতে গেলে তার বয়স মাত্র কয়েক শ' বছর। কিন্তু মানুষের দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত হয়েছিলো কয়েক হাজার বছর আগে। ভারতবর্ষ, চীন, মিশর, তারপর গ্রীস এবং গ্রীস থেকে ক্রমে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে দার্শনিক চিন্তার প্রসার ঘটেছে। যদিও বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ধরনের দার্শনিক মতের উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু দেখা গেছে এর মূল প্রকৃতিটা প্রায় সর্বত্রই এক। সে হ'লো, বিশ্বচরাচরের চরম এবং পরম সত্য কথাটা বলে দেওয়ার জন্য একটা তীব্র প্রবণতা। দার্শনিক লক্ষণযুক্ত ভাব ধারণার এইটেই হ'লো গোড়ার কথা। বলাই বাহুল্য, এই চরম এবং পরম সত্য সম্পর্কে কদাচিৎ দু'জন প্রথম সারির দর্শনবেত্তাকে একমত হতে দেখা গেছে। ফলে, সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে শিক্ষার যতো প্রসার হয়েছে, দার্শনিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ মানুষের সংখ্যা যতো বেড়েছে, দার্শনিক মতের সংখ্যাও তেমনি ক্রমাগতই বেড়েছে। ভাববাদী এবং বস্তুবাদী—সমস্ত দার্শনিক চিন্তাকে এই দু'টোর কোনো একটা দলভুক্ত করে ফেলার যে সহজ পদ্ধতি এক শ' বছর আগেও চালু ছিলো, মনে হয় আজকের দিনে তা আর কার্যকরী নয়। তার কারণ, একদিকে পুরনো ধরনের দার্শনিক মতের বিভিন্ন মৌলিক শাখা প্রশাখাগুলির বিভ্রান্তিকর জটিলতা এবং আর একদিকে মূলতঃ বিজ্ঞানাশ্রয়ী দর্শন চিন্তার প্রসার। তারপরে আর এক সমস্যা, এবং হয়তো সব চেয়ে বড় সমস্যা হ'লো 'ঈশ্বর'। 'ভগবান' আছেন কি নেই এ প্রশ্নটা বহু পুরনো হ'লেও এর কোনো সর্ববাদিসম্মত সমাধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

এ রকম বহু দার্শনিক আছেন যাঁদের কোনো মতেই বস্তুবাদী বলা যায় না, অথচ শেষ পর্যন্ত ভগবান অস্বীকার করেছেন। আবার এ রকম দার্শনিকও আছেন যাঁরা বস্তুবাদী, কিন্তু ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। বলাই বাহুল্য 'ভগবান' বলতেও সব দার্শনিক একটা নির্দিষ্ট কিছু কখনো

স্বীকার করেন না। ভগবানের 'গুণ' সম্বন্ধেও মতের বিভিন্নতা কম বিভ্রান্তিকর নয়। যাই হ'ক, এ সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনার স্থান এ নয়। আমরা বর্তমানে একটি মাত্র দার্শনিক মতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো—সে হ'লো অস্তিত্ববাদ (Existentialism)। ফরাসী সাহিত্যিক জঁা-পল সাত্র্'কে বুঝতে হ'লে তাঁর দার্শনিক মত অর্থাৎ 'অস্তিত্ববাদ'-এর আলোচনা করতেই হবে। অনেকের কাছে তো সাত্র্ শুধুই একজন দার্শনিক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক বা সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে তাঁর সৃষ্টিকে এঁরা মনে করেন তাঁর দার্শনিক মতেরই পরিপূরক মাত্র। কিন্তু এটা বোধ হয় ঠিক নয়। আসলে সাত্র্ যেমন একজন পুরাদস্তুর দার্শনিক তেমনি একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক। যে-কোনো প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-স্রষ্টার রচনাতেই একটা জোরালো ভাবধারা (System of ideas) দেখা যায় এবং তাকে নিশ্চয় একটা দার্শনিক মত আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। শেক্সপীয়ার, গ্যয়টে, হুগো, ডস্টয়েভস্কি এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচনা মন্থন করে দেশ-বিদেশে একাধিক দর্শনের বই রচিত হয়েছে ; এবং সে জন্য ওঁদের রচনার সাহিত্য-মূল্য নিশ্চয়ই বেড়েছে, কমেনি। তাই আমাদের মনে হয় একটা জোরালো দার্শনিক মত ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে বলে সাহিত্যিক সাত্রে্র নাটক, গল্প ও উপন্যাসের মূল্যও বেড়েছে, কমেনি। দার্শনিক সাত্রে্র কথা হয়তো আগামী পঞ্চাশ বছর পরে মানুষের মনে না-ও থাকতে পারে—যদিও একাধিক পুরাদস্তুর দর্শনের বই উনি লিখেছেন ; কিন্তু সাহিত্যিক সাত্র্ ইতোমধ্যেই বিশ্বসাহিত্যে নিজস্বতায় ভাস্বর হয়ে উঠেছেন বলা যায়। যে অল্প কয়েক বছর উনি সাহিত্যচর্চায় ব্যাপৃত আছেন, তার মধ্যেই এতোটা প্রতিষ্ঠা নিশ্চয় ওঁর অসাধারণ সাহিত্য-প্রতিভারই পরিচায়ক।

প্রথম জীবন—জঁা-পল সাত্র্ জন্মগ্রহণ করেন প্যারিসে (Jean-Paul Sartre, 212. June, 1905)। পারিসেই কাটে ওঁর ছেলেবেলা। একেবারে বাল্যবয়স থেকে কিছুটা ভাবুক প্রকৃতির সাত্র্ প্যারিসের জীবন-যাত্রা থেকেই যেন পৃথিবীতে মানুষের জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। সব-কিছু বুঝবার জন্যই একটা উদগ্র বাসনা ওঁর মাষ্টারমশায়রা একেবারে ছেলেবেলাতেই লক্ষ্য করতেন। বলাই বাহুল্য, তার বেশির ভাগই তখন উনি বুঝতে পারতেন না এবং কে জানে

আজকের মহাবিজ্ঞ দার্শনিক সাত্র´ও হয়তো বলবেন—যা বুঝেছি, তার মধ্যেও অনেক ভুল রয়ে গেছে, অর্থাৎ কিনা ঠিক ঠিক বুঝা হয়নি।

১৯৩০ সালে অর্থাৎ ঠিক পঁচিশ বছর বয়সে সাত্র´ তাঁর কলেজের বাঁধাধরা পড়াশুনো শেষ করলেন। দর্শনশাস্ত্রে ওঁর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে অধ্যাপকগণ সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। সাত্র´ নিজেই পেশা হিসেবে শিক্ষকতা বেছে নিলেন। ওঁর মনে হ'লো মানুষ তৈরি করতে হলে একেবারে প্রথম থেকে শুরু করা উচিত—তাই স্কুলের শিক্ষক হলেন উনি।

চার বছরে পর পর তিনটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করলেন সাত্র´। কিন্তু কোথায়ও আশার তেমন কিছু দেখতে পেলেন না—না প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে, না পড়ুয়াদের মধ্যে; তার ওপর রয়েছে নিজের ভেতরের অস্থিরতা—সবকিছু জেনে ফেলবার বুঝে ফেলবার জন্য একটা তীব্র আগ্রহ। চার বছর এইভাবে কাটবার পরে সাত্র´ স্কুলমাষ্টারী ছেড়ে দিলেন। ইচ্ছে হ'লো বিদেশ দেখবার। তাই বেরিয়ে পড়লেন। একে একে মিশর, গ্রীস, ইতালী ঘুরবার পরে জার্মানী এসে পৌছলেন সাত্র´। সে সময়কার জার্মানীতে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে এডমণ্ড হাসের্ল এবং মার্টিন হাইডেগ্গারের প্রচুর নাম-ডাক ছিল। সাত্র´ কয়েকদিনের মধ্যেই পরিচিত হ'লেন ওঁদের সঙ্গে। ওঁদের জ্ঞান এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা মুগ্ধ করলো সাত্র´কে। মনে হলো এঁদের কাছে থাকতে পারলে, এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ-আলোচনা করবার একটা সুযোগ পেলে নিজের অগোছালো দার্শনিক চিন্তা সঠিক পথ ধরে এগোতে পারবে। এই কথা মনে হতেই সাত্র´ কিছুদিনের জন্য রয়ে গেলেন জার্মানীতে। অধ্যাপক হাসের্ল এবং হাইডেগ্গার খুশী হলেন একজন জ্ঞানলিপ্সু যুবককে পেয়ে। দর্শনশাস্ত্রের নানা জানা-অজানা দিক সম্বন্ধে ওঁরা সাত্রে´র দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে উনবিংশ শতাব্দীর ডেনমার্কের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সোরেন কির্কেগার্ড-এর চিন্তাধারা সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিলো। সাত্র´ একটা তীব্র আকর্ষণ বোধ করলেন কির্কেগার্ডের দার্শনিক মতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে। এবং সেইদিন থেকেই পড়তে আরম্ভ করলেন কির্কেগার্ডে´র বিভিন্ন দর্শনের বই।

দর্শন-চিন্তার শুরু—১৯৩৫ সালে সাত্র´ যখন প্যারিস ফিরে এলেন, অনেকের মতে সেই সময় উনি ওঁর নিজস্ব দার্শনিক মতবাদের মূল চিন্তাগুলি

ঠিক করে ফেলেছিলেন। তা' হ'লে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে কির্কেগার্ডের চিন্তার প্রভাবে বা তাঁর দর্শনের ওপর ভিত্তি করে এবং ব্যক্তিগতভাবে হাইডেগ্‌গারের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সাত্র্‌ তাঁর দার্শনিক মতবাদ গড়ে তুলেছিলেন। সাত্র্‌কে যেমন অস্তিত্ববাদী বলা হয়, কির্কেগার্ডকেও ঠিক তেমনি অস্তিত্ববাদী বলা হোত। কাজেই বলতে হয় অস্তিত্ববাদী হিসেবে সাত্র্‌ কির্কেগার্ডের উত্তরসূরী। যদিও বিংশ শতাব্দীতে, ঠিক আজকের দিনে 'অস্তিত্ববাদ' বলতে যে বিশিষ্ট চিন্তাধারাকে বোঝায় তার বেশির ভাগই হাইডেগ্‌গার ও সাত্র্‌র চিন্তা-প্রসূত। কির্কেগার্ড বলতেন—মানুষ যতোই ভগবানের সন্নিকটবর্তী হচ্ছে বলে মনে করে, প্রকৃতপক্ষে সে ততোই একটা মহাশূন্যতার আওতায় এসে পড়ছে। অর্থাৎ ভগবান লাভের জন্য যে চেষ্টা তা' বরাবরই একটা চেষ্টা মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। এই চেষ্টা যতোই চালিয়ে যাও, দেখবে শেষ নেই, আরো চেষ্টা করো, দেখবে তবু আরো অনেক দূরে লক্ষ্যবস্তু। কাজেই এ চেষ্টার কোনোদিনই শেষ হতে পারে না—অর্থাৎ ভগবান লাভ হ'তে পারে না। কির্কেগার্ডের এই ধারণাটিকে কেন্দ্র করেই সাত্র্‌ ক্রমশঃ তাঁর নিজস্ব 'অস্তিত্ববাদ' গড়ে তুলতে শুরু করলেন।

প্যারিসে ফিরে এসে সাত্র্‌ আবার একটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা শুরু করলেন। পরিচিতেরা এবার একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখতে পেলেন ওঁর মধ্যে। সে হ'লো কথাবার্তা এবং সাধারণ চালচলনে একটা স্থিরতা। প্রথমবার শিক্ষকতার সময়ে প্রকৃতির অস্থিরতাই ছিলো যাঁর মধ্যে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় জিনিষ, এখন তাঁরই মধ্যে এতটা স্থিরতা দেখে তাই অনেকেই বিস্মিত হ'লেন। অবশ্য যুবক সাত্র্‌কে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন, তাঁরা আগের অস্থিরতারও কারণ বুঝতেন, এবারের স্থিরতারও কারণ বুঝতে পারলেন। সৃষ্টির চরম এবং পরম সত্যকে জানবার জন্য সাত্র্‌ এতদিনে পর্যালোচনা চালিয়ে যাবার মতো একটা দার্শনিক মূল সূত্র পেয়েছেন এবং এবার অবিশ্রান্ত তাঁর নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলতে লাগলেন।

প্যারিসে ফিরে সাত্র্‌ বাসা বাঁধলেন ছোটো একটা হোটেলের খুব ছোট্ট একখানা কামরায়। শিক্ষকতার অবসরে ওঁর কাজ রইলো দু'টি—হয় পড়া-শুনো এবং লেখার কাজে ব্যস্ত থাকা, আর না হয় বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় ঘুরে বেড়ানো। একাদিক্রমে অন্ততঃ দু' বছর সাত্র্‌ বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় এত ঘুরলেন যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রেস্তোরাঁ-মালিকদের সঙ্গে ওঁর

রীতিমতো হৃদ্যতা জমে উঠলো। এই হৃদ্যতা জমে উঠবার অবশ্য অন্য একটা কারণও ছিলো, এবং নিঃসন্দেহে সেইটাই প্রধান কারণ। সাত্রেঁর যাতায়াতের ফলে ঐ সমস্ত রেস্তোরাঁতে প্রত্যহ নতুন নতুন ভদ্র এবং শিক্ষিত খরিদ্দারের ভিড় হতে আরম্ভ করেছিলো।

ব্যাপারটা খুবই অভিনব। সাত্রঁ যে রেস্তোরাঁয় রেস্তোরাঁয় ঘুরে বেড়াতেন তার পেছনে ওঁর একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিলো। সে হ'লো সাধারণ শিক্ষিত মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করা এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করে নিজের বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদ 'অস্তিত্ববাদ' সম্পর্কে একটা যুক্তিযুক্ত এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। দু'টো বছর চলবার পর দেখা গেলো অস্তিত্ববাদে বিশ্বাসী সাত্রেঁর অনুগামীর সংখ্যা কয়েক শ'-এ পৌঁছে গেছে। যারা প্রত্যেকেই শিক্ষিত এবং বেশির ভাগই বয়সে তরুণ।

এই সময়ের মধ্যে সাত্রঁ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধও রচনা করলেন "আবেগ ও কল্পনা" সম্বন্ধে। পণ্ডিত মহলে রচনাটির প্রচুর সুখ্যাতি হ'লো কিন্তু সাধারণ পাঠকমহলে তার কোনো পড়ুয়া পাওয়া গেলো না। কাজেই লেখক হিসেবে প্রকাশক মহলেও ওঁর কোনো স্বীকৃতিলাভ ঘটলো না। এর পরের বছর সাত্রঁ একটি সাহিত্য পত্রিকায় পর পর কয়েকটি সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখলেন—ফকনার, হেমিংওয়ে, ডস্ প্যাসস এবং স্টাইনবেক সম্বন্ধে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রচনাগুলি সাধারণ পাঠকমহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। ফকনার সম্বন্ধে সাত্রেঁর প্রবন্ধটি তো রীতিমতো আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করলো,—যেমন পাঠকমহলে তেমনি প্রকাশকদের মধ্যে। কিছুদিনের চেষ্টায় সাত্রঁ একখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। বন্ধু-বান্ধব এবং অনুগামীরা অনেকেই সে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখলেন। একটা কাহিনীর মাধ্যমে সাত্রঁ যে তাঁর 'অস্তিত্ববাদ' প্রচার করেছেন সে-লেখায় একথা কারো কাছেই গোপন করলেন না উনি। প্রকাশকেরা যদি প্রত্যাখ্যান করেন এই কথা মনে হতেই কিছুটা ইতস্ততঃ করছিলেন সাত্রঁ—রচনাটি পুস্তকাকারে প্রকাশের কথা মাঝে মাঝে একটু-আধটু ভাবতেন শুধু, আর প্রায় সময়ই পাণ্ডুলিপিটি সংশোধন করতেন। এবার ওঁর লেখার জন্য পাঠকমহলের তাগিদে প্রকাশকেরা এতটা আগ্রহশীল হয়ে উঠলেন যে এই রচনাটি প্রকাশের অগ্রাধিকারের জন্য কয়েকটি প্রকাশকের মধ্যে রীতিমতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গেল। পরে যাতে

কোনো রকম ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয় সেই জন্যে সাত্র্ প্রত্যেককেই স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, রচনাটিতে 'অস্তিত্ববাদ' প্রচার করা হয়েছে। অর্থাৎ কি না রচনাটি যদিও একখানি উপন্যাস কিন্তু তারই মধ্যে দর্শনচর্চা করা হয়েছে এবং দর্শনের দিকটাই আসল। এ কথার পরেও প্রকাশকেরা কেউ পিছিয়ে গেলেন না। অতঃপর সাত্র্ চুক্তিবদ্ধ হলেন এক প্রকাশকের সঙ্গে—প্রকাশিত হ'লো সাত্র্র প্রথম উপন্যাস—'নসিয়া'। এটা ১৯৩৮ সালের কথা। সাত্র্র বয়স তখন ঠিক তেত্রিশ।

উপন্যাস হিসেবে "নসিয়া"র বিক্রি যদিও খুব বেশী হ'লো না, কিন্তু লেখক হিসেবে সাত্র্ সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লেন। কারণ শুধু ফরাসী দেশেই নয়, ইংলণ্ড, জার্মানী, ইতালী এবং আমেরিকার বিদগ্ধ মহলেও উপন্যাসখানির মূল বক্তব্য নিয়ে প্রচুর আলোচনা হ'লো। এই উপন্যাসের ভেতর অস্তিত্ববাদের একটি প্রধান চিন্তা সাধারণের সামনে তুলে ধরা হ'লো। পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই যা মানুষের জীবনধারণের যৌক্তিকতাকে সমর্থন করে বলে মনে করা যেতে পারে (Nothing, absolutely nothing justifies man's existence in earth.)। অর্থাৎ কিনা আমরা মানুষেরা যেন কিছুটা অন্যায় ভাবে কিম্বা অন্য ভাবে বলতে গেলে—একান্ত অসহায়ভাবে এখানে পৃথিবীতে এসে পড়েছি এবং কালাতিপাত করছি। অবশ্য বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কথারই সম্পূর্ণ মর্ম উপলব্ধি করা যায় না—সেজন্য গোটা অস্তিত্ববাদ বুঝবার চেষ্টা করা দরকার।

যাই হ'ক, সার্ত্রের 'নসিয়া' আত্মপ্রকাশের সময় ইউরোপের অবস্থাটা অনুধাবনযোগ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পদধ্বনি তখন ইউরোপের সর্বত্র প্রকট হয়ে উঠেছে। হিটলার ১৯৩৩ সালে জার্মানীতে ক্ষমতা দখল করেই বিদ্যুৎগতিতে স্বদেশকে অস্ত্রসজ্জায় সুসজ্জিত করে তুলবার জন্যে অবিশ্রান্ত সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করছিলেন। প্রত্যহ হাজার হাজার ইহুদী প্রাণ নিয়ে জার্মানীর বাইরে পালাবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। মেমেল, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া একটির পর একটি পররাজ্য হিটলার গ্রাস করে চলেছেন। কখন কোথায় কি ভাবে নাৎসীদের আক্রমণ আরম্ভ হয়ে যেতে পারে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই একটি আলোচনা প্রাধান্য লাভ করলো। ওদিকে ইতালীতে হিটলারের আগে থেকেই মুসোলিনী ক্ষমতায় আসীন হয়েছিলেন। মুসোলিনীর আবিসিনিয়া বিজয় সম্পূর্ণ হয়েছে, আলবেনিয়ার ওপর আক্রমণ

আসন্ন হয়ে উঠেছে। স্পেনে প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে ফ্রাঙ্কো তাঁর একনায়কত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। নাৎসী ও ফ্যাসিস্টদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি সর্বজনজ্ঞাত। ইংলণ্ড সামরিক শক্তিতে দুর্বল তো বটেই, নেতৃত্বের অভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইংলণ্ড দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীতে অবনমিত হয়েছে। সে সময়ে রাশিয়া ছিলো পুরোপুরিই লোহার জালে ঘেরা, কি তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আর কি তার প্রকৃত শক্তি সবই ছিলো অনুমানের ব্যাপার। আর খাস ফ্রান্সে বলতে গেলে সে সময়ে মাসে দু'টো করে মন্ত্রিসভার পতন হচ্ছিলো। নিত্য নূতন নেতা আর নিত্য নূতন প্রধানমন্ত্রী—ফলে সে দেশের সমাজ জীবনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এইরকম একটা সময়ে, অর্থাৎ সংকটের মুহূর্তে বা যুগ-সন্ধিক্ষণে সার্ত্র ফ্রান্সের সাহিত্যের আসরে আত্মপ্রকাশ করলেন তাঁর 'অস্তিত্ববাদ' নিয়ে। ক্রমে দেখা গেলো অস্তিত্ববাদ একদিকে যেমন ধনতন্ত্রবাদ-ঘেঁষা ভাববাদের বিরোধিতা করছে, ভগবানকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে, তেমনি আর একদিকে মার্ক্সবাদেরও বিরোধিতা করছে। কাজেই দারুণ হতাশায় নিমজ্জিত ফরাসীদেশের শিক্ষিত সমাজ আগ্রহভরে শুনতে আরম্ভ করলো সার্ত্রর কথা!

পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে সার্ত্র তাঁর প্রথম গল্পসংকলন প্রকাশ করলেন—'দি ওয়াল'।

এদিকে শান্তিকামীদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। শুরু হলো একটা অভূতপূর্ব নাটকীয়তার সঙ্গে। জার্মানীর সঙ্গে কম্যুনিস্ট রাশিয়ার কোনো বোঝাপড়া হতে পারে এটা অতিদূরদর্শী রাজনীতিবিদেরাও কেউ কখনো ভাবেন নি। কিন্তু ঠিক তাই হলো। হিটলার স্ট্যালিনের সঙ্গে একটা অনাক্রমণ চুক্তি সম্পন্ন করে পোলাণ্ড আক্রমণ করলেন। পোলাণ্ডের অর্ধেক আন্দাজ নিলে জার্মানী, বাকীটা রাশিয়া। পোলাণ্ড আক্রমণ করবার পরেই পূর্বপ্রতিশ্রুতি মত ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। কয়েকটা দিনের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাস নতুন পথে মোড় ফিরলো।

নাৎসী কিংবা ফ্যাসিস্ট-বিরোধী কোনো দেশই এ সময়ে মহাযুদ্ধজাতীয় একটা বৃহৎ ব্যাপারের জন্য তৈরী ছিলো না। ফ্রান্স তো নয়ই। যাই হ'ক যুদ্ধ যখন শুরু হয়েই গেলো, লক্ষ লক্ষ যুবক স্বেচ্ছায় সৈন্যদলে যোগ দিলো। সার্ত্রও যোগ দিলেন, উনি বেছে নিলেন গোলন্দাজ বাহিনী।

নাৎসী বর্বরদের তাড়নায় এইভাবে একজন উদীয়মান সাহিত্যিক এবং দার্শনিককে লেখাপড়া ছেড়ে, কলম বন্ধ করে কামানের গোলার তদারকির কাজে লেগে পড়তে হয়েছিলো।

বলাই বাহুল্য, সৈনিকের কাজও সার্ত্র বিশেষ যোগ্যতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গেই করেছিলেন। অস্তিত্ববাদের একটি প্রধান লক্ষ্য হ'লো মানুষের জন্য প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করা এবং তা রক্ষা করা। নাৎসীদের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সার্ত্র দেখেছেন ফ্রান্স বা জার্মানীতে সাধারণ মানুষ অনেক রকমের স্বাধীনতা ভোগ করে। অস্তিত্ববাদী হিসেবে সেটুকু স্বাধীনতায় সার্ত্রের মোটেই খুশী হবার কথা নয়। স্বাধীনতা আরো প্রয়োজন, আরো, আরো। চালু সমাজ-ব্যবস্থার আওতায়ও মানুষকে উত্তরোত্তর সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করা যেতে পারে এই বিশ্বাসই সার্ত্রের ছিলো। কারণ, এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সাধারণ মানুষের যে সংগ্রাম তা সরকারের বিরুদ্ধে ততটা নয়, যতোটা ব্যক্তি মানুষদের অশিক্ষা এবং ভুল শিক্ষার বিরুদ্ধে। অস্তিত্ববাদীদের আন্দোলনটা মূলতঃ একটা দার্শনিক আন্দোলন। যে কোনো গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় এ ধরনের আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা নয়। নাৎসীদের আবির্ভাবের পর কি ফ্রান্সে আর কি জার্মানীতে এ ধরনের আন্দোলনও পুলিসী হামলার বাইরে থাকতে পারে না। এবং বাস্তবিক পক্ষে নাৎসীরা জার্মানীতে ক্ষমতা দখল করবার পর যত ভাবে সম্ভব মানুষের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করছিলো। তাই ফ্রান্স যখন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো তখন সার্ত্র মনে করলেন বিপদটা দু'রকমের—প্রথমতঃ জাতীয় বিপদ, আর দ্বিতীয়তঃ মানবিক বিপদ।

যে কোনো সাধারণ মানুষের যুদ্ধে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সার্ত্রের যুদ্ধে যোগ দেওয়ার এইখানেই হলো বিশেষত্ব। উনি যুদ্ধে যোগ দিলেন স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে। দু'মুখী যুদ্ধ উনি চালাতে লাগলেন : প্রথমতঃ জাতির স্বার্থে যুদ্ধ আর দ্বিতীয়তঃ সমগ্রভাবে মানব-সমাজের জন্য।

মাত্র তিন সপ্তাহ প্রত্যক্ষ যুদ্ধের পর ফ্রান্স যখন জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পণ করলো তখন লক্ষ লক্ষ ফরাসী তরুণ সৈনিককে জার্মানরা বন্দী করলো।

সার্ত্রও বন্দী হলেন জার্মানদের হাতে। উনি ধরা পড়লেন ম্যাজিনো লাইন অঞ্চলে।

নাৎসী যুদ্ধ-বন্দী-শিবিরে—প্রায় ন'মাস সার্ত্র জার্মানদের যুদ্ধ-বন্দী-শিবিরে ছিলেন। কথায় বলে, যার প্রকৃতই এমন কোনো কথা আছে যা অপরকে না শোনালেই নয় সে কথা সে ব্যক্তি অপরকে শোনাবেই—পারিপার্শ্বিক যতই প্রতিকূল হ'ক না কেন। কথাটা যে কতো সত্য সার্ত্রর বন্দী-জীবনই তার প্রমাণ। বন্দী করবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সমস্ত সৈনিকের মতো সার্ত্রকেও জার্মানরা নিরস্ত্র করলো। কিন্তু হাত আর কতক্ষণ খালি রাখা যায়? হয় রাইফেল আর না হয় কলম—একটা কিছু তো চাই-ই। বন্দী অবস্থায়ই কলম ধরলেন সার্ত্র।

এবার নাটক লেখা আরম্ভ করলেন। সার্ত্র যে যুদ্ধ-বন্দী-শিবিরে আটক ছিলেন সেখানকার ভারপ্রাপ্ত জার্মান অফিসারটি ছিলেন বয়সে প্রৌঢ় এবং কিছুটা ভদ্রপ্রকৃতির। সার্ত্র অফিসারটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এই যে হাজার হাজার তরুণ-বয়স্ক যুদ্ধ-বন্দী দিনের পর দিন মনমরা হয়ে কাটাচ্ছে এ জন্য কি জার্মান সরকারের করবার কিছু নেই?'

—'এ জন্য সরকারের কিছু করবার থাকলেও বর্তমানের জরুরী অবস্থায় কিছুই করা সম্ভব নয়।' জার্মান অফিসারটি জানালেন।

অতঃপর সার্ত্র প্রস্তাব করলেন যে উনি নাটক লিখে বন্দীদের নিয়ে অভিনয় করবেন যুদ্ধ-বন্দী-শিবিরে। এতে সকলেরই মন ভালো থাকবে। জার্মান অফিসারটি অনুমোদন করলেন সার্ত্রর প্রস্তাব। তারপর থেকে সার্ত্র নাটক লিখে নিয়মিত অভিনয়ের বন্দোবস্ত করলেন যুদ্ধ-বন্দী-শিবিরে। কয়েকদিন পরে দেখা গেলো যুদ্ধ-বন্দীরা তো নাটক দেখছেই, জার্মান সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিক এবং অফিসাররাও প্রচুর সংখ্যায় এই সমস্ত নাটকের অভিনয় আগ্রহভরে দেখতে আরম্ভ করেছে। এইভাবেই চললো কয়েকটা মাস। ইতোমধ্যে বহু ফরাসী যুদ্ধ-বন্দীকে আন্তর্জাতিক আইন অগ্রাহ্য করে জবরদস্তি করে জার্মানরা যুদ্ধের কাজে (জার্মানদের পক্ষে, মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে) নিযুক্ত করলো। সার্ত্র পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, কোনো অবস্থাতেই এ কাজটি তাঁর দ্বারা হবে না—তার জন্য জার্মান সরকার যতই রুষ্ট হোক না কেন।

যুদ্ধ-বন্দী-শিবিরের ভারপ্রাপ্ত জার্মান অফিসারটি সার্ত্র সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট দিলেন যে—'এ যুবকটি নেহাত খেয়ালী প্রকৃতির, গান-বাজনা আর নাটক নিয়ে মেতে থাকে সারাক্ষণ, একে দিয়ে আমাদের

পক্ষের কোনো যুদ্ধের কাজ করাবার চেষ্টা বৃথা। অকারণে আমরা একটা লোকের খোরাক জুগিয়ে চলেছি।'

মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে—এর পর জার্মান সরকার মুক্তি দিলেন সার্ত্রকে। সার্ত্র চলে এলেন প্যারিস এবং সরাসরি মুক্তি-যোদ্ধাদের দলে যোগ দিলেন। বিগত বছর দেড়েক ধরে ব্যবহারিক জীবনের যে অভিজ্ঞতা ওঁর হ'য়েছিলো তাতে সার্ত্র বুঝতে পেরেছিলেন যে একটা কাজ করবার সময় অন্য আর সমস্ত কাজ ধামাচাপা দিয়ে রাখা চলে না। যা কিছু করণীয় তা' সমস্তই একসঙ্গে করে যাওয়া দরকার। এবার তাই এক হাতে নিলেন রাইফেল আর এক হাতে কলম। এইভাবেই প্রায় চারটে বছর কাটলো ওঁর। প্রতি মুহূর্তে নিজের জীবন বিপন্ন করে সার্ত্র একদিকে যেমন দেশপ্রেমিক মুক্তি-যোদ্ধাদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যেতে লাগলেন, ফ্রান্সকে জার্মান নাগপাশ থেকে মুক্ত করবার জন্য, আর একদিকে তেমনি উনি লেখা আরম্ভ করলেন—নাটক, উপন্যাস, গল্প এবং প্রবন্ধ তো লিখতে লাগলেনই সেই সঙ্গে তাঁর নিজস্ব "অস্তিত্ববাদ"ও লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। সমগ্র মানবজাতির জন্য সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা অর্জন যাঁর দর্শনের গোড়ার কথা, যুদ্ধকালীন জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সেই সার্ত্রর জীবন কাটতে লাগলো প্রতি মুহূর্তে একটা চরম বিভীষিকার মধ্যে। অত্যাচার, অনাচার, অবিচার, উৎপীড়ন—জীবন নিয়ে ছিনিমিনি করা—এই হ'লো সে সময়কার ফ্রান্সের প্রতিদিনের অবস্থা। পরবর্তীকালে "দি রিপাবলিক অব সাইলেন্স" প্রবন্ধে সার্ত্র লিখলেন—'জার্মানদের অধীনে নিপীড়িত অবস্থায় আমরা যতটা স্বাধীন ছিলাম সে রকম আর কখনো থাকিনি। সমস্ত রকমের নাগরিক এবং মানবিক অধিকার আমরা হারিয়েছিলাম, এমন কি পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবার অধিকারটুকু পর্যন্ত। প্রত্যহ আমরা অপমানিত হচ্ছিলাম তুচ্ছ সমস্ত কারণে এবং এ সমস্তই বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা হজম করতে বাধ্য হচ্ছিলাম। এক এক সময় এক এক রকমের অছিলায় আমাদের গ্রেপ্তার করা হ'তো—শ্রমিক, শিক্ষক, ইহুদী, রাজনৈতিক কর্মী, সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী, কেউই বাদ পড়তো না। বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের হাজারে হাজারে গ্রেপ্তার করে কন্‌সানট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হ'তো, কখনো বা সরাসরি জাহান্নামে পাঠানো হ'তো। কি খবরের কাগজে, কি রেডিওতে, কি সিনেমা-থিয়েটারে সর্বত্রই অত্যাচারী জার্মানরা যা চাইতো তাই করা হ'তো।

কিন্তু, এ সমস্ত সত্ত্বেও আমার বিশ্বাস যে আমরা ফরাসীরা স্বাধীন ছিলাম। নাৎসীদের বিষ আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল। কাজেই এই সময় প্রতিটি সুস্থ,স্বাভাবিক চিন্তাই প্রকৃতপক্ষে এক-একটা বিজয়ের সূচনা করতো। নাৎসী কর্তৃত্বাধীনে সর্বশক্তিমান পুলিস কঠোর হস্তে আমাদের নীরব করে রেখেছিল, তাই আমাদের প্রত্যেকের মুখের প্রতিটি কথার মূল্য লক্ষ গুণ বেড়ে গিয়েছিল।…যেহেতু প্রতি মুহূর্তে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতো গেস্টাপো বা তাদের বেতনভোগী অনুচরেরা, সেই কারণেই পরস্পরের প্রতি আমাদের প্রতিটি ইশারা পবিত্র প্রতিশ্রুতি হয়ে উঠেছিল।…. ·এই বর্বরোচিত এবং হৃদয়হীন পরিবেশেই, কী আশ্চর্য! শেষ পর্যন্ত আমরা বাঁচতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। এজন্য আমাদের কোনো লজ্জা নেই বা মিথ্যে কারণ খুঁজতে চাই না। আমরা, হ্যাঁ, আমরা সভ্য পৃথিবীর শিক্ষিত মানুষেরাই এই বিশৃঙ্খল এবং অসম্ভব অবস্থার মধ্যে বাঁচতে লাগলাম।…ওঃ মানুষের সহ্যশক্তি কী ভীষণ! এর মধ্যেও বাঁচতে হয়, না বাঁচলেই নয়!'

এই নিদারুণ অবস্থার মধ্যে সাত্র্ শুধু যে বেঁচে রইলেন তাই নয়, অত্যন্ত সক্রিয়ভাবেই বেঁচে রইলেন। অর্থাৎ কিনা এক হাতে রাইফেল আর এক হাতে কলম সমানভাবে চালাতে লাগলেন। একদিকে যেমন উনি মুক্তি-যোদ্ধাদের মধ্যে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হ'লেন—সাহিত্যিক এবং দার্শনিক হিসেবেও সর্বসাধারণের কাছে উনি একজন প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করলেন। বাস্তবিক পক্ষে, ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন শেষ হ'লো এবং ফ্রান্স নাৎসী কবল মুক্ত হ'লো, তখন রাতারাতি সাত্র্'র নাম গোটা সভ্যজগতে ছড়িয়ে পড়লো ফ্রান্সের বিদগ্ধ সমাজের শিরোমণি হিসেবে। এ সময়ে সাত্র্'র বয়স মাত্র বছর চল্লিশ। ফ্রান্সের মতো একটা দেশে, এত অল্পবয়সে লেখক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসেবে সাত্র্'র এই যে বিরাট খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা, অনেকের মতে তার প্রধান কারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ওঁর দুঃসাহসিক কাজকর্ম। সাহিত্যচর্চা অনেকেই করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে স্বদেশের মুক্তির জন্য সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতে খুব কম সংখ্যক লেখককেই দেখা যায়—তা যে কোনো দেশের কথাই ধরা যাক না কেন। যে সমস্ত পরাধীন বা নিপীড়িত দেশের সাহিত্যিকদের দেশের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে, তাঁরা বেশির ভাগ

ক্ষেত্রেই লেখার মধ্যেই তাঁদের রাজনীতি সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কিন্তু সার্ত্র একদিকে যেমন তাঁর লেখনী ব্যবহার করেছেন নাৎসী শত্রুদের বিরুদ্ধে, তেমনি বারুদের সাহায্যও নিয়েছেন শত্রুর কবল থেকে পিতৃভূমি উদ্ধার করবার জন্য। এবং এ দু'রকম কাজের জন্যই প্রতি মুহূর্তে তাঁকে জীবন বিপন্ন করে চলতে হয়েছে একটানা প্রায় চারটে বছর।

সাহিত্যসাধনার পরিণত রূপ—এই সময়ে অর্থাৎ ফ্রান্স যখন নাৎসীদের কবলে প্রতিদিন নিষ্পিষ্ট হচ্ছিলো, তখন প্যারিসে বসেই সার্ত্র দু'খানা নাটক রচনা করলেন। 'দি ফ্লাইজ' এবং 'নো একজিট'। সাহিত্য হিসেবে নিঃসন্দেহে 'নো একজিট' শ্রেষ্ঠতর রচনা, তা' ছাড়া অস্তিত্ববাদের ব্যাখ্যানেও এর মূল্য অধিকতর—কিন্তু পদদলিত দেশবাসীকে স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টায় উদ্‌বুদ্ধ করবার প্রয়াস হিসেবে 'দি ফ্লাইজ' নাটকের তুলনা নেই। জার্মান সেন্সর বিভাগের ধুরন্ধরদের নজর এড়িয়ে সার্ত্র যে নাটকখানা কি ভাবে ছাপালেন এবং মঞ্চস্থ করালেন তা পরবর্তীকালে অনেকেরই বিস্ময় উদ্রেক করেছে। অনেকের ধারণা যে ক্লাসিকাল বিষয়বস্তু বলেই নাৎসী-সেন্সর বিভাগ, 'দি ফ্লাইজ' এর রূপকের আড়ালে বক্তব্যটিকে বুঝে উঠতে পারে নি। হয়তো তাই-ই। 'দি ফ্লাইজ' নাটকের বিষয়বস্তু ওরেস্টেস-উপাখ্যান। হোমর হেসিয়ড, এস্‌কাইলাস ও ইউরিপিদেস প্রভৃতির বিভিন্ন রচনা থেকে মালমসলা সংগ্রহ করে সার্ত্র 'দি ফ্লাইজ' রচনা করলেন।

ওরেস্টস উপাখ্যানে দেখা যায় গ্রীকদের প্রধান সেনাপতি রাজা আগেমেমনন ট্রয় জয় করে স্বরাজ্যে ফিরে এসেছেন। ফিরে আসবার পরে দেখতে পেলেন তাঁর স্ত্রী ক্লাইতেমনেস্ত্রা রাজ্য-রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভারপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি ইগিসথাসের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছেন। ইগিসথাস এবং ক্লাইতেমনেস্ত্রা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলেন আগেমেমননকে! আগেমেমননের একমাত্র পুত্র ওরেস্টেসকে হত্যা করবার চেষ্টাও ও঄রা করলেন, কারণ, তাহলে আগেমেমননের নাম চিরতরে মুছে ফেলা যায়। কিন্তু তা ও঄রা পারলেন না। বোন ইলেকট্রার সাহায্যে তরুণ ওরেস্টেস পিসির বাড়ি পালিয়ে বাঁচলো। এদিকে ইগিসথাস ওরেস্টেসের পিতৃ-রাজ্যে যা খুশী তাই করতে লাগলো। ওরেস্টেসের মা প্রকাশ্যে ইগিসথাসের সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হ'লেন। ওদিকে ওরেস্টেস পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরী হ'তে লাগলো এবং দীর্ঘ সাত বৎসর পরে পিসতুতো ভাই পাইলেডীসকে সঙ্গে নিয়ে পিতৃরাজ্যে

আত্মগোপন করে এসে শেষ পর্যন্ত অত্যাচারী ইগিসথাসকে হত্যা করে পিতৃহত্যার উপযুক্ত প্রতিশোধ নিলো।

সাত্র´র রচনা-চাতুর্যের গুণে দেখা গেছে সে সময়কার ফ্রান্সে 'দি ফ্লাইজ' নাটকের পাঠক বা দর্শক অভ্রান্তভাবেই ইগিসথাসের সঙ্গে অত্যাচারী এবং পররাজ্য দখলকারী নাৎসীদের তুলনা করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। প্রতিক্রিয়াটা সহজেই অনুমেয়।

'নো একজিট' নাটিকার পটভূমি নরক। নরকের একটি নোংরা এবং শস্তাদামের হোটেল। এখানে দেখা যায় তিনটি লোক—দু'টি পুরুষ এবং এক নারী. এরা কেউ কাউকে চায় না, কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না, অথচ ঘটনাচক্রে নরকের একটি জায়গায় এসে পড়েছে। এখান থেকে কারো বেরিয়ে যাবারও কোনো উপায় নেই। এই নাটিকাটিতে শেষ পর্যন্ত সাত্র´ বলেছেন যে যাকে চাই না, বা যা চাই না, সেইটেই মানুষের পক্ষে নরকতুল্য হয়ে পড়ে।

দর্শন-চিন্তার বৈশিষ্ট্য—অস্তিত্ববাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাত্র´ তাঁর "বিইং এণ্ড নন-বিইং" এবং 'একজিসটেনসিয়ালিজম' বই দু'খানিতে যা বলেছেন তা একটু আলোচনা করা দরকার। সাত্র´ বলেছেন যে দু'-রকমের অস্তিত্ববাদী আছেন। এক হলেন যাঁরা খ্রীষ্টান ধর্ম মানেন অথচ অস্তিত্ববাদী —যেমন জ্যাসপারস্, গাব্রিয়েল মার্সেল প্রভৃতি। আর দ্বিতীয় ধরনের অস্তিত্ববাদীরা হলেন নাস্তিক—যেমন হাইডেগগার এবং সাত্র´ নিজে।

সাত্র´র অস্তিত্ববাদ অনুসারে ভগবান নেই, থাকতে পারে না। পৃথিবীতে সাধারণত মানুষ যতো জিনিসের সত্যতায় কম-বেশি বিশ্বাসী—ধূলিকণা থেকে শুরু করে ভগবান পর্যন্ত—এ সমস্তেরই গোড়ার কথা আলোচনা করলে দেখা যাবে, মানুষের পক্ষে, কোনো বস্তুর অস্তিত্বই সত্য নয় যে সম্পর্কে সে যথাযথ ধারণা করতে না পারে। অর্থাৎ যে কোন বস্তুর অস্তিত্বের যাথার্থ্য মানুষের ধারণার ওপর নির্ভরশীল। নির্ভরশীল কোনো জিনিস আর যাই হ'ক ভগবান বলতে কবি-মানসে যে সর্বশক্তিমান সত্তার কথা উদয় হয়—তা' হ'তে পারে না। কাজেই ভগবানের ধারণার কোনো বাস্তব সত্যতা নেই।

হাইডেগগার অনুসরণে সাত্র´ বল্লেন যে, একটিমাত্র জিনিষের বেলায় দেখা যায় Existence precedes essence. সে হ'লো মানুষ, কিম্বা বলতে

হয়—মানব অস্তিত্ব। নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা করতে না পারলেও মানুষ বাঁচতে পারে, তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে।

মানুষ মাত্রেরই অবচেতন মনের একটা নিজস্ব কর্মপদ্ধতি বা প্রকৃতি থাকে। এই প্রকৃতিই ক্রমশঃ উদ্‌ঘাটিত হ'তে থাকে মানুষের জীবনে। সজ্ঞানভাবে মানুষ কি ইচ্ছা (will) করলো সেটা বড়ো কথা নয়—কারণ কি সে ইচ্ছা করেছে বা করবে তা-ও ঐ প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই বলতে হয় মানুষ নিজেই সর্বতোভাবে তার সব কিছুর জন্য দায়ী।

মানুষকে তার অস্তিত্বের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করে দেওয়া অস্তিত্ববাদী হিসেবে সার্ত্র তাঁর প্রথম কর্তব্য মনে করেন। মানুষ শুধু যে তার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব সম্পর্কে দায়ী তা নয়—প্রত্যেকটি ব্যক্তি-মানুষ সমগ্র মানবজাতির দায়িত্ব বহন করে। সার্ত্র বলেন যে, কোনো কিছুই কারো পক্ষে প্রকৃত ভালো হতে পারে না, যদি তা সমগ্রভাবে মানুষের পক্ষে ভালো না হয়। এই দায়িত্ববোধ যার আছে জীবনটা তার পক্ষে একটা রীতিমতো যাতনা (Anguish)। ভগবান নেই বলেই জীবনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব মানুষের নিজের। অন্তরে বাইরে এমন কোনো উচ্চতর সত্তা বা মানদণ্ড মানুষের নেই যার সঙ্গে তুলনা করে বা যার কষ্টিপাথরে যাচাই করে মানুষ নিজের কাজের ভালো মন্দ বিচার করতে পারে। এই জন্যই সার্ত্র বলেন যে পৃথিবীতে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই স্বাধীনতা মানুষের পক্ষে একটা যন্ত্রণা বা শাস্তি বিশেষ (Man is condemned to be free)। কারণ কোনো ব্যক্তি-মানুষই স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে আসেনি—তাকে আনা হয়েছে এবং এনে বিরাট একটা দায়িত্বের ভার তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ হলো একটা নিদারুণ নিঃসহায় অবস্থা (Forlornness)। কোন্‌টা পাওয়া জীবনে সম্ভব আর কোন্‌টা সম্ভব নয় তা সঠিকভাবে বুঝে উঠতে না পারার জন্যই মানুষের জীবনে দেখা দেয় নৈরাশ্য (Despair)। বাইরের পৃথিবীর কোনো কিছুই মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি দৃক্‌পাত করে চলে না। অথচ সর্বদাই মানুষ "বাইরের সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করবার বৃথা চেষ্টা করে হয়রান হচ্ছে"। "বাইরের পৃথিবীকে ছেড়ে দিয়ে নিজেকে জয় করো"—সভ্য মানুষকে ডেকার্ট এই যে পরামর্শ দিয়ে গিয়েছিলেন তা সার্ত্রও সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

সার্ত্র ঘোরতরভাবে মার্ক্‌সবাদ এবং অন্য সকল রকমের বস্তুবাদের

বিরোধী। কারণ, বস্তুবাদ মানুষকেও বিশ্বের অসংখ্য বস্তুর মধ্যে একটি বলে গণ্য করে। একটা চেয়ার বা টেবিল বা একখণ্ড পাথরের সঙ্গে সামিল করে মানুষের বিচার করা হবে—এটা সাত্র্‌ সমর্থন করেন না। সাত্র্‌ মনে করেন যে মানুষকে বিচার করবার এবং বুঝবার একমাত্র উপায় হলো বস্তুবাদের ঠিক বিপরীত পদ্ধতি। অর্থাৎ Subjective পদ্ধতি। সাত্র্‌ মনে করেন যে কোনো মানুষই কখনো একেবারে ফুরিয়ে যায় না। কোনো অবস্থাতেই বলা যায় না যে মানুষ তার চরম উন্নতি করে ফেলেছে। কারণ সর্বদাই সে একটা দারুণ পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে কাটাচ্ছে এবং কার্যতঃ সে নিজেরও প্রচুর পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।

পেশাদার দার্শনিকেরা অস্তিত্ববাদকে একটা পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক মত বলে গণ্য করেন না, তাই তাঁরা এর সম্পর্কে কিছুটা উদাসীন ভাব দেখান। তাঁরা বলেন 'অস্তিত্ববাদ' কেবল একটা Attitude মাত্র, Philosophical System নয়। অস্তিত্ববাদের বিরূপ সমালোচনা সব চাইতে বেশি করে থাকেন খ্রীষ্টান ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বা গোঁড়া খ্রীষ্টান সাধারণ লেখকেরা। বিশেষ করে এই শ্রেণীর বিরুদ্ধ-সমালোচনাকারীদের প্রতি নজর রেখেই সাত্র্‌ বলেন যে, তাঁর অস্তিত্ববাদ যদিও সকল রকমের নিরীশ্বরবাদী দার্শনিক মতের একটা সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাই বলে "ভগবান নেই" শুধু এই কথাটা বলাই তাঁর উদ্দেশ্য নয়, বা, এই কথাটা বলবার পরেই তার বক্তব্য শেষ হয়ে যায় না। কাজেই অস্তিত্ববাদের বিরুদ্ধে মানবজাতিকে ঈশ্বর-মুক্ত করে একটা নিদারুণ হতাশার মধ্যে টেনে আনবার অভিযোগ ভিত্তিহীন। সাত্র্‌ বলেন: 'ভগবান নেই তা ঠিক, কিন্তু যদি থাকতেনও তাহ'লেও পৃথিবীতে মানুষের অবস্থার কোনই পরিবর্তন হ'তো না। ভগবানের সমস্যাটা প্রধান নয়, মানুষের সমস্যাটাই প্রধান—অস্তিত্ববাদ এই সমস্যার সমাধানের জন্যই চেষ্টিত।' পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মানুষ পৃথিবীতে সম্পূর্ণ স্বাধীন—ভালো বা মন্দ সব কিছু করবারই তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে, তা ছাড়া রয়েছে বিরাট দায়িত্ব, নিজের সম্পর্কে তথা সমগ্র মানবজাতি সম্পর্কে—এই দায়িত্ব বহন করে সঠিক পথে চলতে পারা দারুণ সমস্যা মানুষের পক্ষে। তাই সাত্র্‌ বলেন Man is condemned to be free. প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা থাকলে অধিকাংশ সময়ে দেখা যায় ভুল কম হয়, তা ছাড়া শক্তি বাড়ে। শক্তি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে আত্মবিশ্বাস, তাই পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত অবস্থা

সম্পর্কে তাকে সজাগ করে দিয়ে অস্তিত্ববাদ সত্যের সেবা ত করেই, তা' ছাড়া এর ফলে মানুষের মনে একটা নতুন আশার সঞ্চারও হয়। কাজেই "অস্তিত্ববাদ" একটি মানবতন্ত্রী এবং আশাবাদী দার্শনিক মত।

সাত্র্ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ একখানি এপিক উপন্যাস লিখেছেন। উনি এ উপন্যাসের নামকরণ করেছেন "দি ওয়েস অব ফ্রিডম"। এই বিরাট উপন্যাসের প্রথম দু'টি খণ্ড "দি এজ অব রিসন" এবং "দি রিপ্রীভ" যুদ্ধ থেমে যাবার কিছু পরেই প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে বইখানা ইংরেজীতে অনূদিতও হয়েছে। তৃতীয় এবং শেষ খণ্ড "ট্রাবল্‌ড স্লীপ" প্রকাশিত হয়েছে কয়েক বছর পরে। এই উপন্যাসমালায় সাত্র্ তাঁর 'অস্তিত্ববাদ' আরও পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

আজকের পৃথিবীতে দার্শনিক মত সংখ্যায় অসংখ্য। ধর্মপুস্তককে প্রামাণিক সত্য মনে করে এ রকম থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ জ্ঞানকেই চরম সত্য মনে করে এ রকমও আছে। সাত্র্‌র ঝোঁকটা বিজ্ঞানের দিকেই বেশি মনে হয়। অস্তিত্ববাদ ঠিক পুরনো ধরনের দর্শন নয়। পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় ও বস্তু সম্পর্কে এর মতামত জানাবার দায় নেই। অস্তিত্ববাদ মানুষের জীবনকে (conduct of life) পরিচালনার একটা উপায় বিশেষ। বিজ্ঞানের সত্য তথা ধর্মের গ্রহণযোগ্য বিষয়গুলি আত্মসাৎ করবার এর একটা প্রবণতা আছে।

গত কয়েক বছর ধরে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সাত্র্‌র মেলামেশাকে অনেকেই ভালো চোখে দেখছেন না। ১৯৫২ সালে ভিয়েনাতে অনুষ্ঠিত শান্তি কংগ্রেসে যোগদান করে সাত্র্ পশ্চিমী দুনিয়ার যুদ্ধবাজদের তীব্রভাবে সমালোচনা করে একটি জোরালো বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বিশেষ করে এর পর থেকেই ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তাঁর জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ কমতে আরম্ভ করেছে। বিদগ্ধ সমাজের একটা শ্রেণী নানাভাবে সাত্র্‌র চিন্তাধারার মূল্য কমিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এমন কি সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবেও তাঁকে যথাযোগ্য সমাদর করতে রাজী নন দেখা যাচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই খুব দুর্ভাগ্যের কথা।

আমেরিকাতেই সাত্র্-বিরোধীদের উত্তেজনা সব চাইতে বেশী। তার একটা কারণও আছে। সাত্র্ তাঁর একটি নাটকে আমেরিকার সমাজ-জীবনের পঙ্কিলতার একটি দিক্ অত্যন্ত প্রকটভাবে তুলে ধরেছেন। ১৯৪২ সালে সাত্র্‌র তিনখানি নাটক প্রকাশিত হয়েছিলো—'ডার্টি হ্যাণ্ডস,' 'দি ভিকটরস' এবং

'দি রেসপেকটেব্‌ল প্রস্টিটিউট।' শেষোক্ত নাটকের পটভূমি খাস আমেরিকা। এ নাটকে দেখা যায় বিরাট ধনী এক আমেরিকান যুবক একটি নিগ্রোকে হত্যা করেছে এবং তারপর আইনের চোখে ধুলো দেবার জন্যে একজন বারবনিতাকে বলছে যে, তুমি প্রকাশ্যে বলবে যে তুমিই ঐ নিগ্রোটাকে হত্যা করেছ। কারণ হিসেবে বলবে যে সে তোমাকে ধর্ষণ করতে চেয়েছিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা কি পরিমাণ নগ্ন এবং সত্য। আইনের দেশ আমেরিকাতে এক শ্রেণীর মানুষ অর্থাৎ শ্বেতকায়রা যে আইনের আওতা থেকে কার্যত বাইরে থাকতে পারে এ কথা সর্বজনবিদিত—সাত্র্ এই সত্য কথাটাই মাত্র তাঁর পাঠক এবং দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন।

বলাই বাহুল্য, যা উচিত, ভালো বা করণীয় বলে মনে করেন সাত্র্ তা বরাবরই করে এসেছেন এবং এখনো করছেন। দারুণ বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও সাত্র্ ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে মস্কোতে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনেও গিয়েছিলেন।

শেষ পর্যন্ত সাত্র্‌র দার্শনিক মতের কি হবে তা এখনই বলা যায় না। তবে তাঁর সাহিত্য ইতোমধ্যেই বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে উঠে গেছে, একথা সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায়।

সুইডিশ আকাদমী ১৯৬৪ সালের জন্যে সাহিত্য নোবেল পুরস্কার সাত্র্‌কেই দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সাত্র্ এ পুরস্কার প্রত্যাখান করেছেন।

আলবেয়ার কামু

রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন সব দেশের বাস্তব সামাজিক জীবন-যাত্রার যেমন মোড় ঘুরিয়ে দেয়, শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় না। মানুষমাত্রেই কমবেশি স্পর্শকাতর, আর যাঁরা সুকুমার-শিল্পের চর্চা করেন তাঁরা তাঁদের কর্মধারার বিশেষ প্রকৃতির জন্যেই ক্রমশঃ অধিকতর সংবেদনশীল হয়ে উঠতে থাকেন। তাই দেখা যায়, বড়ো রকমের একটা রাজনৈতিক বিপর্যয় এক-একটা গোটা দেশের সাহিত্যচিন্তাতেও আমূল পরিবর্তন এনে দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীর কাছে ফ্রান্সের পরাজয় নিঃসন্দেহে এ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি দুঃখজনক ঘটনা। ফ্রান্স শুধু জার্মানীর কাছে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয় নি, ফ্রান্স জার্মানী কর্তৃক অধিকৃতও হয়েছিল এবং চার বছরের ওপর ফরাসী জনগণকে কার্যতঃ বন্দীদশাতেও কাটাতে হয়েছিল। স্বাধীনতা হারানোর মানে যে কি তা আমরা সকলে হয় তো ঠিক সমানভাবে এবং সহজে বুঝে উঠতে পারবো না; কারণ আমরা ও জিনিস হারিয়েছিলাম কয়েক পুরুষ আগে এবং তারপর পুরুষানুক্রমে পরাধীন জীবনযাপন করবার ফলে ও জিনিসটির আসল মূল্য আমাদের অনেকের কাছেই বোধ হয় খুব স্পষ্ট নয়—এমন কি নতুন করে এ যুগে স্বাধীনতা অর্জনের এতো বছর পরেও। তাই স্বাধীনতা হারাবার পরে সোয়া চার কোটি ফরাসী নরনারীর বাস্তব সামাজিক জীবনের কথা বাদ দিয়ে তাদের মানসিক যে যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়েছিল, সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় যে তা মৃত্যুরও অধিক।

সমস্ত রকমের বিচিত্র এবং বিপরীতধর্মী চিন্তার সৃষ্টি করা, তাকে লালন করা এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা করা যে ফরাসী দেশের শিক্ষিত সমাজের একটি প্রধান নেশা বলে আমরা গত শতাধিক বছর ধরে জেনে এসেছি, রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে দেখা গেলো শ্রেণী নির্বিশেষে তাদের বেশির ভাগই এক উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে—সে হলো স্বাধীনতা পুনরর্জন করা। স্বাধীনতা পুনরর্জনের এই সংগ্রামে সাহিত্য ও চিন্তার ক্ষেত্রে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য একজন হলেন আজকের ফ্রান্স তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ এবং নাট্যকার,

ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক জাঁ-পল সার্ত্র। আলবেয়ার কামু নাৎসীদের কবল থেকে ফ্রান্সের স্বাধীনতা পুনরর্জনের সংগ্রামে যেমন এক সময় সার্ত্রের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন, তেমনি চিন্তার ক্ষেত্রেও তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পরে অবশ্য দেখা গিয়েছিল চিন্তার ক্ষেত্রে কামু তাঁর নিজস্ব মত গড়ে তুলবার জন্যে প্রয়াসী হয়েছেন—আমরা যথাস্থানে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করবো।

প্রথম জীবন—আলবেয়ার কামু (Albert Camus ; 1913—1960) বয়সে সার্ত্রের চাইতে আট বছরের ছোট ছিলেন। সার্ত্র একেবারে বাল্যবয়স থেকেই খাস ফ্রান্সের আবহাওয়াতে পরিবর্ধিত হয়েছিলেন। কিন্তু কামুর প্রথম জীবন কিছুটা ভিন্ন রকমের ছিল। জন্মসূত্র থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয়েই সার্ত্র যেমন পুরোদস্তুর ফরাসী, কামু ঠিক সে সুযোগ লাভ করেন নি; খাঁটি ফরাসী হয়ে উঠবার জন্ম তাঁকে গোটা কৈশোর এবং যৌবন রীতিমতো চেষ্টা করতে হয়েছিলো। তার প্রথম কারণ, কামুর মা ছিলেন স্পেন দেশের মেয়ে, আর দ্বিতীয় কারণ, কামু জন্মগ্রহণ করেছিলেন খাস ফ্রান্স থেকে অনেক দূরে— ভূমধ্যসাগরের অপর পারে, আলজিরিয়াতে। আলজিরিয়া ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিলো বটে, কিন্তু নানা কারণবশতঃ খাস ফ্রান্সের সঙ্গে আলজিরিয়ার ফরাসী অধিবাসীদের ধ্যান-ধারণার যোগাযোগ ছিলো খুবই ঘনিষ্ঠ এবং লক্ষ লক্ষ ফরাসী নরনারী স্থায়ীভাবে আলজিরিয়াতে বসবাস করতেন, এমন কি আলজিরিয়া স্বাধীনতা অর্জনের পরে আজো করছেন। কামুর বাবা জাতিতে ফরাসী ছিলেন কিন্তু ফ্রান্সের যে অঞ্চলে তাঁর জন্মস্থান ছিলো, অর্থাৎ আলসেসিয়া, দীর্ঘকাল তা ছিলো জার্মান সাম্রাজ্যের অঙ্গ। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানী পরাজিত হবার ফলে রাইন নদীর পশ্চিমের এই আলসেসিয়া প্রদেশ আবার ফ্রান্সের অঙ্গ হয়ে ওঠেছিল। যাই হ'ক, কামুর বাবা প্রথম মহাযুদ্ধের সময় স্বদেশের একজন সৈনিক হয়ে জার্মানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত অবস্থাতেই প্রাণ দিয়েছিলেন। সে সময়ে কামুর বয়স ছিল মাত্র বছর তিনেক। কামুর জীবনে দুঃখদৈন্যও সেই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল।

নানা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করে আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে কামুর ছাত্রজীবন কেটেছিলো। একজন দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে কামু ছাত্রজীবনে বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। একেবারে

প্রথম থেকেই মেধাবী ছাত্রহিসেবে মাষ্টারমশায়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন উনি। আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় কামু পাশ করেছিলেন ১৯৩৬ সালে তেইশ বছর বয়সে। উনি ছিলেন দর্শনের ছাত্র। প্লোটিনাস এবং সন্ত অগষ্টাইনের ভাবধারা সম্পর্কে কামুর নিজস্ব মতামত আলজিরিয়ার ফরাসী চিন্তাবিদ মহলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং দু'বছরের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল রাজধানী অর্থাৎ আলজিয়ার্সের চিন্তাবিদ্ এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন মহলে যুবক কামু একজন বিশিষ্ট ও সক্রিয় ব্যক্তি। এ সময়ে কামুর বয়স পঁচিশেরও কম ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়বার পরেই কামুকে দেখা গিয়েছিল আলজিয়ার্সে নবনাট্য আন্দোলনের একজন নায়করূপে। উনি নিজে একটি ছোটো কিন্তু শিক্ষিত এবং সুসংবদ্ধ নাট্য-সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন। কামু নিজে শুধু পরিচালনাই করতেন না তাঁর নাট্য-সম্প্রদায়কে, একাধিক নাটকের অভিনয়ে অংশ গ্রহণও করেছিলেন। দেশ-বিদেশের প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারদের নাটকের যেমন মঞ্চরূপ দিতেন কামু তাঁর সম্প্রদায়ের সহযোগিতায়, তেমনি অনেক বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপ করেও তা মঞ্চস্থ করতেন। এই সময়ে দেখা গিয়েছিল জিদ্, সিঞ্জ, বেন জনসন এবং ডস্টয়েভস্কি কামুর সবচাইতে প্রিয় লেখক ছিলেন। প্রাচীন গ্রীসের স্বনামধন্য নাট্যকার ইস্কাইলাসের অমর নাটক 'প্রমিথেউস বাউণ্ড'-এর অনুবাদ করে কামু আলজিয়ার্সের শিক্ষিত সমাজের একজন আলোচনার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। এর মঞ্চরূপটিও সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল।

সাহিত্যসাধনার শুরু—সাহিত্যক্ষেত্রে কামুর আবির্ভাব ঘটেছিল ১৯৩৭ সালে একখানা ছোট প্রবন্ধের বইয়ের রচয়িতা হিসাবে। পরের বছরেই প্রকাশিত হয়েছিল দ্বিতীয় প্রবন্ধের বই। এ দু'খানা বই-ই আলজিয়ার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৩৮ সালে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার কিছুদিন পূর্বে কামু সর্বপ্রথম আলজিরিয়ার বাইরে বেরুবার সুযোগ পেয়েছিলেন। জার্মানী, মধ্য ইয়োরোপের অন্য কয়েকটি দেশ, ইতালী এবং খাস ফ্রান্স ঘুরে কয়েক মাসের মধ্যেই কামু আবার আলজিরিয়াতে ফিরে এসেছিলেন।

আলজিয়ার্সে ফিরে কামু এবার সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিলেন এবং 'আলজার রিপাবলিকান' নামে জনপ্রিয় দৈনিক সংবাদপত্রের

একজন সহকারী সম্পাদক হিসেবে চাকুরী পেলেন। এর অল্প কিছুদিন পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলো। সাংবাদিক হিসেবে কামুর যোগ্যতার কথা অল্পদিনের মধ্যেই এমন ছড়িয়ে পড়েছিল যে ১৯৪০-এর প্রথম দিকেই প্যারিসের একটি সংবাদপত্রের মালিকের কাছ থেকে কামু আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তাঁর কাগজের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যে। কামু চলে এলেন প্যারিসে। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের বেশি ওঁর পক্ষে প্যারিসে থাকা সম্ভবপর হয়ে উঠলো না। ১৯৪০-এর জুন মাসে ফ্রান্স পর্যুদস্ত হলো জার্মানীর কাছে। প্যারিস অধিকৃত হবার কিছু পূর্বেই কামু আবার আলজিরিয়ায় ফিরে এলেন।

এবার আর আলজিয়ার্সে এলেন না কামু। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবনের শুরু থেকেই দেশ-বিদেশের সাহিত্য এবং দার্শনিক রচনাদি পাঠ এবং নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা সব কিছুর সমন্বয়ে যুবক কামুর ভেতরে ভেতরে শুরু হয়ে গিয়েছিলো একটা প্রবল আলোড়ন। এ ধরনের আলোড়ন নিশ্চয়ই সব দেশের সব তরুণ মনেই একটা বিশেষ বয়সে দেখা দেয়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় মানুষ তার ভেতরের স্ফূর্তমান স্ফুলিঙ্গগুলিকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলে কোথায়ও সুযোগের অভাব বলে, কখনো সংসারের চাপের দোহাই দিয়ে, কখনো বা নিজের ভেতরের শক্তির ওপর যথেষ্ট আস্থা রাখতে পারে না বলে। কাজ যে করবে না, তার অজুহাতের অভাব হয় না। আর কাজ যে করবে বলে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ কোনো অসুবিধেই তাকে বেশিদিন পঙ্গু করে রাখতে পারে না। আমরা আগেই দেখেছি কামু নেহাৎ গরীব ঘরের ছেলে ছিলেন। নিজের যোগ্যতার গুণেই যদিও প্যারিসের মোটা মাইনের একটা সাংবাদিকের চাকুরী জোগাড় হয়েছিল এবং আর্থিক দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেয়ে নিশ্চিন্ত মনে সাহিত্য এবং দর্শনচর্চা আরম্ভ করবেন মনস্থ করে-ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠিক সেই সময়েই নাৎসী বর্বরেরা বাধ সাধলো। প্রথমটা কামু একটু হতাশ হয়েই পড়েছিলেন। কিন্তু সে মাত্র কয়েকদিনের জন্যে। কিন্তু তারপরেই বুঝলেন যে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং' বজায় রাখার চাইতে ভেতরের স্ফুলিঙ্গগুলিকে প্রকাশের একটা বন্দোবস্ত করা অধিকতর জরুরী কাজ। তাই দেখা গেলো 'আলজার রিপাবলিকানে'র আগের চাকুরীতে ডাক পড়া সত্ত্বেও কামু সেখানে গেলেন না। পড়াশুনো, চিন্তা-ভাবনা এবং লেখার জন্যে যেমন প্রয়োজন কিছু সময়ের, তেমনি প্রয়োজন উত্তেজনা থেকে দূরে থাকবার। কামু তাই 'আলজার রিপাবলিকানে'র

বেশি মাইনের চাকুরীতে না গিয়ে আলজিয়ার্সের কিছু দূরে একটি ছোট শহর ওরান-এ চলে এলেন। ওরান-এ এসে একটি স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করলেন কামু। ইতিমধ্যে বিবাহিত হয়েছিলেন উনি। স্কুলমাষ্টারের স্বল্প উপার্জনের মধ্যেই সংসারযাত্রা নির্বাহের বন্দোবস্ত করে কামু এবার তাঁর সাধনার মধ্যে আত্মনিয়োগ করলেন। এসময়ে ওঁর বয়স ছিল ঠিক সাতাশ বছর।

প্যারিসের পতনের পূর্বেই সার্ত্রর প্রথম উপন্যাস 'নসিয়া' এবং গল্পসংগ্রহ 'দি ওয়াল' প্রকাশিত হয়েছিল। এ দুখানি বই এবং প্রথম-শ্রেণীর সাময়িক পত্র-পত্রিকাদিকে প্রবন্ধাদি প্রকাশের ফলে ফ্রান্সের তরুণ চিন্তা-বিদগণের মধ্যে সার্ত্র নিজের বিশিষ্ট আসন করে নিয়েছিলেন। প্যারিসের পতনের সময় সার্ত্রর এবং কামুর কার কতটা প্রতিষ্ঠা সে সম্পর্কে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এ সময়ে কামু দু'খানা বইয়ের লেখক এবং ফ্রান্সের অন্যতম উপনিবেশ আলজিরিয়াতে একজন উদীয়মান চিন্তাবিদ্ হিসেবে স্বীকৃত; আর সার্ত্রর‌ও বইয়ের সংখ্যা যদিও দু'খানা কিন্তু তাঁর স্বীকৃতি তখনই বলতে গেলে শুধু খাস ফ্রান্সেই নয়, ফরাসী ভাষাভাষী পৃথিবীর সর্বত্র। একজন তরুণ চিন্তানায়ক এবং অস্তিত্ববাদের ব্যাখ্যাতা হিসেবে সার্ত্র তখনই শিক্ষিত সমাজের আলোচনার পাত্র। ওরানে এসে কামু যখন একাগ্রচিত্তে সাহিত্যসাধনা শুরু করলেন সে সময়ে উনি সার্ত্রর একজন বিশিষ্ট অনুগামী এবং ভক্ত। প্যারিসের সংবাদপত্রের চাকুরী নেবার কিছুদিন পরেই ব্যক্তিগতভাবে সার্ত্রর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন কামু। কামু কখনো সৈন্যদলে যোগদান করেন নি। কিন্তু সার্ত্র ফরাসী সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন একজন গোলন্দাজ হিসেবে। প্যারিসের পতনের কয়েকদিন পূর্ব থেকেই সার্ত্রর কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। তারপর কামু ওরানে এসে শিক্ষকতা শুরু করবার কিছুদিন পরে অবশ্য জানতে পারলেন যে সার্ত্র জার্মানদের বন্দী-শিবিরে রয়েছেন।

ওরান-এ এসে দু'বছরের চেষ্টায় কামু তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দি স্ট্রেঞ্জার' এবং কাহিনী-ভিত্তিক একখানি দর্শনের বই 'দি মিথ অব সিসিফাস' রচনা করেছিলেন।

প্রায় নয় মাস জার্মানদের যুদ্ধ-বন্দী-শিবিরে কাটাবার পরে মুক্তি পেয়ে সার্ত্র প্যারিসে ফিরে এলেন এবং ফিরে এসেই নাৎসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তৎপর হলেন। একদিকে যেমন গুপ্ত

বিপ্লবী বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সার্ত্র, অন্যদিকে তেমনি গুপ্ত সংবাদ সরবরাহের কাজ তথা গুপ্তভাবে কাগজ প্রচারের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। যুক্ত ছিলেন অর্থাৎ রীতিমতো নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ সব ছাড়াও সার্ত্রর একান্ত নিজস্ব সংগ্রামী সাহিত্যসৃষ্টির কাজ তো চলছিলই।

জার্মানদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সার্ত্র প্যারিসে আসবার পরেই চেষ্টা করেন কামুর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের। একজন প্রতিশ্রুতিবান তরুণ চিন্তাবিদ হিসেবে কামু সার্ত্রর আস্থাভাজন ছিলেন। কয়েক মাসের চেষ্টায় কামুর সঙ্গে সার্ত্রর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিলো। সার্ত্রর অনুপ্রেরণায় কামুও বুঝতে পারলেন যে দেশের বর্তমান অবস্থায় প্রত্যেকেরই সক্রিয়ভাবে কিছু-না-কিছু করা দরকার, এ কাজ শুধু সাহিত্য বা দর্শনের চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, ব্যাপকতরভাবে সক্রিয় সংগ্রামে অংশ-গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাই সার্ত্রর আহ্বানে সাড়া দিলেন কামু।

১৯৪২ সালের মাঝামাঝি জার্মান অধিকৃত প্যারিসে চলে এলেন কামু। সে সময়ে ওঁর দু'পকেটে দু'টি পাণ্ডুলিপি 'দি স্ট্রেঞ্জার' এবং 'দি মিথ অব সিসিফাস'। দু'খানা বই-ই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ফ্রান্স জার্মান কবলমুক্ত হবার পরে। প্যারিসে এসেই সার্ত্রর নির্দেশে কামু গুপ্ত সংবাদপত্রগুলির সঙ্গে যুক্ত হলেন—অন্ততঃ চারখানি গুপ্ত সংবাদপত্রে নিয়মিত লিখতেন কামু। তার মধ্যে একখানা, The Combat, ফ্রান্স জার্মান কবলমুক্ত হবার পরে যখন নতুনভাবে প্রকাশ্যে প্রচারিত হতে আরম্ভ করলো তখন কামুই এ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। গুপ্ত সংবাদপত্রগুলিতে কামুর রচনাবলী স্বাধীনতাযোদ্ধাদের এতই প্রেরণা জোগাত যে, বাস্তবিক পক্ষে সে সময়ে বেশ কিছুদিনের জন্য কামুকে ফরাসী তরুণ সমাজের বিবেক-নিয়ন্ত্রক বলা হতো। ফ্রান্সের স্বাধীনতা পুনরর্জনের কিছুদিন পরেই অবশ্য কামু The Combat-এর সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন পুরোপুরিভাবে নিজেকে সাহিত্য-সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত রাখবার জন্যে। এ সময় পর্যন্ত কামু প্রায় সর্বতোভাবেই সার্ত্রর অস্তিত্ববাদের অনুগামী ছিলেন বলা চলে। সার্ত্র ঘোষণা করেছিলেন যে, ভগবান নেই এবং ভগবান নেই বলেই মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং এ স্বাধীনতা তার পক্ষে একটা শাস্তি বিশেষ (Man is condemned to be free)—মানুষের জীবন নানাবিধ যাতনা (Anguish),

অসহায়তা (forlornness) এবং নিরাশায় (despair) পরিপূর্ণ। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত কামু তাঁর তৃতীয় এবং চতুর্থ বইতেও (দি ষ্ট্রেঞ্জার এবং দি মিথ অব সিসিফাস) প্রকারান্তরে সেই এক কথাই বললেন—মানুষের জীবন অতি অসহায়, অর্থহীন, বেঁচে থাকা মানে একটা পণ্ডশ্রম করে বেড়ানো।

কামুর নিজস্ব দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তা—কিন্তু এর পর থেকেই কামুর চিন্তাধারায় দ্রুত পরিবর্তন দেখা দিতে আরম্ভ করলো। যে কামু অস্তিত্ববাদকে মানুষের দর্শনচিন্তার শেষ কথা মনে করতেন—সার্ত্রের 'নসিয়া' যার বাইবেল স্বরূপ হয়ে উঠেছিল, প্রাচীন গ্রীসের ওরেসটেস উপাখ্যান অবলম্বনে সার্ত্রের রচিত নাটক "দি ফ্লাইজ" মঞ্চস্থ করবার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে নিয়ে কয়েক সপ্তাহ আহার নিদ্রা ভুলে গিয়েছিলেন, তিনিই এবার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাদিতে রচিত প্রবন্ধাদিতে অস্তিত্ববাদের বিরোধিতা শুরু করলেন। কামু তাঁর নিজস্ব দার্শনিক মতবাদের নাম দিলেন 'সেকিউলার হিউম্যানইজম'। কিন্তু সমালোচকগণ বললেন যে কামু একটা নতুন নাম উদ্ভাবন করলেন মাত্র, সার্ত্রের অস্তিত্ববাদের আওতা কাটিয়ে বাস্তবপক্ষে খুব বেশি দূর এগুতে পারলেন না উনি। তারুণ্যের উচ্ছলতায় নতুন যা বললেন আসলে তা' অস্তিত্ববাদেরই একটা বিকৃতরূপ। সব কিছুতেই অবিশ্বাস (Nihilism) হয়ে উঠলো এই সময়ে কামুর প্রধান বক্তব্য। প্রবন্ধের বই 'দি রেবেল' এ কথার সাক্ষ্য দেবে। পশ্চিমী দুনিয়ার একাধিক রাজনৈতিক বিপ্লবের তাৎপর্য বিশ্লেষণের পরে কামু এই বলে উপসংহার টানলেন যে: 'বর্তমান সময়ে মানুষের জীবন একটা নিদারুণ হতাশা তথা অবিশ্বাসের স্রোতের মধ্যে উজান ভেঙে চলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না এবং এটা পারবার কথাও নয়। এই যে অর্থহীন অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা এর যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হচ্ছে দাঙ্গা-খুন-জখম-নরহত্যা এবং তার ব্যাপকতর রূপ যুদ্ধ বা মহাযুদ্ধের জন্যে এবং তার সমর্থনে মতবাদ গড়ে তোলা।' কামু আরো বললেন: 'বিদ্রোহ বা বিপ্লব যখন চরমরূপ নেয় তখন কার্যত সেই স্বাধীনতাকেই সে খর্ব করে ফেলে বা এমন কি সম্পূর্ণ নস্যাৎ করেও ফেলে যা অর্জন করা শুরুতে এর লক্ষ্য ছিলো বা থাকে।' 'দি রেবেল' প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে এবং এ বই প্রকাশের পরেই একদিকে ঘোরতরভাবে মার্কসবাদ-ষ্টালিনবাদ বিরোধী

বলে কামুর খ্যাতি খুব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো আর অন্যদিকে ঠিক ঐ কারণের জন্যেই কামুর জনপ্রিয়তা কমে আসতে লাগলো।

'দি রেবেল'-এর পূর্বে প্রকাশিত 'দি প্লেগ' উপন্যাস কামুর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি বলেই বেশির ভাগ সমালোচকের বিশ্বাস। কামুর আর একখানি জনপ্রিয় উপন্যাস হলো 'দি ফল।' প্রবন্ধ এবং উপন্যাস ছাড়া কামু তিনখানা নাটকও রচনা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলি কখনোই বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি।

১৯৪৬ সালে কামু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন এবং তখনই 'দি ষ্ট্রেঞ্জার' প্রকাশিত হবার পরে আমেরিকার সাহিত্য-রসিকমহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

কামু আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, অবিলম্বে একটি বিশ্ব-সরকার (World Government) প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে মানব জাতির কোনই ভবিষ্যৎ নেই। তাই ১৯৪৭ সাল থেকেই বিশ্ব-সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সঙ্গে উনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তা ছাড়া কামু নিজে একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার নাম হলো 'কমিটী টু এড দি ভিক্‌টিমস্ অব টোটালিটারিয়ান ষ্টেট।' নামের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই কমিটীর মধ্য দিয়ে হিটলারের জার্মানী, ষ্ট্যালিনের রাশিয়া, সালাজারের পর্তুগাল এবং ফ্রাঙ্কোর স্পেন থেকে বিতাড়িত অন্ততঃ কয়েক শ' অসহায় নরনারীকে কামু প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কামু সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯৫৭ সালে মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে এবং এর তিন বছর পরে প্যারিসে একটি মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। একটি ছেলে এবং একটি মেয়েসহ কামুর স্ত্রী বর্তমানে স্থায়ীভাবে প্যারিসেই বসবাস করছেন।

সাহিত্যসাধনার পরিণত রূপ—মৃত্যুর সময় পর্যন্ত কামুর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা মোট বারো এবং বয়স ছে'চল্লিশ বছর কয়েক মাস। কিন্তু এই অল্প বয়সের মধ্যেই উনি সাহিত্য জগতে যে খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন তা' এ শতাব্দীতে নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে এটা সম্ভব হলো কি ভাবে, কিসের জন্যে? কি এমন গুণ ছিল তাঁর সৃষ্টির? আমরা আগেই বলেছি 'দি প্লেগ' উপন্যাসই কামুর-শ্রেষ্ঠকীর্তি

বলে সমালোচকগণ মনে করে থাকেন; আমরা তাই 'দি প্লেগ'-এর মধ্যেই কামুর বিশিষ্টতা খুঁজবার চেষ্টা করবো।

দি প্লেগ—আড়াই শ' পৃষ্ঠার এই উপন্যাসে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যদিও কামু ওরান শহরে একদা মহামারীরূপে ঘোষিত প্লেগ রোগ এবং তার আক্রমণের ফলে দু'লক্ষ লোকের একটা গোটা শহরের অবস্থা চিত্রিত করেছেন, কিন্তু আসলে প্লেগ রোগটা একটা প্রতীক। এ উপন্যাসে যেখানে প্লেগ শব্দটি আছে সেখানে যদি নাৎসী বা আক্রমণকারী বা শত্রু বা অত্যাচারী পড়া যায় এবং যেখানে ওরান শব্দটি আছে সেখানে যদি ফ্রান্স বা পিতৃভূমি পড়া যায় এবং ওরানের অধিবাসীদের জায়গায় যদি ফরাসী জনগণকে ধরে নেওয়া যায় তা' হলেই প্রকৃত চিত্রটি পাওয়া যাবে। প্লেগটা একটা প্রতীক হিসেবে নিয়েছেন বলেই কামু তাঁর উপন্যাসের টাইটেল-পৃষ্ঠায় 'রবিনশন ক্রুশো'র ভূমিকায় ড্যানিয়েল ডিফোর কয়েকটি কথা তুলে দিয়েছেন : 'এক ধরণের বন্দীদশার কথা দিয়ে আর ধরণের বন্দীদশা দেখানো খুবই ন্যায়সঙ্গত, ঠিক যেমন যার বাস্তব অস্তিত্ব আছে এ রকম জিনিষের সাহায্যে যার বাস্তব অস্তিত্ব নেই এরকম জিনিষ আমরা গড়বার চেষ্টা করি।'

আলজিরিয়া উপনিবেশের একটি শহর ওরান। দু'লক্ষ লোকের বাস এ শহরে। এ শহরের সব মানুষই পৃথিবীর অন্য যে কোনো শহরের মতোই—যে যার কাজ নিয়ে আছে; কাজ মানে অর্থোপার্জনের জন্যে সদা ব্যস্ততা। ভোর থেকে অনেক রাত পর্যন্ত চলে এই কাজ—তারপর এক সময় 'সবুজের চিহ্নহীন, চাকচিক্যহীন, হৃদয়হীন, নিষ্প্রাণ শহর ইট আর পাথরের গাঁথুনির মধ্যে মুখ লুকিয়ে চোখ বোজে।' কয়েক ঘণ্টার জন্যে মাত্র, তারপর আবার কাজ।

ওরান শহরে গরম প্রচণ্ড, প্রায় সারা বছরই কম-বেশি গরম চলে, বর্ষার সময় কয়েকটা দিন কিছু কিছু বৃষ্টি হয়। এখানে শীত ঋতুর আগমন বোঝা যায় যখন গরম খানিকটা কমে আসে—অর্থাৎ ঠাণ্ডা পড়ে খুবই কম। বসন্তকালের খবর প্রাকৃতিক কোনো পরিবর্তনে বোঝা যায় না। কিন্তু তবু বসন্ত যে এলো তা সবাই বুঝতে পারে কেন না তখন শহরের বাজারের ফুলওয়ালাদের হাঁকডাক বেড়ে যায় (···it's a spring cried in the market-places)।

এই ওরান শহরে একদিন দেখা গেলো ইঁদুর মরতে আরম্ভ করেছে। প্রথমে একটি দু'টি পথে ঘাটে এখানে সেখানে, তারপর ডজনে ডজনে, শতে শতে, হাজারে হাজারে—চাই কি রোজ মরা ইঁদুর ফেলবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি থেকে আলাদা বন্দোবস্ত করতে হলো—ট্রাকের বন্দোবস্ত করতে হলো। ব্যাপারটা সকলেরই নজরে পড়লো—কেউ অবাক হয়ে গেলো, কেউ দুঃখ বোধ করতে লাগলো অসহায় জীবগুলির জন্যে, কেউ আতঙ্কিত হয়ে উঠলো কারণ কোন্ বইতে নাকি লেখা আছে ইঁদুর মারা যাওয়া একটা মারাত্মক অশুভ ইঙ্গিত। কেউ বললো ভূমিকম্পের আগে ইঁদুর মরতে আরম্ভ করে—ইত্যাদি।

শহরের একজন তরুণ ডাক্তার, নাম তার বার্নার্ড রিয়ো, প্রথম থেকেই ইঁদুর মারা যাবার এই ব্যাপারটাকে মোটেই ভালো মনে করছিল না। ডাঃ রিয়ো যেমন কোনো কুসংস্কারে বিশ্বাসী নয়, তেমনি আসল ব্যাপারটা যা হতে পারে তা'ও অন্যকে বলতে কিছুটা দ্বিধাবোধ করছিল। কারণ, আসল ব্যাপার যা হতে পারে—অর্থাৎ 'প্লেগ' কথাটা মনে হতেও গা শিউরে ওঠে ডাঃ রিয়োর।

হঠাৎ ইঁদুর মরা বন্ধ হয়ে গেলো। তারপর একদিন ডাঃ রিয়োর ডাক পড়লো একটি রোগী দেখবার জন্য। রোগীর প্রচণ্ড জ্বর, গা হাত পায়ে এবং গলায় প্রচণ্ড ব্যথা। ডাঃ রিয়ো পরামর্শ দিলো রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এ্যাম্বুলেন্স এলো। ডাঃ রিয়ো রোগীকে নিয়ে গাড়ীতে উঠলো। সঙ্গে রোগীর স্ত্রী। রোগীটি যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে অকস্মাৎ একেবারেই নিঃসাড় হয়ে গেলো। রোগীর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলো—'কি বুঝছেন ডাক্তারবাবু, কোনো আশাই কি নেই?'

—'ও মারা গেলো।' ডাক্তার রিয়ো সংক্ষেপে জানালো।

এই যে শুরু হলো কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেলো শহরের অন্যান্য অঞ্চলেও মানুষ মরতে আরম্ভ করেছে। ডাঃ রিয়ো তার কয়েক জন ডাক্তার-বন্ধুর সঙ্গে মিলে শহরের পৌরসভাকে চাপ দিতে আরম্ভ করলো শহরে প্লেগ সুরু হয়েছে বলে ঘোষণা করবার জন্য। পৌরসভা প্রথমে কানে তুললো না ডাক্তারদের কথা। প্রত্যহ দশ-বিশ জন মানুষ মরতে শুরু করলো। কিন্তু যে খবরের কাগজ ইঁদুর মরার সময়ে বড়ো বড়ো ,হেড লাইনে

খবর ছাপাতো এবার তারা নীরব। কারণ, কামু বলছেন: 'ইঁদুর মরে রাস্তায় আর মানুষ মরে ঘরের ভেতর, খবরের কাগজের কারবার রাস্তা নিয়ে।'

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শহরে দৈনিক প্লেগের শিকার সংখ্যা যখন তিরিশ-চল্লিশে পৌঁছলো তখন পৌরসভার টনক নড়লো। প্লেগ মহামারী হিসেবে ঘোষিত হলো। শুধু তাই নয়, সরকার ওরান শহরকে আইন জারী করে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো বাইরের জগৎ থেকে। শহরে লোক যেতে পারবে, কিন্তু বেরুতে পারবে না। বাইরে চিঠিও পাঠানো চলবে না, চালু রইলো শুধু টেলিগ্রাম।

হাজার হাজার মানুষের জীবনে অকস্মাৎ দেখা দিলো এক নতুন সমস্যা। কেউ হয় তো কাজকর্মের প্রয়োজনে শহরে এসে পড়েছিল, তাদের কারোই বাইরে যাবার কোনো উপায় রইলো না। কোনোভাবেই না। সমস্ত রকম বিশেষ অনুমতি দেওয়া বন্ধ হয়ে গেলো। পালিয়ে যাবারও কোনো উপায় রইলো না। কারণ, শহরের বাইরে যাবার সমস্ত পথে কড়া পাহারা। আমরা আগেই জেনেছি বাইরে থেকে শহরের ভেতরে মানুষের আসতে বাধা নেই। কিন্তু কামু সুতীক্ষ্ণ শ্লেষের সঙ্গে বলছেন: 'স্বামী বা স্ত্রী দু'জনে দুই জগতে থেকে বিরহে অশ্রুপাত করছেন বটে, কিন্তু বাইরে যিনি আছেন তাঁকে শহরে আসতে খুব ইচ্ছুক মনে হয় না'—অর্থাৎ কি না প্রেমের আকর্ষণের চাইতেও প্লেগের ভয় অনেক বেশি। শুধু একটিমাত্র নারী শহরে ফিরে এলো তার স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। সে নেহাৎ বুড়ী।

এইভাবেই কাটতে লাগলো সপ্তাহের পর সপ্তাহ। দৈনিক মৃত্যুসংখ্যা এখন দেড়শতে পৌঁছে গেছে। প্রতিটি নাগরিকের মুখ-চোখ সর্বক্ষণ থমথমে। হাসতে মানুষ ভুলে গেছে। তবে হ্যাঁ, হাসে, এখনো অনেকেই হাসে, প্রচুর হাসে—এক হাসে যারা মাতাল হয়ে ওঠে আর হাসে যারা পাগল হয়ে গেছে। পাগলের সংখ্যা শহরে প্রতিদিনই বাড়তে লাগলো।

প্লেগকে প্রতিরোধের জন্য যারা দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করে আসছিল প্রথম থেকে—একে একে তারা অনেকেই প্লেগের শিকার হয়ে পড়তে লাগলো। ডাঃ রিয়ো প্রথম থেকেই নিরলসভাবে খেটে চলেছে, কিন্তু এবার সেও অবসন্ন বোধ করতে লাগলো। শহরের চতুর পাদ্রী এই সুযোগে প্লেগের ভয় দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ভক্তি আদায় করবার চেষ্টা

শুরু করলো। কিন্তু খুব সুবিধে হয়ে উঠলো না। মানুষের মনে আজ আর শুধু ভয় নয়, নিদারুণ অবিশ্বাসও দেখা দিয়েছে। গোটা পৃথিবী পড়ে থাকতে এই শহরটাই শুধু প্লেগের কবলে পড়লো কেন? কেন, কেন, কেন? এ শহরের সবার মনেই আজ এই এক প্রশ্ন।

কামুর রচনাশৈলীর এক আশ্চর্য গুণ বাক্ সংযম। এতো অল্প বলে বেশি বোঝাতে পারার দক্ষতা কদাচিৎ দেখা যায়। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আড়াই শ' পাতার এ বইয়ের বক্তব্য পৃথিবীর যে কোন দেশেরই হক না কেন অনেক প্রথম শ্রেণীর লেখকও পাঁচশ' পাতায়ও বলে উঠতে পারতেন না। যেমন ডাঃ রিয়োর স্ত্রীর খবরটা। প্লেগ এখন আর শহরে মহামারী আকারে নেই। ডাঃ রিয়োর স্ত্রী প্লেগ শুরু হবার পূর্ব থেকে অসুস্থ অবস্থায় বাইরের স্যানাটোরিয়ামে ছিল। যোগাযোগের ব্যবস্থা শুধু টেলিগ্রাম। সেখান থেকে টেলিগ্রাম এলেই বৃদ্ধা শাশুড়ী, অর্থাৎ ডাঃ রিয়োর মা উৎসুকভাবে ছেলের মুখের দিকে তাকান। এবারের টেলিগ্রাম আসবার পরও তেমনি হলো। ডাঃ রিয়ো সংক্ষেপে জানালো…'হ্যাঁ, এক সপ্তাহ আগে।'

বাক্ সংযমের সঙ্গে ক্ষুরধার বিদ্রূপ মিশে 'দি প্লেগ' একখানি অনবদ্য সৃষ্টি হয়েছে। বিপন্ন অসহায় মানুষকে বুঝবার এই যে গভীর দৃষ্টির পরিচয় কামু তাঁর রচনার সর্বত্র ছড়িয়ে রেখেছেন তা'ও নিশ্চয়ই একটি অসাধারণ সাহিত্যকর্ম।

উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় আমরা দেখতে পাই, প্লেগমুক্ত ওরানের সাধারণ মানুষের আনন্দ, উল্লাস আর কোলাহল। কিন্তু এসবের মধ্যেও ডাঃ রিয়ো ভাবছে: 'এসব বোধ হয় ঠিক নয়, এ আনন্দ বেশি স্থায়ী হবার নয়; কারণ প্লেগের জীবাণু কখনোই একেবারে মরে যায় না, লুকিয়ে থাকে; তারপর আবার ইঁদুরগুলোকে চাঙ্গা করে তোলে…আবার শুরু হয়ে যায়…'

এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌

'সায়েন্স ফিকশন' বা বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পিত কাহিনী আজকের দিনে যেমন প্রচুর রচিত হচ্ছে, তেমনি পঠিতও হচ্ছে প্রচুর। বহির্বিশ্বের হাতছানিতে আজ আর কেবল বিজ্ঞানীরাই আকৃষ্ট হচ্ছেন না—সাধারণ মানুষেরও আজ ও প্রসঙ্গে কৌতূহল অদম্য। কারণ, চাঁদ, মঙ্গল, বা অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে একদিন যে মানুষ যেতে পারবে এটা আজ আর বিজ্ঞানীর যোগ-বিয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বুদ্ধিগম্য লক্ষণ আজকের দিনে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় প্রায়ই পাওয়া যায়। এটার সম্ভাবনায় আমরা বিশ্বাস করছি আজ, কিন্তু এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌ এ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন আমাদের পঞ্চাশ বছর আগেই।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হবার পূর্বে ওয়েল্‌স্‌ কিছুদিন একটা পত্রিকার সঙ্গে সাংবাদিক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। সাধারণের উপযোগী করে বিজ্ঞানের গল্প লেখার ধারণা ওঁর এই সময়েই প্রথম মনে এসেছিল।

প্রথম জীবন—একজন পেশাদার ক্রিকেট খেলোয়াড়ের ছেলে এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌ (Herbert George Wells, 1866-1946) একেবারে ছেলেবেলা থেকেই বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগ, বিশেষ করে জীববিজ্ঞান সম্পর্কে অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। স্কুলের পড়াশুনোর শেষে অবস্থা বিপাকে কিছুদিন এক জামাকাপড়ের দোকানের কর্মচারীর কাজ করেছিলেন ওয়েল্‌স্‌। একটা স্কুলে সহকারী শিক্ষকের কাজ করেছিলেন প্রায় এক বছর। তারপর আবার কলেজের শিক্ষা লাভ করেন। ওঁর বাবা ছিলেন সংসার সম্পর্কে কিছুটা দায়িত্বজ্ঞানহীন। কাজেই ওঁর মাকে কিছুকাল বাধ্য হয়েই পরিচারিকার কাজ করতে হয়েছিল। জীবনের এ তিক্ত স্মৃতি ওয়েল্‌স্‌ বরাবর মনে রাখতেন এবং যখন যা করতেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই করতেন।

সাহিত্যসাধনার শুরু—ওয়েল্‌স্‌-এর প্রথম প্রকাশিত বইয়ের প্রকাশকাল ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ (সিলেক্ট কনভারসেশনস্‌ উইথ এ্যান আঙ্কেল) এবং শেষ বই প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের সাহিত্যসাধনার সময়ে ওয়েল্‌স্‌ প্রায় পঁয়ষট্টিখানা বই রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে জীববিজ্ঞান,

ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প তথা সামাজিক গল্প ও উপন্যাস থেকে আরম্ভ করে নিতান্ত আজগুবি গল্পও অনেক আছে। সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে ওয়েল্‌সের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে অনেক সমালোচকই নিতান্ত অপ্রিয় কথা বলেছেন, যার অন্তর্নিহিত সত্যতা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই, বিশেষ করে ওঁর 'দি টাইম মেশিন' (১৮৯৫) প্রকাশিত হবার সময় থেকেই ইংরেজী সাহিত্যের পাঠক মহলে যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল, অনেকেই সে ব্যাপারটাকে ইবসেন ও শ-য়ের আবির্ভাবের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। 'দি টাইম মেশিন'-এর পর 'দি ইনভিসিব্‌ল ম্যান' (১৮৯৭); 'দি ওয়ার অব দি ওয়ার্লড্‌স' (১৮৯৮); 'দি ফার্স্ট মেন ইন দি মুন' (১৯০১) প্রভৃতি গ্রন্থ নিঃসন্দেহে সুখপাঠ্য। পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে পারা যায় না এবং শেষ হবার পরও মনে হয় এরকম আরো হাজার হাজার পৃষ্ঠা স্বচ্ছন্দে পড়ে ফেলা যায়।

গল্পের প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ তা বোধহয় তার সংস্কৃতি-জীবনের আর কোন কিছুর সঙ্গেই তুলনা করা যায় না। তাই দেখা যায় পটভূমি বাস্তবধর্মী হোক আর অবাস্তবই হোক, বলবার মতো করে বলতে পারলে সব গল্পই মানুষ শোনে বা পড়ে।

'দি ওয়ার অব দি ওয়ার্লড্‌স'—এর কাহিনীতে দেখা যায় যে পৃথিবীর কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী একসময় লক্ষ্য করলেন যে মঙ্গল গ্রহে অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। ওঁরা আরো দেখলেন যে উল্কার মতো কি একটা যেন মঙ্গল গ্রহের দিক থেকে মহাশূন্য পাড়ি দিয়ে পৃথিবীতে এসে পড়লো। সবাই গেল দেখতে—সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক, সাধারণ মানুষ অনেকেই। সবাই দেখলো পদার্থটির উপরে একটা ঢাকনি আছে। ভেতর থেকে আস্তে আস্তে ঢাকনিটার স্ক্রু খোলা হলো। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এক অদ্ভুত জীব—চোখ আর হাত-সর্বস্ব, মঙ্গল গ্রহের ভয়ঙ্কর অধিবাসী এরা। ঐটির মতো আরো আসতে লাগলো দলে-দলে—মঙ্গলগ্রহবাসীরা পৃথিবী আক্রমণ করেছে।

মঙ্গলগ্রহবাসীদের দেহ বলতে শুধু মস্তিষ্ক আর হাতের মতো দেখতে কতকগুলি অঙ্গ। ওদের কোন খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। জীবন্ত প্রাণীর রক্ত ইনজেকশন করে ওরা শরীর সুস্থ রাখে। কিছুতে এদের শ্রান্তি আসে না, ক্লান্তি আসে না, এরা ঘুমোয় না। অস্ত্র বলতে এরা একটা অত্যন্ত উত্তপ্ত রশ্মি ব্যবহার করে, তার সংস্পর্শে এলে যে কোন জীব বা বস্তু মুহূর্তে পুড়ে

ধ্বংস হয়ে যায়। অল্প সময়ের যুদ্ধেই ওরা লণ্ডন শহরের আশপাশের মানুষদের যুদ্ধে পরাস্ত করলো এবং পৃথিবী জয়ে নেমে পড়লো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা' আর হ'লো না। পৃথিবীর মানুষদের ওরা হারাতে পারলেও পৃথিবীর রোগ-জীবাণুর কাছে নিজেরাই হেরে গেল। মঙ্গলগ্রহে কোন রোগ জীবাণু নেই, কাজেই রোগজীবাণুর হাত থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায়ও ওদের জানা নেই। রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেল ওরা।

বৈজ্ঞানিক তথ্য ও অনুমানের ওপর ভিত্তি করে রচিত এই গ্রন্থগুলির প্রকৃতই সামাজিক মূল্য কিছু আছে কি? পাঠ শেষ করবার পর এ কথা যে পাঠকের মনে হবে, তিনি নিশ্চয়ই সময়টা নষ্ট হলো ভেবে দুঃখিত হবেন। ভেরনে, যার আজগুবি রচনাগুলির সঙ্গে ওয়েল্সের রচনার তুলনা অনেকেই করেছেন, তাঁর কথা বাদ দিলেও, বার্গারেক, ভলটেয়ার কিম্বা ফ্ল্যামারিয়নের সঙ্গে তুলনা করলে শিল্পস্রষ্টা হিসেবে ওয়েল্সের দৈন্য যে কোনো পাঠকের কাছেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। বার্গারেকের 'ভয়েজ টু দি মুন', 'ভয়েজ টু দি সান' ফ্ল্যামারিয়নের 'উরানিয়া' এবং ভলটেয়ারের 'মাইক্রোমেগাস'-এর পাঠকেরা চন্দ্র, সূর্য, মঙ্গল বা শনি সম্বন্ধে হয়ত অনেক কম বৈজ্ঞানিক তথ্য লাভ করেন, কিন্তু তবু যে-সাহিত্যরস তাঁরা পান ওয়েল্সের বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প-উপন্যাসের 'সাহিত্য-বস্তু' তার চাইতে অনেক কম বলে মনে হয়। কিন্তু ওয়েল্সের রচনা অনেক বেশি convincing, এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য হয়। আর তা' ছাড়া, বহির্বিশ্ব সম্পর্কে পাঠকের মনে একটা অদম্য কৌতুহলেও সঞ্চার করে।

সাহিত্যসাধনার পরিণত রূপ—আজগুবি পরিবেশের কথা বাদ দিয়ে আমাদের পরিচিত সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ওয়েল্স্ যে গ্রন্থগুলি রচনা করেছেন, যেমন 'লাভ এণ্ড মিষ্টার লিউইশ্যাম' (১৯০০); 'দি প্যাশনেট ফ্রেণ্ডস' (১৯০০); 'এ্যান্টিসিপেশনস্' (১৯০১); 'দি ফিউচার অব আমেরিকা' (১৯০৬); 'নিউ ওয়ার্লডস্ ফর ওল্ড' (১৯০৮); 'মডার্ণ অটোপিয়া' (১৯০৫); কিম্বা 'কিপস্' (১৯০৫); 'ওয়াইফ অব স্যার আইজাক হারম্যান' (১৯১৪); 'ফার্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট থিংস' (১৯০৮); 'টনো-বাঙ্গে' (১৯০৯); 'আন ভেরোনিকা' প্রভৃতিও নিছক কাহিনীই নয়। ওয়েল্সের প্রবন্ধগুলিও যেমন এই কাহিনীগুলিও ঠিক তেমনি, বিশেষ এক ধরণের সমাজতন্ত্রবাদ এবং সমাজ-সংস্কার-মূলক

ভাবধারণায় পরিপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ দু'খানা উপন্যাস 'লাভ এণ্ড মিঃ লিউইশ্যাম' এবং 'টনো-বাঙ্গে' সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে।

লাভ এণ্ড মিঃ লিউইশ্যাম—মিঃ লিউইশ্যাম একজন তরুণ আদর্শবাদী স্কুল মাষ্টার। উনি এমন একটা পরিকল্পনা করলেন যার ফলে বিজ্ঞান এবং রাজনীতিতে তাঁর শ্রেষ্ঠ আসন লাভ হবে। ব্যক্তিগত জীবনের যাবতীয় সুখ-সুবিধা এবং দয়া, মায়া, প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদি প্রকৃতির অনুশাসন সব কিছু অস্বীকার করতেন মিঃ লিউইশ্যাম। কিন্তু ঘটনাচক্রে একটি মেয়ের নামের সঙ্গে ওঁর নাম জড়িয়ে পড়লো। ঐ স্কুলের কাছাকাছি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের জন্য আসতো মিস্ এথেল হেণ্ডারসন। এই এথেলের সঙ্গে পরিচিত হ'লো তরুণ স্কুল মাষ্টার এবং তারই ফলে দুর্নাম।

এদিকে শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ লিউইশ্যাম উচ্চশিক্ষার জন্য পড়াশুনো করছিলেন। সেখানে মিস্ হেডিঙ্গার নামে এক সহপাঠিনীর সঙ্গেও তাঁর কিছুটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। মিস হেডিঙ্গার এথেলের মতো সাধারণ মেয়ে নয়। মিঃ লিউইশ্যামের মতো ওরও উচ্চাশা অনেক। জীবনে নানাদিকে নামযশ প্রভাব প্রতিপত্তি গ'ড়ে তুলতে হবে—এই ওদের দু'জনের বাসনা। কিন্তু তা হবার নয়। ঘটনাচক্রে এথেলের সঙ্গে আবার দেখা হ'লো মিঃ লিউইশ্যামের। এবং এবার ওঁদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়েটা গোপনেই হ'লো। শুরু হ'লো জীবন-সংগ্রাম। পরীক্ষায় ফেল করলো মিঃ লিউইশ্যাম। এমন কি বিবাহিত জীবনও ওঁদের ব্যর্থ হয়ে যাবার উপক্রম হ'লো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এথেলের মাতৃত্বের সম্ভাবনায় লিউইশ্যাম বাধ্য হ'লো বাস্তব জীবনকে বাস্তব উপায়ে উপভোগ করবার জন্য নিজের মনকে তৈরী করবার জন্য। ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে দিলো উচ্চাশা সার্থক করবার পরিকল্পনা। স্কুল-মাষ্টারের জীবনের সঙ্গেই নিজের জীবনকে খাপ খাইয়ে নেবার কথা ভাবতে লাগলো মিঃ লিউইশ্যাম।

'টনো-বাঙ্গে'—এ উপন্যাসে দেখা যায় এডোয়ার্ড একজন কেমিস্ট। ওর এক ভাইপো জর্জ এলো ওর কাছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে। কিছুকাল পরে ম্যারিয়ন নামে একটি মেয়ের সঙ্গে ওর পরিচয় হ'লো। ম্যারিয়নকে পেতে হ'লে অনেক টাকা চাই। টাকার লোভে জর্জ ওর কাকার সঙ্গে তার পেটেণ্ট ওষুধের ব্যবসায়ে যোগ দিলো। প্রচুর ধনলাভ হ'লো ওদের দু'জনেরই। কিন্তু জর্জ ক্রমশঃ বুঝতে পারলো যে ঐ পেটেণ্ট ওষুধে যে সব রোগ সারায় ব'লে

প্রচার করা হয় আসলে তা ঘটে না। তাই কাকার কাছ থেকে তার ভাগের টাকা কড়ি নিয়ে সরে এলো জর্জ। এবার সে তার প্রকৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণা নতুনভাবে সুরু করলো এবং সাফল্য লাভ করলো। ওদিকে এডোয়ার্ড কপর্দকহীন অবস্থায় একটা হোটেলে মারা গেল।

ওয়েল্‌স্ সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল সাহিত্য সাধনা করেও জীবনানুগ এবং স্বাভাবিক চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন নি। নিজের বিচার তিনি নিজে যেভাবে করেছেন তাতে পাঠক মাত্রেরই বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। বিজ্ঞানভিত্তিকই হোক আর সামাজিক পরিবেশেই হোক দীর্ঘ কাহিনীগুলি বাদ দিয়ে ছোট গল্পগুলি পড়লে পাঠক উপকৃত হবেন। এবং তাঁর অনেক কাহিনী-গ্রন্থ বাদ দিলেও 'আত্মজীবনী' অধ্যয়নে পাঠক মাত্রেই উপকৃত হবেন। আইডিয়া-কেন্দ্রিক চরিত্র-চিত্রণ সম্পর্কে পুরোধাস্রষ্টা ইবসেনের যে বাস্তববোধ ছিল তার সঙ্গে ওয়েল্‌সের কোনো তুলনা হয় না, চলতে পারে না। ইবসেনের সমাজ-সমস্যামূলক নাটকগুলির প্রত্যেকটি চরিত্রই কোন না কোন একটা সামাজিক ভাবের বাহক তা ঠিক, কিন্তু তবু তারা মানুষ, ইবসেন তাদের মানুষ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন; এইখানেই ইবসেনের শ্রেষ্ঠত্ব; সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে তো বটেই, সমাজ-সংস্কারক হিসেবেও বটে। ওয়েল্‌সের চরিত্রগুলি কেবলমাত্র ভাবধারার বাহক, সমাজতত্ত্বমূলক ভাবধারাগুলি হয়ত তারা প্রকাশ করতে পেরেছে কিন্তু মানুষের চরিত্র হিসেবে পাঠকের মনে ছাপ রাখতে সক্ষম হয় না। ওয়েল্‌সের এক প্রখ্যাত সমালোচক 'মেনকেন' তো দ্ব্যর্থহীন ভাষায়ই বলেছেন যে, ওয়েলস্ যা লেখেন তা নানা ভাবধারায় সমৃদ্ধ বলে সুখপাঠ্য বটে কিন্তু সাহিত্যপাঠের যে আনন্দ তা কদাচিৎ পাওয়া যায়। বুদ্ধি-সর্বস্ব শ-য়ের সম্বন্ধে যা অনেকে বলেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জীবন সম্পর্কে তাঁর একটি নির্দিষ্ট ধারণা ছিল এবং তাঁর চরিত্রগুলির ভাবাবেগকে তিনি সর্বৈব মগজের বশীভূত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ওয়েল্‌সের চরিত্রগুলির ভাবজগৎ তাদের মগজের সঙ্গে সর্বদাই দ্বন্দ্ব-প্রবণ।

পরিচারিকার পুত্র ওয়েল্‌স্ সমাজতত্ত্ব বিষয়ে ঘোরতর মার্কসবাদী হ'লে নিশ্চয়ই খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হতো। কিন্তু মার্কসবাদী তিনি ছিলেন না, অথচ যা হোক একটা সমাজতন্ত্রের দিকে তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিলো। তাঁর আইডিয়া-কাহিনীগুলি এই বিশেষ সমাজতন্ত্রবাদের বক্তব্য বহন করে। এদিক

থেকে অবশ্যই তিনি একজন আদর্শ ফেবিয়ান ছিলেন। সমাজের যে নিম্নস্তরে তাঁর জীবন শুরু হয়েছিলো তার কথা ওয়েল্‌স্‌ জীবনে কখনো ভুলতে পারেন নি। ঘুরে ফিরে বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে তাঁর নিজের জীবনের (অর্থাৎ অতীত জীবনের) কথা ছড়ানো থাকতো। কিন্তু এই জীবনের জন্য, ঐ বাস্তব পরিবেশের জন্য, তাঁর কোনো সমবেদনা ছিলো না। সে জীবনের সামাজিক কাঠামোকে উপলব্ধি করবার কোনো আন্তরিক প্রয়াস তাঁর কোনো লেখাতেই পাওয়া যায় না। পরিণত বয়সে উচ্চতর সামাজিক পর্যায়ে উঠতে পারলে ফেলে আসা জীবনকে যাঁরা অবজ্ঞার চোখে না দেখুন, অন্তত ভুলে থাকবার জন্যে সর্বদা চেষ্টিত থাকেন, ওয়েল্‌স্‌ ছিলেন তাঁদেরই একজন।

অনেক পাণ্ডিত্য নিয়ে সৃষ্টিমূলক সাহিত্য রচনায় বিংশ শতাব্দীতে যাঁরা প্রয়াসী হয়েছিলেন ওয়েলস্‌ তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রদের অন্যতম। বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন রুচির যে বিপুল সৃষ্টি ওয়েল্‌স্‌ তাঁর সারাজীবনে করে গেছেন সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে তার পাঠক সংখ্যায় প্রচুর এবং বিশ্বব্যাপী। কিন্তু তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, নানা বিজ্ঞান তথা দর্শন, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য প্রকৃতই কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়নি একথাও অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে ওয়েল্‌সের নিজেরই কথা। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা গেছেন ধরে নিয়েই একটি শোক সংবাদ রচনা করেছিলেন; তাতে অনেক কথার সঙ্গে যে বিষয়ের ওপর তিনি জোর দিয়েছিলেন সে হলো এই যে সাহিত্য আসলে একটি মাধ্যম মাত্র—আসলে তিনি একজন বৈজ্ঞানিক। বোধ হয় এই ব্যাপারের পরেই মেনকেন বলেছিলেন, জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধনা করলে তিনি অধিকতর স্থায়ী কিছু কীর্তি রেখে যেতে পারতেন।

আবার অনেকে মনে করতেন যে সমাজদর্শন বিষয়ে যেহেতু ওয়েল্‌স্‌-এর পাণ্ডিত্য ছিলো প্রগাঢ় এবং নিজস্ব চিন্তাও ছিল প্রচুর, সেই জন্য এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্যগুলি উপন্যাসের মাধ্যমে না বলে সরাসরি প্রবন্ধের মাধ্যমে বললেই বেশি ভালো হতো। A. C. Ward ওয়েল্‌স্‌-এর জীবদ্দশাতেই লিখেছিলেন যে ঔপন্যাসিক হিসেবে ওয়েল্‌স্‌ took the wrong turning......he exchanged the novelist's business for that of a Utopian drill-sergeant—(*The Nineteen Twenties*).

ওয়েল্‌সের গল্প-উপন্যাসের চরিত্রগুলির মানসিক গঠন নিতান্তই দুর্বল। কারণ, তাদের মুখ দিয়ে নিজের কথা বলিয়ে নিতে, পূর্ব স্থিরীকৃত 'আইডিয়া' প্রচার করতে ওয়েল্‌স্ এতই ব্যস্ত থাকতেন যে তারা কেউই স্বাভাবিক মানুষের মতো আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। বলাই বাহুল্য, স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে তাদের সৃষ্টি করা বোধহয় ওয়েল্‌সের অসাধ্যই ছিল। ওয়ার্ডের ভাষায়: "Military drill-sergeants, of course, are not allowed to know anything about the minds of their squades."

সর্বশেষে একটি কথা অবশ্যই বলা প্রয়োজন। তা হলো এই যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর সৃজনীপ্রতিভা না হলেও—ঐতিহাসিক ওয়েল্‌স্ দীর্ঘকাল মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করবেন তাঁর 'আউটলাইন অব হিষ্ট্রি'র মাধ্যমে। ইতিহাসের কোনো বিভাগেই হয়ত তাঁর কোনো মৌলিক গবেষণা নেই এবং অনেক দেশ, সমাজ, সভ্যতা তথা ধর্মের ও সংস্কৃতির উত্থান-পতন সম্পর্কেও হয়ত ওয়েল্‌সের সঙ্গে সব পাঠক একমত হ'তে পারবেন না, কিন্তু তবু সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসের মোটামুটি প্রধান ধারাগুলিকে একখানা মাত্র গ্রন্থের মাধ্যমে পরিবেশনের জন্য পাঠকমাত্রেই ওয়েল্‌সের নিকট কৃতজ্ঞবোধ করবেন।

'আউটলাইন অব হিষ্ট্রি' কেবল তথ্যমূলক ইতিহাসের বই-ই নয়। ইতিহাসের নানা জ্ঞাত তথ্যের তুলনামূলক আলোচনান্তে ওয়েল্‌স্ এ গ্রন্থে যে তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তা প্রায় "ইতিহাসের দর্শন" পর্যায়ে পড়ে।

জীবনের সায়াহ্নে রচিত 'আত্মজীবনী' এবং 'ওয়ার্ক, ওয়েল্‌স্ এণ্ড হ্যাপিনেস অব ম্যানকাইণ্ড' এ শতাব্দীতে রচিত দু'খানা অবশ্য পাঠ্য বই।

জন গলস্‌ওয়ার্দী

প্রথম জীবন—একজন বিশিষ্ট এবং সম্পদশালী আইনজীবীর পুত্র জন গলস্‌ওয়ার্দীর (1867-1933) জন্ম হয়েছিল সারের কিঙ্‌সটন হিল-এ। শৈশব এবং বাল্যের অপরিমিত স্নেহযত্নের পরে কিশোর বয়স থেকে তাঁর লেখাপড়ার জন্য যে আয়োজন করা হয়েছিল, তা কদাচিৎ কোন বড়ো লেখকের প্রথম জীবনে ঘটতে দেখা গেছে। হ্যারো এবং তারপর অক্সফোর্ডে পড়াশুনো যথাসময়ে কৃতিত্বের সঙ্গেই শেষ করেছিলেন গল্‌সওয়ার্দী। পরিবারের বড়োদের ইচ্ছে ছিলো, আইনজীবীর পুত্র আইনজীবীই হবেন। মাত্র তেইশ বছর বয়সে তাঁকে ব্যারিষ্টারের পোশাক পড়তেও দেখা গিয়েছিল বটে, কিন্তু ব্যারিষ্টারীতে তাঁর মন বসলো না। আইন বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান সম্বন্ধে যদিও কারো কখনো সন্দেহ দেখা দেয় নি, কিন্তু তবু আইন ব্যবসায়ে গলস্‌ওয়ার্দী কিছুমাত্র সফলতা লাভ করলেন না। তাই বেশির ভাগ সময়েই দেখা যেতো উনি দেশ-বিদেশের সেরা সাহিত্য, তথা সামাজিক ইতিহাস বিষয়ের বইপত্র পড়াশুনোয় ব্যস্ত।

উপন্যাস কাকে বলে—অর্থাৎ উপন্যাসের সংজ্ঞা বা লক্ষণ কি? এ প্রশ্নটি গত পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে আলোচনা চলবার পর আজও অমীমাংসিত হয়ে আছে। আর তার ওপর আবার নিত্য নতুন ভাবধারণাও সংযোজিত হচ্ছে। কাজেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক কে—এ প্রশ্নটার উত্তরের আগে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের প্রকৃত লক্ষণ কি তার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হওয়া দরকার। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সমাজের বিভিন্ন আর্থিক কাঠামোর আওতায় সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ সৃষ্টি হয়েছে, প্রাধান্য পেয়েছে। উপন্যাস বিশেষ করে ধনতন্ত্রবাদের যুগের সৃষ্টি। ধনতন্ত্রবাদের বিভিন্ন পর্যায়ে উপন্যাসেরও প্রকৃতির পরিবর্তন হবে, এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা দেবে, এইটেই স্বাভাবিক।

উপন্যাস সম্বন্ধে আজকের দিনে যেটুকু ধারণা হয়েছে তার মানদণ্ডে বিচার করলেও এককভাবে কেউ শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের গৌরব দাবী করতে পারেন কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, যেমন জীবনটা বিরাট, তেমনি আছে এ জীবনের নানা দিক, নানা সমস্যা, ভালোমন্দ,

সুন্দর-কুৎসিতের ছড়াছড়ি, আরো কত কি। এই বিরাটত্ব অনুভব করলেই চলবে না শুধু লিরিক কবিতা রচয়িতার মতো, আবার বিদগ্ধজনের মতো শুধু মগজ দিয়ে বা অঙ্ক কষে এটা বুঝতে পারলেও কাজ শেষ হয়ে গেল না। একদিকে যেমন সমগ্রভাবে বোঝা চাই এই বিরাট সমস্যা তেমনি আবার বুঝতে হবে এর বিশেষ বিশেষ দিকগুলি এবং তারপর যদি শক্তি থাকে, দম থাকে তা হলেই কেবল উপন্যাস রচনায় হাত দেওয়া যায়। সাফল্যের কথা তারপর, তার বিচারক পাঠক সমাজ এবং ভবিষ্যৎ ইতিহাস।

কাজেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক কে? এ প্রশ্নে পাঠক সমাজ নিশ্চয়ই একমত হতে পারে না আজকের দিনেও। একদিকে যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সামাজিক কাঠামোর বৈষম্য রয়েছে, অপরদিকে তেমনি আবার সর্বত্র সমাজব্যবস্থা দ্রুত পরিবর্তনশীল। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে ফ্রান্সের স্তাঁদাল, বালজ্যাক, হুগো, প্রুস্ত, জোলা; জার্মানীর মান; রুশিয়ার টুর্গেনিভ, ডষ্টয়েভস্কি ও টলস্টয়; ইংলণ্ডের ডিকেন্স ও গল্সওয়ার্দী আর সেই সঙ্গে বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র এবং গোরার রচয়িতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস রচনা করতে পেরেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই উপন্যাসের ক্ষেত্রে যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হোক না কেন, এমন কিছু দিয়ে গেছেন যাতে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক হিসেবে এঁদের কারো দাবীই অপর কারো চাইতে কম নয়।

বর্তমানে সাহিত্যের আসরে চালু এবং জনপ্রিয় যে কোন সংজ্ঞা অনুসারে বিচার করলে গল্সওয়ার্দীকে নিঃসন্দেহে একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক বলে অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, সেই ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই।

সাহিত্যসাধনার শুরু—জন গল্সওয়ার্দী একটু বেশি বয়সেই সাহিত্য সাধনা শুরু করে ছিলেন বলতে হবে। কারণ, ওঁর প্রথম উপন্যাস 'ফ্রম দি ফোর উইণ্ডস' যখন বেরোয় তখন ওঁর বয়স ঠিক তেত্রিশ। এ বইখানা উনি ছদ্মনামে প্রকাশ করেছিলেন। এর পর আরো তিনখানা উপন্যাস লিখলেন গল্সওয়ার্দী—'জোকেলিন', 'ভিলা রুবেয়িন' এবং 'এ ম্যান অব ডীভন'। গল্সওয়ার্দীর পঞ্চম উপন্যাসের নাম

হ'লো 'দি আইল্যাণ্ড ফারিসীপ' (১৯০৪) ; এখানা স্বনামেই বের হ'লো। বলাবাহুল্য এ পাঁচখানা উপন্যাসের কোনখানাই যথেষ্ট পাঠক আকৃষ্ট করতে পারলো না। গলস্‌ওয়ার্দীর না হ'লো কোন খ্যাতি লেখক হিসেবে, না পেলেন তিনি নিজে কোন তৃপ্তি।

কিন্তু অধ্যবসায়ের পুরস্কার সব সময়েই আসে, সাহিত্যক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় না। গলস্‌ওয়ার্দীও পেলেন সে পুরস্কার। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন ঠিক চল্লিশ বছর বয়স তখন ওঁর ষষ্ঠ উপন্যাস 'দি ম্যান অব প্রপার্টি' প্রকাশিত হলো। এ উপন্যাস প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঔপন্যাসিক হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন গলস্‌ওয়ার্দী। এ বইয়ের নাম তখন ইংরেজি সাহিত্য-পাঠকের মুখে মুখে ফিরতো। শুধু ঔপন্যাসিক হিসেবেই নয়, নাট্যকার হিসেবেও এই বছরই প্রতিষ্ঠা হ'লো গলস্‌ওয়ার্দীর। কারণ ওঁর 'দি সিলভার বক্‌স' নাটকখানিও এই বছরই প্রকাশিত হয়েছিল। নাট্যকার গলস্‌ওয়ার্দীর কথা আমরা পরে আলোচনা করবো।

'ফরসাইট সাগা'র লেখক হিসেবে গলস্‌ওয়ার্দীর যে বিশ্ব জোড়া নাম ও প্রতিষ্ঠা তার প্রেরণা উনি পেয়েছিলেন ফরাসী লেখকদের কাছ থেকে, বিশেষ করে বালজ্যাক ও জোলা।

টলস্টয়ের 'আনা কারেনিনা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে ম্যাথু আর্ণল্ড বলেছিলেন যে, উপন্যাস সৃষ্টির দক্ষতা ফ্রান্স থেকে মধ্য ইউরোপ পাড়ি দিয়ে রুশিয়ায় চলে গেছে। টলস্টয় এবং গলস্‌ওয়ার্দীর বক্তব্য, জীবন সম্পর্কে ধারণা, রুচি ও নীতিবোধ, শালীনতা, সামাজিক-বিবর্তন সম্পর্কে অভিমত এবং লিপি কুশলতার মধ্যে তফাত অনেক। কিন্তু তবু, 'ফরসাইট সাগা'র পাঠকের মনে হবে যে টলস্টয়ের পর উপন্যাস লেখবার দক্ষতা পুব থেকে পশ্চিমে, মধ্য ইউরোপ পাড়ি দিয়ে ইংলণ্ডে নতুন প্রতিভাধরকে আশ্রয় করে।

সাহিত্যসাধনার পরিণত রূপ—যে কোন প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস পড়বার পর যে জিনিসটা সব চাইতে বেশী মনে দাগ কাটে সে হ'লো কাহিনীর প্রসার ও ব্যাপ্তি।

'ফরসাইট সাগা'র খণ্ডগুলিতে একটি পরিবারের প্রায় অর্ধশতাব্দীর কাহিনী বলা হয়েছে। এটা হ'লো ইংলণ্ডের উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনী। 'ফরসাইট সাগা'র বইগুলির কাহিনী অংশের পরিচয় দু'চার কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। মালিকানার জন্য মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির

তাড়না ব্যক্তিবিশেষকে যে কী পরিমাণ প্রভাবিত করতে পারে, গলস্‌ওয়ার্দী বিশেষ করে তাই দেখাবার চেষ্টা করেছেন এ সিরিজের প্রথম বই 'দি ম্যান অব্‌ প্রপার্টি'তে। অনেকের মতে এই বইখানাই সিরিজের সবচাইতে উপভোগ্য রচনা। 'ফরসাইট সাগা'র সিরিজের দ্বিতীয় উপন্যাস 'ইন চ্যান্সারী' বেরুলো প্রায় চৌদ্দ বছর পরে, তৃতীয় উপন্যাস 'টু লেট' অবশ্য তার পরের বছরই বেরুলো। আসলে এ তিনখানা উপন্যাস প্রথমে পৃথক ভাবেই বেরিয়েছিল। কিন্তু প্রথম খানার সঙ্গে দ্বিতীয় খানার এবং দ্বিতীয় খানার সঙ্গে তৃতীয় খানার কাহিনীর যোগসূত্র ছিল বলেই পরে গলস্‌ওয়ার্দী তিনখানা একত্রে 'ফরসাইট সাগা' নাম দিলেন। ফরসাইট উপাধিধারী একটা গোটা পরিবারের দুই পুরুষের কাহিনী বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে এ উপন্যাসে। এ বই সম্পর্কে ভূমিকায় যদিও গলস্‌ওয়ার্দী বলেছেন যে 'ফরসাইট সাগা' কোন যুগেরই সামাজিক বিবর্তন দেখানোর জন্য লেখা হয় নি, কিন্তু তাঁর অজানিতেই কার্যতঃ তা'ই হয়ে গেছে। ভিক্টোরীয় যুগের ইংলণ্ডের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা সকলেই বলেন যে এ উপন্যাসখানা (অর্থাৎ একত্রে তিনখানা) কার্যতঃ ইংলণ্ডের উচ্চ-মধ্যবিত্তশ্রেণীর সামাজিক বিবর্তনই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এ বইয়ের কয়েকটি চরিত্র সৃষ্টিতে লেখক অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন—যথা আইরিন, এ্যান, জুলিয়ন, হেসথার, সোমস, জন, মাইকেল মণ্ট, প্রসপার, প্রোফাণ্ড ইত্যাদি। গলস্‌ওয়ার্দী মোট প্রায় কুড়িখানা উপন্যাস রচনা করে যান। তা'ছাড়া তিনখানা কবিতার বই, ষোলখানা গল্প ও প্রবন্ধের বই এবং একুশ খানা নাটক। টেকনিকের দিক দিয়ে ঔপন্যাসিক হিসেবে গলস্‌ওয়ার্দী ইংলণ্ডের গতানুগতিক ধারাই মেনে চলেছেন।

নাটক—মোট একুশখানা নাটকের মধ্যে অন্ততঃ চারখানা—'দি সিলভার বক্স', 'ষ্ট্রাইফ,' 'জাষ্টিস' এবং 'লয়ালটিস' নাট্য সাহিত্যে স্থায়ী সংযোজন।

'দি সিলভার বক্স' নাটকে গলস্‌ওয়ার্দী দেখাতে চেষ্টা করেছেন ধনী লোকেরা কিভাবে আইনের চোখে ধুলো দিয়ে থাকে। দু'জন লোক—একজন ধনী, পার্লামেণ্টের একজন সদস্যের ছেলে—এর নাম জ্যাক্। অপর জন জোনস্ দরিদ্র—দু'জনই অধঃপতিত। দু'জনেই আইনের চোখে সমভাবে অন্যায়কারী—মদো-মাতাল জোচ্চোর। একদিন সন্ধ্যার সময়

দু'জনেই চুরির দায়ে ধরা পড়েছে। জ্যাক চুরি করেছে এক ভদ্রমহিলার মণিব্যাগ আর জোনস্‌ চুরি করেছে একটা রূপোর সিগারেট কেস। কিন্তু নাটকের পরিণতিতে দেখা যায়, যে ধনী সে কেমন অনায়াসে আইন ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু যে দরিদ্র আইন কেমন সমস্ত শক্তি নিয়ে তার উপর চড়াও হয়। আইনের নানা ফাঁস কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যে ফিরে আসা গরীব মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

সমাজের ওপর তলার মানুষ ব্যারিষ্টার গল্‌সওয়ার্দী 'জাষ্টিসে' সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতির সঙ্গে নিজের আইন-জ্ঞানের সুব্যবহার করেছেন। আইন একটা এমন ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমান সমাজে যে, এর খপ্পড়ে একবার এক সলিসিটারের একজন গরীব কেরাণী কয়েক সেকেণ্ডের উত্তেজনায় একটা চেকের অঙ্কপাতে ঘসামাজা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত জেল খাটলো, সমাজে সকল রকম প্রতিষ্ঠা হারালো, এমন কি প্রাণটিও হারালো। সামাজিক সুবিচারের দিক দিয়ে 'জাষ্টিস'ই গলসওয়ার্দীর শ্রেষ্ঠ নাটক।

কিন্তু শিল্পচাতুর্যের দিক দিয়ে 'ষ্ট্রাইফ'ই শ্রেষ্ঠ। যদিও বক্তব্যের কথা বিচার করলে হয়ত অনেকেই গলস্‌ওয়ার্দীর সঙ্গে একমত হতে পারবেন না। একটা টিনের কারখানার শ্রমিক-মালিক বিরোধের ওপর ভিত্তি করে এ নাটক রচিত। ইংলণ্ডে প্রত্যক্ষ রাজনীতি ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের যা অবস্থা অর্থাৎ প্রতিপদে আপোস করে চলা—এ নাটকেও গলস্‌ওয়ার্দী তাই ঘটিয়েছেন।

ওয়েল্‌স্‌ যেমন সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্ত দিকেই অশ্রান্তভাবে experiment করতে প্রয়াসী হতেন, গল্‌সওয়ার্দী ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। ইংরেজ সমাজ-জীবনে যা কিছু Traditional, উনি সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকেই লালন করবার চেষ্টা করতেন। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাতে, অর্থাৎ সমাজের আর্থিক কাঠামোতে আন্তরিক বিশ্বাসী ছিলেন। পরিবর্তনশীল পৃথিবী সম্বন্ধে ওঁর জ্ঞান সমসাময়িককালে কারো চাইতে কম না থাকা সত্ত্বেও গলস্‌ওয়ার্দী চাইতেন ইংরেজের সমাজে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন যাতে না ঘটে। কালক্রমে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি-গুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, বাড়ীর সামনের বাহারে ঝোপের মতো তার ডগাগুলি ছেঁটে দিয়ে চালু সমাজের সঙ্গেই মানুষ যেন খাপ খাইয়ে নেয়।

ইংরেজ জাতির সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের একটু গভীরে প্রবেশ করলেই দেখা যাবে যে গলস্‌ওয়ার্দীর এই ধারণাগুলি ইংরেজ জাতিরই অন্তরের কথা। এ জন্যে যুক্তিরও তাদের কখনো অভাব হয় নি। এই জন্যই একদিকে যেমন ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে তারা দু'শ বছর আগের অবস্থাকে যেনতেন প্রকারেণ আঁকড়ে রাখবার চেষ্টা করে, রাজতন্ত্রের জন্য বিংশ শতাব্দীর এই বর্তমান সময়েও তারা প্রচুর যুক্তি উপস্থাপিত করতে সঙ্কোচবোধ করে না, আবার স্বদেশে নানা বিরোধী মতের প্রচার সহ্য করতেও তাদের বাধে না। কারণ, তাদের নিজেদের সুদৃঢ় এবং সুনির্দিষ্ট জীবনাদর্শের অন্যতম অঙ্গ হলো পরমত সহ্য করা। কিছুটা উদারনৈতিক অবস্থা বজায় রাখা। এটা তারা বাস্তবিকই করে থাকে।

সমগ্রভাবে 'ফরসাইট সাগা' ইংলণ্ডের পরিবর্তনশীল উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি সুন্দর চিত্র। Traditionকে ধরে রাখা লেখকের মূল উদ্দেশ্য হলেও ফরসাইট পরিবারের অন্যতম উত্তম পুরুষ 'জুলিয়ান' শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী হয়েছিল—অর্থ সম্পদের নেশা কাটিয়ে একজন শিল্পী হিসেবে স্বাধীন জীবন শুরু করেছিল। Traditionএর মধ্যেও এই অনিবার্য ব্যতিক্রমটুকু গলস্‌ওয়ার্দী ঘটাতে পেরেছিলেন বলেই তিনি একজন সৌন্দর্য স্রষ্টা, একজন শিল্পী হিসেবে সমাদৃত।

কিন্তু গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে গলস্‌ওয়ার্দীর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী নিঃসন্দেহে ওয়েল্‌সের চাইতে অপরিণত। ওয়েল্‌স্ বৈপ্লবিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন—আর গলস্‌ওয়ার্দী মনে করতেন যে বর্তমান সভ্যতায় একটা নৈতিক বিবর্তন ঘটবে, মানুষের অন্তরে সৌন্দর্যানুভূতির একটা নতুন শক্তির বিকাশ ঘটবে এবং তার ফলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।

সমারসেট মম্

লণ্ডন, প্যারিস এবং নিউইয়র্ক—এই তিনটি প্রাণ-চঞ্চল এবং নানাদিক থেকে ঐতিহ্যময় শহরে একখানা করে নিজস্ব বাড়ী থাকাটা নিশ্চয়ই ভাগ্যের কথা। রাজা-মহারাজা, বড় ব্যবসায়ী বা মোটা মাইনের চাকুরে কেউ যদি ঐ সমস্ত শহরে বাড়ী তৈরী করতে পারেন, তাহলে আমরা অবাক হবো না। স্বাভাবিকভাবে এটা বোধ হয় শুধু তাঁদের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু যদি শোনা যায় যে, রাজা-মহারাজা নয়, ব্যবসায়ী নয় বা লাট-বেলাটও নয়, একজন লেখক লিখে যা রোজগার করেছেন, সেই টাকাতেই ঐ সমস্ত শহরে বাড়ী করেছেন একখানা করে, তাহলে অবাক হতে হয় বৈকি। আর যদি জানা যে, ঐ লেখককেই কোনো এক সময়ে দিনের পর দিন, চাই কি, বছরের পর বছর—একটানা প্রায় দশটা বছর এক-বেলা কি আধ-বেলা খেয়ে কাটাতে হয়েছে, তাহলে তো রীতিমতো বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু এই বিস্ময়ের ব্যাপারটাই বাস্তবে সম্ভব করেছিলেন স্বনামধন্য ইংরেজ সাহিত্যিক সমারসেট মম্।

প্রথম জীবন—সমারসেট মম্ (William Somerset Maugham, 1874—1965) জন্মেছিলেন প্যারিসে।

বেশির ভাগ মানুষের বেলাতেই দেখা যায়—জীবনটা যে কি, কেমনভাবে অতিবাহিত করতে হবে এ জীবন, তা নিয়ে চিন্তার কোনো বালাই থাকে না। কোনো নিশ্চিত উদ্দেশ্য বা কোনো পরিকল্পনা থাকে না। মানুষমাত্রেই কম বেশি সুখসন্ধানী। সকলেরই সতৃষ্ণ নজর থাকে একটা সুখকর অবস্থার জন্যে। এবং ব্যক্তিবিশেষের রুচি মাফিক ঐ সুখ পদার্থটা যতক্ষণ সহজেই পাওয়া যায়, ততক্ষণ 'বাঁচার' কাজটা এতো অনায়াসে চলতে থাকে যে, সে যে বেঁচে আছে, এই কথাটাই আদপে খেয়াল থাকে না। কিন্তু এক এক সময় টনক নড়ে। এ যেন অনেকটা পথচারীর হোঁচট খাওয়ার মতো। অকস্মাৎ মনে হয়,—তাই তো, পথ চলছি, অর্থাৎ বেঁচে রয়েছি। এই উপলব্ধিটা হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন সম্বন্ধে যে প্রত্যয় জাগে, সচরাচর তা' দীর্ঘস্থায়ী হয়। এমন কি অনেকের বেলায় এই বোধটা একবার দেখা দিলে আর কখনো তা মন থেকে মুছে যায় না। ফলে, এঁদের জীবনে একটা লক্ষণীয় ব্যতিক্রম দেখা যায় অন্য সাধারণ মানুষের চাইতে। অন্যেরা

যেথানে স্রোতে ভেসে চলে, এঁরা সেখানেই দেখা যায় সর্বদা. একটা উদ্দেশ্যের পেছনে ধাবিত হ'চ্ছেন। এঁরা জীবনটা অতিবাহিত করেন একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে। সাফল্য কারো জীবনে আসে, কারো জীবনে আসে না। সাফল্যটা আসলে খুব বড়ো কথা নয়, কারণ তার ওপরে মানুষের নিয়ন্ত্রণ থাটে না। আসল কথা হচ্ছে চেষ্টা, উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে একাগ্রভাবে কে কতদূর চেষ্টা করতে পারলেন, সেইটেই হ'চ্ছে আসল কথা।

সমারসেট মমের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একেবারে বালক বয়সেই মনে ওঁর অনেক জিজ্ঞাসা দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছিল এবং নিজেকে প্রকাশ করবার জন্যে ভেতরে ভেতরে একটা তাড়না অনুভব করেছিলেন। এ জিনিসটার সূচনা হয় মাত্র আট বৎসর বয়সে মায়ের মৃত্যুর দিন থেকে এবং উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সে দেখা যায় জীবনের লক্ষ্য ওঁর স্থির হয়ে গেছে এবং নিরলসভাবে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। কেমন করে ধীরে ধীরে ঘটলো জিনিষটা, সেই কথায় আসা যাক।

শতাধিক বৎসর ধরে মম্-পরিবারের ছেলেরা আইন-ব্যবসায় করে এসেছেন। সমারসেট মমের ঠাকুরদাদার বাবা আইনজীবী ছিলেন, ঠাকুরদা নিজেও ছিলেন আইনজীবী। শুধু তাই নয়, ওঁর ঠাকুরদা ইংলণ্ডের আইনজীবী সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। এবং এ জন্যে উনি রীতিমতো গর্ব অনুভব করতেন। সমারসেট মমের বাবা রবার্ট ওরমণ্ডও একজন বিশিষ্ট আইনজীবী ছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের পঁচিশে জানুয়ারী যখন মমের জন্ম হ'লো, তখন ওঁর বাবা ছিলেন প্যারিসে ব্রিটিশ দূতাবাসের সলিসিটর। জন্ম থেকে জীবনের প্রথম দশ-এগারোটা বছর মমের ফ্রান্সেই কেটেছে। তথন ওঁদের আস্তানা ছিলো প্যারিসে, তবে অন্যান্য শহরেও প্রচুর বেড়িয়েছেন বাবার সঙ্গে।

মম্ ছিলেন মা-বাবার কনিষ্ঠ সন্তান। ওঁর আগে আরো পাঁচটি ভাই ছিলো। দীর্ঘকাল টি. বি.-তে ভুগবার পরে মমের মা মারা গেলেন। এ সময়ে ওঁর বয়স ছিল ঠিক আট বৎসর।

মায়ের মৃত্যুর সময়েই মমের অন্তরে একটা বিস্ময়ের সৃষ্টি হলো। জীবন সম্পর্কে কিছুটা যেন ভয়-মিশ্রিত বিস্ময়। কারণ, বাড়ীতে যতো

ছবি ছিলো মায়ের, তার কোনোটার সঙ্গেই রুগ্না মায়ের কোনো মিল খুঁজে পান নি। মম্-পরিবারের বন্ধুস্থানীয়রা সমারসেটের বাবা-মাকে পরিহাসছলে বলতেন Beauty and Beast. রবার্ট ওরমণ্ড ছিলেন রীতিমত কুৎসিত, আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন প্রকৃত সুন্দরী। সুন্দরী হিসেবে বেশ নাম-ডাকই ছিল ওঁর। কিন্তু বিয়ের দু'তিন বছর পরে টি. বি. হয়েছিলো। এবং কয়েক মাসের মধ্যেই শরীরটা ভেঙ্গে পড়লো। টি. বি. হবার পরেও আরো চারটি সন্তান হয়েছিলো ওঁর। সমারসেট মম্ কখনো তাঁর মায়ের সুন্দর চেহারা দেখেন নি। কিন্তু শুনেছেন এবং ছবিতেও দেখেছেন মা কতো সুন্দর ছিলেন। তাই রুগ্না মায়ের শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালে মনটা ওঁর ব্যথায় ভরে যেতো। কিন্তু এই রুগ্না মা যে একদিন সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন, সে কথা নিশ্চয়ই বালকের মনে হয়নি কখনো। তাই, মায়ের মৃত্যু একেবারেই স্তব্ধ করে দিয়েছিলো মম্‌কে।

সুন্দর-কুৎসিত, ভালো-মন্দ, জীবন-মৃত্যু—নানা প্রশ্নই জাগতে লাগলো বালক মমের মনে। এবং এই আচ্ছন্ন-করা চিন্তার জট খুলবার আগেই এলো দ্বিতীয় আঘাত। মায়ের মৃত্যুর ঠিক দু'বছর পরে মারা গেলেন মমের বাবা। মা মারা গেছেন টি. বি.-তে, বাবা মারা গেলেন ক্যান্সারে। দশ বছর বয়সেই রূঢ়-বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিলো মমকে। কেঁদে হালকা হবার অবসরটুকুও পেলেন না।

বাবার মৃত্যুর পর প্যারিস এবং ফ্রান্স ত্যাগ করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো। ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়লেন বালক মম্। উত্তরজীবনে লেখক হিসেবে খ্যাতির চরম শিখরে উঠে মম্ তাঁর আত্মকথা The Summing Up-এ লিখেছেন: 'ফ্রান্সই আমাকে সব কিছু শিখিয়েছে। শিল্প-সাহিত্য, রসবোধ, সৌন্দর্যবোধ, বিচার-বুদ্ধি, এমন কি লিখতেও ফ্রান্সই শিখিয়েছে আমাকে।' কাজেই এই ফ্রান্স ছেড়ে যাবার প্রশ্নে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠলো মমের অন্তরাত্মা।

প্যারিসে এ্যাভেনিউ দ্য আন্তিন-এ যে বাড়িতে বাস করতেন মম্, নানাভাবে ওঁর ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রভাবিত করেছে সে বাড়ি। বিশেষ করে বাড়ির ভেতরের সাজ-সজ্জার কথা বলতে হয়। বাড়ির একটা ঘরে আলমারীর মাথায় হয়তো হাজার বছর আগে তৈরী প্রাচীন

আফ্রিকার কোনো দেশের একটা অদ্ভুত মূর্তি, আর একটা ঘরে হয়তো কাঁচের আলমারীর মধ্যে রয়েছে পূর্ব দেশের গহনার কিছু নিদর্শন, বারান্দায় হয়তো দেওয়ালের সঙ্গে ঝুলছে ভীষণ দর্শন একখানা তুর্কী ভোজালী। এগুলো কি করে এলো এ বাড়িতে? প্যারিসে বসবাসকারী একেবারে হাল ফ্যাশনে কেতাদুরস্ত ইংরেজ পরিবারে এ সমস্ত দ্রব্য থাকা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক নয়।

স্বাভাবিক নয়। কিন্তু তবু ঐ বিচিত্র-দর্শন জিনিসগুলি ছিলো বাড়ীতে। মাঝে মাঝে সংখ্যাবৃদ্ধিও হতো। ব্যাপারটা হচ্ছে, মমের বাবার ছিলো দেশভ্রমণের শখ। সুযোগ সুবিধে হলেই চট করে ঘুরে আসতেন বিদেশ থেকে এবং ফেরবার সময় প্রত্যেকবারই কিছু না কিছু নিদর্শন নিয়ে ফিরতেন। বালক মম্ ছেলেবেলা থেকেই এই অদ্ভুত জিনিসগুলি দেখতেন আর কল্পনায় দেখতে চেষ্টা করতেন ঐ সমস্ত দ্রব্য যারা ব্যবহার করে, তারা কে, কেমন দেখতে, কার কেমন স্বভাব ইত্যাদি। দেশভ্রমণের বাসনা এই সময় থেকেই দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছিলো মমের মনে। এবং ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, মালয়, চীন, আমেরিকা, প্রশান্ত মহাসাগর এবং দক্ষিণ সাগরের বিভিন্ন দ্বীপে বিভিন্ন সময়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন মম্। তা' ছাড়া খাস ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ এবং ইয়োরোপের নিকটবর্তী আফ্রিকা ও এশিয়া-মাইনরের বিভিন্ন অঞ্চলও স্বচক্ষে দেখেছেন। মমের কাছে যতো শ্রেষ্ঠশিল্পীর নানা ধরণের ছবি ছিলো, তার মূল্য শোনা যায় কয়েক কোটি টাকা। পিকাসো থেকে আরম্ভ করে শক্তিমান শিল্পী মাত্রেরই কিছু না কিছু সৃষ্টি মম্ সযত্নে তাঁর সংগ্রহশালায় রেখেছিলেন। শোনা যায়, মোট ছবির সংখ্যা তিন শ পঁচানব্বই। মমের সংগ্রহশালাটি ওঁর স্থায়ী আস্তানার সঙ্গেই। লণ্ডন, প্যারিস এবং নিউইয়র্কে মম্ বাড়ি করেছিলেন নেহাত শখের জন্যে। ওঁর স্থায়ী আস্তানা ছিলো ফ্রান্সের রিভিয়েরা-তে। কাজেই সংগ্রহের জন্যে মমের এই যে ঝোঁকটা—এরও সূত্রপাত খুব ছেলেবেলা থেকেই হয়েছিল বলা চলে।

যাই হ'ক, প্যারিস ছাড়তে হ'লো মমকে। ছাড়তে হ'লো ফ্রান্স। চলে এলেন স্বদেশে এক কাকার কাছে। ওঁর কাকা ছিলেন হুইট্স্টেবল-এর পুরোহিত। স্বদেশে এসে মোটেই খুসী হ'তে পারলেন না মম্। নানা অসুবিধে দেখা দিতে লাগলো। প্রথমত ভাষার অসুবিধে। একটি

এগারো বছরের ছেলে যদি তার মাতৃভাষায় স্পষ্ট করে কথা বলতে না পারে, তাহ'লে তার পক্ষে সমবয়সী আর পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। মাতৃভাষা ইংরেজীর চাইতে ফরাসীটাই ভাল জানতেন মম্। যেটুকুও বা জানতেন ইংরেজী, তা'ও গুছিয়ে ব'লে উঠতে পারতেন না। কারণ, উনি বেশ একটু তোতলাও ছিলেন। তৃতীয়ত গড়নটা ছিলো একটু বেঁটেখাটো। পাড়ায় একটি নতুন ছেলে যদি এতগুলি খুঁত নিয়ে এসে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়, তাহ'লে আর পাঁচটি চ্যাংড়া ছেলে মিলে তাকে নিয়ে স্বভাবতঃই কারণে-অকারণে উপহাস করে থাকে। এ রকম নির্মম উপহাস সেই বালক বয়সেই হজম করে যেতে হয়েছে মমকে। স্বদেশে আসবার কিছুদিন পরেই মমের কাকা ওঁকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে যাওয়া মানেই তাদের হৃদয়হীন উপহাস সহ্য করা। কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা দুঃসহ হয়ে উঠলো মমের কাছে। সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিলেন মম্। পারিপার্শ্বিক চাপে মনটা ওঁর অন্তর্মুখীন হয়ে উঠলো। একদিক দিয়ে চলতে লাগলো স্কুলের পড়া, আর একদিকে আরম্ভ হলো লেখার অভ্যাস। যে ছেলের খেলার সাথী কেউ নেই, স্কুলের পড়া শেষ হবার পর সে কি করবে? —হয় গল্পের বই পড়বে, আর না হয় এক-আধটা লেখার চেষ্টা করবে। এইটেই স্বাভাবিক। মম্ দুটোই যুগপৎ আরম্ভ করলেন—অর্থাৎ গল্প পড়া আর লেখা, এইভাবেই চলতে লাগলো।

তিন বছর পরের কথা। হঠাৎ একদিন ভীষণ জ্বর হ'লো মমের, সঙ্গে ভয়ানক কাশি। ডাক্তার এসে বললেন: টি. বি.। টি. বি.? হ্যাঁ টি. বি.। নতুন হয়েছে তা' নয়, টি. বি. ওঁর ছেলেবেলা থেকেই আছে। পড়াশুনোর পরিশ্রম আর সেই সঙ্গে অনিয়ম—এই দুটো মিলে হঠাৎ বেড়ে গেছে। সুতরাং, ডাক্তার পরামর্শ দিলেন: আপাততঃ পড়াশুনো বন্ধ রাখতে হবে, ওষুধপত্র তো খেতেই হবে, সেই সঙ্গে চাই পুষ্টিকর খাদ্য এবং বায়ু পরিবর্তন। মমের বাবা যে টাকা-পয়সা রেখে গিয়েছিলেন, তাই দিয়েই ওঁর বায়ু পরিবর্তনের বন্দোবস্ত হলো দক্ষিণ ফ্রান্সের একটি ছোট শহরে। দশ মাস এখানে কাটাবার পর সুস্থ হয়ে উঠলেন মম্। তাই আবার দেশে কাকার কাছে ফিরে গেলেন।

আগেই বলেছি, মমের কাকা ছিলেন হুইট্‌স্টেবল-এর পুরোহিত

অভিভাবক হিসেবে মমের ভবিষ্যৎ-জীবনের কথা উনি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন। ওঁর বাসনা ছিলো—মম্‌ও ওঁর মতো পুরোহিত হবেন। কিন্তু নানা কারণে পুরোহিত-জীবনের ওপর মমের ইতোমধ্যেই অশ্রদ্ধা জন্মে গিয়েছিল এবং তার প্রধান কারণ ওঁর কাকার চরিত্র। ওঁর কাকা যেমন ছিলেন অলস তেমনি স্বার্থপর এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিরও যথেষ্ট অভাব ছিলো তাঁর। প্রসঙ্গত মমের তোতলামির কথা বলা যেতে পারে। সমবয়সীদের ঠাট্টাবিদ্রূপ যখন চরমে উঠতো, তখন অনেক সময় কেঁদে ফেলতেন মম্‌। এই সমস্ত সময় ওঁর কাকা উপদেশ দিতেন ভগবানকে ডাকতে। বলতেন: 'একাগ্রভাবে ভগবানকে ডাকতে পারলে মানুষের সব কামনা-বাসনা পূর্ণ হয়।' কাকার কথামতো একমনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন মম্‌ তোতলামী সারিয়ে দেবার জন্যে। এইভাবে কিছুদিন চলবার পরও যখন তোতলামী সারলো না, তখন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেললেন মম্‌।

একজন নাস্তিকের পক্ষে আর যে কাজই হক না কেন, পুরোহিতের কাজ সম্পর্কে আগ্রহ থাকবার কথা নয়। কাকার যদিও এই ক'বছর ধরে মনে মনে ইচ্ছে ছিলো যে, মম্‌কে পুরোহিত বানাবেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার কথা পাড়লেন, কিন্তু মম্‌ তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন পুরোহিত না হবার জন্যে। কায়মনোবাক্যে তোতলামী সারাবার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা সত্ত্বেও তোতলামী সারেনি, সেইজন্যে মমের ঈশ্বরে বিশ্বাস ক্ষীণ হয়ে এসেছিলো। আর একদিকে পেশা হিসেবে পুরোহিতের কাজের প্রতিও শ্রদ্ধা চলে গিয়েছিল। কাজেই ভবিষ্যৎ জীবনের পেশা নির্বাচনের প্রশ্নে রীতিমতো সমস্যা দেখা দিল। মম্‌ বললেন: 'আমি ইতিহাস পড়বো, ভাষাতত্ত্ব শিখবো, দর্শনশাস্ত্র শিখবো এবং সেজন্যে জার্মানী যাওয়া দরকার।' তখন পর্যন্ত বাবার টাকাকড়ির কিছু অবশিষ্ট ছিলো কাকার কাছে, তাই মমের ইচ্ছেতে বাধা দিলেন না তিনি!

মম্‌ চলে এলেন জার্মানীর হাইডেলবার্গ-এ। জার্মানীতে পৌঁছেই নিজের মানসিক অবস্থা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেলো নিজের কাছে। উনি ভেবে দেখলেন—ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস বা দর্শনশাস্ত্র, কোনোটার দিকেই এগোবার জন্যে মনে মনে তেমন কোন আগ্রহবোধ করছেন না। যদিও

প্রখ্যাত দার্শনিক কুনো ফিশারের কয়েকটি লেকচার মম্ শুনলেন ছাত্র হিসাবে নাম লিখিয়েই। মাস দশেক উদ্দেশ্যহীনভাবে জার্মানীর বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়ালেন মম্। এই রকম ঘুরতে ঘুরতেই একবার মম্ মিউনিখে এসে পড়েছিলেন।

মিউনিখে যদিও মাত্র কয়েক সপ্তাহে ছিলেন মম্, কিন্তু তার মধ্যেই ওঁর জীবনের একটা পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা দিলো। সে সময়ে নব্য ইয়োরোপের মন্ত্রগুরু যুগপ্রবর্তক হেনরিক ইবসেন মিউনিখে ছিলেন। ইবসেন তখন নাট্যকার হিসেবে উন্নতির চরম শিখরে উঠেছেন। গোটা ইয়োরোপের সমস্ত বড়ো বড়ো শহরে ইবসেনের নাটক অভিনীত হচ্ছিলো সাফল্য এবং উত্তেজনার সঙ্গে। সেই ইবসেনকে চাক্ষুষ দেখবার সৌভাগ্য হলো মমের। মিউনিখের একটা বিখ্যাত রেস্তোরাঁয় বসে বিয়ার পান করতেন ইবসেন। তরুণ মম্ শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে দূর থেকে নিবিষ্ট মনে দেখতেন ইবসেনকে। দেখতেন আর বিস্মিত হতেন।

এই সময়ে, অর্থাৎ জার্মানীতে থাকতেই পড়াশুনার অভ্যাসটা দানা বাঁধতে আরম্ভ করলো মমের। ভাগনার, কুনো ফিশার, ডারউইন প্রভৃতির অনেক লেখাই পড়ে ফেললেন। ইবসেনকে দেখবার পর ওঁর নাটকগুলিও পড়তে আরম্ভ করলেন। চাই কি খাস জার্মানীর পটভূমিকায় একটি জার্মান চরিত্র নিয়ে জার্মান ভাষায় একখানা বইও লিখে ফেললেন। কয়েকজন প্রকাশকের কাছে পর পর ধর্ণা দিলেন মম্। কিন্তু সবাই এক কথাই বললেন: এ বই ছাপবার উপযুক্ত হয়নি। দারুণ বিরক্তিতে সে পাণ্ডুলিপি মম্ নষ্ট করে ফেললেন।

মিউনিখ থেকে সোজা স্বদেশে ফিরলেন মম্। এবার ওঁর কাকাকে বেশ একটু রুষ্ট দেখা গেলো। যা হ'ক একটা পেশা ঠিক করবার প্রশ্নটা উনি আর ফেলে রাখতে কোনো মতেই রাজী হলেন না। জার্মানীতে গিয়ে ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব বা দর্শনশাস্ত্র কিছুই যে পড়েননি মম্ বা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হননি, সে সব যথাসময়ে খবর পেয়েছেন উনি।

এবার কি করা যায়? নিজেকে প্রশ্ন করলেন মম্। এ সময়ে মমের বয়স ঠিক সতেরো বছর। যদিও অন্ততঃ পাঁচ বছর ধরে লেখার অভ্যাস করছিলেন মম্ কিন্তু লেখাটা যে পেশা হতে পারে, সে কথা বোধহয় কল্পনায়ও আনতে পারেননি সে সময়ে। অথচ এদিকে কাকা নাছোড়বান্দা।

বললেন : 'তোমার পেশার প্রশ্নটার এবার নিষ্পত্তি করতেই হবে। অবিলম্বে ঠিক করো কি করবে। কিছুদিন ছবি আঁকবার চেষ্টা করলেন মম্। কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন ওদিকে বিশেষ সুবিধে হবে না। এরপর ঠিক করলেন একাউন্ট্যাণ্ট হবেন। একজন বিখ্যাত চাটার্ড একাউন্ট্যাণ্টের সঙ্গে মাস দেড়েক কাটাবার পর মম্ বুঝলেন এ-কাজেও মন বসছে না। কাকা বললেন : পাদ্রী হ'তে না চাও, আমাদের পূর্ব-পুরুষের অনেকেই যা করে গেছেন, সেই কথাটা ভেবে দেখতে পারো। অর্থাৎ কিনা আইন পড়া; ওকালতি করবার জন্যে তৈরী হও। কিন্তু এতেও রাজী হতে পারলেন না মম্।

মমের কাণ্ডখারখানা দেখে কাকা এবং কাকীমা দু'জনেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কাকা তো রীতিমতো বিরক্তই হয়ে উঠলেন বলা যায়। যাই হ'ক, শেষ পর্যন্ত মম্ জানালেন যে উনি ডাক্তারি পড়বেন। পেশা হিসেবে ডাক্তারিটা অনেক কাজের চাইতেই ভালো। কাজেই কাকা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হ'লেন। লণ্ডনের সেণ্ট টমাস হস্‌পিটালের মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হ'লেন মম্।

কেউ যদি মনে করে থাকেন যে, ডাক্তার হিসেবে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে মমের ক্ষীণতম বাসনা ছিলো, তা হ'লে খুবই ভুল হবে। আসলে ব্যাপারটা হ'চ্ছে লণ্ডনে বসবাস করবার একটা বন্দোবস্ত করা— এবং লণ্ডনে বসবাস করবার একমাত্র উদ্দেশ্যই হ'লো সাহিত্য-সাধনার পথ সুগম করা। লণ্ডন শুধু বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীই নয়, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির একটা বিরাট কেন্দ্রও বটে। চলতি সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হ'লে লণ্ডনের বাইরে থাকবার অনেক অসুবিধে।

চরিত্রের অন্তর্নিহিত সততার জন্যে, একটা 'পলিসি' হিসেবে ডাক্তারি পড়তে আরম্ভ করলেও কখনো ফাঁকি দেন নি মম্। ডাক্তারি বইপত্র বেশ মনোযোগের সঙ্গেই পড়তেন। কিন্তু সাহিত্যপাঠ করতেন তার চারগুণ বেশি মনোযোগ দিয়ে। ইংরেজী, ফরাসী এবং ইতালীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বইগুলি বেছে বেছে পড়তে আরম্ভ করলেন মম্। আর একদিকে চলতে লাগলো লেখা।

সাহিত্যসাধনার শুরু—পর পর কয়েকটি একাঙ্ক নাটক লিখে ফেললেন মম্। কয়েকজন থিয়েটার কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটোছুটি করলেন মাস

কয়েক ধরে, যদি কোনো একটা নাটক মঞ্চস্থ করা যায়—এই আশায়। কিন্তু কোনো কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেই কিছুমাত্র আশাভরসা পেলেন না মম্। এমন কি, অনেক থিয়েটার-কর্তৃপক্ষ তাঁর পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখতেও অস্বীকার করলেন। ভগবানে বিশ্বাস আগেই হারিয়েছিলেন, এবার বুঝি নিজের শক্তি-সামর্থ্যের ওপরও আস্থা টলে উঠলো। একে বেঁটে, তায় তোতলা, তার ওপর বুকের তলায় টি. বি.-র জীবাণু—কিন্তু এ সমস্ত অসুবিধের সঙ্গেও নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন মম্, বিশ্বাস ছিলো সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু থিয়েটার-কর্তৃপক্ষদের পেছনে ঘোরাঘুরি করে বেশ একটু হতাশ হয়েই পড়লেন এতদিনে। শরীরটাও যেন খারাপ লাগতে লাগলো।

জার্মানীতে বসে লেখা প্রথম পাণ্ডুলিপিটি যেমন নষ্ট করে ফেলেছিলেন মম্, এবারকার রচনাগুলিও ঠিক তেমনি নষ্ট করে ফেলবেন কিনা ভাবছিলেন, কিন্তু এই সময়েই আর একটা কথা মনে হ'লো। মম্ ভাবলেন প্রথমে নাটকের জন্যে চেষ্টা না করে বরং উপন্যাসের জন্যে চেষ্টা করলে কেমন হয়? কথাটা মনে হতেই একাঙ্ক নাটকগুলি প্যাকেট করে স্যুটকেশে রেখে দিয়ে উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করলেন মম্। কয়েক সপ্তাহ পরে দেখা গেলো উপন্যাস নয়, দুটি বড় গল্প তৈরী হয়েছে। লেখা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মম্ তাঁর গল্প দুটি বিখ্যাত প্রকাশক ফিশার আনউইনকে ডাকযোগে পাঠালেন। মনের ইচ্ছে, যদি দুটি গল্প একত্রে একখানা বই হিসেবে প্রকাশিত হয়।

কিন্তু না, সে আশাও পূর্ণ হলো না মমের। আনউইন দিন কয়েক পরেই ফেরত পাঠালেন গল্প দু'টি। জানালেন—এ রচনা তাঁর কাজে লাগবে না। আরো জানালেন: 'নতুন লেখকদের রচনা প্রকাশ করবার একটি পরিকল্পনা আছে বটে, কিন্তু গল্প নয়, ছোট উপন্যাস যদি কিছু থাকে আপনার, জানাবেন।' পত্রোত্তরে মম্ জানালেন: 'কয়েকদিনের মধ্যেই আমি একখানা উপন্যাস পাঠাচ্ছি আপনাকে, আশা করি, এ রচনাটি আপনাদের ভালো লাগবে।'

মমের চিঠির ভাবটা দেখলে মনে হয় যেন উপন্যাস লেখা হয়ে পড়ে আছে, একটু চোখ বুলিয়ে দিতে হবে আর কি। কিন্তু আসল ব্যাপার মোটেই তা নয়, কোনো উপন্যাসই মমের লেখা ছিল না। আনউইনকে

চিঠি পোস্ট করবার দশ মিনিটের মধ্যেই একখানা উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করলেন মম্। দিন দশেকের মধ্যেই শেষ হ'লো লেখা এবং দিন-তিনেকের মধ্যেই আনউইনের ঠিকানায় পৌঁছে গেলো পাণ্ডুলিপি। এই উপন্যাসটির নাম করলেন মম্—Liza of Lambeth.

বছর পাঁচেক ধরে, ডাক্তারি পড়তে এসে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার ওপর নির্ভর করেই Liza of Lambeth রচনা করেছিলেন মম্। Lambeth হলো লণ্ডনের বস্তী-অঞ্চল। এই বস্তী অঞ্চল সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের স্থযোগ হয়েছিল মমের সেণ্ট টমাস হসপিটালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী ছাত্র হিসেবে। এই বইখানা রচনা করবার সময় পর্যন্ত শুধুমাত্র ডেলিভারী কেসই মম্ তেষট্টিটি দেখাশুনো করেছিলেন। বস্তীবাসিনী বিপথ-গামিনী তরুণী লিজাকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাস। অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত কতকগুলি সাধারণ মানুষ তার পার্শ্বচরিত্র।

Liza of Lambeth-এর পাণ্ডুলিপি আনউইনকে পাঠাবার পর দিন-কয়েক খুবই উত্তেজনার মধ্যে কাটলো মমের। কিন্তু মাস দুইয়ের মধ্যেও যখন কোনো খবর পাওয়া গেলো না, তখন আশাভঙ্গে অভ্যস্ত মম্ আবার মনে মনে তৈরী হচ্ছিলেন আর একটা আঘাতের জন্য। এমন সময় চিঠি এলো। প্রকাশক অবিলম্বে দেখা করবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন। পত্রপাঠমাত্র মম্ এলেন প্রকাশকের অফিসে। দু' চার কথার পরই চুক্তি-পত্রখানা মমের দিকে এগিয়ে দিলেন প্রকাশক। মম্ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। অসতর্ক মুহূর্তে হয়ত বা একটা ধন্যবাদও দিয়ে ফেললেন ভগবানকে। এতদিনে সত্যি প্রথম বইখানা প্রকাশের সম্ভাবনা দেখা দিলো। এটা ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। এর পরের বছর মম্ ডাক্তারি পাস করলেন। বছর-খানেক ডাক্তারি করবার পর কায়মনোবাক্যে সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করলেন। Liza of Lambeth প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা নাম হ'লো মমের, বইখানার কয়েকটা সংস্করণও হয়ে গেলো পর পর। কিন্তু সাহিত্যসাধনার প্রথম দশটা বছর অবর্ণনীয় কষ্টে কাটাতে হয়েছিল ওঁকে। ডাক্তারি ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনও ছাড়লেন মম্। চলে এলেন প্যারিস। ছেলেবেলার স্বপ্ন-মেশানো ফ্রান্স একটির পর একটি গল্প, উপন্যাস এবং নাটক লেখবার প্রেরণা জোগাতে লাগলো বেঁটে, তোতলা, টি. বি.-রোগগ্রস্ত তরুণ কথা-সাহিত্যিককে। সাহিত্যসাধনার প্রথম দশ বছরে অর্থাৎ ১৮৯৭ থেকে

১৯০৭-এর মধ্যে অনেকগুলি বই বেরুলো মমের। তার অন্ততঃ চারখানার দ্বারা কিছু অর্থাগমও হ'লো। এ চারখানা হ'লো Merry Go Round ; A Man of Honour ; Mrs. Craddock এবং The Making of a Saint. কিন্তু মোটের ওপর কষ্টেই কাটাতে হচ্ছিল মমকে।

মমের অনেক দিনের আশা পূর্ণ হ'লো ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। ওঁর নতুন নাটক Lady Frederick সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিক হিসেবে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন মম্‌। যে বইগুলি এ ক' বছর ধরে বিক্রী হচ্ছিল না মোটেই—সেই বইগুলিরও সংস্করণ হ'তে আরম্ভ করলো বছরে দু'তিনটে করে। Lady Frederick প্রকাশিত হবার সাত বছরের মধ্যে আরো তিনখানা বই প্রকাশিত হ'লো : The Magician ; Home and Beauty এবং Loaves and Fishes. তারপর, অর্থাৎ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হ'লো মমের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—Of Human Bondage.

সাহিত্যসাধনার পরিণত রূপ—অব হিউম্যান বণ্ডেজ—এ বইখানা ষোলো বছর ধরে ধীরে ধীরে লিখেছিলেন মম্‌। এ সম্বন্ধে উনি বলেছেন : 'কেমন যেন ভূতে পাওয়ার মতো হয়ে গিয়েছিলাম আমি, এ বইখানা লেখবার জন্যে একটা দুঃসহ নেশা চেপে গিয়েছিলো আমার···লিখে তবে রেহাই পেলাম।' অর্থাৎ ভেতর থেকে রীতিমতো একটা প্রেরণা পেয়েছেন মম্‌ এ বই লেখবার জন্যে। পাবার কথাও। কারণ, যদিও বইখানা একখানা পুরাদস্তুর উপন্যাস, কিন্তু এর মধ্যে মম্‌ প্রধানতঃ নিজের ছবিই তুলে ধরেছেন। কিছুটা আত্মকথা, কিছুটা কাল্পনিক কাহিনী—এই দু'য়ের প্রায় সমান মিশ্রণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে Of Human Bondage. বালক বয়স থেকে মমের জীবনের নানা প্রতিবন্ধকের কথা আমরা জেনেছি—বেঁটে, তোতলা, টি. বি. রোগী—Of Human Bondage-এর নায়ক ফিলিপ কেরীর-ও তেমনি একটা প্রতিবন্ধক আছে, ওর একখানা পা বিকৃত। মম যেমন তাঁর প্রতিবন্ধকের জন্যে সমবয়সীদের সঙ্গে মিশতে পারতেন না, ফিলিপও তেমনি। মম্‌ তোতলামি সারিয়ে দেবার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে ব্যর্থ হয়ে নাস্তিক হয়ে ওঠেছিলেন, আর ফিলিপ ঈশ্বরে বিশ্বাস হারালো পা সারিয়ে দেবার জন্যে প্রার্থনা করে ব্যর্থ হয়ে। মমের কাকা ছিলেন Whitstable-এর Vicar—ফিলিপ-এর কাকা Blackstable-এর Vicar.

মমের মত ফিলিপও হাইডেলবার্গ ঘুরে এসেছে, ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি ; একাউন্ট্যান্ট হবার চেষ্টা করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ডাক্তারি পড়েছে। একেবারে ছেলেবেলা থেকে তিরিশ বছর পর্যন্ত ফিলিপের জীবনের যে চিত্র মম্ এঁকেছেন, তার মধ্যে ওঁর নিজের বাস্তব জীবনের অনেকখানিই এসে পড়েছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আবার কতকগুলি জায়গায় কল্পনার আশ্রয়ও নিয়েছেন মম্। যেমন: মম্ ছিলেন ছ' ভাইয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ, কিন্তু ফিলিপ একমাত্র সন্তান ; দশ বছর বয়স পর্যন্ত মমের কেটেছে ফ্রান্সে, কিন্তু ফিলিপ জন্ম থেকেই ইংলণ্ডে মানুষ হয়েছে। মমের মা মারা যান আগে, তারপর বাবা ; কিন্তু ফিলিপের আগে বাবা, তারপর মা। সব চাইতে বড় অমিল হচ্ছে প্রেম এবং বিবাহ সম্পর্কে। মম্ বিয়ে করেন একচল্লিশ বছর বয়সে এবং ওঁর যখন তিপান্ন বছর বয়েস, তখন সে বিয়ের সমাপ্তি ঘটলো বিবাহ-বিচ্ছেদের মধ্যে ; কিন্তু এদিকে ফিলিপকে দেখা যায় মিলড্রেড রজার্স নামে একটি মেয়েকে ভালোবাসে, কিন্তু মিলড্রেড বিয়ে করলো অন্য একটি যুবককে। ওদের একটি মেয়ে হ'লো, তার পরেই স্বামীপরিত্যক্তা মিলড্রেড ফিরে এলো ফিলিপের আশ্রয়ে। ফিলিপ কিছুদিন পর্যন্ত মিলড্রেড এবং ওর মেয়ের খরচপত্র জোগাতে লাগলো। কিন্তু তারপর বিয়ে করবার সময় ফিলিপ বিয়ে করলো অন্য একটি মেয়েকে—তার নাম স্যালী।

সাহিত্যকর্ম হিসেবে Of Human Bondage-এর যথাযোগ্য সমাদর একটু দেরিতেই হয়েছিল। কারণ বইখানা যখন বেরুলো, প্রথম মহাযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে মানুষ তখন সূক্ষ্মভাবে কোনো কিছু বিচার করবার অবস্থায় ছিলো না। মম্ নিজেও যুদ্ধের কাজ করেছিলেন ডাক্তার হিসেবে। কিন্তু টি. বি.-র যন্ত্রণা বেড়ে যাওয়াতে কিছুদিন পরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর ধীরে ধীরে Of Human Bondage-এর জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগলো।

কিছুদিন ব্রিটেনের সিক্রেট সার্ভিস-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন মম্। এবং এ ব্যাপারে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিলো তার ভিত্তিতে কতকগুলি ছোটো গল্প লিখে Ashenden নামে প্রকাশ করেছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও পঁয়ষট্টি বছরের স্বনামধন্য সাহিত্যিক মম্ ঘটনাচক্রে যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের

রিভিয়েরাতে বাড়ি কিনেছিলেন মম এবং সেই সময় থেকে এই বাড়িতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। কিন্তু অল্প কয়েকদিন প্রত্যক্ষ যুদ্ধের পর ফ্রান্স যখন আত্মসমর্পণ করলো, তখন বেশ কিছুদিন মমের কোনো খবরাখবর পাওয়া যায় নি। জার্মানরা ওঁকে বন্দী করেছে বা হয়তো উনি মারা গেছেন—এ-রকম গুজবও শোনা গিয়েছিল। খবর নিয়ে দেখা গেলো ফ্রান্সে তাঁর ঘরবাড়িও সব তছনছ হয়ে গেছে, সারা পৃথিবীতে মমের অসংখ্য মুগ্ধ পাঠকের আশঙ্কার শেষ নেই। এমন সময় একদিন মম্ স্বদেশে আত্ম-প্রকাশ করলেন। ফ্রান্স থেকে পলায়নের এই চমকপ্রদ ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই মম্ লিখলেন—Strictly Personal.

Of Human Bondage-এ স্থায়ী প্রতিষ্ঠার পর থেকে ছোটো গল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ মিলিয়ে চল্লিশখানারও বেশি বই প্রকাশ করেছেন মম্—এবং আজকে তাঁর বইয়ের সংখ্যা প্রায় পঞ্চান্ন। তার মধ্যে অন্ততঃ দশখানা বইয়ের পাঠক এক কথায় বিশ্বজোড়া। থিয়েটার এবং সিনেমা হিসেবেও এর অনেকগুলি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

The Moon and Six Pence; The Painted Veil; Cakes and Ale; The Razor's Edge; The Hour before the Dawn; East of Suez; Rain; The Bread-Winner; Our Betters—প্রভৃতি গ্রন্থগুলি নিঃসন্দেহে বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী সংযোজন। বাস্তব চরিত্র মমের অনেক উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে বলে একটা অভিযোগ শোনা যায়। যেমন Cakes and Ale. অনেকেই মনে করেন এডোআর্ড ড্রিফিল্ড-এর চরিত্রটি মম্ সৃষ্টি করেছেন প্রখ্যাত কবি-নাট্যকার-ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির অনুকরণে এবং মিঃ কিয়ার হচ্ছেন স্যার ওয়ালপোল। ঠিক এই রকমই The Moon and Six Pence-এর নায়ক চার্লস স্ট্রীকল্যাণ্ড চরিত্রটি নাকি প্যারিসের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী গগিনকে দেখে সৃষ্টি করেছিলেন। এ অভিযোগ যেমন একেবারে সত্যি নয়, তেমনি একেবারে মিথ্যেও নয়। এ সম্বন্ধে মম্ নিজে বলেছেন: 'লেখকেরা বাস্তব চরিত্রগুলির হুবহু অনুকরণ করেন না, যদিও প্রয়োজন মতো বাস্তবচরিত্র থেকে তাঁরা মালমসলা সংগ্রহ করে থাকেন…যা তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, যা দেখে তাঁরা অনুপ্রাণিত বোধ করেন, তা অবশ্যই তাঁরা নেন, বাস্তবচরিত্রগুলির সঙ্গে হুবহু মিল ঘটাবার জন্যে তাঁদের কোনো দায় থাকে না।' মমের এ কথার পর আমরা

নিশ্চয়ই মনে করতে পারি যে, কোনো বাস্তব ও জীবন্ত লোককে দেখে মম্ হয়তো অনুপ্রাণিত হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু লেখাটা উদ্দেশ্যমূলক নয়, যদিও অনেক ক্ষেত্রে হুবহু মিলও ঘটে গিয়েছিল।

দি মুন এণ্ড সিক্স পেন্স—এ গ্রন্থে শিল্পী গগিন-এর জীবনের সঙ্গে চার্লস স্ট্রীকল্যাণ্ডের মিলটাও একটু বেশি হয়ে গেছে, অর্থাৎ হুবহু হয়ে গেছে। এর কাহিনীভাগে প্রধান চরিত্র তিনটি : শিল্পী স্ট্রীকল্যাণ্ড এবং একটি তরুণী ব্লাঞ্চ ও তার স্বামী। শিল্পীর প্রতি একটা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ বোধ করবার জন্যে ব্লাঞ্চ তার স্বামীর ঘর ত্যাগ করলো (যদিও কোনো এক সময়ে এই স্বামীই তাকে ভয়ানক দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করে এনে সামাজিক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো)। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো শিল্পী ব্লাঞ্চ সম্পর্কে মোটেই আগ্রহশীল নয়, তার কোনো দায়িত্বই নিতে সে প্রস্তুত নয়। ফলে, একটি সাজানো সংসার ধ্বংস হ'লো, অথচ মেয়েটির জন্যে শিল্পীর আকর্ষণ অত্যন্ত তীব্র। কাহিনীর বৈশিষ্ট্য হ'লো ব্লাঞ্চ-এর প্রতি স্ট্রীকল্যাণ্ডের যে আকর্ষণ তার পেছনে কোনো যৌন কামনা-বাসনা নেই। শিল্পী তার সৃষ্টির প্রয়োজনে, তার সাধনায় অনুপ্রেরণার জন্যে মেয়েটিকে আকৃষ্ট করে।

দি পেইণ্টেড ভেইল—মমের বইতে যাঁরা বাস্তব চরিত্রের অনুরনণ খোঁজেন, তাঁরা সব চাইতে অবাক্ হবেন এ বইখানা পড়লে। এ উপন্যাসের নায়ক ডাঃ ওয়াল্টার ফেন বহুলাংশে মম্ নিজে। এই যে সাদৃশ্য, তা জীবনের ঘটনাবিস্তারের জন্যে নয়। কিন্তু ডাঃ ফেন-এর কথাবার্তার ধরন, জীবন সম্পর্কে তার বিশ্বাস, অর্থাৎ সব মিলিয়ে তার যে ব্যক্তিত্ব তা' যেন মমেরই প্রতিরূপ। হংকং-এর পটভূমিকায় রচিত এর কাহিনীভাগে দেখা যায় ডাঃ ফেন ও তার স্ত্রী কিটি, বাইরে থেকে একটি সুখী পরিবার বলেই মনে হয়। কর্মব্যস্ত ডাঃ ফেন একদিন বাড়ি ফিরে দেখতে পেলো কিটি তার এক প্রণয়ীর সঙ্গে একটু বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। তিনজনেই এ ওর মুখের দিকে দেখলো। কিটি এবং তার প্রণয়ী একটা ভয়ানক অবস্থার জন্যে তৈরী হচ্ছিলো, কিন্তু দেখা গেলো ডাঃ ফেন কাউকেই কিছু বললো না। কিটি অকস্মাৎ তার প্রণয়ীর সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করলো। এদিকে চীনের মেই-তান-ফু অঞ্চলে তখন প্লেগ মহামারী রূপে দেখা দিয়েছে। ডাঃ ফেনকে যেতে হবে সেখানে। এ সমস্ত সময়ে সাধারণতঃ ডাঃ ফেন একাই গিয়েছে এর আগে, কিন্তু এবার ও জেদ ধরলো কিটিকেও সঙ্গে যেতে হবে বলে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেতে হ'লো কিটিকে।

কিটি হয়তো প্লেগের শিকার হ'লেও হতে পারে—এই রকম একটা চিন্তা ছিল ফেন-এর। কিন্তু ঘটনা অন্যদিকে মোড় ফিরলো। চীনের গ্রামাঞ্চলে কর্মরত ফরাসী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে কিটির হৃদয়ের পরিবর্তন হ'লো। ডাঃ ফেন মার্জনা করলো স্ত্রীকে।

প্রাচ্যের পটভূমিকায় আরো অনেক বই লিখেছেন মম্। তার মধ্যে The Razor's Edge, East of Suez এবং Rain বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। একটি বড়ো গল্পের নাট্যরূপ হ'লো Rain, এইটিই খুব সম্ভব মমের শ্রেষ্ঠ নাটক।

দি রেজরস্ এজ্—এ উপন্যাসের পটভূমি ভারতবর্ষ, যদিও এর নায়ক আমেরিকান। একটি আমেরিকান যুবক মানবজীবনের রহস্যভেদ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে ভারতবর্ষে এসে একজন সাধকের কাছ থেকে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে শিখতে লাগলো। মম্ লিখেছেন যে, ভারতীয় তত্ত্বশাস্ত্রের সর্বেশ্বরবাদ দেখে আকৃষ্ট হয়েই উনি এ উপন্যাসখানা রচনা করেন।

এ রাইটারস্ নোটবুক—মম্ নিজে পৃথিবীর বহুদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন, এ গ্রন্থে তিনি বিশেষভাবে লিখেছেন দেশভ্রমণের প্রয়োজনীয়তার কথা। এ প্রয়োজন সকলেরই কম বেশি আছে, অর্থাৎ দেশভ্রমণের ফলে সকলেই অল্পবিস্তর লাভবান হবেন। লেখকদের পক্ষে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মম্ শুধু কথার কথা হিসেবে উপদেশই দেননি, এর গুরুত্ব তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন এবং এ জন্যে উনি নিজে সাধ্যমতো সাহায্য করবার জন্যেও এগিয়ে এসেছিলেন। একসময় সংবাদপত্রে দেখা গিয়েছিলো—মম্ একটি 'ফাণ্ড' তৈরী করেছেন নিজে টাকা দিয়ে, যার থেকে প্রতি বছর ১০০০৲ টাকা দেওয়া হবে দেশভ্রমণেচ্ছু দরিদ্র তরুণ লেখকদের।

আজকের পৃথিবীর সব চাইতে ধনী লেখকদের অন্যতম হ'লেন মম্, হয়তো সব চাইতে ধনীও হতে পারেন। পৃথিবীর সমস্ত ভাষাতেই তাঁর কিছু কিছু বই অনূদিত হয়েছে এবং তাঁর যে সম্পদ—তা' এই লেখার দ্বারাই তিনি অর্জন করেছিলেন। কয়েক বছর আগে মম্ একটি উইল তৈরী করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে—তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে একটি ট্রাস্ট তৈরী হবে এবং এই ট্রাস্ট পৃথিবীর সমস্ত দেশের দরিদ্র লেখকদের সাহায্য করবে।

মমের কাহিনীর অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ—কবিতা ছাড়া অনেক কিছুই লিখেছেন। কিন্তু ওঁর প্রতিভার একটি এমন লক্ষণীয় দিক ছিল যা এ

যুগের অনেক শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরের সঙ্গে পাশাপাশি বিচার করলে বিস্মিত হতে হয়। এটা হ'লো সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে মমের দক্ষতা। মম্‌কে বলা হয় ইংরেজ মোপাসাঁ, কিন্তু আবার তাঁর Of Human Bondage এ শতাব্দীর একখানা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তাঁর বেশির ভাগ নাটকই মঞ্চে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আবার সিনেমাতেও তাঁর কাহিনী জনপ্রিয়তায় অতুলনীয়। রেডিও এবং টেলিভিশনেও আগ্রহভরে মানুষ তার কাহিনী শোনে। বিভিন্ন মাধ্যমে কাহিনী পরিবেশনের এই যে দক্ষতা, এটা নিঃসন্দেহে তুলনাহীন।

মমের কথা শুনে মনে হয় লেখার অভ্যাস যাঁদের একবার হয়েছে, তাঁরা বোধ হয় না লিখে থাকতে পারেন না। লেখার কাজটা এঁদের জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠে। বেঁচে রইবো অথচ লিখবো না এ রকম একটা অবস্থার কথা এঁরা ভাবতেই পারেন না। লেখার নেশা মমের প্রায় পঁচাত্তর বছরের, কিন্তু লেখাকে পেশা করে নেন প্রায় পঁয়ষট্টি বছর ধরে এবং সেই থেকে দুটো মহাযুদ্ধের সময় কিছুদিনের জন্য তাঁর লেখার রুটিনের কিছু হের ফের হয়েছে, তা' ছাড়া এই দীর্ঘকাল ধরে লেখার ব্যাপারে নির্দিষ্ট একটা রুটিন অনুসরণ করে চলেছিলেন মম্‌। ঘুম থেকে ওঠবার অভ্যাস ছিল মমের খুব ভোরবেলায়। প্রাতঃকৃত্য শেষ করে সামান্য কিছু খাবার খেয়ে নিতেন, তারপর পড়তে বসতেন। ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা দেড়েক সাধারণতঃ কঠিন কোন বিষয়ে পড়াশুনোয় ডুবে থাকতেন—গ্রীক নাটক বা দর্শনশাস্ত্রের এমন কোনো বই যা পড়ার পরে রীতিমতো মস্তিষ্ক চালনার প্রয়োজন হয়। পড়া শেষ করবার পর কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পদচারণা করতেন মম্‌, তারপর সকাল ঠিক সাড়ে আটটার সময় লেখবার ঘরে প্রবেশ করতেন। দু' ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা —এমন কি চার ঘণ্টাও এক নাগাড়ে লিখতেন কোনো কোনো দিন।

এমন ধারা কঠোর লেখবার রুটিন অনুসরণ করা সত্ত্বেও এক সময় মম্‌ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, অবিচ্ছিন্নভাবে লেখার ধারা বজায় রাখতে না পারলে পৃথিবীর মানুষ হয়তো তাঁকে ভুলে যাবে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে A Writer's Notebook প্রকাশিত হয়। এ বইয়ের এক জায়গায় মম্‌ লিখেছেন: 'দিনকাল যা পড়েছে, তাতে অবিশ্রান্তভাবে লিখে যেতে না পারলে লোকে নিশ্চয়ই ভুলে যাবে আমাকে। এবং এইভাবে কিছুদিন চলবার পর যখন হঠাৎ একদিন 'দি টাইমস' খবর ছাপবে যে, সমারসেট মম্‌

মারা গেছেন, তখন পাঠক আশ্চর্য হয়ে যাবেন—ওঃ ভদ্রলোক তাহলে বেঁচে ছিলেন এতদিন।' কিন্তু মমের এ আশঙ্কা একেবারেই অমূলক প্রমাণিত হয়েছে। এখনো বছরের পর বছর তাঁর বিভিন্ন বইয়ের নতুন সংস্করণ বের হচ্ছে এবং তাঁর জনপ্রিয়তাও ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। সবশেষে একটা কথা মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক। প্রশ্নটা হলো: বিশ্বসাহিত্যে মমের স্থান কোথায়? প্রতিভার স্তর-বিন্যাসে মম্ কাদের আগে বা পরে? এ সম্বন্ধে বিভিন্ন সমালোচকের বিস্তর লেখা আছে। তবে নিজের সম্বন্ধে মমের নিজের অভিমতই খুব সম্ভব সবচাইতে চমৎকার। The Summing Up-এ এক জায়গায় মম্ বলেছেন: 'খুব শক্তিশালী লেখকেরা ইটের দেওয়াল ভেদ করেও তাঁদের দৃষ্টির প্রসার ঘটাতে পারেন।…কিন্তু আমি ততটা চক্ষুষ্মান নই।' (The greatest writers can see through a brick-wall…My vision is not so penetrating.)

ই. এম. ফরস্টার

গত দু'শো কি আড়াইশ' বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, বয়স এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে জাতি হিসেবে ইংরেজরা মোটামুটি দু' ভাগে বিভক্ত। এক হ'লো যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ; আর দ্বিতীয় হ'লো ভদ্র, শান্তিপ্রিয় ইংরেজ। সাম্রাজ্যবাদের শুধু সমর্থক বললে সাধারণভাবে যা বোঝায় তা' নয়—রীতিমতো বেপরোয়া সাম্রাজ্যবাদী, সাম্রাজ্যের জন্যে আন্তরিক গর্ববোধ করতেন বা এখনো করে থাকেন প্রথমশ্রেণীর কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যেও ইংলণ্ডে এরকম অনেককেই দেখা গেছে এবং এখনও যাচ্ছে। ব্যাপারটা যতই দুঃখজনক হ'ক না কেন, অত্যন্ত সত্য। বলাই বাহুল্য, দ্বিতীয় দলে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক নন, এমন কি সক্রিয়ভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী, ভদ্র এবং শান্তিপ্রিয়দের মধ্যেও নিঃসন্দেহে অনেক প্রথম শ্রেণীর ইংরেজ সাহিত্যস্রষ্টাকে আমরা পেয়েছি। ই. এম. ফরস্টার এই শেষোক্ত দলেরই একজন।

প্রথম জীবন—এডোআর্ড মরগ্যান ফরস্টার (Edward Morgan Forster, 1879) ইংলণ্ডের এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে ছাত্রাবস্থাতেই দেখা গিয়েছিল ফরস্টার স্কুলপাঠ্য বইপত্র ছাড়াও নানা দেশের, বিশেষ করে ইতালীর গল্পের বই একান্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়াশুনো করছেন। কলেজ জীবনে এসে দেখা গেলো বি.এ. পাস করবার আগেই সাহিত্য সম্পর্কে এমন বিচিত্র বই এতো প্রচুর পরিমাণে পড়া শেষ করে ফেলেছেন যে, অনেক বয়স্ক ব্যক্তি এমন কি অনেক তরুণ অধ্যাপকের পক্ষেও শোনবার মতো অনেক কথাই বলতে পারেন উনি।

পড়াশুনো শেষ করবার পরে কর্মজীবনে ফরস্টার একজন অধ্যাপক বা সাহিত্য সমালোচক হবেন—বাড়ির লোকজনের এই রকমই ধারণা ছিল। উনি যে সৃষ্টিধর্মী কোনো কিছু লিখতে পারবেন কখনো, এ কথা কারুরই মনে হয়নি সে সময়ে। ফরস্টার কিন্তু বি.এ. ক্লাসের ছাত্র অবস্থাতেই একটু একটু করে লেখা আরম্ভ করলেন। কয়েকটি ছোটো গল্প লেখা শেষ করে বিরাট একখানা উপন্যাস লেখবার পরিকল্পনাও করে ফেললেন। ফাইন্যাল বি.এ. পরীক্ষা সামনে, কাজেই কয়েক মাসের জন্যে এ উপন্যাসখানা লিখতে আরম্ভ করেও বন্ধ রাখলেন। বি.এ.

পাস করবার পরে অনেক রকমের বই-ই ফরস্টার লিখেছেন, কিন্তু এ উপন্যাসখানায় আর হাত দেন নি। পরবর্তীকালে লেখক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার পরে, বন্ধু-বান্ধব, পত্র-পত্রিকার সম্পাদকগণ এবং প্রকাশকেরা অনেক সময় ফরস্টারকে জিজ্ঞাসা করেছেন, প্রথম পরিকল্পিত উপন্যাসখানার কি হ'ল? ফরস্টার সকলকেই এক কথা বলে থাকেন উত্তরে, ওখানা আর লেখা হবে না, কারণ প্রেরণা পাই না। যা কিছু হ'ক না কেন লেখা সম্পর্কে প্রেরণা লাভের জন্য এই যে ঐকান্তিকতা এটা ফরস্টারের একটি প্রধান লক্ষণীয় বিষয়।

কেমব্রিজের কিঙ্‌স কলেজের ছাত্রাবস্থাতেই জি. এল. ডিকিনসনের সঙ্গে ফরস্টারের পরিচয় হয়েছিল। এবং মূলতঃ ডিকিনসনের প্রেরণাতেই বি. এ. পাস করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফরস্টার ছোটো গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন। এই সময়কার ছোটো গল্পগুলির বেশির ভাগই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট রিভিয়্যু পত্রিকায় বের হয়েছিল।

বিভিন্ন পত্রিকায় কয়েকটি ছোটো গল্প এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পরে একদিন শোনা গেলো ফরস্টার ঘোষণা করেছেন যে উনি ইংলণ্ড ছেড়ে চলে যাবেন। চলে যাবেন ইতালীতে। এবং ইতালীতে এসে ইতালীয় নাগরিকত্বলাভের চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ কি না ইতালীকেই তিনি নিজের দেশ বলে গ্রহণ করবেন। কেউ মন্তব্য করলেন ইংলণ্ডের রাজনীতি সম্পর্কে ফরস্টার বিরক্ত হয়ে উঠেছেন, তাই স্থায়ীভাবে দেশ ত্যাগ করতে চাইছেন। কেউ বা বললেন ভেতরে কিছু একটা গুরুতর ব্যাপার আছে, এই রকম আর কি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এর কোনোটাই সত্য নয়। আসল কথা হচ্ছে বিংশ শতাব্দী শুরু হবার আগেই ফরস্টারের বয়স কুড়ি পূর্ণ হয়ে যায় এবং শিল্পসাহিত্যের দিক থেকে ইতালীর শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে যে প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছিল, তাতে যে কোনো তরুণ সাহিত্যস্রষ্টা মাত্রেই ইতালীর প্রতি একটা আন্তরিক আকর্ষণ বোধ করতেন। আগেই বলেছি, প্রধানতঃ ইতালীয় সাহিত্যপাঠের ফলেই ফরস্টারের সাহিত্যপ্রীতি জন্মায় এবং কার্যতঃ সাহিত্যসাধনার শুরু হয়। ইতালীতে এসে বসবাসের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিলো সর্বক্ষণের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশের সান্নিধ্য অনুভব করা—যাতে তাঁর সাহিত্যকর্ম ব্যাহত না হয়।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরস্টার ইতালীতে চলে এসেছিলেন। এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। এই তিন বছরে ইতালীর বিভিন্ন আর্ট-গ্যালারী, কাব্য ও সাহিত্যের মহারথিগণের স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্যমণ্ডিত ইতালীর বিভিন্ন দ্রষ্টব্য অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বলাই বাহুল্য, লেখা এবং পড়াশুনোর কাজও সেই সঙ্গে চলতে লাগল। তিন বছর ইতালীতে কাটাবার পরে ফরস্টার যে আবার স্বদেশে ফিরে গিয়েছিলেন তার একটা কারণ ছিল। বয়স এবং অভিজ্ঞতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটা উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য রচনার জন্যে বিশেষ কোন স্থানে বসবাস করা একান্ত অপরিহার্য নয়। বরং এই রকম একটা পরিবেশ অনিষ্টই করে, কারণ এর ফলে ক্রমশঃ এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যে পরিবেশের একটু পরিবর্তন হলেই তখন চিন্তাধারার দৌর্বল্য দেখা দেয়, এমন কি একেবারেই শক্তিহীন হয়ে পড়ে। ফরস্টার তাই ঠিক করলেন সাহিত্য সাধনায়ই তিনি লিপ্ত থাকবেন এবং বিশেষ কোনো অবস্থার কাছে নতি স্বীকার না করেই, আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করবেন।

সাহিত্যসাধনার শুরু—ইতালীতে থাকবার সময় ফরস্টার মোট তিনখানা বই লিখেছিলেন—দু'খানা উপন্যাস 'হোয়েয়ার এঞ্জেলস ফিয়ার টু ট্রেড' (১৯০৫); 'এ রুম উইথ এ ভিউ' (১৯০৮); এবং কিশোরদের জন্যে এনিডের একটি সংস্করণ (১৯০৬)। ফরস্টারের এই প্রথম উপন্যাস দু'খানারই পটভূমি ইতালী। বেশির ভাগ সমালোচকই এই উপন্যাস দু'খানাকে গতানুগতিকের পর্যায়ে ফেলেছেন। ফরস্টারের তৃতীয় উপন্যাস 'দি লঙগেস্ট জারনি' প্রকাশিত হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। কেম্ব্রিজের জীবনযাত্রাই এ উপন্যাসের উপজীব্য। এই বছরই একটা কলেজে ফরস্টার একটি লেকচারারের পদ লাভ করেন। এবং কিছুদিন যোগ্যতার সঙ্গে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফরস্টারের চতুর্থ উপন্যাস 'হোআর্ডস এণ্ড' প্রকাশিত হয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। অনেকের মতেই প্রথম পাঁচখানির মধ্যে এই বইখানাতেই ফরস্টারের নিজস্বতার কিছুটা প্রকাশ ঘটলো।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ফরস্টার তাঁর একমাত্র নাটক 'দি হার্ট অব বোসনিয়া' প্রকাশ করলেন। এ সময়ে ফরস্টারের বয়স ঠিক তেত্রিশ, সাহিত্যসাধনার প্রথম দশ বৎসর কেটে গেছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা মহলে বোদ্ধা, পণ্ডিত

এবং সাহিত্যরসিক বলে বেশ কিছুটা খ্যাতিও হয়েছে ওঁর। যে কোনো সভা-সমিতিতে গেলে সকলে খাতির করে। বিশেষ সম্মানের সঙ্গে আসনলাভ করেন উনি, কিছু বলবার জন্যে অনুরুদ্ধও হন। কিন্তু তবু যুবক ফরস্টারের মুখ-চোখে একটা দারুণ ম্রিয়মাণভাব। মনে আদৌ কোনো ফুর্তির লক্ষণ নেই, কোথাও গেলে কিছুমাত্র শান্তি পান না। সর্বক্ষণ দারুণ একটা অস্থিরতা—একটা যেন স্থায়ী মাথার যন্ত্রণা পেয়ে বসেছিলো ওঁকে। অনেকেই আড়ালে-আবডালে আলোচনা করে থাকেন—কি ব্যাপার? কেউ মন্তব্য করেন—ব্যাপার আর কি, ইতালীতেই কিছু একটা ব্যাপার-স্যাপার ঘটেছিল আর কি! অর্থাৎ কি না প্রণয়ঘটিত ব্যাপার নিশ্চয়ই। কিন্তু ফরস্টারের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁরা জানতেন যে সে-কথা সত্যি নয়। তবে সত্যি কথাটা কি? কোনো অসুখ-বিসুখ? না, তাও নয়। বোধ হয় মাত্র একজন ব্যক্তিই জানতেন ফরস্টারের এই স্থায়ী বিমর্ষতার কারণ। তিনি হলেন ফরস্টারের অকৃত্রিম সুহৃদ ডিকিনসন। ডিকিনসনই শুধু জানতেন যে ফরস্টারের পড়াশুনো কতো ব্যাপক। কতো সব দুরূহ দুরূহ বিষয় উনি জানেন এবং বোঝেন। এবং সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, ডিকিনসন এ কথাও জানতেন যে প্রকৃতই উচ্চশ্রেণীর, স্থায়ী ধরণের কিছু সাহিত্য-সৃষ্টির জন্যে ফরস্টারের বাসনা কতখানি প্রবল। অথচ কার্যতঃ পেরে উঠছেন না। পর পর এতগুলি বই প্রকাশিত হলো, কিন্তু সমালোচকগণ কোনোখানাকেই ভালো বলতে পারলেন না। চলনসই মাত্র। তার বেশি কিছু নয়। প্রকাশক মহলে সকলেই শ্রদ্ধার চোখে দেখেন ওঁকে। কিন্তু বইগুলি মোটেই বিক্রি হচ্ছে না, এ কথা লজ্জার সঙ্গেই প্রত্যেকে জানাতে বাধ্য হন, কারণ সেইটেই সত্য কথা। ক্রমশই ফরস্টার নিজের সামর্থ্য সম্বন্ধে হতাশ হয়ে উঠছিলেন। এমন সময় একটা ব্যাপার ঘটলো।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সুহৃদ ডিকিনসন কার্যোপলক্ষ্যে ভারতবর্ষে আসবেন। কথায় কথায় একদিন বললেন: 'চলো না আমার সঙ্গে, কিছুদিন একটু অন্যভাবে কাটানো যাবে। শোনা যায় পূর্বের দেশগুলির নানা লক্ষণীয় দিক আছে এবং বিশেষত্বও কম নেই। আর তা' ছাড়া ভারতবর্ষ তো পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যদেশগুলির অন্যতম। কাজেই, একবার ঘুরে আসলে লাভ ছাড়া ক্ষতি কিছু হবে না।' ফরস্টার রাজী হয়ে গেলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের

শেষের দিকে ভারতবর্ষে চলে এলেন ওঁরা। এবং নানা জায়গায় বেড়ানোর পরে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি ভারত ত্যাগ করলেন।

এই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে ফরস্টারের জীবনে খুব সম্ভব সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য একটা ব্যাপার সংঘটিত হলো। ভারতবর্ষে বেড়াবার সময় প্রত্যহ রাতে উনি সেদিনের সমস্ত কাজকর্মের ডায়েরী লিখতেন। পথ-ঘাট, প্রাকৃতিক দৃশ্য, নদ-নদী, মঠ-মন্দির-মসজিদ, ক্লাব-রেস্তোরাঁ-মজলিস, রাজনৈতিক তথা ধর্মসম্বন্ধীয় সমাবেশ, ব্যবসা-বাণিজ্যের ধরন-ধারণ, সাধারণ এবং অসাধারণ মানুষ জন সব কিছুই ফরস্টার যেমন দু' চোখ মেলে দেখতে লাগলেন, ঠিক তেমনিভাবে ডায়েরীতে লিখতে লাগলেন।

প্রথমবারের ভারত ভ্রমণ শেষ করে দেশের উদ্দেশে যাত্রা করলেন ফরস্টার। ইচ্ছে যে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশও দেখবেন। ঘুরতে ঘুরতে উনি যখন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন, ঠিক সেই সময়ে ইয়োরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ বেধে গেলো। কিছুকালের জন্যে দেশে ফেরা স্থগিত রাখতে হলো। যুদ্ধের জরুরী প্রয়োজনে আলেকজান্দ্রিয়াতেই অসামরিক কর্মচারী হিসেবে যুদ্ধের কাজে লেগে গেলেন উনি। এবং কিছুদিন এখানে থাকবার পরে 'ইজিপশিয়ান মেল' দৈনিক পত্রিকায় লেখা পাঠাতে আরম্ভ করলেন। এর বেশির ভাগই হলো 'ফিচার'-ধর্মী রচনা—ছোটো ছোটো এবং সরস। পরে এই রচনাগুলি দু'খানা বই আকারে প্রকাশিত হলো—'ফারোস এণ্ড ফারলিন' (১৯২৩) এবং 'আলেকজান্দ্রিয়া: এ হিষ্ট্রি এণ্ড গাইড' (১৯২২)।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরে ফরস্টার লণ্ডনে ফিরে এলেন। এবং নিউ স্টেটসম্যান এবং স্পেকটেটরের জন্যে ফিচার লিখতে শুরু করলেন। তারপর কিছুকাল ডেইলী হেরাল্ডের সাহিত্য সম্পাদকের কাজও করলেন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের পর ফরস্টার যদিও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাদিতে বিস্তর লিখেছেন এবং বইও বেরিয়েছে দু'খানা, কিন্তু গল্প বা উপন্যাস একখানাও প্রকাশ করেননি। এমন কি পাণ্ডুলিপি কিছু তৈরী আছে বলেও কারো জানা নেই। এমন সময় একদিন শোনা গেল ফরস্টার আবার ভারতবর্ষে আসবেন। কি ব্যাপার? নিছক বেড়ানো না কি অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে? বিভিন্ন পত্রিকা, যাঁদের ফিচারের যোগান দেন ফরস্টার, তাঁরা সবাই জানতে ইচ্ছুক কারণটা। তাঁরা প্রায় সকলেই,

প্রকাশ্যে না বললেও মনে মনে ধরে নিয়েছিলেন যে, গল্প-উপন্যাস লেখা ফরস্টার ছেড়ে দিয়েছেন—সাহিত্য সমালোচনা এবং সম্পাদনাই তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং এই কাজেই তিনি আন্তরিক সন্তুষ্ট।

কিন্তু ফরস্টারের ঘনিষ্ট বন্ধু-বান্ধব কয়েকজন জানতেন, এ কথা সত্যি নয়। যা করে চলেছেন তা কিছুটা বাধ্য হয়েই করছেন, স্বেচ্ছায় এবং আনন্দের সঙ্গে করছেন না। এবং প্রথম যৌবনের বাসনা, কিছু স্থায়ী সাহিত্য-সৃষ্টি করবার আকাঙ্ক্ষা থেকে তিনি কখনো একটুও সরে আসেননি। বরং ক্রমশঃ এ বিষয়ে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হচ্ছেন এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রায় নিয়মিত এইং অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে আসছেন। এই হলো ফরস্টারের 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া'—অমর উপন্যাসখানির পূর্ব কথা।

প্রথমবার বেড়াতে এসে ফরস্টার ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বিরাট জনসমষ্টির যেটুকু ব্যক্তিগত ভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন (যা তাঁর ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ ছিল) সেইটুকুই ভিত্তি করে নিয়ে ফরস্টার ভারতের সমসাময়িক প্রসঙ্গ সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশুনো করলেন দীর্ঘ সাত-আট বছর যাবৎ। কি ভারতের সমস্যা। ভারতীয়েরা ইংরেজদের কি চোখে দেখে একদিকে ফরস্টার তা বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন, অন্যদিকে দুই ধরণের ইংরেজ যারা ভারতে কাজকর্মে লিপ্ত অর্থাৎ ভারত সাম্রাজ্যের সঙ্গে যাদের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এবং স্বদেশবাসী সাধারণ ইংরেজ—এরা কে ভারতবাসীদের কি চোখে দেখে, কোথায় তার ত্রুটি, কী ভাবে এই দুই দেশের সাধারণ মানুষদের মধ্যে প্রকৃত সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে—এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কেই ফরস্টার বিশদভাবে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এবং এ সমস্ত কিছুকে একটা মনোরম এবং স্বাভাবিক কাহিনীর মধ্যে কি করে ফুটিয়ে তোলা যায়, সে সম্পর্কেও ভাবতে লাগেলেন। আট বছরের চেষ্টায় এ কাজ যখন তাঁর সমাপ্ত প্রায়, তখন অর্থাৎ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ফরস্টার তাঁর কালজয়ী উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে দ্বিতীয়বার ভারত পরিদর্শনে এলেন নিজের লেখায় মারাত্মক কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাচ্ছে না কি তা ঝালিয়ে দেখবার জন্যে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের সময়। কাজেই ফরস্টার এমন একটা সময়ে এসে উপস্থিত হলেন এ দেশে, যে, এ দেশের মানুষকে পুরোপুরি সক্রিয়ভাবে দেখবার সুযোগ পেলেন।

ইংলণ্ডে ফিরে যাবার আগেই ফরস্টারের এই নতুন উপন্যাসের কথা এত জানাজানি হয়ে গেলো যে পাঠক এবং সমালোচক তথা রাজনৈতিক মহলও সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো, কবে উপন্যাসখানা ছাপার অক্ষরে বই হয়ে বেরুবে সেই জন্যে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে যেদিন ফরস্টারের 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' আত্মপ্রকাশ করলো তখন যুগপৎ দু'টো ব্যাপার ঘটলো। প্রথমত ফরস্টার যে একজন প্রথম সারির ঔপন্যাসিক এ কথা সমস্ত মহলে স্বীকৃতি-লাভ করলো—যে জন্য বিগত পঁচিশ বছর তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে আসছেন। আর দ্বিতীয় ব্যাপারটি হলো—এক শ্রেণীর ইংরেজ, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ইংরেজরা ফরস্টারের প্রতি বিরূপ হয়ে গেলেন। কারণ ফরস্টার তাঁর এ উপন্যাসে ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা এবং অপরিহার্যতার কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন। শুধু তাই কেন, ভারতের স্বাধীনতা দাবী করলেন বলতে হয়।

যাই হক ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরস্টারের সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ দু'টি পদক দেওয়া হয়।

এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া—ফরস্টারের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি এ উপন্যাসের কাহিনী নিম্নরূপ।

একেবারে শুরুতেই দেখা যায় কয়েকজন শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভারতীয় পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করছেন। বিষয়: ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়গণের প্রকৃত অন্তরের সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব কি না তাই। প্রত্যেকেই বিভিন্ন ধরনের যুক্তির অবতারণা করতে লাগলো। কারো কথাই একেবারে ভুল নয়। প্রত্যেকের বক্তব্যেই যথেষ্ট চিন্তার খোরাক আছে। গায়ের চামড়ার পার্থক্য, ধর্ম-সংস্কৃতি আচার-আচরণের বৈষম্য সত্ত্বেও সাধারণভাবে মানুষ হিসেবে একটু স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের পথে যে কতো রকম প্রত্যক্ষ প্রতিবন্ধক রয়েছে, কতো মিথ্যে এবং ভিত্তিহীন ভুল ধারণা রয়েছে উভয়ের মনেই (অর্থাৎ ইংরেজ ও ভারতীয় মনে) তা' একে একে অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন ফরস্টার।

ডাঃ আজিজ কিছুটা ভাবুক প্রকৃতির কবিত্বশক্তির অধিকারী একজন যুবক। পেশাগতভাবে শল্যচিকিৎসক হলেও জগৎ ও জীবনের অনেক কিছু সম্পর্কেই তাঁর প্রচুর আগ্রহ। এবং অন্যদিকে অন্তরে অন্তরে ভারত-প্রেমিক। সাধারণত ভারতপ্রেমিক বলতেই যেমন ইংরেজ বিদ্বেষী

বোঝায়, আজিজ ঠিক তা নয়। ইংরেজদের মধ্যেও যে ভারতবর্ষ এবং ভারতীয়গণ সম্বন্ধে দু'টো মত, চাই কি দু'টো দল আছে, এ বিষয় আজিজের জানা আছে। কাজেই ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশার সময়ে ও এ জিনিষটা খেয়াল রেখেই চলে। এই যুবক আজিজের সঙ্গেই এক মসজিদের পথে দেখা হয়ে গেলো ইংলণ্ড থেকে ভারতে আগতা এক ভদ্রমহিলা মিসেস মুরের সঙ্গে। দেখা গেল মিসেস মুর ভারতীয় প্রথার প্রতি শ্রদ্ধাবশত বলা মাত্রই মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশের সময় নিজের জুতো জোড়া খুলে রাখলেন। প্রাণবন্ত যুবক আজিজকে মিসেস মুরের খুবই ভালো লাগলো। এই বর্ষীয়সী মহিলা একেবারে প্রথম থেকেই আজিজকে স্নেহের চোখে দেখতে লাগলেন। বলাই বাহুল্য, মিসেস মুর হলেন ভদ্র, শান্তিপ্রিয় ইংরেজ। ভারতীয়দের ছোটো করে বা অবজ্ঞার চোখে দেখেন না। একেবারে সমান সমান ভাবে আজিজকে উনি দেখতে লাগলেন। প্রভু ও দাসের সম্পর্কের কথা ওদের স্পর্শ করলো না।

আজিজ মিসেস মুরের কাছেই শুনলো উনি কেন ভারতে এসেছেন। উনি ভারতে এসেছেন ওঁর ছেলে রনির কাছে। রনি চন্দ্রপুর শহরের ম্যাজিষ্ট্রেট। মিসেস মুরের সঙ্গে ইংলণ্ড থেকে আরও একজন এসেছে। সে হলো মিস আডেলা কোয়াসটেড। ভারতে আসবার প্রধান উদ্দেশ্য হলো রনির সঙ্গে আডেলার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল কিছুদিন ধরে, তার একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করা। আডেলা শুনেছে রনি ভারতবর্ষে কি চাকরী করে, কতো বেতন পায় ইত্যাদি সব। কিন্তু ওকে বিয়ে করে ভারতের মতো একটা দূরের দেশে বাসা বাঁধবার আগে আডেলা কর্মরত অবস্থায় একবার রনিকে তো দেখতে চায়ই, সেই সঙ্গে ভারতবর্ষ দেশটা কেমন, তাও একবার দেখা দরকার। এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস সম্ভব কি না স্বচক্ষে দেশটাকে এবং এখানকার মানুষজনকে না দেখে আডেলা সিদ্ধান্ত করতে নারাজ। তাই ভারতে আসা।

ভারতে আসবার কয়েকদিনের মধ্যেই মিসেস মুর এবং আডেলা দু' জনেরই প্রবল আগ্রহ দেখা দিলো সত্যিকারের ভারতবর্ষকে, ভারতের সাধারণ মানুষকে দেখবার জন্যে।

চন্দ্রপুরের ইংরেজ এবং এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়—বারটন পরিবার, লেসলী পরিবার বা ক্যালেণ্ডার পরিবার এঁরা কেউই স্থানীয় জনসাধারণের

সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে মেলামেশা করেন না। শহরের একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারী একটা তাস খেলার আয়োজন করলেন। মিসেস মুর এবং আডেলাও সেখানে উপস্থিত। খেলার আগে এবং পরে ঐ সরকারী কর্মচারী এবং তাঁর স্ত্রী নেহাৎ ঘরোয়া পরিবেশে উপস্থিত ভারতীয়দের সঙ্গে যে রকম প্রভুর মতো আচরণ করলেন তা দেখে মিসেস মুর এবং আডেলা দু'জনেই ব্যথিত হলো। নিজের ছেলের তরফ থেকেও এই আচরণ দেখে মিসেস মুর আরো দুঃখিত হলেন। এ রকম অভব্য আচরণ কেন? ভারতীয়রা কি মানুষ নয়? জিজ্ঞাসিত হয়ে রনি বললো: 'আমি খ্রীষ্টান পাদ্রী নই, লেবার পার্টির কোনো সভ্য নই বা ভাববিলাসী কবি-সাহিত্যিকও নই। আমি শাসক, একজন সরকারী কর্মচারী মাত্র। আমার ওপরওয়ালারা ভারতীয়দের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করে থাকেন ঠিক সেই রকমটি করতে আমি বাধ্য। তার বেশি কিছু করি না, কম কিছু করলে চাকরীতে উন্নতির আশা নেই। সুতরাং...'

মিঃ ফিল্ডিং শহরের একটি স্কুলের শিক্ষক। আজিজের সঙ্গ ওঁর হৃদ্যতা জন্মে। মিঃ ফিল্ডিং-এর বাড়ীতে বসেই মিসেস মুর এবং আডেলার সঙ্গে অনেকক্ষণ নানা কথাবার্তার পর ঠিক হলো যে ওঁরা দু'জন মারাবার গুহা দেখতে যাবে। আজিজ কেবল সঙ্গে যাবে ওঁদের দেখাশুনোর জন্যে। এটা বন্ধুভাবে সাহায্য করা ব্যতীত কিছু নয়। আজিজ সানন্দে ওঁদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু প্রথম গুহাতে ঢুকবার পরেই মিসেস মুর দারুণ ভয় পেয়ে গেলেন। অন্ধকারের ভেতর কিছুক্ষণ কাটাবার ফলে রীতিমতো অবসন্ন হয়ে পড়লেন। উনি বেরিয়ে এলেন গুহা থেকে এবং বললেন যে আর ভেতরে যাবেন না। আডেলা তারপরেও আরো একটি গুহায় প্রবেশ করলো এবং যথাসময়ে বেরিয়ে এলো।

তারপরের ঘটনাবলী একটা নতুন মোড় নিলো দেখা যায়। কারণ আডেলার ধারণা হয়েছিল যে আজিজ নিশ্চয়ই অন্ধকার গুহার মধ্যে ওকে অনুসরণ করেছিল কোনো একটা কুমতলবে। এই রকম একটা অভিযোগ করে প্রকাশ্য আদালতে আজিজের নামে আডেলা মামলা সুরু করে দিলে। ছোট্ট শহর চন্দ্রপুর তোলপাড়। ইংরেজ এবং ভারতীয় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই দারুণ উত্তেজনা। ইংরেজরা আজিজের যাতে সর্বোচ্চ শাস্তি হয় তার জন্যে সমবেতভাবে চেষ্টা করতে লাগলো। ভারতীয়গণ—এই মিথ্যে

অভিযোগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে লাগলো। যে কোনো সময়ে একটা ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা বেধে যেতে পারে—জাতি বিদ্বেষের বন্যা এইরকম একটা অশুভ ইঙ্গিত দিতে লাগলো। কালা আদমী হয়ে খাঁটি ইংরেজের মেয়ের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি—এ কিছুতেই মার্জনা করা যেতে পারে না। দেখা গেলো ইংরেজ নির্বিশেষে সকলেই এবার একজোট হয়ে গেছে। এবং ভারতীয়রাও নিজেদের এক দলভুক্তই মনে করতে লাগলো। পথে-ঘাটে, দোকানে-বাজারে, ক্লাবে-রেস্তোরাঁয় নানা গুজব রটতে লাগলো। সকলেই অধীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলো বিচারে কি হয় সেই জন্যে।

নির্ধারিত বিচারের দিনে ঘটলো এক তাজ্জব ব্যাপার। প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়িয়ে আডেলা ঘোষণা করলো যে, ওর একটা মনের ভ্রম হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত ব্যাপারটা ভালোভাবে চিন্তা করে এ বিষয়ে ও এখন নিশ্চিত হয়েছে যে আজিজ গুহার মধ্যে ওকে আদপেই অনুসরণ করেনি। কাজেই আদালত থেকে ও স্বেচ্ছায় আজিজের বিরুদ্ধে ওর যে অভিযোগ, তা তুলে নিলো।

ঘটনার এ আকস্মিকতায় অনেকেই বিস্মিত।

এরপর দেখা যাচ্ছে যে চন্দ্রপুরের সমস্ত শ্রেণীর ইংরেজ এবং ইয়োরোপীয়গণ আডেলার বিরুদ্ধে ক্ষোভে একেবারে ফেটে পড়লো। কারণ তারা যে প্রকৃতই ভারতীয় বিদ্বেষী এবার তা' একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে। এবং ব্যাপারটা প্রকট হয়ে পড়বার পরে কিনা আডেলা সত্যি কথাটা বলে দিলে! তারা সবাই বয়কট করলো আডেলাকে। মিঃ ফিল্ডিং আশ্রয় দিলেন ওকে। দেশে ফিরে যাবার আয়োজন সম্পূর্ণ হবার আগে কয়েকদিন ও মিঃ ফিল্ডিং-এর স্কুলের একটা ঘরে কাটাতে লাগলো।

চন্দ্রপুর শহরে আবার শান্তি ফিরে এলো। মিসেস মুর দেশে ফেরবার পথে মারা গেলেন। আডেলা রনিকে বিয়ে না করেই দেশে ফিরে গেলো। রনি এবং মিঃ ফিল্ডিং সরকারী হুকুমে অন্য একটা প্রদেশে স্থানান্তরিত হলো। আজিজ এবং মিঃ ফিল্ডিং পরস্পরকে ভুল বুঝল।

কিছুদিন পরে দেখা যায় আজিজের সঙ্গে মিঃ ফিল্ডিং-এর আবার দেখা হয়ে গেলো কিছুটা আকস্মিকভাবে একটা দেশীয় রাজ্যে। দু'জনেই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে লাগলো পূর্বের সৌহার্দ্য ফিরিয়ে আনবার

জন্যে, কিন্তু পারলো না। ওরা দু'জনেই বুঝতে পারলো: এখনো সময় আসেনি। ভুল বোঝাবুঝির মূল কারণ অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত—মানুষ হিসেবে সমপর্যায়ে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত—প্রকৃত হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। সে জন্যে আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতেই হবে।

ভারতীয় সমস্যা নিয়ে ভদ্র এবং শান্তিপ্রিয় শ্রেণীর ইংরেজরা এক সময় যে কতো গভীরভাবে চিন্তা করতেন 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' আজো তার সাক্ষ্য বহন করে। একদল ইংরেজ এ উপন্যাসখানাকে শ্রদ্ধার' সঙ্গে মাথায় ছুঁইয়েছেন, আর একদল বিনা বাক্যব্যয়ে জানালা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। আজ যখন হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে তোলবার পথে প্রতিবন্ধক সত্যি সত্যি অপসারিত হয়েছে, তখন আশা করা যায় ইংরেজ সম্পর্কে ভারতীয়গণের এবং ভারতীয়গণ সম্পর্কে ইংরেজদের নতুন করে মূল্যায়নের সময় এসেছে—এবং এবার উভয়ে মানুষ হিসাবে উভয়ের মর্যাদা রক্ষা করে পরস্পরের কাজে লাগতে পারবে।

ফরস্টার তৃতীয়বার ভারতে এসেছিলেন ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে, জয়পুরে অনুষ্ঠিত পি. ই. এন. ভারতীয় শাখার একটি অধিবেশনে আমন্ত্রিত হয়ে। চতুর্থবার, স্বাধীনতার পরে, ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে এসে বহু জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখে গেছেন। এই বছরই স্বদেশের সরকার (যাঁরা দীর্ঘকাল ফরস্টার সম্পর্কে বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করতেন) ফরস্টারকে 'অর্ডার অব দি কমপ্যানিয়ন্‌স অব অনার'—জাতীয় সম্মানে ভূষিত করেন। আজ তাঁর সাহিত্য প্রতিভা সর্বজন স্বীকৃত।

'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া'র পরে নতুন আর কোনো উপন্যাস ফরস্টার লেখেন নি। বোধ হয় লিখবেনও না। তবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাদিতে পূর্ব-প্রকাশিত কতকগুলি গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন বেরিয়েছে। এর মধ্যে গল্প সংগ্রহ 'দি ইটারন্যাল মোমেণ্ট' (১৯২৮) বিশেষ উল্লেখনীয়। 'এ্যাবিঙ্গার হারভেষ্ট' (১৯২৬) একটি প্রবন্ধ সংকলন। ফরস্টার রচিত ডিকিনসনের জীবনীও একখানি উল্লেখযোগ্য রচনা। সাহিত্য-সম্পর্কিত রচনা হিসেবে কয়েকটি বক্তৃতার সংগ্রহ 'এ্যাসপেক্‌টস্ অব দি নভেল,' ফরস্টারের সুচিন্তিত সাহিত্যাদর্শের নিদর্শন।

অলডাস হাকস্‌লি

আজকের পৃথিবীতে মানুষের জীবন নানা সমস্যার ভারে ভারাক্রান্ত। শুধু সমস্যা আর সমস্যা। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যা তো রয়েছেই—এককভাবে মানুষ যার কোনোই সমাধান করতে পারে না। কিন্তু তা' ছাড়া ব্যক্তি মানুষের জীবনেও নানা রকমের সমস্যা রয়েছে। এই বিভ্রান্তিকর সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়ার ফলে একটু সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে, শালীনতার সঙ্গে জীবনযাপনের আদর্শ আজকের দিনে নেহাৎ বইয়ের কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটু স্থিরভাবে চিন্তা করবার ফুরসৎ বলতে গেলে প্রায় কারোই নেই। সকলেই ব্যস্ত। প্রতি মুহূর্তে ব্যস্ত। যাকে বলে প্রাণ রাখতে প্রাণান্তকর অবস্থা!

অথচ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুচিন্তিত পদক্ষেপ এ যুগের মানুষের পক্ষে যতটা প্রয়োজন, দুশো কি পাঁচশো বছর তো দূরের কথা, খুব সম্ভব পঞ্চাশ বছর পূর্বেও ততটা ছিলো না।

ব্যক্তিগত এবং সাংসারিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় অধিকাংশ মানুষকেই ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে, কাজেই সমগ্রভাবে মানুষের কথা বা মানব সভ্যতার কথা ভাববার অবকাশ অধিকাংশেরই নেই।

প্রথম জীবন—অলডাস হাকস্‌লির (Aldous Leonard Huxley; 1894-1963) ব্যক্তিগত জীবনে সমস্যার সংখ্যা খুব বেশি নয়, মাত্র একটিই ছিল, কিন্তু সে অতি মারাত্মক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও গত পঁয়তাল্লিশ বছর কি তারও বেশি কাল ধরে উনি মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করে গেছেন। কখনো প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ, কখনো প্রীতিপূর্ণ পরামর্শ, কখনো নির্মম বিদ্রূপ করে হাকস্‌লি মানুষকে তার নিজের সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবার চেষ্টা করেছেন। কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা, জীবনী অর্থাৎ সাহিত্যের প্রায় সমস্ত বিভাগেই নিজের বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন এবং পৃথিবীর সর্বত্রই কনিষ্ঠ লেখকদের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তার করেছেন।

অলডাস হাকস্‌লির আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই ইংলণ্ডের হাকস্‌লি পরিবার স্বদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলো। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এবং ইংরেজী ভাষায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের অন্যতম প্রবর্তক

টমাস হেনরী হাকস্‌লি ছিলেন অলডাস হাকস্‌লির ঠাকুরদাদা। আর বিখ্যাত 'কর্ণহিল' পত্রিকার সম্পাদক লেনার্ড হাকস্‌লি ছিলেন ওঁর বাবা। হাকসলির মাতৃকুলও ইংলণ্ডের একটি বিখ্যাত পরিবার। হাকস্‌লির মা ছিলেন স্বনামধন্য কবি, নাট্যকার ও সাহিত্য সমালোচক ম্যাথু আর্ণল্ডের ভাইঝি। হাকস্‌লির এক মাসি হামফ্রে ওয়ার্ড তাঁর সময়কার একজন জনপ্রিয় মহিলা-ঔপন্যাসিক ছিলেন। স্বনামধন্য বিজ্ঞানী জুলিয়ান সোরেল হাকস্‌লি অলডাস হাকস্‌লির বড় ভাই।

প্রথম জীবনে সাহিত্যিক হবার কোনো বাসনাই ছিলো না অলডাস হাকস্‌লির। স্কুলের ছাত্রজীবনে এগারো-বারো বছর বয়সেই হাকস্‌লির মনে ইচ্ছে জেগেছিল ভবিষ্যৎ জীবনে ডাক্তার হবেন। ভবিষ্যতে যাতে ডাক্তারী পড়তে সুবিধে হয় স্কুলের পড়াশুনোর গতিও সেইভাবে নির্ধারিত করা হয়েছিল। কিন্তু কয়েকটা বছর যেতে না যেতেই একটা মারাত্মক সমস্যা দেখা দিলো। আগেই বলেছি হাকস্‌লির ব্যক্তিগত জীবনে সমস্যার সংখ্যা খুব বেশি ছিল না; বলতে গেলে এই একটিই। কিন্তু এ অতি মারাত্মক সমস্যা। হাকস্‌লি অন্ধ হয়ে গেলেন। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ অন্ধ। সতেরো বছর পূর্ণ হবার কয়েক মাস আগের কথা। ডাক্তারবাবুরা বললেন চোখে ওঁর 'কেরাটাইটিস' হয়েছে, সারবে কিনা নিশ্চয়ই করে বলা যায় না, তবে চেষ্টা তো করতেই হবে! তাই শুরু হ'লো হাকস্‌লির চোখের চিকিৎসা। মাস দুই চিকিৎসা চলবার পরও যখন কিছুমাত্র উন্নতি হলো না চোখের অবস্থার, তখন প্রাণখুলে কয়েকটা দিন কাঁদলেন হাকস্‌লি, কিন্তু তারপরেই মনে মনে নিজেকে তৈরী করে নিলেন উনি। জ্ঞানলিপ্সু কিশোর হাকস্‌লি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন অন্ধ অবস্থাতেই পড়াশুনো চালিয়ে যাবার জন্যে। শুরু হলো 'ব্রেহলী' পদ্ধতি পড়াশুনো।

টাইপ ওঁর আগেই শেখা ছিল। পড়াশুনোর ব্যাপারে যখনই লেখবার কোনো প্রয়োজন দেখা দিতো, সে কাজ উনি 'টাইপ' করে সারতেন। জ্ঞানার্জনের লিপ্সা ওঁর এতই প্রবল ছিলো যে অন্ধ হয়ে যাবার পর আত্মীয়-স্বজন যাঁকেই যখন কাছে পেতেন, হাকস্‌লি অনুরোধ করতেন কিছু পড়ে শোনাবার জন্যে। সাধারণত বিজ্ঞানের বইয়ের দিকেই ঝোঁক ছিল ওঁর—অন্ধ হবার কয়েক মাস পর্যন্ত হাকস্‌লির বিশ্বাস ছিলো, যেভাবেই হ'ক ডাক্তারী পড়া যাবে। দৃষ্টিশক্তিহীনতা যে ডাক্তারী পড়ার পক্ষে কতো বড়ো

প্রতিবন্ধক, সে কথা উপলব্ধি করবার মতো বাস্তববুদ্ধিটুকু সে সময়ে ওঁর নিশ্চয়ই হয়েছিলো। কিন্তু মানুষের এমনই স্বভাব যে রূঢ় সত্যকে বেশির ভাগ সময়েই সে এড়িয়ে চলতে চায়, এটা নিঃসন্দেহে অবচেতন মনেরই খেলা।

হাকস্‌লির অভিভাবকস্থানীয়রা শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন যে ওঁর রুচি-প্রবৃত্তির ওপর কোনো রকম জবরদস্তি না করে বরং স্বেচ্ছায় উনি কোন্‌ দিকে এগোতে পারেন অন্ধতা সত্ত্বেও সেইটে দেখা যাক। ঠিক হলো ওঁর পড়াশুনোর অভ্যাসটা কাজে লাগাতে হবে। কাজেই বিজ্ঞানের বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগলো আরো পাঁচ রকমের বই— জীবনী, ইতিহাস, গল্প, উপন্যাস, নাটক, ভ্রমণকাহিনী। আর তা' ছাড়া সঙ্গীতচর্চার আয়োজনও হলো কিছু কিছু। বিশেষ করে পিয়ানো এবং বেহালা। কণ্ঠসঙ্গীত চর্চার জন্যও পরিবারের লোকজনেরা ক্রমাগত উৎসাহ জোগাতে লাগলেন ওঁকে।

এইভাবে মাস দুই চলবার পর একটা পরিবর্তন দেখা দিলো হাকস্‌লির রুচিতে। এই পরিবর্তনের কথা হাকস্‌লি নিজেও বলেছেন পরবর্তী জীবনে। বলেছেন: 'ছিলাম পুরোপুরি বহির্মুখীন, আর সাহিত্য পাঠের ফলে যেন আকস্মিকভাবেই রাতারাতি হয়ে পড়লাম অন্তর্মুখীন।' সবাই আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন হাকস্‌লির মধ্যে একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন। প্রায় সময়েই গুন্‌ গুন্‌ করে গান গাইছেন, ছোটো ছোটো কবিতা রচনা করেছেন, এমন কি নিজে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলবার চেষ্টা করছেন, চাই কি টাইপ-রাইটারে ছোটো কয়েকটা গল্প লিখেও ফেললেন।

ক্রমশঃ সাহিত্যকে হাকস্‌লি ভালোবাসতে আরম্ভ করেছিলেন এবং বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলা বা লেখার মধ্যে যে একটা এ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ আছে, কিশোর হাকস্‌লির এই জিনিসটা সব চাইতে ভালো লাগলো। এই ক' মাসে যে কয়েকটা গল্প উনি মুখে মুখে 'বানালেন' বা টাইপ করে লিখলেন সে নেহাৎ ছোটো। বলতে গেলে দু' মিনিটে ফুরিয়ে যায়, পড়তে গেলে বড় জোর মিনিট পাঁচেক লাগে। মোটা মোটা উপন্যাসগুলিতে অন্ধ কিশোর হাত বুলোতেন আর মনে মনে ভাবতেন এই রকম মোটা মোটা কাহিনী কি ইচ্ছে করলে তৈরী করা যায় না? হাকস্‌লি অনুভব করলেন যেন ভেতর থেকে কে চ্যালেঞ্জ করছে। কখনো মনে হয় এটা সাধ্যের অতীত কাজ, কখনো মনে হয় একটু চেষ্টা করলেই পারা যাবে। এমন কিছু অসাধ্য নয়। কাউকে কিছু বললেন না প্রথমটা, একা একা মনে মনে ভেবে নিলেন কি

লিখবেন ভাই। দিন পনরোর মধ্যে ঠিক হয়ে গেলো একটা কাহিনী। শেষ পর্যন্ত টাইপ মেশিন নিয়ে বসলেন হাকস্‌লি। শুরু হ'লো অন্ধ কিশোরের সাহিত্য সাধনা। মাস দেড়েকের মধ্যে হাকস্‌লি শেষ করলেন তাঁর উপন্যাস।

মাস কয়েক পরের কথা। একদিন সকাল বেলা চীৎকার করে উঠলেন হাকস্‌লি—আলো, আলো, আমি আলো দেখতে পাচ্ছি।

একটুক্ষণের মধ্যে এসে জড়ো হ'লেন বাড়ীর সবাই। খবর দেওয়া হ'লো ডাক্তারবাবুদের। একজন ডাক্তারবাবু পকেট থেকে 'ম্যাগনিফায়িং' গ্লাসখানা বের করে হাকস্‌লির হাতে দিয়ে খবরের কাগজখানা এগিয়ে দিলেন চোখের সামনে। বললেন—পড়ো তো খবরের কাগজখানা। হাকস্‌লি 'ম্যাগনিফায়িং' গ্লাসের সাহায্যে খবরের কাগজের নামটা অনায়াসেই পড়ে দিলেন। উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ডাক্তারবাবুরা। একজন বললেন—এখন মনে হ'চ্ছে ওর চোখ ভালো হয়ে যাবে। একেবারে স্বাভাবিক না হ'ক অন্তত অন্ধ-দশায় ওকে কাটাতে হবে না। আরো মাস তিনেক পরের কথা। একদিন পরীক্ষার পরে ডাক্তারবাবুরা ঘোষণা করলেন যে হাকস্‌লির অন্ধত্ব ঘুচে গেছে। এখন বলতে হবে ওর দৃষ্টি শক্তি দুর্বল, এইমাত্র—তার বেশি কিছু নয়। কারণ দেখা গেলো খবরের কাগজের হেডিং বা সাবহেডিং খালি চোখেই পড়তে পারছেন উনি আর 'ম্যাগনিফায়িং' গ্লাস এর সাহায্যে খবরের কাগজের ভেতরের অংশও নির্ভুল ভাবেই পড়তে পারছেন।

দু'বছর অন্ধ হয়ে থাকবার পর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার কথা হাকস্‌লি নিজেই বলে গেছেন যে—এ আনন্দ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ডাক্তারবাবুরা জানালেন—দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো বটে, কিন্তু সারা জীবনই এ জন্যে খুব নজর রাখতে হবে। হাকস্‌লির জন্যে যে চশমার বন্দোবস্ত করা হ'লো তার কাঁচ প্রায় 'ম্যাগনিফায়িং' গ্লাসেরই মতো।

দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা দুঃখও পেলেন হাকস্‌লি। অন্ধ-অবস্থায় টাইপ করে যে উপন্যাসখানা রচনা করেছিলেন, অনেক খুঁজেও সেখানা পাওয়া গেলো না। বড়োরা উৎসাহিত করতে লাগলেন ওঁকে—ওখানা না পাওয়া গেলো তো হয়েছে কি। আরো তো কতো লিখবে তুমি।

আরো লিখবো?—প্রশ্নটা বারে বারেই ঘুরে ফিরে নাড়া দিতে লাগলো কিশোর হাকস্‌লিকে।

হাকস্‌লি নিজেই ঠিক করলেন সাহিত্য এবং ভাষাতত্ত্ব পড়বেন। আত্মীয়স্বজনেরা সকলেই সমর্থন জানালেন ওঁকে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হ'লেন হাকস্‌লি। এই সময়ে পুরু কাঁচের চশমা সর্বদাই ব্যবহার করতে হ'তো ওঁকে, কখনো কখনো ম্যাগনিফায়িং গ্লাসও ব্যবহার করতেন।

চোখের এই অসুবিধে সত্ত্বেও একুশ বছর বয়সে ভালোভাবেই বি.এ. পাশ করলেন হাকস্‌লি। এটা ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ইয়োরোপ তখন মহাযুদ্ধের আবর্তে দলিত মথিত হচ্ছিলো।

সাহিত্যসাধনার প্রথম পর্যায়—অন্ধ অবস্থায় যখন একটু একটু করে হাকস্‌লির রুচির পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা হচ্ছিলো কাব্য এবং অন্যান্য সাহিত্যগ্রন্থের সাহায্যে, সেই সময় হাকস্‌লি যে কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন তা আর বন্ধ হয় নি। দৃষ্টি ফিরে পাবার পরও প্রত্যহই লিখ্‌তেন কিছু কিছু—যার বেশির ভাগ নিজেই নষ্ট করে ফেলতেন। কিন্তু অক্সফোর্ডে ভর্তি হবার বছর খানেক পর থেকে হাকস্‌লি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে কবিতা পাঠাতে আরম্ভ করলেন। দু'বছরের মধ্যে এইভাবে ওঁর গোটাকুড়ি কবিতা প্রকাশিত হ'লো। তারপর বি. এ. পাশ করবার পরের বছর ওঁর প্রথম কবিতার বই ছাপা হয়ে আত্মপ্রকাশ করলো : 'দি বারনিং হুইল'। তার পরের দু'বছরও একখানা করে কবিতার বই প্রকাশিত হ'লো: 'জোনে' এবং 'দি ডিফিট অব ইয়ুথ'। হাকস্‌লির চতুর্থ কবিতার বই 'লেডা' প্রকাশিত হলো ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এবং পঞ্চম ও শেষ কবিতার বই বের হ'লো তার প্রায় এগারো বছর পরে।

কবি হিসেবে অলডাস হাকস্‌লির খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা তেমন কিছু নয়। যদিও ইংরেজী কাব্যের যোগ্য সমালোচক মাত্রেই স্বীকার করেছেন যে, হাকস্‌লির কবি-কর্ম নিঃসন্দেহে নিখুঁত। গদ্যের মতো ওঁর কবিতা-গুলিও বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল এবং বেশ একটা বিষাদের সুরে প্রায় প্রতিটি কবিতাই ঝঙ্কৃত। পরবর্তী জীবনে হাকস্‌লি নিজেও বলেছেন যে, 'অকস্মাৎ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে বসবার ফলে ভেতরে ভেতরে যে ক্ষোভ দেখা দেয়, জীবনের অনিবার্যতার প্রতি যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়, তার ফলে আবেগের

স্রোত যেন হঠাৎ থমকে গেলো। বুদ্ধি দিয়ে, বিচার করে সব কিছু বুঝবার আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা একটু অল্পবয়সেই দেখা দিয়েছিলো।' ফরাসী থেকেও কিছু-কিছু কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন হাকস্‌লি, বিশেষ করে ম্যালার্মের।

আজকের দিনে হাকস্‌লির যে খ্যাতি তা প্রধানত ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার হিসেবে, কবি হিসেবে নয়। যদিও ওঁর কবিত্বশক্তি বিদগ্ধ মহলে প্রথম থেকেই স্বীকৃতি লাভ করেছিলো।

গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধলেখক হিসেবে হাকস্‌লিকে বুঝবার স্থবিধের জন্যে ওঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমত: ১৯২০ থেকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উনি যা লিখেছেন; আর দ্বিতীয়তঃ ১৯৩২-এর পর থেকে শেষ পর্যন্ত যা লিখেছেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ওঁর প্রথম গল্পের বই 'লিম্বো' প্রকাশিত হ'লো। দ্বিতীয় গল্পের বই 'মরটাল কয়েল' (১৯২২); তৃতীয় 'লিটল মেক্সিকান' (১৯২৪); চতুর্থ 'টু অব থি গ্রেসেস' (১৯২৪) এবং পঞ্চম 'রোটুণ্ডা' (১৯৩২)। ১৯৩২ সাল পর্যন্ত উপন্যাসও হাকসলি মোট পাঁচ খানাই লিখেছিলেন—'ক্রোম ইয়েলো' (১৯২১); 'এন্টিক হে' (১৯২৩); 'দোস ব্যারেন লীভস' (১৯২৫); 'পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্ট' (১৯২৮); এবং 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' (১৯৩২)।

এই গল্প ও উপন্যাসগুলিতে হাকস্‌লিকে দেখা যায় প্রধানতঃ সমালোচক-রূপে। একটা কাহিনীর কাঠামোর মধ্যে ফেলে মানব-জীবনের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির নির্মম ভাবে সমালোচনা করেছেন হাকস্‌লি। সাহিত্য, শিল্প, অর্থনীতি, ধর্ম, যৌন সম্পর্ক, প্রেম-ভালবাসা, রাজনীতি—কিছুই বাদ পড়েনি। মায় পোষাক-পরিচ্ছদ, চলা-ফেরা, পেশাজনিত ব্যক্তিজীবনের দ্বন্দ্ব—জীবনের সমস্ত দিকের অসঙ্গতিকে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। ওঁর এই প্রথম দিককার রচনাবলী ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে এতই সমৃদ্ধ যে অনেকেই হাকসলিকে স্বনামধন্য জোনাথান সুইফটের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ সময়কার অন্তত দু'খানা বই বিশ্বসাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছে—'পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্ট' এবং 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড'।

হাকস্‌লি যখন গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ লিখতে সুরু করলেন, ইয়োরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। অধিকাংশ পরিবারই শোকে মুহ্যমান। কেউ বাপ হারিয়েছে, কেউ ভাই, কেউ পুত্র, কেউ বা স্বামী।

যুদ্ধ যখন চলছিল তখন বড়ো বড়ো রাজনৈতিক নেতারা তথা মিলিটারীর বড়ো বড়ো সেনাপতিরা জোর গলায় বলতেন—এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ, এর পর সভ্য মানুষকে আর কোনো দিন পরস্পরকে ধ্বংস করবার জন্যে লড়তে হবে না। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটু যাঁরা চিন্তাশীল তাঁদের আর বুঝতে বাকী রইলো না যে নেতারা নেহাৎ ভাওতা দিয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধ, যাকে তাঁরা তখন জোর গলায় war to end war বলেছেন তা' নিতান্তই সাময়িকভাবে প্রেরণা জুগিয়ে প্রত্যেকের নিকট থেকে কাজ আদায় করে নেবার একটা ছল মাত্র। আরো ব্যাপক এবং মারাত্মক ধরণের যুদ্ধের ইঙ্গিত প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধিমানেরা পেয়েছিলেন।

যুদ্ধজনিত শোকের দহন কাটিয়ে উঠবার আগেই সাধারণ মানুষ বুঝতে পারলো যে তারা মিথ্যে কথায় ভুলে বা বাধ্য হয়ে নানা ত্যাগ স্বীকার করেছে। যুদ্ধ আবার আসছে। এ তো গেলো একদিকের কথা। আর একদিকের আঘাত তীব্রতর। যুদ্ধ থেমে যাবার পর জীবনটা খুব সুস্থ, সুন্দর এবং নিরুদ্বেগ হবার কথা ছিলো—অন্তত এই রকম জীবনের চিত্র বিভিন্ন দেশের প্রচার বিভাগ থেকে সাধারণ মানুষের সামনে রাখা হ'তো। কিন্তু যুদ্ধ থামবার পর কার্যত দেখা গেলো অসামরিক সাধারণ মানুষের জীবন কী ভীষণ দুর্বহ হয়ে উঠেছে। অসংখ্য নতুন নতুন সমস্যায় ছেয়ে ফেলেছে সমাজ-জীবন। অর্থনৈতিক সমস্যা একটা এমন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে যে পুরনো, অর্থাৎ যুদ্ধপূর্ব অবস্থার আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে পারিবারিক জীবনে। আগে মেয়েরা চাকুরী যে পরিমাণে করতেন, এখন তার চাইতে বহু গুণ বেড়ে গিয়েছে। ফলে শিশুদের জীবনযাত্রা এবং সাধারণভাবে সংসারযাত্রা একটা নতুন রূপ নিচ্ছে। মেয়েদের এই অত্যধিক বহির্মুখীনতার ফলে মেয়েদের নিজেদের জীবন-যাত্রায় যে আকস্মিক পরিবর্তন দেখা দিলো তার সঙ্গে থাপ খাইয়ে চলা অধিকাংশের পক্ষেই দুষ্কর হয়ে উঠলো—ফলে পুরনো শালীনতাবোধ এলো শিথিল হয়ে, নীতিবোধে দেখা দিলো অবজ্ঞার লক্ষণ, যৌন-অভীপ্সা সিদ্ধির ব্যাপক প্রয়াস দেখা দিলো সর্বত্র।

যে পতঙ্গ মৃত্যু অনিবার্য বলে জেনেছে তার সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় সে যেমন বেপরোয়াভাবে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এ-ও অনেকটা

তেমনি যেন। যুদ্ধ থেমে গেলেও সামাজিক জীবনযাত্রায় এমন একটা অনিশ্চয়তা দেখা দিলো যে, সাধারণ মানুষ, এককথায় বিভ্রান্ত হয়ে গেলো। শিল্প, সাহিত্য ও ধর্মের সব কিছুই নেহাৎ 'সেকেলে' হয়ে দাঁড়ালো অধিকাংশের কাছে; অথচ বর্তমানের কাজ চালাবার মতো 'রেডিমেড' আদর্শও কিছু নেই, অর্থাৎ ভাবের ঘরে শূন্য—অবস্থাটা যখন এই রকম, সেই সময় হাক্‌সলি আরম্ভ করলেন তাঁর সাহিত্যসাধনা। কাজেই জীবনের ভালোমন্দকে যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝবার চেষ্টা ওঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এদিক দিয়ে ওঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হলো 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট'।

পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্ট—এ কাহিনীটির সব ক'টি চরিত্রই ভদ্র এবং শিক্ষিত। চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য হলো এরা প্রত্যেকেই এক-একটি ভিন্নমুখী জীবনদর্শনের সমর্থক। পরস্পরের সঙ্গে সর্বদা নিজস্ব জোরালো মতবাদ নিয়ে বিতর্কে ব্যস্ত—তাই পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্ট। চরিত্রগুলির প্রত্যেকেই ঘোরতর অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত। যুক্তি আর আবেগ—কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টার কাছে সমর্পণ করা যায় নিজেকে? কোন্‌টা বেশি নির্ভরযোগ্য—যুক্তি না আবেগ? সকলেরই ভেতরে ভেতরে এই এক সমস্যা। শুধু একটি চরিত্রের (মার্ক র‍্যামপিয়ন) এই সমস্ত কোনো সমস্যাই নেই, জীবন এবং জগৎ সম্বন্ধে তার একটা স্থির ধারণা আছে। লর্ড এডওয়ার্ড ট্যাণ্টামাউণ্ট বিজ্ঞানভক্ত, তার মেয়ে লুসি মনে করে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ফুর্তি করে বেড়ানো। বারলপ ধার্মিক বেশে একজন পাকা ভণ্ড, নায়ক ফিলিপ কোয়ারেল্‌স একজন ভ্রমণ-বিলাসী পেশাদার লেখক—এইগুলি হচ্ছে উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র। সমস্যা-প্রধান এবং আলোচনামূলক উপন্যাস হিসেবে 'পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্ট' ইংরেজী সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ রচনা।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই প্রধানত যুদ্ধের প্রয়োজনে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি হতে থাকে। ছোটো-বড়ো আবিষ্কারের সংবাদ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে যেন প্রাত্যহিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবনের নানা দিকে বিজ্ঞানের এই ক্রমোন্নতি নিশ্চয়ই আশা এবং আনন্দের কথা। পঞ্চাশ বছর আগে যে সমস্ত ব্যাধিতে মৃত্যু অনিবার্য ছিলো, আজকের দিনে তার বেশীর ভাগই মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে। শিল্পের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক উন্নতি একদিকে যেমন প্রচুর উৎপাদন করছে, তেমনি নানা শিল্পের প্রসার ঘটায়

ফলে বহুলোকের কাজকর্মের সংস্থানও হয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটার বহু ভালো এবং খারাপ দিক আছে যার বিস্তারিত আলোচনার স্থান এ নয়। তবে মোটামুটিভাবে বলা চলে যে বিজ্ঞান ও শিল্পের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে যে-সব সমস্যা দেখা দিচ্ছে তার সমাধানের জন্যে অনুপ্রাণিত হয়েই হাকস্‌লি লিখলেন 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড'। নির্দিষ্ট কোনো সমাধান এ বইতে নেই। তবে বিজ্ঞানের অবাঞ্ছিত দিকগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাকস্‌লি এ যুগের মানুষকে সজাগ করে দিতে চেয়েছেন এই বইখানার সাহায্যে।

ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড—উপন্যাস বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়। কাহিনীভাগের চাইতে প্রবন্ধ-অংশই বেশি। বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর কী হাল হতে পারে, অর্থাৎ মানুষের জীবনে কি পরিবর্তন ঘটতে পারে সেই সম্বন্ধেই হাকস্‌লি অনুমান করবার চেষ্টা করেছেন। হাকস্‌লি বলেছেন আগামী যুগে শিল্পপতিরাই সমাজের আদর্শ পুরুষ বলে গণ্য হবেন। 'ডেমোক্রেসী' 'টেকনোক্রেসী'তে রূপান্তরিত হবে। অর্থাৎ কিনা মানবজীবনের সর্বত্রই যন্ত্রের প্রাধান্য দেখা দেবে। সত্য ও সুন্দরের আদর্শ ভুলে মানুষ সুখ এবং আরামের পূজারী হয়ে উঠবে। সাহিত্য এবং সুকুমার শিল্পের প্রচলন একেবারে বন্ধ হয়ে না গেলেও, শিল্পক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখবার জন্যে তা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে এবং সেন্সার করা হবে যে তা লোপ পাবারই সামিল হবে। এমন কি আজকের মানুষেরও যে সব নৈতিক আদর্শ আছে তাও থাকবে না। মা-বাপ থাকাটা সে সময়কার নাগরিকদের মধ্যে অসভ্যতা বলে গণ্য হবে—কারণ, বিজ্ঞানের কৃপায় আগামী সেই যুগে মানুষদের রীতিমতো যান্ত্রিকপদ্ধতিতে উৎপাদন করা হবে। এবং ব্যক্তির বিশিষ্টতার জন্যে শিল্পের যে অসুবিধে দেখা দেয় তা দূর করবার জন্যে মানুষের উৎপাদন করবার সময়েই প্রয়োজন অনুসারে শ্রেণীভাগ করে দেওয়া হবে। কয়েকটি নির্দিষ্ট 'টাইপের' যে মানুষ তৈরী করা হবে তাদের মধ্যে সবচাইতে চৌকসদের বলা হবে 'আল্‌ফা' আর নিকৃষ্টতমদের বলা হবে 'এপসাইলন'। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মানুষদের দিয়েই কায়িক শ্রমের কাজগুলি করানো হবে। বিয়ের বালাই থাকবে না। যৌন ব্যাপারে অবাধ মেলামেশা সর্বজনস্বীকৃত হবে। 'কারখানায়' যে সব শিশু তৈরী করা হবে তাদের লেখাপড়া শেখানো হবে ঘুমন্ত অবস্থায় বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে।

বিদ্রূপাত্মক রচনা হিসেবে 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' যে সুইফটের 'গালিভার্স ট্রাভেলস'-এর সঙ্গে তুলনীয় এ কথা ইংরেজী সাহিত্যের সমালোচক মাত্রেই স্বীকার করেছেন। সাধারণ পাঠকও এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। বিজ্ঞান যে মানবজীবনকে ভবিষ্যতে কিভাবে কতটা প্রভাবিত করবে তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ থাকতে পারে, কেউ হয়তো হাকস্‌লির ধারণা মেনে নেবেন, কেউ বা নেবেন না। কিন্তু যে সদিচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে হাকস্‌লি এ বই রচনা করেছেন তা' নিঃসন্দেহে লক্ষ লক্ষ পাঠককে মুগ্ধ করেছে, আজো করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। আমরা আগেই বলেছি একটু স্থিরভাবে চিন্তার প্রয়োজন এ যুগে সবিশেষ—যে কাজের জন্যে আমাদের মধ্যে বেশির ভাগেরই মোটেই সময় নেই। এ বই পড়বার পরে পাঠক যদি মানব-সমাজে বিজ্ঞানের প্রয়োগ কিভাবে এবং কতটা করতে হবে, এ কথা ভাবতে উদ্বুদ্ধ হ'ন তা'হলেই হাকস্‌লির শ্রম সার্থক হবে।

হাকস্‌লির এ বইখানাকে এক শ্রেণীর সমালোচক বিজ্ঞান-বিরোধী বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের তা' মনে হয় না। এই বিরূপ মন্তব্যের সাক্ষ্য স্বরূপ তাঁরা এর কাহিনীর পরিণতির কথা বলেন। এর কাহিনী অংশে দেখা যায় নায়ক স্যাভেজ (বর্তমান যুগের যে কোনো সাধারণ মানুষের মতো রুচি ও চিন্তাধারণা বিশিষ্ট) নায়িকা লিনিমার (আগামী যুগের 'ব্রেভ নিউ ওয়াল্ডে'র মানদণ্ডে সুসভ্য) যৌন-উন্মাদনার খপ্পরে পড়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে অনাগত 'ব্রেভ নিউ ওয়াল্ড' মানবসমাজের পক্ষে আত্মহত্যার সামিল হবে। বর্তমান সভ্যতার যুগে সমাজজীবনে যে সমস্ত বিষয় আমরা অনুসরণযোগ্য আদর্শ বলে গণ্য করি, সমাজজীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ যে রকম অব্যাহতগতিতে এবং বিশেষ চিন্তা না করেই চলতে দেওয়া হচ্ছে, তাতে এ রকম আশঙ্কা অমূলক নয় যে ভবিষ্যতে কোনোদিন বিজ্ঞানের বিশেষ কোনো কেরামতি দেখাবার জন্যে মানব-সভ্যতা বিপন্ন হয়ে পড়বে। হাকস্‌লি বইখানা লেখেন বহু বছর আগে, ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সময়ে যন্ত্র-দানব মানুষের সমাজজীবনে যতটা আধিপত্য করতো, আজকের দিনে এই বছরগুলির ব্যবধানে তার আধিপত্য বহুগুণে বেড়ে যায়নি কি? পঁয়ত্রিশ বছরেই যখন এতটা হতে পারলো তখন ১০০, ২০০, কি ৩০০ বছর পরে যন্ত্র-প্রধান অর্থাৎ বিজ্ঞান-প্রধান

মানব-সভ্যতা যে হাকস্‌লির আশঙ্কিত অবস্থার সৃষ্টি করবে না এ কথা জোর করে বলা যায় না।

হাকস্‌লির গল্প বা উপন্যাসের বেশির ভাগটাই থাকে প্রবন্ধের আকারে। অর্থাৎ লেখক তাঁর বক্তব্য পেশ করতে ব্যস্ত। প্লট যে একটা থাকে তার সার্থকতা প্রধানত প্রবন্ধের অংশকে জোরালো করবার জন্যেই। কাহিনীর মাধ্যমে রস-পরিবেশন কখনই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য নয়। কাহিনীটি সবদাই গৌণ।

প্রথম পর্যায়ের সাহিত্য-সাধনার কালে, অর্থাৎ ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হাকস্‌লি অনেকগুলি প্রবন্ধ সংগ্রহও প্রকাশ করেছিলেন ; যার মধ্যে 'অন দি মার্জিন' (১৯২৩) ; 'প্রপার ষ্টাডিজ' (১৯২৭) ; 'ভালগারিটি ইন লিটারেচার' (১৯৩০) ; এবং 'টেক্সটস্ এণ্ড প্রিটেক্সট্‌স' (১৯৩২) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেকেই মনে করেন যে শুধু এ যুগেরই নয়, ইংরেজী সাহিত্যে প্রবন্ধের ইতিহাসে যে কোনো প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধ লেখকের চাইতে হাকস্‌লি কোনো অংশে কম নন। বস্তুতপক্ষে প্রবন্ধের মধ্যে হাকস্‌লি নিজেকে যতটা পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারেন, ততটা বোধ হয় গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে পারেন না।

এই সময়ের মধ্যে দু'খানা ভ্রমণকাহিনীও রচনা করেছিলেন হাকস্‌লি। 'এ্যালঙ্‌ দি রোড' (১৯২৫) এবং 'জেষ্টিং পাইলেট' (১৯২৬)। দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর জন্যে একেবারে তরুণ বয়স থেকেই হাকস্‌লির একটা প্রচণ্ড আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। জীবনের শেষ পর্যন্ত সুযোগ পেলেই উনি নতুন কোনো একটা জায়গা থেকে ঘুরে আসতেন। তা সে দূর দেশই হোক বা নিজের দেশের বা শহরের কোনো নতুন পল্লীই হোক।

বি. এ. পাশ করবার পর হাকস্‌লি প্রথমে কিছুদিন সরকারী অফিসে কেরাণীর কাজ করলেন, তারপর কিছুদিন করলেন শিক্ষকতা। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে উনি বিয়ে করলেন লণ্ডনে বেলজিয়ান শরণার্থী পরিবারের একটি মেয়ে মেরিয়া নীস-কে। এই বছরই উনি শিক্ষকতায় ইস্তাফা দিয়ে বিখ্যাত 'এথেনিয়াম' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদকের কাজ নিলেন জন মিডল্‌টন মারে-র অধীনে। বছর দুই এই পত্রিকাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবার ফলে রকমারী লেখায় অভ্যস্ত হলেন হাকস্‌লি—সাহিত্য-সংবাদ, সাহিত্য-সমালোচনা, বই-সমালোচনা, সঙ্গীত-সমালোচনা, সাধারণ প্রবন্ধ

ইত্যাদি। এই সমস্ত লেখার অভিজ্ঞতা হবার ফলে অন্যান্য পত্রিকার তরফ থেকে লেখার তাগিদ আসতে লাগলো। শুধু লিখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করবার মতো রোজগার হ'তে লাগলো অল্পদিনের মধ্যেই। এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে হাকস্‌লি স্ত্রী এবং শিশুপুত্রটিকে নিয়ে চলে এলেন ইতালীতে। উদ্দেশ্য—প্রথমতঃ লরেন্সের (ডি. এইচ.) কাছাকাছি থাকা যাবে, আর দ্বিতীয়তঃ কিছুটা নিরিবিলি সাহিত্যচর্চা করা যাবে।

দেশ ভ্রমণের তাগিদটা হাকস্‌লির মধ্যে এতই প্রবল ছিল যে বেশিদিন এক জায়গায় চুপচাপ থাকতে পারলেন না। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে সস্ত্রীক বেরিয়ে পড়লেন পূর্ব দিকে। এই সময় কিছুদিন ওঁরা ইন্দোনেশিয়ায় কাটিয়ে যান, ভারতবর্ষেও ছিলেন কিছুদিন। হাকস্‌লি দ্বিতীয়বার ভারতে বেড়াতে এসেছিলেন ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালী ফিরে যাবার পর একাদিক্রমে চারটে বছর আবার লরেন্সের সান্নিধ্যে কাটালেন হাকস্‌লি। মাঝে মাঝে দু'জনে মিলে ফ্রান্স থেকেও বেরিয়ে আসতেন। হাকস্‌লি পূর্ব-সাধকগণের মধ্যে অনেক প্রথম শ্রেণীর লেখকের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। সুইফট্, ভলতেয়ার, ল্যাম্ব, হ্যাজলিট, বাটলার, পীকক প্রভৃতি অনেকের প্রভাবই দেখা যায়। কিন্তু এককভাবে বিচার করলে মনে হয় লরেন্সের প্রভাবই সর্বাধিক। দু'জনের সম্পর্ক যে কতটা গভীর ছিলো তা লরেন্স-পত্নী ফ্রিডার কয়েক বছর আগের একটি লেখা থেকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারা যায়। ফ্রিডা বলছেন—'স্বদেশের বিদেশের অনেকেই আসতেন আমার স্বামীর কাছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তাঁরা বুঝতে পারতেন না লরেন্সের ভাবধারণা। এর অঙ্গুলিমেয় ব্যতিক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হলেন অলডাস হাকস্‌লি।...

'ফলে তাঁরা বিরূপ হয়ে উঠতেন লরেন্স সম্পর্কে এবং দূরে গিয়ে অনেক সময় অবাঞ্ছিত মন্তব্য করতেন। এর একটা ব্যতিক্রম দেখতাম হাকস্‌লি পরিবার সম্পর্কে। মেরিয়া ও অলডাস ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শুনতেন আমার স্বামীর কথা এবং ওঁরা চলে যাবার পর লরেন্সের মুখ চোখ দেখলেই মনে হ'তো ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে পেরে উনি আন্তরিক তৃপ্তিলাভ করেছেন' (New Statesman and Nation, Aug. 13,1955)।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে 'পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্ট' এর মার্ক র‍্যামপিয়ন চরিত্রটি হাকস্‌লি লরেন্স-কে দেখেই সৃষ্টি করেছিলেন। এবং ফিলিফ কোয়ারেলস-এর মধ্যে উনি নিজেকে প্রতিফলিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

লরেন্স মারা যান ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে। তারপরই হাকস্‌লি ইতালী ছাড়লেন। চলে এলেন ফ্রান্সে। চার বছর কখনো ফ্রান্স, কখনো স্বদেশে কাটালেন। তারপর চলে এলেন পশ্চিম গোলার্ধ দেখতে। দুই আমেরিকার বিভিন্ন দেশে কয়েকদিন করে কাটাবার পর কয়েক মাস রইলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তারপর আবার স্বদেশে ফিরলেন। কিন্তু স্বদেশে ফিরেও এক জায়গায় থাকতে পারলেন না বেশিদিন। বিভিন্ন শহরে ঘুরলেন কিছুদিন, বার কয়েক ফ্রান্সে এলেন, তারপর ঠিক তিন বছর পরে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে এলেন। এবার মার্কিন দেশে আসবার অন্য একটা কারণও ছিলো দেশ ভ্রমণ ছাড়া, সে হলো চোখের সমস্যা। অন্ধত্ব ঘুচবার পর, অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি কিছুটা ফিরে পাবার পর থেকে বিগত ২৫ বছরে চোখের অবস্থাটা ক্রমশই ভালোর দিকে যাচ্ছিলো। কিন্তু লোকমুখে হাকস্‌লি শুনতে পেলেন যে ডাঃ বেট্‌স নামে এক ভদ্রলোক চোখের চিকিৎসার একটা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন এবং বহু লোককে অনিবার্য অন্ধত্বের কবল থেকে উনি রক্ষা করেছেন। একথা শুনবার পর আর কোনমতেই স্থির থাকতে পারলেন না হাকস্‌লি। মার্কিন দেশে এসে খুঁজে বের করলেন ডাঃ বেট্‌স-কে। এবং কয়েক মাস তাঁর চিকিৎসাধীন থাকবার পর আশ্চর্য ফল পেলেন। পুরু কাঁচের চশমা বদল করতে হ'লো। সাধারণ চশমাতেই কাজ চলে যেতে লাগলো ওঁর। এমনকি চলাফেরার জন্যে বা বড় টাইপের লেখা পড়বার জন্যে আর আদৌ কোনোরকম চশমার প্রয়োজন রইলো না। হাকস্‌লির মনে হলো যে চোখের অবস্থার আরো উন্নতির জন্যে অর্থাৎ স্বাভাবিক'দৃষ্টিশক্তি পুনরুদ্ধারের জন্যে ডাঃ বেট্‌স-এর কাছাকাছি থাকা দরকার। তাই উনি ঠিক করলেন স্থায়ী ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করবেন। কিছুদিন হোটেলে এবং ভাড়া বাড়ীতে কাটাবার পর লস্‌ এঞ্জেলস-এ হলিউড হিলস-এর-কোল-ঘেঁষা ছোট্ট একটি বাগান ঘেরা বাড়ী কিনলেন হাকস্‌লি। এটা ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সেই থেকে এইখানেই ছিলেন হাকস্‌লি। মাঝে মাঝে এদেশ-ওদেশ ঘুরতে বেরোলেও এইটেই ছিল ওঁর স্থায়ী ঠিকানা।

লস্ এঞ্জেলস-এ আসবার পর বিভিন্ন ছায়াছবি নির্মাতার হয়ে কিছু কিছু কাজ করেছেন হাকস্‌লি। তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় 'প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিস' এর কথা। এ ছবির চিত্রনাট্য হাকস্‌লির লেখা।

সাহিত্যসাধনার দ্বিতীয় পর্যায়—এবার আমরা হাকস্‌লির সাহিত্য-সাধনার দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা আলোচনা করবো। প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় আমরা দেখেছি সে সময়কার সমাজের চলতি অবস্থাকে হাকস্‌লি কোনো মতেই মেনে নিতে পাচ্ছেন না। যুদ্ধ এবং তার পরবর্তীকালের নানা জটিল সমস্যা এবং তার কোনো সহজ, সরল ও আশু সমাধানের লক্ষণ না থাকবার জন্যে যে হতাশা সাধারণ মানুষের মনে দেখা দিয়েছিলো, তার হাত থেকে মানব সমাজকে রক্ষা করবার উপায় হিসেবে হাকস্‌লি বিজ্ঞানের নানা ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে জোরালো ভাষা ও ভঙ্গিতে লিখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু স্পষ্টতই দেখা গিয়েছিল মানুষ সে কথায় কান দিলো না। সে সমস্ত সতর্কবাণীকে নেহাৎ সাহিত্যিকের খেয়াল বলে উড়িয়ে দিলো, কেউ বা বিজ্ঞান-বিরোধী বা প্রতিক্রিয়াশীল বলে বিরূপ সমালোচনা করলো—যদিও সাধারণভাবে ওঁর বইয়ের কাটতি হলো প্রচুর। বিশেষ করে 'পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্ট' এবং 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' তো লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হলো কয়েকটা বছরের মধ্যে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যে এ সব বইয়ের কথায় খুব গুরুত্ব দিচ্ছে না এ কথা হাকস্‌লির আর বুঝতে দেরি হলো না। ওদিকে ইতালীতে এবং জার্মানীতে ফ্যাসিবাদ এবং নাৎসীবাদ ক্ষমতা দখল করে নিলো। জাপান তো বেশ কিছুদিন ধরেই মহাচীনকে গ্রাস করবার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল এবং দিকে দিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমস্ত লক্ষণই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। মানুষের এবং তার শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার তা' হলে ভবিষ্যৎ কি? হাকস্‌লি প্রশ্ন তুললেন। বিভিন্ন ছোটো বড়ো লেখার মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্নটা তুলে ধরতে লাগলেন পাঠকের সামনে। কিন্তু বিশেষ ফল হলো না।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু লেখকই মার্কস্‌বাদকে মুক্তির উপায় বলে মনে করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু হাকস্‌লি মার্কসবাদেও আস্থাবান ছিলেন না।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল দারুণ বিরক্তি এবং প্রচণ্ড হতাশা হাকস্‌লিকে

মারাত্মকভাবে অন্তর্মুখীন করে ফেলেছে। হাকস্‌লি মরমী পন্থায় বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। এ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর উনি বরাবরই ভেবেছেন, কিন্তু এবার দৃঢ় হলো ওঁর বিশ্বাস। মরমীপন্থা (Mysticism) পৃথিবীতে এমন কিছু নতুন জিনিষ নয়। হাকস্‌লি দাবীও করলেন না জিনিষটা সম্পূর্ণ নিজস্ব বলে। বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভক্ত-সাধু-সজ্জনদের জীবনী-বাণী-আদেশ-উপদেশ এবং অনুশাসন খুঁজে খুঁজে পড়তে আরম্ভ করলেন। সাহিত্য এবং দর্শন চর্চা এবার যুগপৎ চলতে লাগলো।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সাহিত্যসৃষ্টি যে পুরোপুরিই উদ্দেশ্যমূলক সে কথা হাকস্‌লি খোলাখুলিভাবেই বলেছেন প্রথম থেকে। কারণ ওঁর অন্তরে যে বিপ্লব ঘটে গিয়েছিলো তার ফলে এ কথা বলতে উনি আর দ্বিধাবোধ করেননি যে নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টির নেশায় মশগুল হয়ে থাকলে মানুষের জীবন অদূর ভবিষ্যতেই যারপরনাই কুৎসিত হয়ে উঠবে। জীবনধারণের মোড় ফেরাতে না পারলে মানুষের আর কোনো আশা নেই। এবং একটা প্রগাঢ় ধর্ম বিশ্বাস ও মরমীপন্থার সাহায্যেই এটা সম্ভব বলে হাকস্‌লি দৃঢ়ভাবে স্বমত প্রকাশ করতে লাগলেন। তাই ওঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের সাহিত্যে সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে একটি কল্যাণের বাসনা ওৎপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে দেখা যায়। এই পর্যায়ের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'আইলেস ইন গাজা' (১৯৩৬); 'আফটার মেনি এ সামার ডাইস দি সোয়ান' (১৯৪০); 'টাইম মাষ্ট হ্যাভ এ ষ্টপ' (১৯৪৪); 'এপ এণ্ড এসেন্স' (১৯৪৮); 'দি ডেভিলস্ অব্ লাউডন' (১৯৫২) এবং 'দি ডোরস অব পারসেপশন' (১৯৫৪) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'আইলেস ইন গাজা,' 'আফটার মেনি এ সামার' এবং 'টাইম মাষ্ট লাভ এ ষ্টপ'-এ হাক্‌সলি উচ্চ মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিভিন্ন বিশ্বাস, আদপ-কায়দা এবং বহুলাংশে অর্থহীন জীবনধারণ পদ্ধতি, লোক-দেখানো প্রেম ও আভিজাত্য ও ভুয়া শিক্ষার গর্বের সমালোচনা করেছেন।

এপ এণ্ড এসেন্স—এ বইতে হাকস্‌লি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবীর একটি শহরের সম্ভাব্য পরিণতির চিত্র এঁকেছেন। ওঁর ধারণা ছিল যে দেড় শ' বছর পরে তৃতীয় মহাযুদ্ধ হবে। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তার আগেই ঘটবে ব্যাপারটা। এ উপন্যাসখানায় লস্ এঞ্জেলস্ শহরের যে বিধ্বস্ত অবস্থার কল্পনা করেছেন হাকস্‌লি, সে রকম অবস্থা বা তার চাইতেও খারাপ অবস্থা পৃথিবীর অধিকাংশ বড়ো শহরের ভাগ্যেই ঘটবে মনে হয়।

'আফটার মেনি এ সামার'-এ এক অপদার্থ কিন্তু ধনী পুস্তক প্রকাশকের ব্যাঙ্গাত্মক ভাবে চরিত্র এঁকেছেন হাকস্‌লি।

'গ্রে এমিনেন্স'—দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনাবলীর মধ্যে একখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। এখানা হ'লো একখানা জীবনী। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী অতীন্দ্রিয়বাদী ও রাজনীতিবিদ ফাদার জোসেফের জীবনকাহিনী লিখেছেন হাক্‌সলি তাঁর নিজের বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। হাক্‌সলির রচনার গুণে এ জীবনীখানা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

'দি ডেভিলস্‌ অব্‌ লাউডন'—ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত একখানা উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস। প্রাচীনকালে একটা মঠের একজন প্রকৃত ধর্মপ্রাণ-পুরোহিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনতার হাতে কী শোচনীয় ভাবে প্রাণ দিয়েছিলেন এ উপন্যাসে সেই কাহিনীর মাধ্যমে আচার-অনুষ্ঠান-সর্বস্ব ভুয়ো ধর্মের বিপরীত হিসেবে মরমী-পন্থা বা অতীন্দ্রিয়বাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন হাকস্‌লি।

হাকস্‌লি তাঁর ঠাকুরদা অর্থাৎ টি. এইচ. হাকস্‌লি সম্বন্ধেও বই লিখেছেন একখানা—'টি. এইচ. হাকস্‌লি এ্যাজ এ ম্যান অব লেটার্স' (১৯৩২)। অনেক সমালোচকের মতে টি. এইচ.-এর সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে এর চাইতে ভালো বই অদ্যাবধি কেউ লিখতে পারেন নি।

হাকস্‌লির একখানা বিচিত্র বই হ'লো 'দি আর্ট অব সিয়িং' (১৯৩৩)। যে দৃষ্টিশক্তি হাকস্‌লি একসময় হারিয়ে বসেছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যা হারাবার আশঙ্কায় ওঁর সমস্ত সত্তা সদা-উৎকণ্ঠিত ছিল—এই বইখানা সেই সমস্যার ওপরই রচিত।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে কোন প্রচেষ্টার পেছনে ছিল হাকস্‌লির অকুণ্ঠ সমর্থন। এবং নিজে এ জন্যে দু'খানা উল্লেখযোগ্য বইও রচনা করেছিলেন—'এ্যান এনসাইক্লোপিডিয়া অব প্যাসিফিজম্‌' (১৯৩৭) এবং 'সায়েন্স, লিবার্টি এণ্ড পীস' (১৯৪৭)।

নাটক—হাকস্‌লি নাটক লিখে গেছেন দু'খানা—'দি ডিসকভারি' (১৯২৪) এবং 'দি ওয়ার্ল্ড অব লাইট' (১৯৩১)। তা' ছাড়া 'লিম্বো'র প্রকাশিত একটি গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন—'দি গিয়োকণ্ডা স্মাইল' (১৯৪৮)। এই কাহিনীটির যখন পরে ছায়াছবি করা হ'লো 'এ উয়োম্যান্‌স ভেনজেন্স' নামে তখন তার চিত্রনাট্যও হাকস্‌লিই লিখে দিয়েছিলেন।

হাকস্‌লির দর্শন-চিন্তায় ভারতীয় ভাবধারার প্রভাব—শেষ জীবনে লস্ এঞ্জেলস্-এর বাড়ীতে বসে হাকস্‌লি প্রধানত পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকতেন। শেষের দিকে লেখা অনেক কমিয়ে দিয়েছিলেন, তবে কিছু কিছু লিখতেন। ওঁর প্রধান দর্শনের বইখানা—দি **পেরেনিয়াল ফিলসফি**—যদিও ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিলো, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এর প্রতিটি নতুন সংস্করণ উনি পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে গেছেন।

বর্তমান সভ্যতাকে সংকটের হাত থেকে রক্ষা করবার নিশ্চিত উপায় হিসেবে হাকস্‌লি অতীন্দ্রিয়বাদী হয়ে উঠেছিলেন। এবং এ ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাস যে কতো দৃঢ় তা 'দি পেরেনিয়াল ফিলজফি'র পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন। পরাজিতের মনোভাবের চাপে এটা কোন আকস্মিক বা সাময়িক মনোবিকার নয়। দেশ-বিদেশের অতীন্দ্রিয়বাদীদের অভিজ্ঞতা ও বাণী দীর্ঘকাল ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভ্যাসের পরে হাকস্‌লি তাঁর এই বইখানা রচনা করেছিলেন। প্রাচীন চীন ও খ্রীষ্টান জগতের এবং মধ্যযুগের অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছ থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করেছিলেন হাকস্‌লি। তবে, এ ব্যাপারে ওঁর সবচাইতে বেশি ঋণ ভারতবর্ষের কাছে। ভারতের উপনিষদ, গীতা, বেদান্ত, বুদ্ধের শিক্ষা ও কবীরের বাণী প্রভৃতির প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে হাকস্‌লি তাঁর অতীন্দ্রিয়বাদ ব্যাখ্যা করেছেন এবং বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এ বইয়ের একটি বিশেষত্ব এই যে যদিও একখানা পুরাদস্তুর দর্শনের বই, কিন্তু হাকস্‌লি এ বই লিখেছিলেন সাধারণ পাঠকের জন্যে। তাই এ বইয়ের রচনা পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ ও সরল।

দার্শনিক হিসেবে হাকস্‌লির নিজস্ব মতামত কি? উনি কি ভাববাদী না বস্তুবাদী? ভাববাদী তো নিশ্চয়ই। কিন্তু তারপরে ওঁকে আর শ্রেণীভুক্ত করার কাজটা প্রকৃতই দুঃসাধ্য। কারণ যেহেতু ওঁর আসল পরিচয় হলো যে উনি অতীন্দ্রিয়বাদী, সেই জন্যে ভাববাদীদের নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণীতে ওঁকে ফেলা দুষ্কর। কখনো উনি কবীরকে অনুসরণ করে বলছেন—একের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখো, দ্বিতীয়ে, তৃতীয়ে পরমেশ্বরকে খুঁজলে প্রতারিত হবে। এ সময়ে নিশ্চয়ই ওঁকে অদ্বৈতবাদী মনে হবে। কিন্তু, আবার যখন ছান্দোগ্য উপনিষদের শ্বেতকেতুর লবণের উপাখ্যান পাঠকের সামনে রেখে প্রশ্ন করেন—লবণজল ফেলে দেবার পরও লবণাক্ত স্বাদটা যায় না কেন? ঈশ্বর হলেন ঐ স্বাদটার মতো। তখন অবশ্যই ওঁকে সর্বেশ্বরবাদী

(Pantheist) মনে হবে। এভাবে হাকস্‌লিকে বুঝতে চেষ্টা করা বৃথা—বরং এইটাই ওঁর পক্ষে সবচাইতে বড়ো পরিচয় যে উনি অতিন্দ্রিয়বাদী।

এমন কথা যেন কেউ মনে না করেন যে হাকস্‌লি সন্ন্যাসাশ্রম বা বৈরাগ্যে বিশ্বাসী ছিলেন। না তা নয়। উনি নিজে পুরাদস্তুর সংসারীই ছিলেন। এবং উনি বিশ্বাস করতেন যে সংসারী থেকে ঈশ্বরোপাসনা করা খুবই সম্ভব।

হাকস্‌লি লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে খুবই ভালোবাসতেন। কিন্তু আবার এমন কথাও বলতেন যে—লোকে পাঁচজনের সঙ্গে মেশে ছু' কারণে, হয় সস্তা আনন্দের শরিক হবার জন্যে, আর না হয় তাদের আনন্দের খোরাক জোটাবার জন্যে, কিন্তু আমি এর কোনোটাই পছন্দ করি না।—(থিম্‌স এণ্ড ভেরিয়েশনস্‌)

আজকের পৃথিবীর সর্বত্র অবাঞ্ছিত বস্তুতে আকীর্ণ। অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি প্রতি মুহূর্তে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রায় অসম্ভব করে তুলছে। কিন্তু তবু সে সব দূর করবার জন্যে কোনো রকম অশিষ্ট, অভব্য পদ্ধতি বা জবরদস্তি করার উনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। হাকস্‌লি বলতেন—'উদ্দেশ্যটা কত বড় বা কত মহৎ তার উপর প্রকৃত মহত্ত্ব নির্ভর করে না। কি উপায়ে আমরা ঐ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে অগ্রসর হচ্ছি সেইটেই হ'চ্ছে আসল কথা।'—(এণ্ডস্‌ এণ্ড মিনস্‌)

একাধারে কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, সাহিত্য-সমালোচক ও দার্শনিক অল্‌ডাস হাকস্‌লি প্রায় আটচল্লিশ বছর ধরে নানা বিষয় চিন্তা করে গেছেন এবং এখনো করছেন। প্রতিটি বিষয়ে তাঁর চিন্তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা দেখলে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে মাথা নুয়ে আসবে। অতীন্দ্রিয়বাদী হিসেবে বিখ্যাত হবার পর থেকে এক শ্রেণীর সমালোচক আজকের দিনে সাহিত্যিক হিসেবে হাকস্‌লিকে যথাযোগ্য স্থান দিতে নারাজ দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে হাকস্‌লি হঠাৎ একদিন অতীন্দ্রিয়বাদী হয়ে পড়েন নি—যদিও এ বিষয়ে তাঁর প্রসিদ্ধিটা কিছু বিলম্বে হয়েছিল। শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির মূলমন্ত্র হিসেবে এ সম্বন্ধে প্রথম জীবনে হাকস্‌লি যা লিখেছিলেন, সে কথার মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। হাকস্‌লি লিখেছিলেন—'সুন্দর যদি শুধু সৌন্দর্যের জন্যেই পূজিত হয়, কোনো উচ্চতর নীতিবোধ বা দার্শনিক প্রেরণা এবং উদ্দেশ্য যদি তার ভেতর না থাকে, তাহ'লে সে সৃষ্টিকে আমরা অবশ্যই নিকৃষ্ট বলবো এবং তাকে এড়িয়ে চলা উচিত।'—(প্রপার ষ্টাডিজ)

অস্কার ওয়াইল্ড

আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজধানী ডাবলিন নগরীর একজন অত্যন্ত অবস্থাপন্ন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত শল্য-চিকিৎসকের পুত্র অস্কার ওয়াইল্ড (Oscar Fingall O' Flahertie Wills Wilde ; 1854—1900) বিংশ শতাব্দী শুরু হবার পূর্বেই দেহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর নানা বিচিত্র গল্প ও কাহিনী, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং সর্বোপরি নাটকগুলির যে প্রভাব তা' বিংশ শতাব্দীরই বিষয়। এ প্রভাব যেমন সাহিত্যসাধকগণের মধ্যে দেখা গিয়েছিলো বা এখনো দেখা যায়, তেমনি সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও।

প্রথম জীবন—অস্কার ওয়াইল্ড ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজের পড়াশুনা শেষ করবার পরে অক্সফোর্ডের ম্যাগডালেন কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। এখানেও ছাত্র হিসেবে অস্কার ওয়াইল্ড অধ্যাপকমণ্ডলী তথা ছাত্রসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। পড়াশুনোয় মনোযোগ এবং মেধার জন্যে ওঁকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন অধ্যাপকগণ এবং নানা বিষয়ে, বিশেষ করে শিল্প এবং সাহিত্য বিষয়ে বিচিত্র সমস্ত ধারণা দেখে বিস্মিত হতো সমবয়সী ছাত্রগণ।

গোটা জীবনটাকেই একটা 'আর্ট'-এ রূপান্তরিত করবার জন্যে অস্কার ওয়াইল্ডের যে সাধনা তার সূচনা অক্সফোর্ডে ছাত্রাবস্থায়ই শুরু হয়েছিল। একেবারে শৈশব থেকে প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ অস্কার ওয়াইল্ড যৌবনের শুরু পর্যন্ত নানা খেয়ালের মধ্যে কাটাবার পরে এক সময়ে, অর্থাৎ নিজের দায়িত্ব যখন নিজে নেবার সময় এলো তখন দেখা গেলো বেশ কিছুটা বিপন্ন। কারণ, জীবন সম্পর্কে ওঁর বিচিত্র ধারণাবলীর তেমন সমর্থক জুটলো না। কয়েকটা বছর নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে কাটাবার পরে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তেত্রিশ বছর বয়সে উনি একটা সাময়িক পত্রিকার (The Woman's World) সম্পাদকের চাকরী নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ছাত্রজীবনেই ইংরেজি সাহিত্যের সেরা বইগুলি পড়ে ফেলেছিলেন অস্কার ওয়াইল্ড; এবার ফরাসী সাহিত্যপাঠে মনোনিবেশ করলেন। ফরাসী ভাষা ওঁর বেশ ভালোই জানা ছিলো।

সাহিত্যসাধনার শুরু—অস্কার ওয়াইল্ডের প্রথম বই কয়েকটি কবিতার সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল ওঁর সাতাশ বছর বয়সে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ ওঁর

সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর ছিলো বলতে হয়। কারণ, এই বছরই ওঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গল্পগুলির প্রথম কয়েকটি, যথা, 'লর্ড আর্থার স্যাভাইলস্ ক্রাইম', 'দি ক্যান্টারভিলি গোস্ট', 'দি মডেল মিলিওনেয়ার' প্রকাশিত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে অস্কার ওয়াইল্ড আরো যে সমস্ত ছোটো বড়ো গল্প রচনা করেছিলেন তার মধ্যে কয়েকটি বিশ্বসাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছে। যেমন, 'দি হ্যাপি প্রিন্স', 'দি ইয়ং কিঙ', 'দি ডিভোটেড ফ্রেণ্ড', 'দি ফিশারম্যান এণ্ড হিজ সোল', 'দি সেলফিশ জায়াণ্ট', 'দি বার্থ ডে অব ইনফ্যাণ্টা' এবং 'দি স্টার চাইল্ড' প্রভৃতি।

দি পিক্‌চার অব ডোরিয়ান গ্রে—এই দীর্ঘ কাহিনীটি বিশ্বসাহিত্যের একখানা বিশিষ্ট সৃষ্টি। যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে যে কোন পরিণত বয়স্ক লোক একটু ভেবে দেখলেই অবিশ্বাস্য মনে হবে এইরকম একটি কাহিনী আশ্চর্যভাবে পরিবেশন করলেন অস্কার ওয়াইল্ড অভূতপূর্ব লিপিকুশলতার সঙ্গে। এ রচনাটি প্রকাশ হবার পর থেকে অস্কার ওয়াইল্ডের Convincing Style দেশ-বিদেশের তরুণ সাহিত্যস্রষ্টাগণের অনুশীলনের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। এর কাহিনী অংশে দেখা যায় বেসিল হলওয়ার্ড নামে একজন বয়স্ক শিল্পী ডোরিয়ান গ্রে নামে একজন তরুণের ছবি আঁকছে। সৌন্দর্য সাধক এই তরুণ ছবিটি শেষ হবার পরে দেখে বিস্ময়ে বলে উঠলো: 'আমি যা প্রতিদিন খোয়াব তা কেন এর মাঝে অক্ষয় হয়ে থাকবে? প্রতিটি মুহূর্ত যেমন যেমন আমাকে ক্ষয় করছে ঠিক তেমনি একে সমৃদ্ধ করছে। ওঃ, যদি ঠিক এর বিপরীতটি হতো! যদি ক্ষয় হতো চিত্রটির আর আমি থাকতে পারতাম অক্ষয় হয়ে!' এই বিচিত্র অভীপ্সাটি একটা অত্যাশ্চর্য উপায়ে সিদ্ধ হয়েছিল। এই অবিশ্বাস্য কাহিনীটি শুনলে বিশ্বাস হয় না, কিন্তু পড়লে বেশ কিছুকাল মনে হয়, হ্যাঁ লেখক যা বলেছেন তাই সত্য। এইটেই হলো অস্কার ওয়াইল্ডের বৈশিষ্ট। Illusion সৃষ্টি করতে ওঁর সমান দক্ষতা বিশ্বসাহিত্যের আসরে কদাচিৎ দেখা গেছে।

কিন্তু এ হলো অস্কার ওয়াইল্ডের প্রতিভার একটা মাত্র দিক।

সাহিত্যচিন্তার বৈশিষ্ট্য—'আর্ট ফর আর্টস্ সেক' থিয়োরীর সর্বাপেক্ষা উদ্যোগী প্রচারক হিসেবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে অস্কার ওয়াইল্ড ইউরোপের সাহিত্যের আসরে রীতিমত একটা আলোড়ন সৃষ্টি

করেছিলেন। ওয়াইল্ড যখন আসরে নামলেন, শিল্প-সাহিত্যের নানা বিভাগের বিচক্ষণ সমালোচক হিসেবে তখনকার ইউরোপে রাস্কিনের প্রতিষ্ঠাই সর্বাধিক ছিল। রাস্কিন সুন্দরের পূজারী ছিলেন সত্য, কিন্তু সৌন্দর্যতত্ত্বকে তিনি একটা গভীর নীতিবোধের ওপর গড়ে তুলেছিলেন। শিল্প-সাহিত্য যদি মানুষের নৈতিক তথা সামাজিক প্রয়োজন না মেটাতে পারে, তা' হলে যে তার প্রচারের পক্ষে যুক্তিযুক্ততা কত দুর্বল হ'য়ে পড়ে, রাস্কিন বা মরিস সে কথা মর্মে মর্মে অনুভব করতেন। এঁদের কিছু পরে পেটারই প্রথম 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক' কথাটাকে একটা 'থিয়োরীর' রূপ দিলেন। পেটার (Walter Pater) মনে করতেন আনন্দদানই শিল্প-সাহিত্যের চরম ও পরম উদ্দেশ্য। ওয়াইল্ড ছিলেন পেটারের সমর্থক। শুধু সমর্থকই নন, প্রধানতম ব্যাখ্যাতাও বটে এবং অল্প দিনের মধ্যেই দেখা গেল, পেটার যে থিয়োরীটাকে শুধুমাত্র পণ্ডিতগণের আলোচনার বিষয়বস্তু করে রেখেছিলেন, ওয়াইল্ডের হাতে তা'ই বহুল প্রচারের ফলে সাধারণ পাঠকশ্রেণীর মনেও স্থান করে নিয়েছে! আজকের পৃথিবীর নানা দেশের সমাজ-সচেতন সাহিত্যসৃষ্টির যুগে এ থিয়োরীটা অনেকের কাছেই নেহাৎ জলো মতবাদ মনে হ'তে পারে, কিন্তু অস্কার ওয়াইল্ডের মৃত্যুর পরও নানা দ্বন্দ্ব তথা জিজ্ঞাসায় পূর্ণ দীর্ঘ পঁয়ষট্টি বছর কেটে গেল, তবু আজ পর্যন্ত পৃথিবীর নানা দেশের সাহিত্য-স্রষ্টার ভাবজগতে ওঁর প্রভাব লক্ষণীয়ভাবেই কাজ করছে।

অস্কার ওয়াইল্ড বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ছোটদের উপযোগী ছোট ছোট গল্প থেকে আরম্ভ করে বড়োদের জন্যে গল্প, উপন্যাস, নাটক, সাহিত্য-মূলক প্রবন্ধ, সাহিত্য-সমালোচনা, কবিতা, অর্থাৎ সাহিত্যের প্রায় সমস্ত বিভাগেই তাঁর প্রতিভা অনেক কালজয়ী সৃষ্টি রেখে গেছে।

সাহিত্যসাধনার পরিণত রূপ—অস্কার ওয়াইল্ডের প্রধান চারখানা সামাজিক নাটক হ'লো 'লেডী উইণ্ডারমেয়ারস্ ফ্যান' (১৮৯১); 'এ উয়োম্যান অব নো ইম্পর্ট্যান্স' (১৮৯২); 'এ্যান আইডিয়াল হাসব্যাণ্ড' এবং 'দি ইম্পর্ট্যান্স অব বিয়িং আর্নেষ্ট' (১৮৯৫)। এর প্রত্যেকখানারই রচনা-নৈপুণ্য উচ্চাঙ্গের। ওয়াইল্ডকে যে কেন শব্দ-শিল্পী বলা হয়, এর যে কোন একখানা নাটক পড়লেই সাধারণ পাঠকের কাছেও তা' পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। যথাযথ শব্দ-চয়ন এবং ছোট ছোট বাক্যের সুতীক্ষ্ণ বক্তব্যপূর্ণ সংলাপ পাঠক-

মাত্রকেই মুগ্ধ করতে সক্ষম। অস্কার ওয়াইল্ডের নাটকের প্লটগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিতান্ত সাধারণ এবং সেগুলি এমন এক সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বন করে থাকে যে, দর্শক বা পাঠকের স্নায়ুমণ্ডলীর রীতিমত একটা কসরৎ করতে হয় নিজেকে সংযত রেখে নাটকের রস গ্রহণের জন্য।

লেডী উইণ্ডারমেয়ারস্ ফ্যান—স্বামী-স্ত্রীর সংবেদনশীল সম্পর্ককে কেন্দ্র করে 'লেডী উইণ্ডারমেয়ারস্ ফ্যান'-এর আখ্যানভাগ রচিত। লর্ড এবং লেডী উইণ্ডারমেয়ার এক সুখী দম্পতি। লেডী তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে কিছু বন্ধু-বান্ধবকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং দেখা যাচ্ছে এই জন্যই সকাল বেলায় তিনি বাড়িঘর সাজাতে ব্যস্ত। লেডীর স্বামীর এক বন্ধু লর্ড ডারলিংটন প্রায়ই এ বাড়িতে আসেন এবং বন্ধু-পত্নীর প্রতি কিছুটা আসক্তি-বোধ করবার জন্য সময়-অসময়ে নানা অছিলার মধ্য দিয়ে নিজের মনোভাব প্রকাশ করবার চেষ্টাও করেন। বুদ্ধিমতী লেডী সবই বুঝতে পারেন, কিন্তু সাধারণত কিছু বলেন না ; তবে এক সময়ে তাঁর মনে হ'ল ডারলিংটন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন, তাই মৃদু তিরস্কার করলেন। তারপর এলো লেডীর এক বান্ধবী। ইতিমধ্যে লর্ড ডারলিংটন চলে গেছেন। এই বান্ধবীর মুখে কতকগুলি অত্যন্ত আপত্তিকর কথাবার্তা লেডী শুনলেন তাঁর স্বামীর সম্পর্কে। কে এক মিসেস এরলিন এসে জুটেছেন শহরে। অনেকেরই নাকি মাথা খেয়েছেন মহিলাটি, কতো সংসার নাকি ছারখার হয়ে গেছে, এবার সরলমতি লর্ড উইণ্ডারমেয়ারের ঘাড়ে চেপেছেন। এই বান্ধবীটি লেডীকে আরো জানালেন যে, ইতিমধ্যেই নাকি ঐ মহিলাটিকে তাঁর স্বামী প্রচুর টাকাকড়ি দিয়েছেন।

এ জাতীয় সংবাদ পাবার পর স্ত্রীর মনোভাব কি হয় বা হতে পরে, তা সহজেই অনুমেয়। লেডী প্রথমটা যেন একেবারে পাথরের মতো হয়ে গেলেন। যে স্বামীর ভালবাসার গর্বে একটু আগেই ডারলিংটনকে তিরস্কার করলেন, একটু পরে তাঁর সম্বন্ধেই এসব কথা শুনতে হল ? হায় ভগবান ! মুহূর্তের জন্য লেডীর মনে হয় স্বামীই যখন বিপথগামী হয়ে গেল তখন ডারলিংটনকে এখন থেকেই হাতে রাখার চেষ্টা করা ভাল। হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে স্বামীর টেবিলের ড্রয়ারটা ভেঙ্গে চেক বইখানা বের করে লেডী দেখলেন, সত্যি সত্যি হাজার হাজার পাউণ্ড লর্ড উইণ্ডারমেয়ার ইতিমধ্যেই মিসেস্ এরলিনকে দিয়েছেন। ঠিক এমনি সময়ে স্বামী সেখানে এসে হাজির হলেন। মিসেস এরলিনকে অর্থ সাহায্য করবার প্রশ্নটা তিনি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা

করলেন। বললেন, সব ব্যাপার এখুনি তোমার জানবার দরকার নাই। তিনি আরও বললেন যে আজকের সন্ধ্যায় ওঁকেও অর্থাৎ মিসেস এরলিনকেও নিমন্ত্রণ করতে হবে। কোন স্ত্রীই স্বামীর উপপত্নীকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতে রাজী হ'তে পারে না। কিন্তু লর্ড গোপনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন এবং সন্ধ্যার সময় অন্যান্য আমন্ত্রিতদের মধ্যে মিসেস এরলিনকেও দেখা গেল্। লেডী উইণ্ডারমেয়ার সামনাসামনি কোন দুর্ব্যবহার করলেন না, কিন্তু স্বামীর নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে রাতের বেলায়ই একা বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে।

এদিকে মিসেস এরলিন কয়েকটি কথাবার্তার মধ্য থেকেই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে লেডী উইণ্ডারমেয়ার তাঁর স্বামীর নৈতিক চরিত্রে সন্দেহ করেন; এবং সন্দেহটা ওঁকে কেন্দ্র করেই। বাড়ির মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে স্বামীর উদ্দেশে লিখিত লেডীর চিঠিখানা ওঁর হাতে পড়তে ওঁর বুক কেঁপে উঠলো। লেডী একটা ভুলের বশবর্তী হয়ে স্বামীর ওপর অভিমান করে যা করতে চলেছেন, নিজের অবস্থা দিয়ে মিসেস এরলিন বুঝলেন যে তাতে তাঁর সর্বনাশ হয়ে যাবে।

ভেতরের রহস্য এই যে, মিসেস এরলিনের সঙ্গে লর্ড উইণ্ডারমেয়ারের কোনই অসৎ সম্বন্ধ নেই। লর্ড তাঁর লেডীকে ভালোবেসে একপ্রকার অনাথ অবস্থা থেকেই বিয়ে করেছিলেন। লেডী বাল্যবয়সে পিতৃমাতৃহীনা বলেই সকলে জানতো। কিন্তু সত্যি কথাটা এই যে, এই মিসেস এরলিনই আসলে লেডীর গর্ভধারিণী জননী। তরুণ বয়সে স্বামীর সঙ্গে একদিন একটা ভুল বোঝাবুঝির ফলে লেডী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর সাধারণত মেয়েদের যা হয়, অর্থাৎ স্বামীর ঘরের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবং তারপর জীবনধারণের জন্য বিভিন্ন সময়ে তাঁকে নানা অসৎ উপায় অবলম্বন করতে হয়েছিল—সমাজের চোখে যেগুলি নিতান্তই কদর্য। ঘটনাচক্রে লর্ড উইণ্ডারমেয়ারের সঙ্গে মিসেস এরলিন নামে পরিচিতা এই মহিলাটির জানাশুনো হয়ে গিয়েছিল। শাশুড়ীকে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই লর্ড সর্বদা চেষ্টিত। স্ত্রীকে তিনি এতো ভালবাসেন যে, মহিলাটি যাতে বাধ্য হয়ে কুৎসিত জীবন যাপনে প্রবৃত্ত না হন, সেই জন্যই তিনি নিজের অস্বচ্ছল অবস্থার মধ্যেও শাশুড়ীকে সাহায্য করে আসছিলেন। এটুকু বিশ্বাস তাঁর ছিল যে, যে যাই বলুক, স্ত্রী কিছুতেই তাঁকে সন্দেহ বা অবিশ্বাস করবেন না।

লেডী উইণ্ডারমেয়ার যে স্বামীকে কিছু কম ভালবাসেন, তা' নয়; কিন্তু স্ত্রীজনোচিত সন্দেহ বাতিকের কাছে প্রেমের পরাজয় হ'ল। লেডী ক্ষুব্ধ হ'য়ে লর্ড ডারলিংটনের বাড়িতে আশ্রয়ের আশায় চলে গেলেন। ভাগ্যের কথা যে, লর্ড ডারলিংটন তখন নাইট ক্লাবে। এদিকে মিসেস এরলিন স্বামীর উদ্দেশে লিখিত লেডীর চিঠি পড়ে তার মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি লর্ড ডারলিংটনের বাড়ি চলে এলেন। নিজের ওপর অপরিসীম ঘৃণা এবং লজ্জার জন্য মিসেস এরলিন নিজের প্রকৃত পরিচয় মেয়ের কাছে প্রকাশ করতে পারলেন না। কিন্তু, নানাভাবে বুঝিয়ে শুনিয়ে মেয়েকে স্বামীর বাড়িতে ফেরৎ পাঠাতে সক্ষম হলেন। এদিকে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে লর্ড উইণ্ডারমেয়ার লর্ড ডারলিংটনের বাড়িতে এসে তাঁর স্ত্রীর হাতপাখাখানা দেখতে পেলেন। এ পাখাটি জন্মদিনের উপহারস্বরূপ তিনি স্ত্রীকে দিয়েছিলেন। লর্ড ডারলিংটনের সঙ্গে লর্ড উইণ্ডারমেয়ারের হাতাহাতি হবার উপক্রম। এমন সময় মিসেস এরলিন আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করে বললেন যে তিনিই ভুলকরে পাখাটি নিয়ে এসেছিলেন। লর্ড ডারলিংটনের বাড়িতে মিসেস এরলিনকে দেখে সকলেই নানা কুৎসিত ইঙ্গিত করতে আরম্ভ করল। কিন্তু মিসেস এরলিন মেয়ের কথা ভেবে নিজের চরম অমর্যাদাও মাথা পেতে নিলেন।

বলা বাহুল্য, লেডী উইণ্ডারমেয়ার অনতিবিলম্বেই বুঝতে পারলেন যে, মিসেস এরলিনের সঙ্গে তাঁর স্বামীর কোন কুৎসিত সম্বন্ধ নেই। বরং নিজে যে ভুলটা করতে বসেছিলেন তাই ভেবে শিউরে উঠলেন। আরো মনে হল, মিসেস এরলিন ওখানে গিয়ে না পড়লে নিজের কি হাল হতে পারতো। লেডী উইণ্ডারমেয়ার শেষ পর্যন্ত জানতে পারলেন যে, মিসেস এরলিন তাঁর জননী। তখন কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন ভরে উঠলো।

অ্যান আইডিয়াল হাসব্যাণ্ড—এ নাটকের আখ্যানভাগও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ওপর কেন্দ্র করে রচিত। আধুনিক সামাজিকজীবনে ক'টি পরিবার প্রকৃত সুখী?—সন্দেহাতীতভাবে সুখী? ক'জন লোকের জীবন সর্বৈব সত্যকে আশ্রয় করে গঠিত? ক'জন তাঁদের সামাজিক মর্যাদার আর্থিক ভিত্তিটা সম্বন্ধে ন্যায্যতঃ গৌরববোধ করতে পারেন? 'অ্যান আইডিয়াল হাসব্যাণ্ড' নাটকে ওয়াইল্ড এই সমস্ত প্রশ্নেরই অবতারণা করেছেন। স্যার রবার্ট চিলটার্ণ একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। জমা ধনদৌলত,

বিষয়-সম্পত্তিও প্রচুর। প্রায়ই তাঁর মন্ত্রী হবার কথা শোনা যায়—এমনই তাঁর সততা ও সাধুতার নামডাক। চিলটার্ণ দম্পত্তি একটি অত্যন্ত সুখী পরিবার। হঠাৎ এই পরিবারে একটি মহিলার আবির্ভাব হলো। তিনি চান যে, রবার্ট পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে আমেরিকায় একটা খাল কাটার সরকারী প্রস্তাব সম্বন্ধে বিশেষ কতকগুলি কথা বলবেন। কারণ, তা'হলে সেই মহিলা এবং তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা ফাটকাবাজীতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। বলা বাহুল্য, রবার্ট এ কাজে কিছুতে রাজী হলেন না, কারণ, কাজটা অসৎ। তখন মহিলাটি রবার্টকে শাসালেন এই বলে যে, যদি তাঁর কথামত কাজ করা না হয় তা'হলে তিনি রবার্টের একটা গোপন ব্যাপার ফাঁস করে দেবেন। ব্যাপারটা হলো এই যে, বহু বছর পূর্বে রবার্ট তাঁর এক বন্ধুকে একটা সরকারী তথ্য গোপনে জানিয়ে প্রচুর অর্থ পেয়েছিলেন। রবার্টের বর্তমান আর্থিক স্বচ্ছলতার মূলে হচ্ছে ঐ অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ। যা হোক, শেষ পর্যন্ত এক বন্ধুর বুদ্ধি ও সহৃদয়তার জন্য রবার্ট ঐ মহিলার কথামত অসৎ কাজটা না করে পারলেন। আর তা ছাড়া স্ত্রীর কাছেও তাঁর প্রথম অপরিণত বয়সের মারাত্মক ভুলের কথাটা খুলে বলা হল। রবার্ট চিলটার্ণের পারিবারিক জীবন যে গোপনীয়তার জন্যে ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল, আবার সত্য ও প্রেমের ভিত্তিতে তা নতুন করে শুরু হলো। স্ত্রী স্বামীকে মার্জ্জনা করলো।

নাটক হিসেবে 'এ উয়োম্যান অব্ নো ইম্পর্ট্যান্স' অস্কার ওয়াইল্ডের সমস্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়নি।

'দি ইম্পর্ট্যান্স অব বিয়িং আর্নেষ্ট' নাটকটিকে অনেকেই ওঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে মনে করেন। অবশ্য 'লেডী উইণ্ডারমেয়ারস্ ফ্যান'কে অস্কার ওয়াইল্ডের শ্রেষ্ঠ নাটক মনে করেন এমন সমালোচকের সংখ্যাও কম নয়। আমাদেরও তাই বিশ্বাস।

নিকট প্রাচ্যের একটি প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে অস্কার ওয়াইল্ড 'সালোম' নাটকটি রচনা করেছিলেন ফরাসী ভাষায়। এটিও যথেষ্ট শিল্পগুণ সমৃদ্ধ।

শব্দ-শিল্পী অস্কার ওয়াইল্ডের নাটকের কথোপকথনের যে বৈশিষ্ট্য তা বোধ হয় তাঁর পূর্ববর্তী বা পরবর্তীদের মধ্যে মাত্র তিন চারজনের সঙ্গেই

তুলনীয়। বিচ্ছিন্নভাবে হলেও কয়েকটি ডায়ালগের অংশ থেকেই একথার যাথার্থ্য বোঝা যাবে :

কান্নাই ভালো মেয়েদের পরম আশ্রয়, দুষ্টাদের যদিও তার ফলে সর্বনাশ হয়ে থাকে... একজন স্ত্রী তার স্বামীর পেছনে স্পাইয়ের মত কাজ করবে মনে হয় এটা অন্যায়...বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জানবার-বুঝবার শক্তি বাড়ে তবে কিনা তখন আর ইচ্ছেটা থাকে না... নারীর যদি ইচ্ছে হয় যে কোন পুরুষকে বশ করতে ত তার আদিম রিপুতে ইন্ধন জোগালেই হয়...পুরুষেরা এতো ভীরু! তারা আইন ভাঙবে, অথচ কেউ তার সমালোচনা করবে সেই ভয়ে কাতর হয়...নষ্টারা পুরুষদের সহ্য করে আর ভালো মেয়েরা পুরুষদের বিরক্তির কারণ হয়...ওঃ বিয়েটা পুরুষের কী সর্বনাশই না ঘটায়, ঠিক সিগারেটের মত নৈতিক অবনতি আনে এবং অনেক বেশী খরচে...জীবনটা ভয়ঙ্কর, আমরা এর দ্বারাই চালিত হই, একে চালাতে পারি না...আদর্শ সব সময়েই বিপজ্জনক, বাস্তব খুব নিরাপদ।

(—লেডী উইণ্ডারমেয়ারস্ ফ্যান)

স্ত্রী-পুরুষের সমতার কথাটাই ভুয়ো, যেখানে আত্মদানের প্রয়োজন ঘটে সেখানে পুরুষেরা মেয়েদের চাইতে অনেক অনেক উর্ধ্বে...বাবার সঙ্গে আমার বাক্যালাপ ছিল না, মানে, আমার বয়স এক বছর পূর্ণ হবার আগেই উনি মারা গিয়েছিলেন।

(—দি ইম্পর্ট্যান্স অব বিয়িং আর্নেষ্ট)

ধরা পড়ে গেলেই পুরুষেরা কী রকম বোকা বনে যায়, আর ধরা তারা সব সময়েই পড়ছে...প্রায় বিশ মিনিট হয়ে গেলো মেয়েটির সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে, আশা করি এর মধ্যে তার মনের পরিবর্তন ঘটে নি...আদর্শ স্বামী, হুঁ! কথাটা যেন অন্য জগৎ থেকে ভেসে এলো মনে হয়!

(— অ্যান আইডিয়াল হাসব্যাণ্ড)

বিচ্ছিন্নভাবে হলেও এই ডায়ালগগুলির মধ্য থেকে আর একটি জিনিষও স্পষ্ট বোঝা যায়, তা হলো এই যে অস্কার ওয়াইল্ড সাধারণতঃ সমাজের ওপর তলার মানুষদের নিয়েই নাটক রচনা করতেন।

অস্কার ওয়াইল্ড মারা যান মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে। তার মধ্যে জীবনের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতাও তাঁর হয়েছিল। সৌন্দর্যের পূজারী এই প্রতিভাধর প্রচলিত নীতিবোধকে অগ্রাহ্য করবার জন্যে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। কয়েদী অবস্থায় সমাজের নিম্নতম পর্যায়ের মানুষদের সঙ্গে কিছুদিন তাঁকে বসবাস করতে হয়েছিল। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার যে সে অবস্থায়ও তিনি দু'খানা শ্রেষ্ঠ রচনা লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একখানা কাব্যগ্রন্থ: 'দি ব্যালাড অব রিডিং গ্যায়োল' এবং দ্বিতীয়খানা প্রবন্ধ, 'ডি প্রোফাণ্ডিস'।

জর্জ বার্নার্ড শ

আয়ার্ল্যাণ্ড দেশটি আয়তনে ছোট হলেও শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে এ দেশের মানুষের কীর্তি নিঃসন্দেহে বিস্ময় উদ্রেক করবার পক্ষে যথেষ্ট। অস্কার ওয়াইল্ড, য়েটস, জেমস জয়েস, সীন ও'কেসী, জে. এম. সিঞ্জ এবং জর্জ বার্নার্ড শ—এঁরা সকলে একই দেশের মানুষ। এঁরা সকলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন পঞ্চাশ বছরের মধ্যে। ব্যাপারটা বিস্ময়কর। নয় কি?

শ ছিলেন দুই শতাব্দীর মানুষ। উনবিংশ শতাব্দীর উনি প্রায় অর্ধেক দেখেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর পুরো অর্ধেকটাই। অবশ্য পৃথিবীর দেশ-বিদেশের শিক্ষিত সমাজে এ রকম অসংখ্য মানুষই আছেন যাঁরা মনে করেন যে শ-য়ের শারীরিক অস্তিত্বটা মাত্র দু'টো শতাব্দীতে ব্যপ্ত থাকলেও আসলে উনি ছিলেন কয়েকটা শতাব্দীর মানুষ—অর্থাৎ কিনা আগামী কয়েক শতাব্দীর চিন্তাধারা তথা সাহিত্য শ-য়ের দ্বারা প্রভাবিত হবে।

প্রথম জীবন—উনবিংশ শতাব্দীর দ্রুত পরিবর্তনশীল ভাবধারণা তথা ঘটনাবলী শ-য়ের মানস গঠন করেছিল শুধু পুঁথি পত্রের দ্বারাই নয়, বাস্তব জীবনের নানাবিধ টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে, জীবন সংগ্রামের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, শিল্প-সাহিত্য-মূলক, সামাজিক, অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক তথা নৈতিক—এক কথায় মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে আসতে পারে এ রকম প্রায় সমস্ত রকম কার্যকলাপেরই মধ্য দিয়ে।

জর্জ বার্নার্ড শ (George Bernard Shaw, July, 26, 1856—Nov. 2, 1950) জন্মগ্রহণ করেছিলেন ডাবলিনে। ওঁর ঠাকুরদা বড়ো সরকারী চাকরী করতেন। তিনি ছিলেন কিলকেনীর শেরিফ। কিন্তু ওঁর বাবা ছিলেন একেবারেই দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং যে কেনো কাজ-কর্মের পক্ষে অনুপযুক্ত। তার উপরে আবার ছিল তাঁর পান দোষ। ফলে শ-পরিবারের দুর্গতির সীমা ছিল না। শ-য়ের আর ভাই ছিল না, তবে দু'টি বোন ছিল। শ-য়ের মা ছিলেন একজন সঙ্গীত পারদর্শিনী মহিলা। অপদার্থ স্বামীর কবল থেকে মুক্তির জন্য তাঁর সংবেদনশীল হৃদয়

কয়েক বছর ধরেই উতলা ছিল। এক সময় দেখা গেলো উনি সত্যি বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। এবং তিনটি নাবালক সন্তানের মায়া কাটিয়ে তিনি স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশও ছাড়লেন। চলে এলেন লণ্ডনে নিজের যোগ্যতার ওপর ভরসা রেখে। এবং অল্প দিনের মধ্যে বাস্তবিকই সঙ্গীত শিক্ষিকার একটা চাকরীও সংগ্রহ করে নিলেন।

এরপর বালক শ-য়ের দায়িত্ব ওঁর এক পাদ্রী কাকা গ্রহণ করলেন। একটা স্কুলেও ভর্তি করা হয়েছিল ওঁকে। এই স্কুলের পাঠ শেষ করবার পরেই শ-কে একটা চাকরীতে ঢোকানো হল—এই প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা ছিল ডাবলিনে জায়গা-জমির দালালী। শ-য়ের বয়স ছিল এ সময় ঠিক পনরো। এর কিছুকাল পূর্ব থেকেই শ পত্রযোগে মায়ের সঙ্গে নিয়মিত যেগোযোগ রেখে চলতেন। ওঁর দুঃখিনী মা লণ্ডনের মতো বিরাট একটা নগরীতে যা'হক করে অনশনটা ঠেকিয়ে রাখছিলেন বলা চলে, তার বেশি কিছু নয়।

জমির দালাল প্রতিষ্ঠানে শ পাঁচ বছর চাকরী করবার পরে হঠাৎ একদিন চলে এলেন লণ্ডনে—মায়ের কাছে, এ সময় ওঁর বয়স হয়েছিল ঠিক কুড়ি।

এরপর থেকে একটানা বাইশ বছর শ সাধ্যমতো মায়ের সেবা করে গেছেন।

সঙ্গীত, ছবি আঁকা এবং পড়াশুনোর প্রতি শ-য়ের সারা জীবনের যে নেশা, তার সূত্রপাত হয়েছিল ডাবলিন থাকতেই একেবারে বালক বয়সে, মায়ের কাছ থেকে। দালালী প্রতিষ্ঠানে চাকরীতে ঢোকবার পর থেকে শ কিছুটা এলোপাতাড়িভাবে পাবলিক লাইব্রেরীতে ঘুরে ঘুরে পড়াশুনো আরম্ভ করেছিলেন। উনি যখন লণ্ডন গিয়ে পৌঁছলেন, তখন দেখা গিয়েছিল কয়েক বছরের অভ্যাসের ফলে উনি যথার্থই একজন বইয়ের পোকা হয়ে উঠেছেন।

লণ্ডন আসবার পরে প্রায় দশটা বছর শ-কে যাকে বলে 'জীবন সংগ্রামে' ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। নানা জায়গায় কায়িকশ্রমের কাজ করবার চেষ্টা করেছেন, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা তথা প্রকাশকের ফরমাস মতো কিছু লিখে-টিখে রোজগারের চেষ্টা করেছেন—পর পর পাঁচখানা উপন্যাস লিখে প্রকাশকদের নিকটে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন।

সামাজিক চিন্তায় বিবর্তন—অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কারপন্থী সে যুগের স্বনামধন্য বক্তা হেনরী জর্জ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে ইংলণ্ড এসেছিলেন। এঁর বক্তৃতা শুনে তথা নানা প্রবন্ধ পড়ে শ-য়ের মনে সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। ওঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে: The importance of economic basis dawned on me.

লণ্ডন আসবার কিছুদিন পরেই শ ফেবিয়ান সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এবং ক্রমে এর অন্যতম নেতা এবং আদর্শ প্রবক্তা হিসেবে বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। রোমান সেনাপতি ফেবিয়ুস এর নাম থেকে ফেবিয়ান (Fabian) কথাটার উৎপত্তি। ইতিহাসে দেখা যায় প্রবল পরাক্রান্ত হ্যানিবলকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ফেবিয়ুস কেবল যুদ্ধে দীর্ঘসূত্রতার কৌশল অবলম্বন করেই পরাজিত করেছিলেন। ফেবিয়ান সোসাইটির উদ্দেশ্য: সমাজতন্ত্রের মন্থর কিন্তু ক্রামশিক বিস্তারে সহায়তা করা।

কিছু দিনের জন্য অবশ্য শ-কে ফেবিয়ান সোসাইটির সীমাবদ্ধ আদর্শের বাইরে ঘোরতর সমাজতন্ত্রবাদীর মতো একেবারে মার্কসীয় আদর্শে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য বক্তৃতা করতে তথা পুস্তিকা রচনা করতেও দেখা গিয়েছিল। বক্তৃতাও উনি ভালোই দিতেন। কিন্তু এটা ছিল সাময়িক। আসলে উনি ফেবিয়ান আদর্শেই বিশ্বাসী ছিলেন।

স্টার, ওয়ার্ল্ড, স্যাটারডে রিভিয়্যু, পলমল গেজেট প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে কখনো নাট্য সমালোচক, কখনো বা পুস্তক-সমালোচক হিসেবে যুক্ত শ তাঁর অগ্নিবর্ষী আলোচনার জন্য সব সময়েই পাঠকের প্রিয় ছিলেন;—বলাই বাহুল্য, শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই পথেই তাঁর শত্রু বৃদ্ধিও হয়েছিল সর্বাধিক।

সাহিত্যসাধনার শুরু—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন এসে পৌছবার পরেই শ কয়েকখানা উপন্যাস রচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পাঁচখানা উপন্যাস রচনার কাজ সমাপ্তও করেছিলেন। (ইম্‌ম্যাচিওরিটি (১৮৭৯); এ্যান আনসোসিয়াল সোসিয়ালিষ্ট (১৮৮২); ক্যাসেল বায়রন্‌স প্রোফেশন (১৮৮২); দি ইর‍্যাশনাল নট (১৮৮৪) লাভ অ্যামঙ দি আর্টিষ্টস (১৮৮৩)।) এর মধ্যে চারখানাই একেবারে

অপাঠ্য হিসেবে গণ্য হয়েছিল—তখনও তার পরেও। কেবল একখানা—'ক্যাসেল বায়রন্‌স প্রোফেশন' পরবর্তীকালে কিছুটা সমাদরলাভ করেছিল।

বলাই বাহুল্য শ-য়ের যে বৈশিষ্ট্য তার কিছুমাত্র লক্ষণ এই উপন্যাসগুলির মধ্যে দেখা যায় নি। যদিও 'ক্যাসেল বায়রন্‌স প্রোফেসন'-এ কিছুটা শ্লেষাত্মক বাচনভঙ্গী অনেকেরই ভালো লেগেছিল।

সাহিত্যক্ষেত্রে 'আবির্ভাব' বলতে যা বোঝায় শ-য়ের বেলায় তা একটু দেরীতেই হয়েছিল বলতে হবে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'উইডোয়ার্স হাউসেস' মঞ্চস্থ হবার পর থেকেই শ-কে যথার্থভাবে একজন সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সময়ে জর্জ বার্নার্ড শ-য়ের বয়স ছিল ঠিক ছত্রিশ।

এইখানে একটা প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। শ প্রকৃত পক্ষে কি ছিলেন? সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী সমাজসংস্কারক, মার্ক্‌সবাদী বিপ্লবী, রাজতন্ত্রী প্রচারক, জীববিজ্ঞানের মুগ্ধ পূজারী, না কি শুধুমাত্র একজন ক্রুদ্ধ সমালোচক?—পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং নৈতিক, এককথায় বলতে গেলে প্রচলিত সমস্ত কিছুরই ঘোরতর বিরোধী সমালোচক? কোনটা ছিলেন?

সব বিষয়ে না হক অন্তত: রাজনৈতিক ব্যাপারে নিজেকে নিয়ে বরাবর শ-য়ের যে সমস্যা ছিল, সে সম্পর্কে উনি নিজেই চমৎকারভাবে লিখেছিলেন Spectator পত্রিকায় বিয়েত্রিচ ওয়েব-এর My Apprenticeship-এর আলোচনায় '…myself, a useful member of the Webb's Fabian retinue, but highly obnoxious to Beatrice for the technical reason that I could not be classified'.

অনেকের বিশ্বাস যে আসলে শ ঐ সব রকমই কিছু কিছু ছিলেন। কারণ, তাঁর রচনার মধ্যে এক-একসময় এক এক রকম ধারণার ছাপ দেখা গিয়েছিল।

মার্ক্‌সবাদী হিসেবে সাহিত্যক্ষেত্রে শ-য়ের যা কিছু দেবার তা তিনি প্রথম জীবনের দু' খানা নাটকেই শেষ করেছিলেন। একখানা হলো ওঁর প্রথম নাটক 'উইডোয়ার্স হাউসেস' এবং দ্বিতীয়খানা হলো 'মিসেস ওয়ারেন্‌স প্রোফেশন' (১৮৯৪)। এরপর থেকে ওঁর প্রতিটি নাটকেই উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের লক্ষণ প্রকট হতে থাকে। এবং এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী সবকিছুকেই শ তাঁর পরবর্তী গোটা জীবনের রচনায় তীব্রভাবে

আক্রমণ করেছেন এবং ক্ষতবিক্ষত করে গিয়েছেন। ফলে অনুকরণীয় style, বুদ্ধিদীপ্ত শ্লেষপূর্ণ বাচনভঙ্গী, এবং idea-র প্রায় একটা মিছিল দেখে দর্শক তথা পাঠক আনন্দলাভ করেছেন। কিন্তু এতৎসত্বেও যখনই তাঁরা তাঁর নাটকের মধ্যে প্রকৃত 'সাহিত্যবস্তু' খুঁজতে গিয়েছেন, তখনই চরম হতাশা দেখা দিয়েছে। সাহিত্যের মাধ্যমে কিছু একটা পূর্ব-নির্ধারিত আইডিয়ার প্রচার শ য়ের আগে বা পরে অনেকেই করে গিয়েছেন—কিন্তু শ-য়ের মতো সাহিত্যের নামে সাহিত্য 'জবাই' বোধহয় কেউ করেন নি। অবশ্য অনেকে মনে করতে পারেন যে সাহিত্যকে মাধ্যম করে 'আইডিয়া' প্রচারে বাধা থাকবে কেন? তা না থাকতে পারে। কিন্তু এটাও ভাবতে হবে এবং বুঝতে হবে যে ঐ আইডিয়া আসলে আমাদের কি দিচ্ছে এবং কতটুকু দিচ্ছে। প্রচলিত কোন কিছু আঁকড়ে থাকবার নেশা আজকের দিনের মানুষের খুব কমই আছে। এবং সেইজন্যই প্রচলিত সব কিছুর সমালোচনা দেখলে বা শুনলে বেশির ভাগ মানুষেরই বাহবা পাওয়া যায়। কিন্তু এ সমালোচনা যদি কেবলই সমালোচনার জন্য করা হয়, শুধুই destructive হয় এবং কোন গঠনমূলক আইডিয়া উপস্থাপিত করবার মতো বক্তব্য এবং বলিষ্ঠতা যদি আইডিয়া-পন্থী লেখকের না থাকে, তা হলে 'নীট' লাভটা কি হয় বা হতে পারে?—এক কথায় Frustration.

মানুষের মনে যে ঈশ্বরের স্থানটি রয়েছে সে জায়গাটা কখনই খালি থাকতে পারে না। ঈশ্বরকে আসনচ্যুত করে পচা কাদার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলে অনেকেরই হাততালি পাওয়া যেতে পারে সত্য, কিন্তু ঐ শূন্য আসন যদি নৈতিকজীবনের পক্ষে অধিকতর সহায়ক ধারণাবলীর সাহায্যে পূর্ণ করা না হয়, তাহলে যে 'শয়তান' তা দখল করে বসবে সে কথা মনে রাখা দরকার। এ দায়িত্ব যদি লেখকগণ এড়িয়ে চলেন তা'হলে মানুষের ভবিষ্যৎ কি?

যাই হোক, শ-য়ের প্রথম দিকের সাতখানা নাটকের অন্ততঃ চারখানায় আইডিয়ার চাইতে 'সাহিত্যবস্তু'ই প্রাধান্য পেয়েছিল (আর্মস এণ্ড দি ম্যান, ক্যাণ্ডিডা, দি ম্যান অব ডেসটিনি, এবং ইউ নেভার ক্যান টেল)। প্লেসাণ্ট প্লেজ-এর অন্তর্ভুক্ত এ নাটকগুলি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল, যদিও অভিনীত হয়েছিল কয়েক বছর আগেই। 'উইডোয়ার্স হাউসেস,' 'মিসেস ওয়ারেন্‌স্ প্রোফেশন' এবং 'দি ফিলানডারার' আনপ্লেজাণ্ট প্লেজ-এর

অন্তর্ভুক্ত। 'দি ডেভিলস্ ডিসাইপল,' 'সিজার এণ্ড ক্লিওপেট্রা' এবং 'ক্যাপ্টেন 'ব্রাসবাউণ্ডস কনভারসন' (থ্রি প্লেজ ফর পিউরিটান) প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে।

সাহিত্যসাধনার পরিণত রূপ—বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে অর্থাৎ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শ মোট ছত্রিশখানা নাটক রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে অন্ততঃ বারোখানা আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 'ম্যান এণ্ড সুপারম্যান' (১৮০৩) নাটকে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল যে শ কেবল ইবসেন-পন্থী আধা-সমাজতন্ত্রী ফেবিয়ানই নন, তাঁর মধ্যে নীট্‌শে এবং কার্লাইলেরও প্রচুর প্রভাব ক্রিয়াশীল, চাই কি তিনি একজন অটোক্রাট।

জন্মভূমি দরিদ্র এবং দুর্দশাগ্রস্ত আয়ার্ল্যাণ্ড এবং তার সাধারণ মানুষকে যে শ কখনো ভোলেন নি, তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটক 'জন বুল্‌স আদার আইল্যাণ্ড' (১৯০৪) তার সাক্ষ্য বহন করে।

'মেজর বারবারা' (১৯০৭); 'গেটিং ম্যারেড' (১৯০৮) এবং 'মিস্-এ্যাল্যায়েন্স' (১৯১০) আলোচনা প্রধান নাটক রচনার আদর্শস্বরূপ। 'এ্যাণ্ড্রোক্লীস এণ্ড দি লায়ন' (১৯১২) এবং 'পিগম্যালিয়ন' (১৯১২)-ই বোধ হয় শ য়ের সর্বাপেক্ষা কম বিতর্কিত নাটক। এদিক থেকে 'সিজার এণ্ড ক্লিওপেট্রা'ও এই ধরনের রচনা।

'হার্টব্রেক হাউস' (১৯১৭); 'ব্যাক টু মেথুসেলা' (১৯২১) 'সেণ্ট জোয়ান অব আর্ক' (১৯২৫); 'দি অ্যাপেল কার্ট' (১৯২৯) এবং 'জেনেভা' (১৯৩৮) শ-য়ের নানা বিচিত্র চিন্তার নাট্যরূপ।

ব্যাক টু মেথুসেলা—শ নিজে মনে করতেন যে 'ব্যাক টু মেথুসেলা'-ই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্য-সৃষ্টি। যদিও সাধারণ পাঠক থেকে আরম্ভ করে নাটক বিশেষজ্ঞগণ অনেকেই মনে করেন যে এখানা আর যাই হোক নাটক হয় নি। ('Whatever pleasure *Back to Methuselah* gives us, is not *dramatic* one.'—*The Modern Writer and his World*—G. S. Fraser ;...'a most undramatic desire to reduce all human life to disembodied speculation.'—David Daiches in *Introduction to English Literature*, Vol. V.)

মোট পাঁচটি অংশের সমষ্টি সুবৃহৎ 'ব্যাক টু মেথুসেলা'য় শ

কিংবদন্তীমূলক মানব সৃষ্টির আদিমতম যুগ থেকে কল্পনায় আনা যায় এ রকম অনাগত যুগের সুবিশাল পটভূমিকায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য এক্ষেত্রে প্রধানত জীববিজ্ঞান সম্বন্ধীয়। শ বলতে চান যে বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের জীবন যে অবস্থায় এসে পৌছেছে, তাতে কি করে যে জীবনধারন করতে হবে বা করা উচিত একথা পুরোপুরি বুঝে উঠবার আগে, অর্থাৎ নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এ শিক্ষা সঠিকভাবে লাভ করবার আগেই মানুষের মরবার সময় ঘনিয়ে আসে। তাই শ চান যে মানুষের বাঁচবার কাল যাতে আরো বাড়ানো যায়। কথাটার মধ্যে অবশ্যই প্রচুর চিন্তার খোরাক রয়েছে। কিন্তু 'ব্যাক টু মেথুসেলা'র পাঠক হতাশবোধ করেন যখন দেখা যায় যে, এ নাটকের শেষ তিনটি অংশে এমন কোন কিছুই পাওয়া যায় না যার ফলে এ কথা মনে করবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে যে দীর্ঘায়ু হ'লেই মানুষের জীবন সুখ-সমৃদ্ধ হবে। মূল বক্তব্যটি ভাববার মতো সন্দেহ নেই, এবং সে কথা শ-য়ের মতো শক্তিশালী লেখক বলবার জন্য অপরিমিত জায়গাও নিয়েছেন। কিন্তু তবু, এই সুদীর্ঘ পরিসরেও শ একটি বিশ্বাসযোগ্য এবং শিল্পগতভাবে স্বাভাবিক সুষ্ঠু কাহিনী পরিবেশন করতে পারেন নি। 'ব্যাক টু মেথুসেলা'র বেশিরভাগই magnificently irrelevant and much is maddeningly garrulous—(*The Nineteen Twenties*—A. C. Ward). অথচ এই নাটকখানিকেই শ তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি মনে করতেন।

নিজের নাটকগুলির বিভিন্ন সময়ে শ যে ভূমিকা লিখে গেছেন তা অনেক সময় আসল নাটকের চাইতেও অর্থপূর্ণ হয়েছে। বহুল প্রচারিত এ ধারণা মিথ্যে নয়। প্লেজান্ট প্লেজ-এর ভূমিকায় সার্থক নাটক সৃষ্টি প্রসঙ্গে শ যা বলেছেন তা প্রকৃতই অনুধাবনযোগ্য। শ বলেছেন: 'The end may be reconciliation or destruction; or, as in life itself, there may be no end; but the conflict is indispensable; no conflict, no drama.' শ-য়ের এ ধারণানুযায়ী বিচার করলেও 'ব্যাক টু মেথুসেলা'র ব্যর্থতা দুঃখজনক মনে হবে।

বরং, তুলনামূলকভাবে শেষের দিকের রচনার মধ্যে 'সেন্ট জোয়ান অব আর্ক' কিংবা 'দি অ্যাপেল কার্ট' অধিকতর সার্থক সৃষ্টি।

সেন্ট জোয়ান নাটক হিসেবে সার্থক ত বটেই, উপরন্তু এ নাটকে

স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কে শ-য়ের দীর্ঘদিনের অস্পষ্ট ধারণাটাও প্রচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। প্রথম থেকেই দেখা গিয়েছিল শ পুরুষ অপেক্ষা নারীকেই শ্রেষ্ঠতর জীব মনে করতেন—অন্ততঃ বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে ত বটেই। পুরুষ সম্পর্কে তাঁর ধারণা কিছুটা হেঁয়ালীপূর্ণ। পুরুষকে তিনি জগতের বাস্তব জীবনের পক্ষে অপটু মনে করতেন।

দি অ্যাপেল কার্ট—এ নাটকের কিং ম্যাগনাস শ-য়ের মোট পঁয়তাল্লিশখানা নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত তথা মানবিক গুণসম্পন্ন চরিত্র। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন অর্থাৎ 'গণতন্ত্র' নামক যে আপ্তবাক্যটি আজকের পৃথিবীর সমস্ত দেশের সাধারণ মানুষের কানে পুরে দিয়ে তাদের বধির করে রাখা হয়েছে, প্রধানতঃ তার বিরুদ্ধে আক্রমণই এ নাটকের উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে নাটকের সাহিত্যবস্তু একেবারে বিসর্জন না দিয়েও শ তাঁর বক্তব্য বলতে পেরেছেন মনে হয়। প্রথম জীবনে ইবসেনের 'অ্যান এনিমি অব দি পীপল'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে শ সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন তথা গণতন্ত্র সম্বন্ধে যা বলেছিলেন 'দি অ্যাপেল কার্ট' নাটকে সেই আইডিয়ারই বিস্তার ঘটালেন! (The pioneer is a tiny minority of the force he heads ......though it is easy to be in a minority and yet be wrong, it is absolutely impossible to be in the majority and yet be right as to the newest social prospects.—*The Quintessence of Ibsenism.*)

গণতন্ত্রের যে ধারণার সঙ্গে আমরা এখন পর্যন্ত পরিচিত হয়েছি, তার মধ্যে সব সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা অবশ্যই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তার মানেই কি এই যে আমাদের আবার রাজতন্ত্রে ফিরে যাওয়া দরকার, কিংবা একনায়কত্বের সমর্থক হতে হবে? এ নাটকে শ সেই পরামর্শই দিয়েছেন। নেপোলিয়ন, স্তালিন বা হিটলারের প্রশস্তি করতে শ কুণ্ঠিত হতেন না; কিন্তু For that splendid liberal tradition, which gave him his own platform he never expressed any respect. (*G. S. Fraser* in *The Modern Writer and his World.*)

স্থায়ী সৃষ্টি—নাট্য-সাহিত্যে শ-য়ের স্থায়ী সৃষ্টির কথা ভাববার সময় অনেক কথাই চিন্তা করবার আছে। একটা জোরালো দার্শনিক বক্তব্য সাহিত্যের মর্যাদা অবশ্যই বাড়ায় কিন্তু সাহিত্য হিসেবে সে রচনাটি কতখানি

সার্থক, সাহিত্য হিসেবে রচনাটি যথার্থই হৃদয়গ্রাহী কিনা—ব্যাপারটা আসলে তার ওপরই নির্ভর করে। সাহিত্যবস্তুকে কোনঠাসা করে কোন দার্শনিক বা রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের চেষ্টা হলে তা হামেশাই ব্যর্থ হয়ে যায়; সাহিত্য হিসেবে ত বটেই, দর্শন বা রাজনীতি হিসেবেও। শ-য়ের অধিকাংশ নাটকের সৃষ্টি এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার মধ্যে হয়েছিল মনে হয়।

অবশ্য এরকম পাঠক বা সমালোচকেরও সংখ্যা কম নয় যাঁরা মনে করেন যে শ আসলে একজন দার্শনিক ছিলেন—নাটককে তিনি কেবল মাধ্যম হিসেবেই ব্যবহার করতেন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে শশাঙ্কমোহনের কথা: "এই Philosopher ব্যক্তি কোন Philosophy রচনা করাও প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। তিনি নিজের কথায়, একজন সোসিয়ালিষ্ট Revolutionist......Philosopher ব্যক্তির পক্ষে Artist হওয়ার অর্থ—দর্শনের সন্দর্ভরীতির পরিহার করিয়া, প্রকাশ্য যুক্তি-প্রমাণ ও বিচার-বিতর্ক সিদ্ধান্তের ঋজু পদ্ধতি এড়াইয়া, মানুষের তর্কের চোখে অজানিতে ধূলা দিয়া তাহাকে সহজে নিজের 'মতলবী সত্যটি' গেলাইবার চেষ্টা।"—(বানীমন্দির)। এ ধরনের চেষ্টা কদাচিৎ সফল হয়, হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কারণ, যখনই মানুষ বুঝতে পারে যে তাকে বোকা বোঝানো হয়েছে বা এমন কি তার ওপর কোন মত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন তার অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করবেই।

যাই হ'ক বিংশ শতাব্দীতে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শ যে ছত্রিশখানা নাটক রচনা করে গেছেন তার মধ্যে স্থায়ী সৃষ্টি কিছু না থাকলেও নাটক রচনার প্রথম যুগে 'প্লেজাণ্ট প্লেজ'-এর দু'খানা নাটক যে বিশ্ব-নাট্য-সাহিত্যে স্থায়ী সংযোজন, সে বিষয় সন্দেহ থাকতে পারে না। এ নাটক দু'খানা হলো 'আর্মস এণ্ড দি ম্যান' এবং 'ইউ নেভার ক্যান টেল'।

শ-য়ের নাটকের মঞ্চ-সাফল্য—বহু ব্যর্থ নাট্যকারকে নাট্য-সমালোচক হতে দেখা গেছে। বলাই বাহুল্য, নাট্য-সমালোচক হিসেবেও সচরাচর এঁরা ব্যর্থই হয়ে থাকেন। কিন্তু শ-য়ের আরম্ভটা হয়েছিল একটু ভিন্ন ধরনে। প্রথম যৌবনে সংগ্রামময় দৈন্যদশাগ্রস্ত জীবনের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই হ'ক কিংবা ভাল লাগত বলেই হ'ক, শ প্রথম জীবনে ছিলেন নাট্য-সমালোচক। ফলে নাটকের প্রয়োগ কুশলতা সম্বন্ধে একেবারে গোড়া থেকেই তাঁকে ওয়াকিফহাল হতে হয়েছিল। তাই দেখা গিয়েছিল নিজের

নাটক মঞ্চস্থ করবার সুযোগ যখন এলো তখন প্রথমটি থেকেই তাঁর নাটক মঞ্চে অভাবনীয় সফলতা তথা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

ব্রিটেনের রঙ্গমঞ্চে বিবর্তনের ইতিহাসে তাই বার্নার্ড শ নিজেই একটা যুগ বিশেষ। এ কথা সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায় যে স্বয়ং শেক্সপীয়ারের পরে শ-য়ের সমকক্ষ আর কোনো একক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেনি ওদেশের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে। শ তাঁর দীর্ঘ জীবনে এক টানা প্রায় আটচল্লিশ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রসের পরিবেশন করেছেন তাঁর নাটকে। অসংখ্য সমস্যা আর সে সব সম্পর্কে সুতীব্র বুদ্ধিদীপ্ত বাক্যবিনিময় তাঁর নাটকের চরিত্রগুলিকে অল্পেতেই দর্শকের মনোহরণ করতে সহায়তা করতো। শ-য়ের নাটকের মঞ্চ-সফলতায় নতুন করে বাণ ডেকেছিল নিউ ইয়র্কে 'ক্যাণ্ডিডা' মঞ্চস্থ (১৯০৬) হবার পর থেকে। প্রয়োগ কৌশল তথা দৃশ্যসজ্জা সম্পর্কে শ-য়ের নিজস্ব অভিজ্ঞতা-প্রসূত ধারণাবলী অবশ্যই তাঁর নাটকের মঞ্চসাফল্যের অন্যতম কারণ।

প্রবন্ধ—শ-য়ের প্রবন্ধ ও নিবন্ধের বইয়ের সংখ্যা প্রায় কুড়িখানা। তার মধ্যে প্রধান কয়েকখানা হলো 'দি কুইন্টেসেন্স অব ইবসেনইজম' (১৮৯১); 'দি স্যানিটি অব আর্ট' (১৮৯৫); 'দি পারফেক্ট ওয়াগনারাইট' (১৮৯৮); 'ইন্টেলিজেন্ট উয়োম্যান্স গাইড টু সোসিয়ালিজম এণ্ড ক্যাপিট্যালিজম' (১৯২৮); এবং 'এভরিবডিজ পলিটিক্যাল হোয়াট ইজ হোয়াট' (১৯৪৪)।

এ ছাড়া এলেন টেরী এবং মিসেস প্যাট্রিক ক্যাম্পবেলের সঙ্গে শ-য়ের বিভিন্ন সময়ে যে পত্র বিনিময় হয়েছিল তার মধ্যেও সমাজ-সংসার, প্রেম-ভালবাসা-স্নেহ, রাজনীতি-দর্শন, অর্থনীতি, সাহিত্য, শিল্প ও সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে শ-য়ের মতামত আশ্চর্য সাবলীলতার সঙ্গে ফুটে বেরিয়েছে।

সবার শেষে বলতে হয় বিভিন্ন বইয়ে, বিশেষ করে নাটকগুলিতে ওঁর ভূমিকাগুলির কথা। এই ভূমিকাগুলিও বই আকারে বেরিয়েছে। বলাই বাহুল্য এই ভূমিকাগুলির মতো ভূমিকা বোধহয় পৃথিবীর কোন দেশের লেখকই কখনো লিখতে পারেন নি। শ-য়ের দার্শনিক মত বলে যদি বাস্তবিক কোন কিছু থাকে ত তা জানবার সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত উপায় হলো এই ভূমিকাগুলি।

শ নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। পুরস্কারের সমগ্র অর্থ উনি এ্যাংলো-সুইডিশ ফাউণ্ডেশনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্যে যাতে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দেশগুলির সাহিত্য ইংরেজী ভাষাভাষী পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়।

গেরহার্ট হাউপ্ট্মান

জার্মানীর সাহিত্যের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যে ক'টি কালজয়ী স্রষ্টার আবির্ভাব হয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হ'লেন গেরহার্ট হাউপ্ট্মান [Gerhart Johann Robert Hauptmann, 1862-1946]। ক্লপস্টক, নোফালিস, গ্যয়টে, শিলার, ভাগনার, লেসিং, হাইনে, টমাস মান প্রভৃতি যেমন জার্মান সাহিত্যের অমর স্রষ্টা, তেমনি একজন হ'লেন হাউপ্ট্মান, যদিও ইয়োরোপের বাইরে তাঁর পরিচিতি অপেক্ষাকৃত কম।

তুই শতাব্দীর মানুষ হাউপ্ট্মান নাটক এবং উপন্যাস—সাহিত্যের এ তুটো বিভাগেই একাধিক এমন সৃষ্টি করে গেছেন যা নিঃসন্দেহে বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী সংযোজন। হাউপ্ট্মানের শ্রেষ্ঠ নাটক 'দি উইভার্স' এবং শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দি এ্যাটলান্টিস'। হাউপ্ট্মান তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির স্বীকৃতি হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন রবীন্দ্রনাথের তু' বছর আগে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে।

জার্মানীর পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চল সাইলেসিয়াতে হাউপ্ট্মান জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক তাঁতী পরিবারে। হাউপ্ট্মান নিজে বা তাঁর বাবা তাঁত না বুনলেও, তাঁর ঠাকুরদা বুনতেন। হাউপ্ট্মানের ঠাকুরদা একজন অত্যন্ত সাধারণ দীনদরিদ্র শ্রমজীবী তাঁতী ছিলেন। অনশন বা অর্ধাশন সে সময়কার জার্মানীর সাইলেসিয়ার সাধারণ শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। বলাই বাহুল্য, হাউপ্ট্মানের ঠাকুরদাকেও প্রচুর উপোস করতে হয়েছিল। এটা হলো জার্মানীতে শিল্প-বিপ্লবের পূর্বের কথা। উত্তর জীবনে হাউপ্ট্মানের ঠাকুরদা হোটেলের ব্যবসায় করেছিলেন। প্রথমে ছোট্ট একটা রেস্ট্রেন্ট লীজ নিয়ে চালাতেন এবং তার থেকেই ক্রমশঃ উন্নতি হতে লাগলো, পরে উনি একটা হোটেল নিজেই খুলেছিলেন।

প্রথম জীবন—হাউপ্ট্মান যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন ওঁর বাবার হোটেলের ব্যবসা বেশ ভালই চলছিল। বালক বয়সেই ওঁর তুরন্ত স্বভাব সকলের চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। ব্রেসলাউ শহরে একটা স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল হাউপ্ট্মানকে যথাসময়েই। কিন্তু দেখা গিয়েছিল স্কুলের পড়াশুনোর দিকে ওঁর কিছুমাত্র মন ছিল না। স্কুলের পড়াশুনো শেষ হবার আগেই হাউপ্টমানের বাবার হোটেলের ব্যবসা খারাপ হতে হতে এক সময় একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। এরপর দেখা গিয়েছিল হাউপ্ট্মান

স্কুলের পাঠ শেষ করবার আগেই এক কাকার আশ্রয় এবং সহায়তায় ভাস্কর্য শিল্পে হাতেকলমে শিক্ষাগ্রহণ শুরু করলেন। ব্রেসলাউ-এর রয়্যাল আর্ট কলেজে কয়েক বছর শিক্ষালাভ করেছিলেন হাউপ্ট্‌মান। কলেজে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে কয়েক মাসের জন্য ইনি বহিষ্কৃতও হয়েছিলেন। রোম নগরীতে এসে অল্প কিছুদিন ভাস্কর হিসেবে জীবিকার্জনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তারপরেই দেখা যায় বার্লিন ফিরে এসে অভিনেতা হিসেবে জীবনে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হলেন। এ সময়ে হাউপ্ট্‌মানের বয়স ছিল ঠিক তেইশ বছর।

সাহিত্যসাধনার শুরু—হাউপ্ট্‌মানের প্রথম বই, কয়েকটি কবিতার একখানা সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল ওঁর বাইশ বছর বয়সে। বায়রনের অনুকরণে রচিত এ কবিতাগুলি পাঠক বা সমালোচক কোন মহলেরই দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়নি। তিন বছর বাদে ওঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ এবং প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। এটা ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। এই বছরই উনি জার্মান সাহিত্যে উগ্র বাস্তবতার স্রষ্টা আর্নো হল্‌জের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নবোদ্যমে সাহিত্যসাধনা শুরু করেছিলেন।

হাউপ্ট্‌মানের প্রথম নাটক "বিফোর ডন" ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন অভিনীত হলো তখন ওঁর বয়স ঠিক সাতাশ।

সাহিত্য বা নাট্যজগতে সম্পূর্ণ অপরিচিত হাউপ্ট্‌মান রাতারাতি বিখ্যাত এবং সুপরিচিত হয়ে উঠলেন জার্মানীর বিদগ্ধ সমাজে। দু'ভাবেই বিখ্যাত হ'লেন উনি: নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক রচনার কৃতিত্বের জন্যে যেমন, তেমনি আর একদিকে দর্শকমণ্ডলীর বিরক্তি ঘটাবার জন্যেও বটে। গ্রাম্য গরীব দুঃখীদের জীবনে যদি আদৌ কোনো রসের বস্তু থেকেও থাকে, শহরের সাধারণ দর্শক তার জন্যে সময় বা পয়সা কোনোটাই খরচ করতে ইচ্ছুক নন। কাজেই একখানা নতুন নাটক আরম্ভ হচ্ছে দেখে যাঁরা শহুরে জীবনের কিছু একটা চমকপ্রদ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করবার আশায় থিয়েটারে এলেন তারা রীতিমতো খেপে উঠলেন। গোলমাল একটা লেগে যায় আর কি! ভয়ানক উত্তেজনার মধ্যে শেষ হলো নাটক। সব শেষে, শান্ত, সৌম্য, প্রিয়দর্শন যুবক হাউপ্ট্‌মান মঞ্চে উঠে দর্শকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানালেন—অবহেলিত গ্রামীণ মানুষের যে কাহিনী তাঁরা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে দেখলেন এবং শুনলেন সে জন্য। মুখচোখে তাঁর এমন কিছু একটা ছিল যে

হাউপ্ট্‌মান মঞ্চে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে সব একেবারে চুপচাপ। কয়েকটা দিন কাটলো এইভাবেই, তারপর ক্রমশঃ প্রতিবাদের সুর নরম হয়ে আসতে লাগলো। এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেলো নাট্যকার হাউপ্ট্‌মান দুঃসাধ্য সাধন করেছেন। দর্শকমণ্ডলী ভালোবাসতে আরম্ভ করেছেন তাঁর নাটককে। শহরের নাগরিকেরা দেখতে লাগলেন ফেলে আসা গ্রাম্য সভ্যতার দেবতাকে— দেখতে লাগলেন তাঁদের নিজেদের বিস্মৃত এবং অবহেলিত ইতিহাসকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত দর্শন, বিজ্ঞান ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে জার্মানগণের শ্রেষ্ঠত্ব গোটা ইউরোপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ফ্রান্স বা ইংলণ্ড যে এ সময়ে জার্মানদের তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু এ কথাও সত্য যে এ ব্যাপারে জার্মানগণ যথাযোগ্য প্রচারের অভাবে ন্যায্য সমাদর লাভেও বঞ্চিত হয়েছিল। অনেকের ধারণা যে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি ওদের দেশের সাহিত্যিকগণের বিশ্বজোড়া পাঠক সমাজ গড়ে তুলতে এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। কথাটা সত্য বলেই মনে হয়। দার্শনিক হিসেবে লাইবনিজ, কাণ্ট, ফিক্‌টে, শেলিং, হেগেল বা শোপেনহাওয়ারের প্রতিষ্ঠা বা পাঠক সমাজ বলতে গেলে বিশ্বজোড়া। সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে ঐ রকম বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা একমাত্র গ্যয়টে ভিন্ন জার্মানীর আর কারো ভাগ্যেই জোটেনি। অথচ সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে লেসিং, ভিলাণ্ট, ক্লপষ্টক, শ্লিগেল, নোফালিস, টিয়েক, রিকটার, শিলার, হাইনে প্রভৃতিরাও কালজয়ী স্রষ্টা ছিলেন।

গ্যয়টে ফাউষ্টের প্রথমেই বলেছিলেন যে পাঠক বা দর্শকগণকে satisfy করা দুঃসাধ্য, কিন্তু mistify করা খুবই সহজ। মনে হয় যে সচেতনভাবেই হক আর অবচেতনের তাড়নায়ই হক জার্মানীর কবি-সাহিত্যিকগণ এ সম্পর্কে অতিমাত্রায় প্রবণতা বিশিষ্ট। শোনা যায় গ্যয়টের 'হ্বিল্‌হেলম মেইষ্টার' পড়তে গিয়ে বিরক্ত হয়ে ওয়ার্ডসওআর্থ একাধিকবার বইখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন মেঝের ওপর। সুকল্পিত প্লট হিসেবে রিকটারের 'হেসপারাস' বা 'টাইটানে'র সমতুল্য উপন্যাস নিশ্চয়ই সে যুগে আকছার রচিত হতো না। অথচ উপন্যাস হিসেবে 'রবিনশন ক্রুশো' বা 'টম জোন্‌স' কিম্বা 'কাঁদিদ'-এর পাঠক সংখ্যার সঙ্গে গ্যয়টে বা রিকটারের উপন্যাসগুলির কোন তুলনাই হয় না।

প্রায় দেড়শ বছর ধরে শুধু দর্শন বা সঙ্গীতই নয়, সাহিত্যের মাধ্যমেও mystifying-এর প্রবণতা যে দেশের সাহিত্যস্রষ্টাগণের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সে দেশের সাহিত্যের আসরে হাউপ্ট্‌মানের আবির্ভাব তাই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বলতে হবে। কারণ জার্মান সাহিত্যে হাউপ্ট্‌মানের আবির্ভাব জার্মান নাটক ও উপন্যাসে বাস্তব প্রবণতার বৈশিষ্ট্যের গোড়ার কথা।

সাহিত্যসাধনার পরিণত রূপ—সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা বলতে যা বোঝায়, 'বিফোর ডন' অর্থাৎ প্রথম নাটকখানি প্রকাশিত হবার পরেই হাউপ্ট্‌মান তা অর্জন করেছিলেন। এরপর থেকে আরো অনেকগুলি নাটক পর পর রচনা করলেন হাউপ্ট্‌মান,—মোট আটত্রিশখানা; যার মধ্যে কয়েকখানি নাট্যসাহিত্যের স্থায়ী সংযোজন। 'দি বিভার কোট' একখানি কমেডী। যোগ্য সমালোচকেরা এই নাটকের জন্যে হাউপ্ট্‌মানকে জার্মানীর জাতীয় কমেডী রচয়িতা লেসিং-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'দি র‍্যাট্‌', 'দি এ্যাসাম্পশন অব হ্যানেল,' 'দি উইভার্স' 'দি সানকেন বেল'—এর প্রত্যেকখানিই জার্মানীতে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

দি উইভার্স—'দি উইভার্স'ই সর্বশ্রেণীর সমালোচক তথা সর্বসাধারণের মতে হাউপ্ট্‌মানের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। এ নাটকের বৈশিষ্ট্য এই যে, অনেকগুলি চরিত্র, বলতে গেলে একটা অঞ্চলের গোটা সমাজ [অর্থাৎ সাইলেসিয়ার তাঁতী সমাজ] সমগ্রভাবে এ নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে অংশ গ্রহণ করেছে। সাধারণতঃ নায়ক বলতে যা বোঝায় সে রকম কারো প্রাধান্য নেই, অথচ গোটা নাটকটি পড়া বা দেখা শেষ হবার পর পাঠক বা দর্শক এ কথা মানতে বাধ্য হবেন যে কোনো চরিত্রই বাদ দেওয়া চলে না। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে সাইলেসিয়ায় নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল তাঁত-শ্রমিকদের মধ্যে। হাউপ্ট্‌মান ঐতিহাসিকের সত্যনিষ্ঠা, তথা কবির দরদ নিয়ে রূপায়িত করলেন জার্মানীতে শ্রমিক অসন্তোষের প্রথমদিকের ঐ ঘটনাটি।

স্বদেশের বাইরে নাট্যকার হিসাবে হাউপ্ট্‌মানের যে খ্যাতি তার সূত্রপাত হয় তাঁর চতুর্থ নাটক 'দি উইভার্স' (১৮৯২) প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই। বস্তুতপক্ষে এই একখানা মাত্র গ্রন্থ রচনা করে গেলেও হাউপ্ট্‌মান বিশ্ব-সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করতেন। এই বৎসরই ইবসেনের 'দি মাষ্টার বিল্ডার'

প্রকাশিত হয়েছিল। উত্তরে ইবসেন, ষ্ট্রীণ্ডবার্গ, বিয়ার্নসন, পূর্বে টলষ্টয়, চেকভ, গর্কি, পশ্চিমে জোলা, লোতি, মোঁপাসা স্বদেশে সুডারম্যান ও অয়েরব্যাক প্রভৃতির জীবদ্দশায় সাহিত্যক্ষেত্রে নিজের স্বতন্ত্র একটি আসন করে নেওয়া কম শক্তির পরিচায়ক নয়। তাছাড়া থ্যাকারে, ডিকেন্স, ডষ্টয়েফস্কি, টুর্গেনিভ, ফ্লোবেয়র ও হুগো পরলোকগত হলেও তাঁদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি তখন গোটা ইউরোপকে তোলপাড় করছিল। গ্যয়টের 'গ্যায়টস' ও 'এগমণ্ট' এবং শিলারের 'উইলিয়াম টেল'-এ যে প্রতিরোধ ও সুবিচার আদায়ের জন্য বিদ্রোহী শক্তি ব্যক্তি বিশেষকে আশ্রয় করে প্রকাশ পেয়েছে, হাউপ্ট্‌মান সেই অনাচার-অত্যাচারক্লিষ্ট দুঃখী মানুষের প্রতিরোধী ও বিদ্রোহী শক্তিকে একটা গোটা সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত করে প্রকাশ করলেন 'দি উইভার্স' নাটকে। এ গ্রন্থে সকলেই নায়ক কারণ সকলেই কর্মী। হাউপ্ট্‌মানের পিতা যদিও হোটেলের ব্যবসা করতেন, কিন্তু তাঁর পিতামহ ছিলেন তাঁতী। সাইলেসিয়ার তাঁতী সমাজের দুঃসহ দৈন্য ও বিদ্রোহের ঘটনাবলীকে আশ্রয় করে রচিত এ নাটক সব কিছু বাদ দিলেও এর ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী এবং গোষ্ঠী ও সমাজ চিত্রায়নের প্রথম বলিষ্ঠ ও সার্থক সৃষ্টি হিসাবে বিশ্বসাহিত্যে যে একখানি স্থায়ী সংযোজন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

নীলদর্পণ ও দি উইভার্স—প্রসঙ্গত মনে পড়ে আমাদের দেশের স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের কথা। 'নীলদর্পণ'-এর রচনাকাল ১৮৫৮, অর্থাৎ, হাউপ্ট্‌মানের 'দি উইভার্সে'র ৩৪ বছর পূর্বে। চরিত্রগত ভাবে দুখানা গ্রন্থই যদিও একই ধরনের, কিন্তু শুধুমাত্র পরাধীন জাতির লেখক বলেই দীনবন্ধু দেশের বাইরে কখনই যথাযোগ্য স্বীকৃতি লাভ করেন-নি; এবং স্বদেশেও আজ প্রায় বিস্মৃত। কিন্তু রাজনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিমান জাতির লেখক বলে হাউপ্ট্‌মান একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সুযোগ্য অধিকারী বলে স্বীকৃত। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের শোষণ এবং ক্রমাগত অন্যায়-অত্যাচার উৎপীড়নের ফলে, বলতে গেলে, তারাও যে মানুষ এই কথাটাই ভুলতে বসেছিল, এ-হেন কতকগুলি মানুষের চিত্র হিসেবে 'নীলদর্পণ' সার্থক সাহিত্য সন্দেহ সেই, কিন্তু তার নরনারীরা মানুষ হিসেবে হাউপ্ট্‌মানের সৃষ্ট চরিত্রগুলির মতো বলিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি।

জার্মান সাহিত্যের একজন সমালোচক বলেন যে হাউপ্ট্‌মান For upwards of half a century had been the representative

German. বাস্তবিকই তাই। এবং শুধু নাটকগুলি সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য নয়, আটত্রিশখানা নাটক ছাড়াও হাউপ্ট্‌মান যে উপন্যাসগুলি রচনা ক'রে গেছেন, তার মধ্যেও এ বৈশিষ্ট বিদ্যমান।

এ্যাটলান্টিস—উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্তত: চারখানা স্মরণীয়—'দি ফুল ইন খ্রাইষ্ট ঃ এমান্যুয়েল কুইণ্ট'; 'দি হেরেটিক অব সোয়ানা'; 'এ্যাটলান্টিস' এবং 'দি আইল্যাণ্ড অব দি গ্রেট মাদার'। এগুলির মধ্যে 'এ্যাটলান্টিস' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাউপ্ট্‌মানের আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও সর্বাধুনিক শিল্প-সম্পদে সমৃদ্ধিশালী দেশ আমেরিকায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের নরনারীর জীবনযাত্রার, সুখ শান্তি তথা মননরীতি সম্পর্কে নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। তা ছাড়া জাহাজডুবির যে ঘটনাটি এ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে, তা সত্যই অবিস্মরণীয়।

'দি উইভার্স'এর মত 'এ্যাটলান্টিস' বিংশ শতাব্দীর অনেক প্রথম শ্রেণীর লেখককেও প্রভাবিত করেছে।

হাউপ্ট্‌মান ছিলেন একজন সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী। জার্মানীর যা কিছু দোষগুণ অকপটে তাঁর রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করতে আমরণ প্রয়াসী হয়েছেন। এ জন্যে বিভিন্ন সময়ে কারণে-অকারণে বিভিন্ন জাতীয় সরকার ওঁর প্রতি বিরাগভাজনও হয়েছেন। কিন্তু ওঁর জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে কার্যত ওঁর বিরুদ্ধে করতে পারেনি কিছুই। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বের কথা। ওঁর একটি নাটক সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট একটি নাট্যশালায় অভিনীত হবে জেনে কাইজার সে নাট্যশালায় নিয়মিত সরকারী সাহায্য বন্ধ করে দিলেন, কিন্তু ওঁর নাটকের অভিনয় বন্ধ করতে সাহসী হননি। ঠিক তেমনি বলদর্পী হিটলারও হাউপ্ট্‌মানকে দিয়ে নিজের সমর্থনে কথা বলাতে পারতেন না বলে, কোন রকম পৃষ্ঠপোষকতা কখনো করেন নি, কিন্তু অনেক বিজ্ঞানী বা লেখককে যেমন দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন, সে রকমও করতে তাঁর সাহসে কুলোয় নি। নিজের জীবনটাও ওঁর কম ট্র্যাজিক নয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন ভালবাসতেন কলকাতাকে, হুগো বাসতেন প্যারিসকে, ঠিক তেমনি হাউপ্ট্‌মান ভালোবাসতেন তাঁর প্রাদেশিক শহর ড্রেসডেনকে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারীর রাতের ঘটনা: হাউপ্ট্‌মান স্তব্ধ হয়ে দেখলেন চোখের সামনে তাঁর প্রিয় শহর মিত্রশক্তির প্লেন থেকে নিক্ষিপ্ত বোমার ঘায়ে ধ্বংস হয়ে গেলো। এর পর আর বছর খানেক বেঁচেছিলেন হাউপ্ট্‌মান।

হাউপ্ট্মানের সাহিত্য-পদ্ধতি বা চিন্তাধারায় জোলা, টলষ্টয় এবং ইবসেনের প্রভাব লক্ষণীয়ভাবে বিদ্যমান। ওঁর গুরু ও বন্ধু, কবি ও সমালোচক 'হল্জ'এর প্রভাবই অবশ্য ওঁর ওপর সর্বাধিক ছিল। এঁদের সকলের নিকট থেকে কিছু না কিছু গ্রহণ করে নাটক বা উপন্যাসের ক্ষেত্রে হাউপ্ট্মান যা পরিবেশন করেগেছেন তা সম্পূর্ণ ওঁর নিজস্ব।

টমাস মান

জার্মানীর সাহিত্যে জনপ্রিয় স্রষ্টার সংখ্যা, ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের তুলনায় এতই কম যে অবাক লাগে। কিন্তু তবু জার্মানীর সাহিত্য সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু জানা না থাকলে যে ইয়োরোপীয় সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছুই অজানা থেকে যায় একথা অবশ্য স্বীকার্য। কারণ, প্রথম সারির সাহিত্যস্রষ্টার সংখ্যা জার্মানীতে কখনোই খুব বেশি দেখা না গেলেও, যে ক'জনেরই আবির্ভাব ঘটেছে তাঁরা পৃথিবীর অনেক দেশের প্রথম শ্রেণীর লেখকগণের চাইতেই অনেক বিষয়ে মহত্তর এবং বিরাটতর স্রষ্টা। জার্মান সাহিত্যের বিগত যুগে আমরা পেয়েছি গ্যয়টে, নোফালিস, শিলার এবং হাইনে-কে, যাঁদের সৃষ্টি আজ বিশ্বমানবের সম্পদ বলেই স্বীকৃত। আর এ যুগেও অন্তত তিনজন আমরা এমন সাহিত্যস্রষ্টা পেয়েছি যাঁরা প্রত্যেকে তাঁদের জীবদ্দশাতেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন—এঁরা হলেন হাউপ্ট্‌মান, হেরমান হেস, এবং টমাস মান। তা' ছাড়া অয়েরবাক, সুদারমান, স্টেফান জ্বাইগ এবং বের্টোল্ড ব্রেখ্‌টের প্রসিদ্ধিও বাড়তির দিকে।

প্রথম জীবন—জার্মানীর লুবেক শহরের মান পরিবার চার পুরুষ ধরেই বিখ্যাত ছিল। মানের ঠাকুরদাদার বাবা দেশের প্রচলিত ধর্মের বিরোধিতা করে বক্তৃতা দিয়ে এবং কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করে তাঁর সময়ে দেশ বিখ্যাত হয়েছিলেন। ঠাকুরদা ছিলেন একজন পেশাদার রাজনীতিবিদ, এক সময়ে জার্মানীর হয়ে নেদারল্যাণ্ডে রাষ্ট্রদূতের কাজও করেছিলেন। মানের বাবা পার্লামেণ্টের সদস্য ছিলেন, তা' ছাড়া দু'বার লুবেক শহরের মেয়রও হয়েছিলেন। টমাস মান যখন জন্মগ্রহণ করলেন তখন ওঁদের চার পুরুষের বিরাট ব্যবসার গতি ধাপে ধাপে মন্দের দিকে।

টমাস মান ছিলেন তিন ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয়। ওঁদের দু'টি বোনও ছিলো। কিন্তু তারা দু'জনেই আত্মহত্যা করে। পৈতৃক ব্যবসার অবস্থা মন্দের দিকে যেতে শুরু করলেও বাল্য এবং কৈশোর পর্যন্ত মানের কখনো কোন আর্থিক অভাব ঘটেনি। যথা সময়েই স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন টমাস মান। কিন্তু বাঁধাধরা পড়াশুনোয় ওঁর নিদারুণ অমনোযোগিতা দেখে মাস্টার মশায়রা প্রায় সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করতেন। বছর বারো বয়স

থেকেই দেখা যেতো পাঠ্যবই মান কদাচিৎ পড়ছেন, কিন্তু অপাঠ্য (!) বই দু'চারখানা সব সময়েই তাঁর পড়ার ঘরে লুকোনো অবস্থায় পাওয়া যেতো। এ হেন ব্যক্তি যে পনরো বছর বয়স থেকেই গল্প, কবিতা এবং নাটক লিখতে আরম্ভ করবেন তাতে আর আশ্চর্যের কি!

সাহিত্যসাধনার শুরু—পনরো বছর বয়সেই মান অন্য কয়েকজন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলে একখানি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এবং প্রথম তিন বছর 'পল টমাস্' এই ছদ্মনামে লিখতেন এই পত্রিকায়। তারপর ওঁর যখন আঠারো বছর বয়স পূর্ণ হলো সেই সময় দেখা যায় স্বনামে প্রথম লেখা বেরুলো—একটি কবিতা।

মান পরিবারের চার পুরুষের ব্যবসায় ক্রমাবনতি ঘটতে ঘটতে এমন একটা অবস্থায় এসে পৌছলো যে, স্কুলের পড়াশুনো শেষ করবার পরেই মানকে চাকুরীর সন্ধান করতে হলো। লুবেক ছেড়ে মিউনিকে এসে একটা বীমা কোম্পানীতে কেরাণীর চাকুরী নিলেন মান, আর সঙ্গে চলতে লাগলো লেখার কাজ। একটি বড়ো গল্প ('পতিত') কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ করেছিলেন মান। চাকুরীর সঙ্গে সঙ্গেই পড়াশুনোও চলতে লাগলো। মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প এবং অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশুনো শেষ করে চলে এলেন রোমে বড়ো ভাই হাইনরিশের কাছে। হাইনরিশ ছবি আঁকতেন, টমাস মান মাঝে মাঝে অবাক হয়ে দেখতেন সেই ছবি, কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই পড়াশুনোয় ডুবে থাকতেন। এই সময়ে মান প্রধানত ফরাসী, ইতালীয়, রুশ, নরওয়ে এবং সুইডেনের সাহিত্য পড়তেন। দু'ভাই মিলে অল্প কিছুদিনের জন্যে প্যালেস্টাইনও ঘুরে এসেছিলেন। যীশুর স্মৃতি-বিজড়িত জায়গাগুলিতে গিয়ে পড়লে হাইনরিশকে রীতিমতো বেগ পেতে হতো ভাইকে সেখান থেকে সরিয়ে আনবার জন্যে। মানের প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হলো ওঁর তেইশ বছর বয়সে ('লিটল্ হার ফ্রিডেমান')। এ বই প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং প্রকাশকের তরফ থেকে জোর তাগিদ আসতে থাকে আরো লেখার জন্যে।

এর প্রায় বছরখানেক বাদে মান যখন রোম থেকে মিউনিকে ফিরলেন, দেখা গেলো মাঝারী ধরনের একটি সুটকেশ নিয়ে উনি প্রায় সময়ই ব্যস্ত থাকেন। বাড়ীর লোকজন কিছুটা আশ্চর্যবোধ করেছিলেন যখন জানতে পারলেন যে, সুটকেশ ভর্তি বিরাট কাগজের বাণ্ডিলটা আসলে একটি

পাণ্ডুলিপি। এতো বড়ো পাণ্ডুলিপি? হ্যাঁ, এতো বড়ো পাণ্ডুলিপি। অবশ্য এমন আর কি-ই বা বড়ো, তরুণ মান কিছুটা যেন কৈফিয়তের সুরে লজ্জার সঙ্গে উত্তর দিতেন, 'কাগজের একপিঠে তো লেখা। মাত্র আঠোরো শ' সত্তরখানা কাগজ। বেশি মনে হচ্ছে? কিন্তু ব্যাপারখানাও তো সোজা নয়। একটি বৃহৎ পরিবারের ঠিক চার পুরুষের প্রায় গোটা ইতিহাস—মানে কল্পিত কাহিনী লিখতে হয়েছে যে।' অনেকখানি লিখে ফেলবার জন্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে কিছু নরম সুরে এমনি ধারা কথা শুধু যে বাড়ীর লোকজনকেই বলতেন মান তা'নয়, রাজধানী বর্লিনে তাঁর যে প্রকাশক প্রথম উপন্যাস প্রকাশের সাফল্যের পরে ক্রমাগতই জোর তাগিদ দিয়ে চিঠি লিখতেন আরও লেখার জন্যে, তাঁকেও চিঠির পরে চিঠি দিতেন অমনি সুরে।

প্রকাশক প্রথমেই জানালেন যে, বইখানা ছাপাতে পারলে উনি খুবই আনন্দবোধ করবেন, তবে কিনা আয়তনটা দুই তৃতীয়াংশ কমিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু মান জানালেন, 'কোন অংশ কমাবো, কার অংশ কমাবো? ঠাকুরদার, নাকি বাবার, না ছেলের? কারো কথাই তো কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। একজনের কথা বাদ দিলে যে অন্য সকলের কথাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।' পাণ্ডুলিপির ভেতরেও বাবা তাঁর মেয়ের বিয়ের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে লিখছেন: 'ঐ যুবকটিকে বিয়ে করবি জানিয়েছিস, কিন্তু দেখ, তা' কি করে হবে, তা' তো হবার নয় বাছা, আমরা কেউ যা খুশী তাই করতে পারি না, আমরা কেউই আলাদা নই, আমরা সবাই মিলে একটি দীর্ঘ শৃঙ্খল এবং আমরা প্রত্যেকে এর এক-একটি অংশ-বিশেষ।'

সাহিত্যসাধনার পরিণত রূপ—যাই হ'ক, প্রকাশক শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন মানের বইখানা ছাপতে। একটি ছত্রও বাদ না দিয়ে, পুরু এন্টিক কাগজে মোটা মোটা দু'টি খণ্ডে প্রকাশিত হলো টমাস মানের দ্বিতীয় উপন্যাস, সুবৃহৎ 'বাডেনব্রুকস'। যাঁরা সৎ সমালোচক তাঁরা বইয়ের আয়তন দেখেই চটে গেলেন—কারণ ওই বিরাট বইটা তাঁদের পড়তে হবে, তবে তো তার সমালোচনা লিখবেন। পাঠকএবং ক্রেতা সাধারণ চটে গেলেন বইয়ের দাম দেখে। প্রকাশক যে নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেই ছেপেছিলেন বইখানা সে কথা আমরা আগেই দেখেছি। কাজেই প্রকাশক এমন উচ্চ মূল্য ধার্য করেছিলেন 'বাডেনব্রুকস'-এর জন্যে যে কোনো মতে এক কপি বিক্রি হলে যাতে অন্তত তিন কপির খরচটা উঠে আসে।

প্রকাশক পরে বলেছিলেন যে, একজন তরুণ এবং উঠতি লেখককে হাতে রাখবার জন্যেই উনি এ বই প্রকাশের ঝুঁকিটা নিয়েছিলেন। লাভের কিছুমাত্র আশাই তাঁর ছিল না, পনরো কি বিশ বছরে হয় তো খরচটা উঠে গেলেও যেতে পারে এইমাত্র আশা করতেন তিনি। এটা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। কিন্তু বইয়ের ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ প্রকাশক মশায়ের সমস্ত আন্দাজ এবং অনুমান ভুল প্রমাণিত হলো বছর ঘুরে না আসতেই। তিন হাজারের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়। প্রকাশক এবার প্রকৃত ব্যবসায়ীর মতো সস্তা দামের একটি এক খণ্ডে পাতলা কাগজে দ্বিতীয় সংস্করণ বের করলেন। সেই যে বিক্রি শুরু হলো 'বাডেনব্রুকস'-এর, বত্রিশ বছরে এক জার্মান ভাষাতেই এ বইয়ের প্রায় বারো লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছিল। তারপর এ বই মানের অন্য সমস্ত বইয়ের মতই হিটলার 'অ-জার্মান' ঘোষণা করে জনসমক্ষে আগুনে পোড়ালেন।

কিছু কিছু গোঁয়ার এবং ছিটগ্রস্ত মানুষ বোধ হয় সমাজের সর্বস্তরেই দেখা যায়। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রেই এদের সংখ্যাধিক্যটা দেখা যায় সব চাইতে বেশি। এঁদের মাথায় একবার যে ধারণাটা এসে পড়ে সেটা যে একেবারেই অভ্রান্ত সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশেরও উপায় থাকে না আর কারো। তাই একনায়ক হিটলারের আমলের জার্মানীতে বিংশ শতাব্দীর জার্মানীর সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁরা সবচাইতে স্মরণীয় প্রতিভা, হিটলার তাঁদের দুজনকেই জার্মানীর পক্ষে পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। এঁদের একজন হলেন হেরমান হেসে আর দ্বিতীয়জন হলেন টমাস মান।

বাডেনব্রুক্স—'বাডেনব্রুকস' হ'লো একখানি পারিবারিক উপন্যাস, চারটি পুরুষের সুদীর্ঘকাল ধরে এর বিস্তৃতি। এই সময়ের মধ্যে দেখা যায় একটি পরিবার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, কঠোর পরিশ্রমের ফলে ক্রমশঃ সমৃদ্ধিশালী এবং প্রভাবশালী হয়ে উঠছে এবং তারপর আবার ধীরে ধীরে কালের ক্ষয়িষ্ণু প্রভাবে চতুর্থ পুরুষে এসে সংগ্রামবিক্ষত পরিবারটি নির্মূল হয়ে গেলো পৃথিবীর বুক থেকে। লুবেক শহরের বাডেনব্রুকস পরিবারের এই কল্পিত কাহিনী যে বহুলাংশে মান পরিবারের সত্য কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত, তা সহজেই অনুমেয়। তবে শেষের অংশটি নয়। ব্যক্তি বা গোষ্ঠিবদ্ধ মানুষের জীবনে সমস্ত দোষগুণের প্রকাশ ঘটেছে এ' বইতে। সে হিসেবে এ যেন একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ।

মান পরিবারের প্রথম তিন পুরুষের প্রধান উপজীবিকা ছিল ব্যবসায়, বাডেনব্রুক্স পরিবারেরও তাই। বাডেনব্রুক্স পরিবারে তৃতীয় পুরুষ থেকে অবক্ষয়ের হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছিল, মান পরিবারের বেলাতেও ঠিক তাই হয়েছিল! অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত জার্মান পরিবারের গঠনপ্রণালী তথা তার শক্তির উৎসের পরিচয় জানবার জন্যে 'বাডেনব্রুক্স' এখানি অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ। একটি সুন্দর পরিবার গড়ে তুলতে হলে ব্যক্তিগত স্বার্থ যে কতোখানি ভুলে থাকতে হয়, ক্ষুদ্রবৃহৎ নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তার জটিলতাকেও আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে মান তাঁর পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। বিশ জন মানুষ এক জায়গায় থাকলে যেমন তাঁদের প্রত্যেকের আলাদা অলাদা একটি পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি আবার সেই বিশ জনের মিলিত একটি রূপ আছে। বিভিন্ন বিচিত্রধর্মী ভাবধারণা, প্রেমপ্রীতির তীব্রতা তথা হিংসা, দ্বেষ এবং স্বার্থবুদ্ধি— এসবগুলি যে কী ভাবে মানবিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে একটি পৃথক সত্তার রূপ নিয়ে বংশ পরম্পরায় এগিয়ে চলতে থাকে তা' মানের এই উপন্যাসে ছবির মতো ফুটে বেরিয়েছে!

বাডেনব্রুক্স-এর ধরনের পরিবারিক উপন্যাস বর্তমান শতাব্দীতে আরো অনেক লেখা হয়েছে; তাদের মধ্যে যে ক'খানা আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে 'বাডেনব্রুক্স' শিল্পসৃষ্টি হিসেবে তাদের কারো চাইতেই পিছিয়ে-পড়া নয়। গল্সওয়ার্দীর সুবৃহৎ পারিবারিক উপন্যাস 'ফরসাইট সাগা', কোপীরাসের 'দি বুক অব দি স্মল সোলস', মার্টিন স্থ গার্ডের 'দি থিবল্টস', উনসেটের 'খ্রীষ্টিন লাভর্যান্‌সডাটার,' ভার্জিনিয়া উলফের 'দি ইয়ার্স' বা পারিবারিক উপন্যাসের পথপ্রদর্শক এ্যান্টনি ট্রলোপের রচনাবলী—এঁদের কারো চাইতেই মানের রচনার গুরুত্ব কম নয়, যদিও বাডেনব্রুক্স তাঁর প্রথম যৌবনের রচনা।

বাডেনব্রুক্স প্রকাশিত হবার পরের বছর থেকে মানকে জীবিকা নির্বাহের জন্যে লেখা ব্যতীত কখনো আর অন্য কোনো কাজ করতে হয় নি। মূল জার্মান ভাষায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'বার বছর তিনেকের মধ্যেই অন্য চার পাঁচটি ইয়োরোপীয় ভাষাতেও এ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজী অনুবাদ বেরিয়েছে অনেক পরে—প্রায় তেইশ বছর পরে।

লুবেকে চার পুরুষের ব্যবসায়ে বিপর্যয় ঘটলো এবং মানের বাবার মৃত্যুর পরে মান পরিবারের অন্য সবাই মিউনিকে চলে এলেন। এখানেই আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলতে লাগলো। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মান বিয়ে করলেন মিউনিকের এক অবস্থাপন্ন পরিবারের একমাত্র মেয়েকে। কাজেই মিউনিক মান পরিবারের পক্ষে নতুন জায়গা হলেও লেখক হিসেবে মানের খ্যাতি এবং বিবাহ-সূত্রে বিরাট একটি স্থানীয় পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক—এ দু'য়ের ফলে অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই মিউনিকে মান পরিবার সাধারণের কাছে বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠলো।

'বাডেনব্রুক্স' প্রকাশিত হবার পরে একটানা তেত্রিশ বছর মানের কেটেছে সাফল্যের মধ্যে। একদিকে সাফল্য যেমন এসেছে আর্থিক এবং পারিবারিক দিকে, অন্যদিকে তেমনি লেখার দিকে। এই সময়ের মধ্যেই মান তাঁর শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উপন্যাসগুলি রচনা করেছিলেন। 'টোনিও ক্রোগার' (১৯০৩) রচনা প্রসঙ্গে মান পরবর্তীকালে তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'এ স্কেচ অব মাই লাইফ' (১৯৩০)-এ বলেছেন যে, ঐ ক্ষুদ্র কাহিনীটি রচনার কালেই গদ্যের ভেতর কীভাবে সঙ্গীতের রসসৃষ্টি করতে হয় তা' নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করেন। 'রয়াল হাইনেস' (১৯০৯) একখানি আয়তনে ছোট উপন্যাস—জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে এখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর বলে গণ্য হয়েছে। যোগ্য সমালোচকগণ মনে করেন যে, মানের শিল্পবোধ এ রচনাতে অতি প্রচ্ছন্ন হওয়া সত্ত্বেও রচনাটির ব্যর্থতার কারণ এর অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গের সুর। ব্যঙ্গধর্মী রচনায় মান কখনোই যথেষ্ট পটুতা দেখাতে পারেন নি।

ডেথ ইন ভেনিস—১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে মানের আর একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস 'ডেথ ইন ভেনিস' প্রকাশিত হবার পরে গোটা ইয়োরোপের সাহিত্যরসিক মহলে আর একবার আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকের মতে বিংশ শতাব্দীতে এমন কি এখন পর্যন্ত এখানি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র উপন্যাস। গুস্তাভ নামে একজন প্রখ্যাত লেখকের কল্পিতকাহিনী হলো এর বিষয়। গুস্তাভ ভেনিসে বসবাস করেন। ওঁদেরও চারপুরুষের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এ কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায়। তা' ছাড়া পাওয়া যায় আর একটি বিচিত্র মানবিক প্রবৃত্তির পরিচয়। একটি পরিবার বাইরে থেকে ভেনিসে এসেছে বেড়াতে। তাদের একটি ছোটো ছেলেকে গুস্তাভের খুবই ভালো লাগে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই

এই প্রীতির সম্পর্কে দেখা দিলো দারুণ তীব্রতা। এবং এই তীব্রতার জন্যেই দেখা যায় শেষ অবধি ছেলেটিও মারা গেলো, গুস্তাভও মারা গেলো। কারণ, ভেনিসে হঠাৎ প্লেগ দেখা দিয়েছিল। গুস্তাভ নিজে বা ছেলেটির পরিবার ভেনিস ছেড়ে চলে গেলে প্লেগের কবলে না-ও পড়তে পারত। কিন্তু ছেলেটির প্রতি গুস্তাভের আকর্ষণ এতই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে ওরা একাধিক বার শহর ছেড়ে চলে যাবার উদ্যোগ করলেও গুস্তাভ এক-একবার এক-একভাবে সে আয়োজন পণ্ড করে দিয়েছিল।

দি ম্যাজিক মাউণ্টেন—'ডেথ ইন ভেনিসে'র পরেই মানের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য রচনা হলো 'দি ম্যাজিক মাউণ্টেন' (১৯২৪)। অনেকের মতে 'বাডেনব্রুকস' নয়, 'ম্যাজিক মাউণ্টেন'ই মানের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। বিক্রয়ের দিক থেকে এ বই, এ শতাব্দীর সর্বাধিক প্রচারিত উপন্যাসগুলির অন্যতম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানের শিল্পনৈপুণ্য তথা জীবনের এবং বিদ্যাবত্তার যে পূর্ণ সমন্বয় ঘটেছে এ উপন্যাসে, সে বিষয়ে সকলেই একমত। 'বাডেনব্রুক্স'-এর দার্শনিকোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমরা দেখতে পাই টমাস মান আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে 'টোনিও ক্রুগারে'র সঙ্গীতের রেশটি এবং তার সঙ্গে 'ডেথ ইন ভেনিসে'র বিশ্লেষণধর্মিতার মিশ্রণের ফলে এমন সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন যে পাঠক শুধু কাহিনীতে নয়—রচনার প্রতিটি বাক্যের দ্বারাও ম্যাজিকের মতোই প্রভাবিত বোধ করেন।

'ম্যাজিক মাউণ্টেন' রচনার একটু পূর্ব-ইতিহাস আছে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মান একটা স্যানাটোরিয়ামে গিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসার জন্যে। তিন সপ্তাহ মান ছিলেন সেখানে। এখানে থাকা অবস্থাতেই একটি রোগীকে দেখে মান প্রথমত এ কাহিনী রচনার জন্যে প্রেরণা পেয়েছিলেন। ঠিক ছিল একটি ছোট উপন্যাস হবে। কয়েক পৃষ্ঠা রচনার পরেই মনে হলো, না, অতো অল্পে জিনিষটা মনোমতো তৈরী করা যাবে না। তাই বছরখানেক পরে আবার নতুন করে লেখা আরম্ভ করলেন। কিন্তু এবারও কিছুদূর এগোবার পরে মান দেখলেন, অনেক কিছুই এসে যাচ্ছে মনে। তাড়াহুড়ো না করে সে সবের সুষ্ঠু প্রকাশের জন্যে আরো অনেক চিন্তার প্রয়োজন এবং কাজটা ধীরে ধীরে করা দরকার মনে হয়েছিল। তাই শেষ পর্যন্ত করেছিলেন মান। দীর্ঘ দশ বছরের ওপর একটু একটু করে লিখে তিনি যখন 'ম্যাজিক মাউণ্টেন' শেষ করলেন তখন তা' আকৃতিতে যেমন বিরাট হয়ে পড়লো,

বিষয়বস্তুতেও তেমনি এ রচনার অভিনবত্ব প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই পাঠক এবং সমালোচক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

শিল্পী হিসেবে মান যে অতিমাত্রায় আত্মসচেতন এ কথা অনেকেই আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর দোষ বা গুণ হেনরী জেমস, জেমস জয়েস বা আঁদ্রে জিদের সঙ্গে তুলনীয়। বিষয়বস্তু নির্বাচনে মান যে আশ্চর্য রুচি-বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে অনুকরণীয়, যে কোনো বিষয় সম্পর্কে মানের যে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী তাও কম বিস্ময়ের নয়। রোগী হতে কেউই চায় না। রোগকে কারোই ভাল লাগার কথা নয়। ম্যাজিক মাউন্টেনের গোড়ার কথা এই রোগ। রোগ সারাবার জন্যে সবাই একটা স্যানাটোরিয়ামে আসতো। এবং শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে একজন (নায়ক হ্যান্স) আবিষ্কার করলো যে রোগের অন্য একটা ক্ষমতা আছে, রোগ জীবনের দরজা খুলে দিতে পারে। মানবমনের এ রকম অসংখ্য প্রকোষ্ঠ আছে রুগ্ন অবস্থায় শয্যার নিষ্ক্রিয়তা ভিন্ন যেদিকে স্বাভাবিকভাবে কখনোই আমাদের নজর যায় না। রোগের মধ্য দিয়ে এই নতুন রাজ্যের সন্ধান পেয়েই হ্যান্স সানন্দে সমর্পণ করলো নিজেকে রোগের কাছে। এই প্রতীকধর্মী ব্যাপারটাকে অনেকেই গ্যয়টের ফাউস্টের শয়তানের সঙ্গে মিতালী স্থাপনের তুলনা করেছেন।

'ম্যাজিক মাউন্টেন'-এর প্রধান চরিত্র হ্যানস ক্যাস্ট্রপ। হ্যানস ঘটনাচক্রে রোগী হিসাবে লোকালয়ের অনেক দূরে এবং উঁচুতে একটা স্যানাটোরিয়ামে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল চিকিৎসার জন্যে। কয়েক সপ্তাহ হ্যানস-এর এখানে থাকবার কথা ছিলো। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেলো কয়েক বছর স্বেচ্ছায়ই ও সেখানে কাটালো। প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু পূর্বে ইয়োরোপ, বা হয়তো বলা যায় গোটা পৃথিবীর সভ্যতায় যে সঙ্কট দেখা দেয় এ উপন্যাসে মান তারই একটি সুষ্ঠু চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। সমস্যার একেবারে ভেতরে প্রবেশ করলে অনেক সময়ই দেখা যায় যে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না আমরা। কারণ, আমরাও সেই সমস্যারই অঙ্গবিশেষ হয়ে পড়ি। তাই দেখা যায় 'অবজেকটিভলি' বিচার করবার সুবিধার জন্যে, যে কোনো সমস্যাকে বুঝবার জন্যে তার বাইরে থেকে দেখবারও একটা পদ্ধতি অনেকে অবলম্বন করে থাকেন। মানও তাই করেছেন। তাঁর উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রই পর্বতশীর্ষের স্যানাটোরিয়ামের রোগী বা

রোগিণী। হ্যানস তাদের কেন্দ্রবিন্দু। এদের জীবনে সক্রিয়তা বলতে বোঝায় পরস্পরের সঙ্গে বিদগ্ধজনোচিত আলাপ-আলোচনা করা—এ ছাড়া আর কারোই কোনো কাজ নেই। সাধারণত দেখা যায় যে, কোনো ঘটনা বা আলোচনা নানা বহির্মুখী শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে তার প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু মানের এই বইতে ঠিক বিপরীত ব্যাপার ঘটেছে। প্রত্যেক আলোচনাই গিয়ে কাহিনীর মধ্যমণি হ্যানসের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে—ফলে বলা যায় যে, মান তাঁর সময়কার দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং সদ্য-শিল্পোন্নত পৃথিবীতে মানুষের যে আত্মিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তারই একটা বিস্তারিত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ম্যাজিক মাউন্টেনে উপস্থিত করেছেন। একটি ধ্বংসোন্মুখ শিল্পসভ্যতার আত্মবিনাশকারী নানা দিকের চিত্রসৃষ্টিতে এ বই বিগত চল্লিশ বছরেরও বেশি বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

মানের পরবর্তী উপন্যাস 'ডিসঅরডার এণ্ড আর্লি সরো' (১৯২৬) প্রধানত তাঁর নিজের সাংসারিক জীবনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত। নামধামের মিল না থাকা সত্ত্বেও এ কাহিনী যে একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব, মান পরিবারের সঙ্গে পরিচিত একাধিক মনস্বী সে কথা বলেছেন। মান তাঁর বড়ো মেয়েটিকে অত্যধিক ভালোবাসতেন—সেই বালিকা কন্যাই কার্যত এই ক্ষুদ্র উপন্যাসের প্রায় সবটা জুড়ে রয়েছে। আর সেই সঙ্গে রয়েছে অপত্যস্নেহের নানা বিচিত্রপ্রকাশ।

দু'বছর পরে, অর্থাৎ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মান তাঁর সাহিত্য-সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

'ম্যারিও এণ্ড দি ম্যাজিসিয়ান' (১৯৩০)-এ মান কিছুটা ভবিষ্যৎদ্রষ্টার অনুভূতি নিয়ে এবং পূর্ববোধে উদ্দীপিত হয়ে একনায়কতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করলেন। এটা হিটলারের আবির্ভাবের তিন বছর আগের ঘটনা।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মান একটি বিরাট বিষয়বস্তু নিয়ে সুবৃহৎ একখানা বই রচনা করবার জন্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ঘটনাটার সূত্রপাত হয়েছিল নিতান্ত সাধারণ একটা ব্যাপার থেকে। এক বন্ধুর সঙ্গে বাইবেলের জোসেফ-এর কাহিনী নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল মানের মিউনিকের বাড়িতে বসে। আলোচনার মধ্যে প্রসঙ্গতঃ জোসেফ এসে পড়লো। কয়েকদিনের মধ্যেই বিভিন্ন সাহিত্য পত্র-পত্রিকাদিতে খবর বেরুলো যে, জোসেফের উপাখ্যান অবলম্বনে মান বড়ো একখানা বই লেখবার জন্যে বইপত্র সংগ্রহে ব্যস্ত। জোসেফ সম্পর্কে

প্রায় শতাধিক বিভিন্ন বই মান দু' সপ্তাহের মধ্যে তাঁর লেখাপড়ার ঘরে এনে জমা করলেন। তার মাস চারেক পরে শুরু হলো লেখার কাজ। লেখা এবং পড়া সমান গতিতেই চলতে লাগল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় সাড়ে তিন বছরের চেষ্টায় মান তাঁর জোসেফ সিরিজের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করলেন— 'জোসেফ এণ্ড হিজ ব্রাদার্স'।

নাৎসীদের বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্রের পক্ষে—১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মানের জীবনের একটা মোড় ঘুরলো। তিন ছেলে এবং তিন মেয়ে নিয়ে সুন্দর সাজানো সংসার তচনচ হয়ে গেলো হিটলার এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের অঙ্গুলি হেলনের ফলে। কয়েক বছর পূর্ব থেকেই মান বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাহিত্য সংস্থার আমন্ত্রণে কখনো ইংলণ্ড, স্পেন, নরওয়ে, সুইডেন, কখনো বা সুইজারল্যাণ্ডে যেতেন বক্তৃতা দেবার জন্যে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন নাৎসী দল জার্মানীতে রাষ্ট্রশক্তি দখল করলো সে সময়ে মান হল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন ঐ রকমভাবে আমন্ত্রিত হয়ে একটি সাহিত্যসংস্থায় বক্তৃতা দানের জন্যে। মান সেখানে থাকতেই খবর বেরুলো হিটলারের সরকার তাঁর পক্ষে জার্মানীতে প্রবেশ করা বেআইনী ঘোষণা করেছেন। উপরন্তু 'বাডেনব্রুক্স' সহ তাঁর সমস্ত রচনাবলী বেআইনী বলে ঘোষিত হয়েছে এবং প্রকাশ্যে আগুনে পোড়ানো হয়েছে। প্রথমটা মানের ধারণা হয়েছিল যে নাৎসী দলের কয়েকজন উগ্রমস্তিষ্ক যুবকের ক্ষিপ্রতার ফলেই এমনধারা হচ্ছে স্বদেশে। নাৎসী দলের বড়ো নেতারা নিশ্চয়ই শীঘ্র তাঁদের সিদ্ধান্ত নাকচ করবেন। কিন্তু তার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। উপরন্তু মানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি— জার্মানীর ভেতর কোথায় কি আছে না আছে তা সব অনুসন্ধান করা আরম্ভ হয়ে গেলো। বলাই বাহুল্য সে সব বাজেয়াপ্ত করলো হিটলারের সরকার। শুধু তাই নয়, প্রথমে শুধু মানের পক্ষে জার্মানী প্রবেশ বেআইনী বলে ঘোষিত হয়েছিল, তার কিছুদিন পরেই আবার আর এক ঘোষণায় মানের জার্মান নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হলো।

এদিকে মানের ভাই এবং ছেলেমেয়েরা চিঠির পর চিঠি লিখতে লাগলেন হিটলারের নীতির বিরোধিতা করে খবরের কাগজে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেবার জন্যে। কিন্তু মান সে কথায় কান দিলেন না। উনি শুধু বললেন যে— আমি নিজেকে non-political বলে মনে করি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করলেন যে, "কয়েক বছর পূর্বেই আমি একখানা ছোট্ট বই লিখেছিলাম 'রিফ্লেকশনস

অব এ নন-পলিটিক্যাল ম্যান', দেশের সরকার আমার বিরুদ্ধে চলে গেছে এবং নানাভাবে আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বলেই আমি অকস্মাৎ আমার নীতির পরিবর্তন করবো এ কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই। তা'হলে তো এই কথাই বোঝাবে যে, হিটলার আমার নীতির পরিবর্তন ঘটাতে পারে, অর্থাৎ কিনা আমি হিটলারের বুদ্ধি মতো চলি। কিন্তু তা আমি বাস্তবিকই চলি না। সব ব্যাপারটা আমাকে আর একবার ভালোভাবে বুঝতে হবে, চিন্তা করতে হবে, তারপর যা করবার করা হবে।"

হিটলারের বর্বরোচিত আচরণের বিরুদ্ধে মান সম্পূর্ণ নিঃশব্দ হয়ে রইলেন। এরপর উনি সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে এসে বসবাস করতে লাগলেন। এ সময়ে ছোটোখাটো লেখা ব্যতীত জোসেফ সিরিজের তৃতীয় খণ্ড রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ড কয়েক মাস পূর্বেই রচনা শেষ হয়েছিল। প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। জুরিখে থাকতে মান একদিন একখানা চিঠি পেলেন বন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। কি ব্যাপার? না বছর পাঁচেক পূর্বে ওঁরা মানকে যে ডক্টরেট উপাধি দিয়েছিলেন, এখন বুঝতে পেরেছেন যে মান তাঁর উপযুক্ত নন—তাই সে প্রদত্ত উপাধি ওঁরা নাকচ করে দিলেন। এ সমস্তই যে নাৎসীদের প্রভাবে ঘটছিল তা' আর মানের বুঝতে বাকী ছিলো না। তাই চিঠিখানা উপস্থিত কয়েকজন বন্ধুবান্ধবদের পড়ে শোনালেন মান এবং তারপর খুব খানিকটা হাসলেন। বন্ধুরা দুঃখিত হলেন।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মানের একখানি গল্পের বইও প্রকাশিত হলো—'দি নকটার্নস'। দু' বছর পরে প্রকাশিত হলো জোসেফ সিরিজের তৃতীয় খণ্ড 'জোসেফ ইন ইজিপ্ট'। প্রকাশ্যে নাৎসীদের বিরুদ্ধে খবরের কাগজে কোনো বিবৃতি বা রেডিওতে কোনো বক্তৃতাদি না দিলেও গোটা পৃথিবীর দেশ-বিদেশের মনস্বী ব্যক্তিরা সব সময়েই মানকে চিঠিপত্র দিতেন হিটলারের নানা কুকাজের সমালোচনা করে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সে সমস্ত পত্র এবং তার উত্তরে লেখা মানের চিঠিগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো—'এ্যান এক্সচেঞ্জ অব লেটার্স'। বলাই বাহুল্য, বাইরে থেকে প্রকাশিত মানের কোনো বইয়েরও জার্মানীতে প্রবেশের হুকুম ছিলো না। কারণ, নাৎসীদের মতে ও সমস্ত 'অ-জার্মান'।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে আশ্রয় নিলেন। মার্কিন সরকার মানকে পাবার সঙ্গে সঙ্গে 'লাইব্রেরী অব কংগ্রেসে'র জার্মান

সাহিত্যের উপদেষ্টার পদে নিয়োগ করলেন। ক্যালিফোর্ণিয়ার সান্তা মনিকাতে বসবাসের জন্যে একটা বাড়ির বন্দোবস্ত করা হলো মানের জন্যে। কয়েক সপ্তাহ মান কাটালেন সে বাড়িতে। তার পরেই মার্কিন দেশের বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করতে লাগলেন বিভিন্ন বক্তৃতায়। ১৯৩৮-এর মাঝামাঝি এই বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো—'দি কামিং অব ডেমোক্রাসি'। কয়েক সপ্তাহ পরেই একই ধরণের আর একখানি বই বেরুলো মানের, 'দিস পীস'।

প্রায় জ্যোতিষীর মতো ভবিষ্যদ্বাণী করতে লাগলেন মান—'যুদ্ধ যে এসে গেলো। আপনারা কি অস্ত্রের ঝনাৎকার শুনতে পাচ্ছেন না'? হিটলার, গোয়েরিং, গোয়েবল্‌স কার কথার কোনটা অসার, কোনটা ফাঁকি, কতটুকু সত্যি, কতটুকু তৈরী হয়ে নেবার জন্যে কালহরণ করবার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, মান তাঁর শ্রোতাদের প্রতিটি বক্তৃতায় সে সমস্ত বিশ্লেষণ করে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু কোথাও কেউই তাঁর কথায় তখন খুব বেশি গুরুত্ব দিত না। তার সবচাইতে প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর হিটলার যেদিন সমস্ত আবেদন নিবেদন এবং সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করে পোলাণ্ড আক্রমণ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধালেন। বিশ্ববাসী দেখলো নাৎসী জার্মানী একটা মহাযুদ্ধের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরী, কিন্তু ব্রিটেন, ফ্রান্স বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেউই এমন কি আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের জন্যেও যথেষ্ট তৈরী নয়।

একদা 'রিফ্লেকশনস অব এ নন-পলিটিক্যাল ম্যান' লিখে যিনি শিল্পী ও সাহিত্যিকদের রাজনীতির বাইরে থাকবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, এবার দেখা গেলো সেই মানের চিন্তাধারায় একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। শিল্পী এবং সর্বস্তরের লেখকদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা একটি অবশ্য করণীয় কর্তব্য বলে ঘোষণা করলেন উনি। মানের এই জাতীয় বিষয়বস্তুর ওপর বিভিন্ন বক্তৃতার সংগ্রহ 'দিস ওয়ার' ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো। এটা পুরোপুরিই রাজনৈতিক রচনা।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন। এবং এই বছরই বি. বি. সি. থেকে একাধিক বক্তৃতায় জার্মান নাগরিকদের কাছে আবেদন জানালেন নাৎসীদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করবার জন্যে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরে আবার দেখা গেলো মান ইয়োরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোথায়ও ধ্বংসস্তূপ দেখছেন, কোথাও বক্তৃতা দিচ্ছেন। যুদ্ধ শেষ হবার বছর খানেক পূর্বেই জোসেফ সিরিজের চতুর্থ এবং শেষ খণ্ড—'জোসেফ দি প্রোভাইডার' প্রকাশিত হয়েছিলো। জার্মানী নাৎসী-কবলমুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে মানের রচনাবলী আবার লাখে লাখে ছাপা হতে শুরু হলো বিভিন্ন প্রকাশকের তত্ত্বাবধানে। লেখক হিসেবে মান এ সময়ে স্বদেশে প্রধানত চারটি বিভিন্ন রূপে পূজিত হতেন। প্রথমত 'বাডেনব্রুক্স' এর রচয়িতা; কালের অতীত, বর্তমান, তথা ভবিষ্যৎ তিনটি দিকেই যাঁর দৃষ্টি সমান অভ্রান্ত। দ্বিতীয়ত 'ডেথ ইন ভেনিস'-এর লেখক, অতি আধুনিক মনোবিশ্লেষণমূলক সাহিত্যের অন্যতম পথপ্রদর্শক মান। তৃতীয়ত 'ম্যাজিক মাউণ্টেনের' বিস্ময় উদ্রেককারী পরিবেশ ও মানসিকতার ব্যাখ্যাতা মান। মানের এই তিনটি প্রধান রূপ হিটলারের আবির্ভাবের পূর্বেও স্বীকৃতিলাভ করেছিল। এবার যুদ্ধ শেষে স্বদেশে তাঁর আর একটি রূপের প্রতিষ্ঠা হলো—তা হলো জোসেফ সিরিজের রচয়িতা হিসেবে। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই বাইবেলের উপাখ্যানের এই আধুনিক রূপ অবিলম্বে জার্মান জন মানস জয় করে ফেললো। পরাজয় জার্মান জাতির পক্ষে এবং জার্মান সাহিত্যের পক্ষে যতোটা গ্লানিকর বলে মনে না হয়েছে, তার চাইতে অনেক বেশি হয়েছে বিভিন্ন মিত্রশক্তি কর্তৃক জার্মানীর বিভিন্ন অংশের অধিকার এবং আদর্শগতভাবে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই পরস্পরবিরোধী ভাগে জার্মানীর বিভাজন। পূর্ব এবং পশ্চিম এই দুই জার্মানীর শাসন কার্যালয়েরই সর্বোচ্চ পদগুলি যদিও জার্মানদের দ্বারাই অধিকৃত হয়ে রয়েছে, কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। সে হলো বছরের পর বছর এই যে বিভক্ত অবস্থা চলছে—এটা জার্মান জনসাধারণের অভিপ্রেত নয়, একান্তই মস্কো-ওয়াশিংটনের ব্যাপার।

যাই হ'ক, যুদ্ধ থেমে যাবার বছরখানেক পর থেকেই উভয় জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকেই মানের কাছে সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ আসতে লাগলো পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্যে। কিন্তু কোন অঞ্চলে যাওয়া যায়? এই একটা প্রশ্নই কয়েক বছর ধরে মান ভাবলেন, তারপর ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ঠিক করলেন যে জার্মানীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার গ্যয়টে প্রাইজ গ্রহণ করবেন দুই জার্মানীর কাছ থেকেই। প্রথম এলেন পশ্চিম জার্মানীতে

তারপরেই পূর্ব জার্মানীতে। এর ফলে জার্মান জনসাধারণের মধ্যে মানের জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে গেলো।

মান যখন ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্যয়টে প্রাইজ গ্রহণ করবার জন্যে স্বদেশে গিয়েছিলেন তার কয়েকমাস আগে, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শেষের দিকে ওঁর আর একখানি যুগান্তকারী উপন্যাস প্রকাশিত হলো—'ডাঃ ফাউস্টাস'। এ ছাড়া মানের অন্যান্য বইগুলির মধ্যে 'দি ট্রান্সপোরটেড হেডস' (১৯৪০); 'দি বিলাভেড রিটারনস' (১৯৩৯); 'দি হোলি সিনার'; 'দি ব্ল্যাক সোয়ান' এবং 'দি কন্‌ফেশনস অব ফেলিক্স ক্রাল'; 'কনফিডেন্স ম্যান' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সারাজীবনে মান কয়েক শ' প্রবন্ধও রচনা করে গেছেন। তার মধ্যে ফ্রয়েড এবং অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীদের ওপর তাঁর নিবন্ধগুলি সবচাইতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে মান আমেরিকা ত্যাগ করে আবার চলে এলেন সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে তাঁর প্রিয় বাড়িটিতে। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত জুরিখের এই বাড়িটিই ছিল মানের স্থায়ী ঠিকানা।

ডাঃ ফাউস্টাস—জার্মান মনসিকতা যে ফাউষ্টীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত এ বিষয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। যে দুর্বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে যুদ্ধ বাধিয়ে নাৎসীরা জার্মানীর ধ্বংস সম্পূর্ণ করলো, সুদূর আমেরিকাতে বসে মান সে সমস্তই বুঝবার চেষ্টা করতেন। মনে মনে ভাবতেন নিজের জীবদ্দশাতেই যে দেশকে তিনি সম্পূর্ণ কৃষি-নির্ভর থেকে শিল্পপ্রধানরূপে গড়ে উঠতে দেখেছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্তক্ষেত্রে মানবপ্রতিভার চরম প্রকাশ বলে যে দেশের কীর্তি দেশে দেশে নন্দিত হয়েছে—সেই প্রিয় পিতৃভূমির বিরাট শিল্পসমৃদ্ধ নগর, শত শত বছরের শ্রম এবং সাধনা বহন করে যে অসংখ্য সৌধ এবং প্রতিষ্ঠান—এ সবের ধ্বংসকার্য কোন অমোঘ অভিশাপে সংঘটিত হলো? ওঁর চিন্তা ধারায় আলোড়ন স্থষ্টি হলো। মান ঠিক করলেন যে জার্মান মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং এই পূর্ব-ঘোষিত এবং স্থির নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে নতুন একখানি উপন্যাস রচনা করলেন—ডাঃ ফাউস্টাস; উপন্যাসটি ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শেষের দিকে প্রকাশিত হয়েছিলো।

ডাঃ ফাউস্টাস উপন্যাসের নায়ক আদ্রিয়ান লেভারকান একজন সঙ্গীতবিশারদ। আদ্রিয়ানের জীবনকথা আমরা শুনতে পাই তার বাল্যবন্ধু সেরেনুসের মুখ দিয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলাফল যখন নিশ্চিতভাবে জার্মানীর

বিরুদ্ধে যেতে আরম্ভ করলো, তখন নাটকীয় আকস্মিকতার মধ্যে সেরেনুস তার বন্ধুর কাহিনী বলতে শুরু করলো। আদ্রিয়ানের কাহিনীর মাঝে মাঝে টমাস মান আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে জার্মানীর তিলে তিলে পরাজয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। উপন্যাসের শেষ হচ্ছে জার্মানীর চূড়ান্ত পতনের দিনে—অর্থাৎ যেদিন জার্মানী আত্মসমর্পণ করলো। সেরেনুস একেবারে ছেলেবেলা থেকে আদ্রিয়ানের বিশেষ কতকগুলি গুণ সম্বন্ধে অবহিত ছিলো, কিন্তু আদ্রিয়ান নিজে তা জানতো না। আদ্রিয়ান এবং সেরেনুস দু'জনকে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী হিসেবে চিত্রিত করেছেন মান। আদ্রিয়ান হ'লো ফাউস্টধর্মী জার্মান—প্রতিভাবান, সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রায় অলৌকিক শক্তির অধিকারী, জীবনে উচ্চাভিলাষী এবং তার এই উচ্চাভিলাষের পথে সে কোনো অন্তরায়কেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে প্রস্তুত নয়। কাজেই প্রতিভা এবং উচ্চাভিলায অনেক সময়েই তার মধ্যে মত্ততার লক্ষণ এনে দেয়। আর সেরেনুস হলো জার্মানদের দ্বিতীয় টাইপ—বিদ্বান, মানবতন্ত্রী, মানুষের মঙ্গলের জন্যে নিজেকে অর্থাৎ নিজের ভাবধারণাকে সংযত করবার প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করে। তবে অসাধারণ কোনো প্রতিভার লক্ষণ ওর মধ্যে নেই এবং নেই বলে সেরেনুসের মধ্যে কোনো প্রকার অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না।

বাল্য এবং কৈশোরের সন্ধিক্ষণে আদ্রিয়ান যেদিন তার সঙ্গীত প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন হ'লো, সেরেনুস লক্ষ্য করলো তার বন্ধুর মধ্যে পরিপূর্ণ উন্মত্ততার প্রকাশ। আদ্রিয়ানের প্রতিভা যেমন সত্য, তার মত্ততাও ঠিক তেমনি। সেরেনুস আরো লক্ষ্য করলো যে এই দু'টি জিনিস শুধু সত্য নয়, ওতপ্রোতভাবে যুক্তও বটে। একদিনের প্রচণ্ড উন্মত্ততার পরে আদ্রিয়ান আবার শান্ত হ'লো বটে, কিন্তু একটানা চব্বিশ বছর ধরে চলতে লাগলো একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি—মাঝে মাঝে উন্মত্ত হয়ে ওঠে আদ্রিয়ান এবং তা কারণে-অকারণে কখনো বা প্রচণ্ড মাথা ধরে এবং তারপরেই অনিবার্যভাবে আদ্রিয়ান একটি অত্যাশ্চর্য স্বরসৃষ্টি করে। 'আদ্রিয়ান এণ্ড টেম্পার' নামে একটি পরিচ্ছেদে এক অভিনব কথোপকথন রয়েছে। সেরেনুসের মতে এটা তার বন্ধুর নিজেরই রচনা—এর সঙ্গে গ্যয়টের ফাউস্টের সঙ্গে যেখানে মেফিস্টোফিলিসের চুক্তি হচ্ছে তার তুলনা করা চলে। টেম্পারের সঙ্গেও আদ্রিয়ানের চুক্তি হলো একটানা চব্বিশ বছর তার প্রতিভা অলৌকিক

সুরসৃষ্টি করে চলবে। তারপর, হ্যাঁ, তারপর একসময় অকস্মাৎ টেম্পার জয় করবে ওকে, অর্থাৎ আদ্রিয়ান উন্মাদ হয়ে যাবে—হলোও ঠিক তাই।

টেম্পারের সঙ্গে এই যে কথোপকথন আদ্রিয়ানের এ জিনিসটাকে অনেকেই ডষ্টয়েভস্কির 'ব্রাদার্স কারামাজোভ'-এ শয়তানের সঙ্গে আইভানের কথোপকথনের সঙ্গেও তুলনা করে থাকেন। শয়তানের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে আইভান যেমন অবোধ শিশুদের জীবন যন্ত্রণার জন্যে ঈশ্বরকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল—আদ্রিয়ানও তেমনি টেম্পারের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে বার বার প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগলো—এবং পর পর তিন বারই তার প্রেম অপরের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

আদ্রিয়ানের কাহিনীকে অনেকেই জার্মানীর জাতীয় জীবনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। জার্মানী যেমন মনে হয় শয়তানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ নিয়ে নিজের ধ্বংস ত্বরান্বিত করবে বলে—এও অনেকটা তাই। সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যাবার পরেও আদ্রিয়ান আরো দশ বছর বেঁচে ছিলো। স্থিরবুদ্ধি সেরেনুস শান্তভাবেই দেখেছে প্রতিভার যাতনা, তার স্ফূর্তি, তার অপব্যবহার এবং তার পরিণাম—এক চোখে দেখেছে সে তার বন্ধুকে, আর এক চোখ তার রয়েছে দেশের দিকে, পিতৃভূমির দিকে—সেখানেও যে প্রতিভার অপব্যবহার ঘটেছে। তাই তার পরিণাম, পিতৃভূমির ধ্বংসস্তূপের দিকে লক্ষ্য রেখে সেরেনুস বলছে: 'আশার আলো কবে দেখবো!'

গ্যয়টে ও মান—জীবদ্দশাতেই টমাস মানকে খাস জার্মানীর সাহিত্য-রসিক মহল স্বয়ং গ্যয়টের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই তুলনা গ্যয়টের প্রতিভার বহুবিস্তৃতি, তার ব্যাপকতা বা গভীরতার সঙ্গে ততটা দেখা যায় না, যতটা অন্যান্য সাধারণ দিকে দেখা যায়। যেমন টমাস মানও গ্যয়টের মতো বিত্তশালী, বিখ্যাত এবং প্রতিষ্ঠাবান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন: টমাস মান গ্যয়টেরই মতো প্রায় কিশোর বয়স থেকেই সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, উভয়েই দীর্ঘজীবন ভোগ করে গেছেন। উভয়েই প্রেরণালাভের জন্যে ইতালীর দিকে তাকাতেন। এবং তারপর, যেটা সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা—গ্যয়টে এবং টমাস মান উভয়েই শতাধিক বছরের ব্যবধানে দাঁড়িয়েও একটা আশ্চর্য প্রেরণা অনুভব করেছিলেন গোটা জার্মানজাতির অস্থিরতা, নিখিলের অপার রহস্যময়তা উপলব্ধি করবার জন্যে মরমিয়া উপায়ের আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা—তাই উভয়ের সৃষ্টির মধ্যেই অনেক সময় একই

অনুভূতির স্পন্দন দেখা যায়। গ্যয়টে জার্মানীর রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা বিরাট ওলট-পালটের সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন—টমাস মানের বেলাতেও ঠিক তাই-ই ঘটেছে। তবে কি না, গ্যয়টে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, আর টমাস মান নিষ্ক্রিয় থেকেও স্বদেশের তদানীন্তন আধা-বর্বর রাজনীতির শিকার হয়েছিলেন।

আর একটি কথা এ প্রসঙ্গে বলা দরকার। টমাস মান কি গ্যয়টের মতো গান বা লিরিক কবিতা লিখতে পারতেন?—নিশ্চয়ই নয়। গ্যয়টের মতো নাটক? তা'ও নয়। গ্যয়টের মতো ধর্ম, দর্শন বা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ? গ্যয়টে ছবি আঁকতে পারতেন, আর টমাস মান তাঁর বড়ো ভাইয়ের আঁকা ছবির দিকে বিমুগ্ধদৃষ্টিতে অবাক বিস্ময়ে তাকাতেন; কখনো নিজে আঁকবার দুঃসাহস করেন নি। বক্তা হিসেবে অবশ্যই দু'জনেই প্রায় সমান ছিলেন বলা যায়—যদিও আইনের জ্ঞান গ্যয়টের অনেক বেশিই থাকবার কথা। দু'জনেই অদ্ভুত রকমের গুণগ্রাহী ছিলেন। মুক্তকণ্ঠে অপরের (অর্থাৎ অন্য লেখকদের) প্রশংসা করতেন। এবং এ বিষয়ে দু'জনের মাত্রাজ্ঞানের অভাবটাও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। যেমন গ্যয়টে ঘোষণা করেছিলেন: 'লর্ড বায়রন এ শতাব্দীর (উনবিংশ শতাব্দীর) শ্রেষ্ঠ কবি, আমার চাইতে ঐ যুবকটি শ্রেষ্ঠতর।' ঠিক তেমনি টমাস মান বলতেন: 'আমি যদি হেসের মতো লিখতে পারতাম!'

গ্যয়টের সঙ্গে টমাস মানের এই অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরে দেখা যাচ্ছে মান কোনো কোনো বিষয়ে গ্যয়টের সমান হলেও অধিকাংশ বিষয়ে তাঁর স্থান গ্যয়টের অনেক নীচে। আর কতকগুলি ব্যাপারে তো ওঁকে গ্যয়টের সঙ্গে আদৌ তুলনা করাই চলে না। যেমন কবিতা ও সঙ্গীত রচনা, ছবি আঁকা বা বিজ্ঞান সাধনার প্রসঙ্গ। কিন্তু এত কথার পরেও একটি বিষয় থেকে যাচ্ছে; সে হ'লো উপন্যাস। গ্যয়টে এবং মান উভয়েই উপন্যাস রচনা করেছেন, এবং এক্ষেত্রে তুলনার পরে দেখা যাবে আলোচনার পাল্লাটা মানের দিকেই মাথা নোয়াচ্ছে। যদিও এ কথা অতি সত্য যে, গ্যয়টের ছোট রোমান্টিক উপন্যাস 'দি সরোস অব হেবরথার' টমাস মান পড়তে পড়তে প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছিলেন এবং গ্যয়টে একখানা সুবৃহৎ উপন্যাসও ('হিবলহেলম মেইস্টার') রচনা করেছিলেন। কিন্তু মানের 'বাডেনব্রুক্স', 'দি ম্যাজিক মাউন্টেন' এবং 'ডাঃ ফাউস্টাস' গ্যয়টের ছোট বড়ো সমস্ত উপন্যাসের চাইতে শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

হারমান হেসে

বিগত তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে প্রায় প্রতি বছরই দেখা যাচ্ছে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের ব্যাপারটা নানা অপ্রীতিকর আলোচনার সূত্রপাত করে চলেছে। এক শ্রেণীর সাহিত্য-রসিকের মনে এইরকম একটা ধারণা প্রায় বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে বর্তমানে শুধুমাত্র সাহিত্যকীর্তির বৈশিষ্ট্যের জন্যই সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে না—ভেতরে ভেতরে রীতিমতো রাজনীতির খেলা চলছে। এটা সত্যি হতে পারে, আবার মিথ্যেও হ'তে পারে। হেসে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। সুখের বিষয় যে গত কয়েক দশকে যে তিন-চারজনের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির ব্যাপারটা অপ্রীতিকর আলোচনার সূত্রপাত করেনি, অর্থাৎ রাজনীতির তাগিদে পক্ষপাত দুষ্ট বলে কোনো দলেরই মনে হয় নি—হেসে তাঁদের অন্যতম।

প্রথম জীবন—হেসে (Hermann Hesse, 1877—1962) জাতিতে ছিলেন জার্মান—যদিও তাঁর পঁচাশী বছর জীবনের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই (ঠিক পঞ্চাশ বছর) খাস জার্মানীর বাইরে, সুইজারল্যাণ্ডে কাটিয়ে গেছেন। বর্তমান পৃথিবীর মানুষ হয়ে, দু'টো মহাযুদ্ধ বলতে গেলে প্রায় চোখের ওপর ঘটতে দেখেও হেসে যে আমৃত্যু সত্যি সমস্ত রকম রাজনৈতিক পঙ্কিলতার উর্ধ্বে ছিলেন—এটা প্রকৃতই একটা আশ্চর্যের ব্যাপার মনে হয়। বরাবর উনি অক্লান্তভাবে সাহিত্য-সেবাই করে গেছেন। এবং সাহিত্যের মাধ্যমে শান্তির পথে, শুভ বুদ্ধির পথে মানুষকে প্রভাবিত করবার জন্যই হেসে বরাবর চেষ্টা করে গেছেন। প্রোটেষ্টাণ্ট মিশনারীর পুত্র হেসের পক্ষে এইটেই ছিলো স্বাভাবিক কাজ।

হেসের বাবাই শুধু নন, ঠাকুরদাদাও একজন প্রোটেষ্টাণ্ট মিশনারী ছিলেন। এবং ওঁরা দু'জনেই তাঁদের সময়ে দীর্ঘকাল এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে কাটিয়ে গেছেন। গত কয়েক শ' বছর ধরে ভারতবর্ষে ইয়োরোপের নানা দেশের মিশনারীদের কার্যকলাপ চলছে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গেছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐ সমস্ত মিশনারীরা নেহাৎ ভারতীয় জনগণের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই

সময় এবং অর্থব্যয় করতেন না—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে প্রত্যেক দেশের মিশনারীরা কার্যতঃ তাদের দেশের সরকারের স্বার্থে ভেতরে ভেতরে কাজ করতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতে জার্মান-মিশনারীদের রাজনৈতিক কার্যকলাপও সুবিদিত ছিল। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মিশনারীই যে যীশুর পবিত্র নামকে এভাবে কলঙ্কিত করতেন তা নয়—হেসের বাবা এবং ঠাকুরদা যে তাঁদের দীর্ঘ ভারত-অবস্থানকালে নিজেদের রাজনীতির উর্ধ্বে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে। হেসের নিজেরও বাল্যবয়স থেকেই বাসনা ছিল ভারত ভ্রমণ করবার। প্রথম মহাযুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ওঁর সে বাসনা পূর্ণ হয়েছিল।

হেসে-পরিবারের ছেলেরা কয়েক পুরুষ ধরেই স্থানীয় পাদ্রী বা বিদেশে মিশনারীর কাজ করে আসছিলেন। আর অল্প কয়েকজন ডাক্তারীকেও পেশা করে নিয়েছিলেন। হারমান হেসের অভিভাবক স্থানীয়দের ইচ্ছা ছিল যে উনিও পাদ্রী হবেন। তাই স্কুলের পড়াশুনোও সেইভাবে আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু হেসের যখন তেরো কি চৌদ্দ বছর বয়স তখন একদিন বাড়িতে খবর এলো যে উনি কিছুদিন ধরেই স্কুল পালাচ্ছেন, আজো স্কুলে পাওয়া যাচ্ছে না ওঁকে। বলাই বাহুল্য, জ্যেঠা-খুড়ো অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন বালক হেসের এমন ধারা উচ্ছৃঙ্খলতায়। সন্ধ্যে নাগাদ যখন বাড়ি ফিরলেন উনি, দেখলেন সকলেরই মুখচোখ থমথম করছে। ওঁর ধারণা ছিল সবাই খুব বকাবকি করবেন, কিন্তু অনেক রাত পর্যন্তও কেউ কিছু বললেন না। বয়স্কদের এই নীরবতার ফলে বালক হেসের মনে একটা দুঃসহ অস্থিরতা দেখা দিলো।

সারারাত ঘুমোতে পারলেন না হারমান। স্কুল-পালোনোর ফলে গোটা পরিবারের লোকজন যে কী পরিমাণ ব্যথিত হয়েছেন—এটা সহজেই বুঝতে পারলেন। সারারাত ধরে ভেবে চিন্তে দেখলেন স্কুলের পড়াশুনোর প্রতি মন-বসানো সহজ হবে না। তাই হেসে ঠিক করলেন বাড়ির লোকজনদের খোলাখুলিই বলবেন কথাটা।

স্কুলের সব কিছুই যে হেসের খারাপ লাগতো ঠিক তা' নয়। ইতিহাস, ভূগোল এবং সাহিত্য খুবই ভালো লাগতো। মুস্কিল হতো অন্যান্য বিষয়ের ক্লাশের সময়ে—যেমন বাইবেল। ভবিষ্যৎ জীবনে হেসে যাতে পাদ্রী হতে পারেন সে জন্য স্কুলের পাঠ্যসূচী নির্বাচন করেছিলেন

অভিভাবকগণ। সমস্যাটাও দেখা দিলো এইখানেই। ভবিষ্যতে পাদ্রী হবার জন্য কোনোই আকর্ষণবোধ করতেন না হেসে, কাজেই বাইবেলের ক্লাশের সময় প্রায় নিয়মিতই উনি বেরিয়ে পড়তেন। স্কুলের অদূরেই ছিলো ছোটো একটা বন। এই বনে এসে লুকোতেন হেসে। তারপর স্কুল ছুটির পরে বাড়ি ফিরতেন। কয়েকমাস শ্যামল বনানীর এই সান্নিধ্য কিন্তু হেসের মানসিকতায় একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটালো। চার লাইন, ছ' লাইনের ছোটো ছোটো কবিতা লিখতে আরম্ভ করলেন উনি।

পরদিন বাড়ির বড়োরা এ কথাও হেসেকে স্পষ্ট জানালেন যে স্বাধীনভাবে হেসে যা শিখবেন বলে বর্তমানে সিদ্ধান্ত নেবেন, সে বিষয়ে কোনোরকম ফাঁকি তাঁরা অবশ্যই মার্জনা করবেন না।

আজকের দিনে ত' নয়ই এমন কি তখনকার দিনেও জার্মানীতে সাধারণ স্কুল-কলেজের সার্টিফিকেটের অভাবে কারো পক্ষে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা বা ঐ ধরনের চাকুরী ব্যতীত অন্য কোনো রকম কাজকর্মের পক্ষে অসুবিধে দেখা দিতো না। কাজেই, আমাদের দেশে সাধারণত একটা ডিগ্রী বা ডিপ্লোমাকে যে চোখে দেখে মানুষ, ওদের দেশে তা নয়। সকলেই যে কোনো ব্যাপার সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার মূল্য দিয়ে থাকেন।

হেসে কয়েক দিন চিন্তা করে তাঁর অভিভাবকদের জানালেন যে, ভবিষ্যতে যাতে একজন মেকানিক হওয়া যায় এইরকম কিছু উনি শিখতে চান—অর্থাৎ হাতে-কলমে কাজ শিখবেন। সেই রকমই বন্দোবস্ত করা হলো। এবং যথাসময়ে হেসে মেকানিকের নির্দিষ্ট শিক্ষায় কয়েকটা বছর কাটালেন। কিন্তু কুড়ি-একুশ বছর বয়সের সময় খুব গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন হেসে এবং চিকিৎসকেরা এ কথাও বললেন যে এ অসুখ থেকে সেরে উঠবার পরেও শারীরিক পরিশ্রম বেশি করা হেসের পক্ষে উচিত হবে না। শরীর তখনো বেজায় দুর্বল। একটু-আধটু বেড়াবার কথা বলেছেন চিকিৎসকেরা। তাই হেসে মাঝে-মাঝে এক-একদিন বাড়ির কাউকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে পরিচিত এক ভদ্রলোকের বইয়ের দোকানে এসে বসতেন। কয়েকদিন পরে যখন আরো একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন তখন একাই এসে বসতেন ঐ বইয়ের দোকানে। যখন যে বইখানা পড়তে ইচ্ছে হতো সেল্ফ থেকে নিয়ে পড়তেন। এইভাবে ক্রমশঃ বইয়ের ব্যবসার দিকে ঝোঁক গেলো হেসের। এবং শেষ পর্যন্ত আত্মীয়-স্বজনের অনুমতি নিয়ে বইয়ের ব্যবসাই আরম্ভ করে দিলেন।

সাহিত্যসাধনার শুরু—পাঁচ বছর পরে দেখা গেলো হেসের বইয়ের ব্যবসা বেশ ভালোই চলছে। এটা ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ব্যবসায়ে হেসের সাফল্যের কথা যখন আত্মীয়-পরিজনের মুখে মুখে ফিরছিল ঠিক এমনি সময় আর একটা খবর শুনে অবাক হয়ে গেলেন সবাই। কি ব্যাপার? না, হেসে উপন্যাস লিখেছেন একখানা, "পিটার ক্যামেনজিণ্ড"। নিজের পয়সায় ছেপে বই বের করছেন দেখে যে সমস্ত বন্ধুবান্ধবেরা গোড়ায় টিটকারি দিয়েছিলেন এবার তাঁরাও আশ্চর্য হয়ে গেলেন যখন দেখা গেলো পর পর কয়েকমাস হেসের উপন্যাসখানার প্রতি মাসেই একটি করে নতুন সংস্করণ বেরুতে লাগলো। মাঝে মাঝে এক-আধটা সাময়িকপত্রে কিছু কিছু কবিতা এবং প্রবন্ধ হেসের বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু হেসে বাস্তবিকই একজন পুরাদস্তুর লেখক হয়ে উঠতে পারেন এটা কেউই ভাবেন নি কখনো। আসল ব্যাপার হ'লো গল্প এবং উপন্যাস রচনার জন্য কয়েক বছর থেকেই হেসে নিজেকে তৈরী করছিলেন। প্রচুর লিখছিলেন এবং সংশোধন করছিলেন—নিজের লাজুক প্রকৃতির জন্য দীর্ঘদিন চাপা ছিল খবরটা, এবার সবাই জানতে পারলেন হেসের উপন্যাস লেখবার জন্য অনুশীলনের কথা—একই বিষয়বস্তুর উপর চারখানা ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডুলিপি দেখা গেলো হেসের পড়বার ঘরে। এই ভাবেই হেসে উপন্যাস লেখার কাজে নিজেকে নিজে দক্ষ করে তুলেছিলেন।

"পিটার ক্যামেনজিণ্ড" প্রকাশিত হবার পর থেকে জীবিকা নির্বাহের জন্য লেখা ছাড়া আর কখনো কিছু করতে হয় নি হেসেকে। বইয়ের ব্যবসা থেকেও উনি বছর দুইয়ের মধ্যে একেবারে সরে এলেন। তারপর চলতে লাগলো শুধু লেখা।

হেসের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির সংবাদ যখন ঘোষিত হ'লো তখন অর্থাৎ ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে দেখা গেলো যে, ওঁর একখানি বইও ইংরেজী ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে না। সে সময় পর্যন্ত গল্প-উপন্যাস-কবিতা ও প্রবন্ধ মিলিয়ে জার্মান ভাষায় যদিও প্রায় সাঁইত্রিশখানা বই ছিলো হেসের, কিন্তু তার মধ্যে একখানাও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয় নাই সে-সময় পর্যন্ত। এটা নিশ্চয়ই একটা আশ্চর্যের ব্যাপার, বিশেষ করে যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর জার্মান ডিটেকটিভ উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদের অভাব ছিল না। এর কারণস্বরূপ এক-একজন সমালোচক এক-এক রকম কথা বলেছেন। একদল বলেছেন যে প্রথম

মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের বিরোধিতা করবার জন্য হেসে বলতে গেলে এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই জার্মানীর সরকারী মহলের সুনজরে ছিলেন না। পদস্থ সরকারী কর্মচারীরা তাঁকে দেশদ্রোহী এবং জার্মান জাতির শত্রু বলেও আক্রমণ করেছেন প্রকাশ্যে। এইজন্যই খাস জার্মানী থেকে যে-সব প্রতিষ্ঠান বিদেশী ভাষায় জার্মান বইয়ের অনুবাদ করাতেন তাঁরা হেসের বইয়ের অনুবাদ করান নি। আর ইংরেজ বা আমেরিকানরা যে হেসের বইয়ের অনুবাদ করেন নি তার কারণ ওঁদের বিশ্বাস ছিল যে হেসের বইয়ের বিশেষ কাটতি হবে না ও-সমস্ত দেশে। হেসের উপন্যাসগুলির বক্তব্য এবং চরিত্রগুলির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বড় বেশি 'টিপিকালি জার্মান' বলে মনে হয়েছে ওঁদের।

পিটার ক্যামেনজিণ্ড—নায়ক পিটার অনেক দিক থেকেই হেসে নিজে। নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনা হেসে তাঁর প্রথম উপন্যাসের নায়কের মধ্যে এমন ভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন যে অনেকে এখানাকে আত্মজীবনীমূলক রচনা বলেই মনে করেন। নায়ক পিটারের সঙ্গে হেসের নিজের যে মিল তা শুধু চিন্তা জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বাস্তব জীবনে নয়। পাদ্রী হবার জন্য ইস্কুলের নির্দিষ্ট পাঠসূচী হেসে কী পরিমাণ অপছন্দ করতেন তা' আমরা দেখেছি—পাদ্রী না হয়ে ইচ্ছে করেই তিনি প্রথম জীবনে হয়েছিলেন এক জন মেকানিক। সে সময়কার জার্মানীতে নতুন শিল্প-সভ্যতার প্রভাবে সমাজ জীবনের সর্বত্রই সাজসাজ রব। কেউ পাদ্রী না হয়ে মেকানিক হবার চেষ্টা করে—কেউ কবি না হয়ে সেনাপতি হবার স্বপ্ন দেখে, কেউ বা শিল্পীর প্রতিভাকে ষ্টক এক্সচেঞ্জের দালালীর কাজে বিকশিত করবার চেষ্টা করে। হেসে একেবারে যুবা বয়স থেকেই ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। হেসের প্রথম নায়ক পিটারকেও দেখা যায়, কি যে তার মন চায় তা সে নিজেই ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে পারে না। ধর্ম-সম্পর্কীয় নানা গল্প ও কাহিনী শুনতে শুনতে অনেক সময় নিজেকে অভিভূত বোধ করে ও, কিন্তু ওর যুক্তিবাদী মন শেষ পর্যন্ত শক্তি-সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় এবং 'অবতার', 'মহাপুরুষ' প্রভৃতির গালগল্পের থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এলো ও সুদূর প্যারিসে। প্যারিসে এসে শিল্পকর্মকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করলো। এটা এক ধরনের চ্যালেঞ্জ। শিল্পের মাধ্যমে বিশ্ব-সৃষ্টিকে "দ্বিতীয় বার" সৃষ্টি করবার জন্য চেষ্টিত হলো পিটার। নিজের ব্যর্থতা দেখে প্রতিদিন ব্যথিত হতে লাগলো; এদিকে পেশার ব্যর্থতায় জন্য দেখা দিলো চরম অভাব-অনটন। শেষ পর্যন্ত দৈববাণী লাভ করলো পিটার।

সন্ত ফ্রান্সিস সূক্ষ্ম শরীরে আবির্ভূত হয়ে জানালেন যে প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ করা নয়, তার বিরোধিতা করা নয়, তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করবার জন্যই তোমার অন্তর ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। অন্তরের এ তাগিদকে হেলায় নষ্ট করো না। এরপর পিটারের জীবনে স্বভাবতই ধর্মই হয়ে উঠলো প্রধান, শিল্পকর্ম গৌণ।

হেসের দ্বিতীয় উপন্যাস "আনটারম রাড"-ও কিছুটা আত্মজীবনীমূলক। যে কারণেই হ'ক হেসের ইস্কুল পালানোর কথা আমরা আগেই জেনেছি। এই দ্বিতীয় কাহিনীর মাধ্যমে হেসে দেখিয়েছেন অবাঞ্ছিত এবং বিরক্তিকর পড়াশুনোর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য কি করে একটি তরুণের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলো এবং শেষ পর্যন্ত জলে ডুবে মরলো।

তৃতীয় উপন্যাস "ন্যাকবার্ন"-এ হেসে একটি ছোটো শহরের সমগ্র জীবনযাত্রাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন।

যে বছর হেসের প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হ'লো সেই বছরই বিয়ে করেছিলেন উনি। দশ বছরের বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতাপুষ্ট উপন্যাস "রসহ্যাল্ড" প্রকাশিত হ'লো ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে। সে বছর ইয়োরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু হ'লো। এই উপন্যাসেই হেসে সর্বপ্রথম যৌনজীবনকে তাঁর সাহিত্যে প্রাধান্য দিলেন। এ কাহিনীর নায়কনায়িকার জীবন মোটেই সুখের হয়নি। অনেকের মতে এর কাহিনী ভাগ বাস্তবিকপক্ষে হেসের নিজের সাংসারিক জীবনেরই চিত্র। ওঁর প্রথম বিবাহিত জীবনের অবসান হয়েছিল বিবাহ-বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে উনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন।

ন্যুলপ্—হেসের একখানি বিচিত্র উপন্যাস হ'লো "ন্যুলপ"। এর কাহিনীতে দেখা যায় একটি ভবঘুরে যুবক নানা আশ্চর্য উপায়ে বিভিন্ন মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে প্রত্যেকে বারই অপরের কিছু না কিছু কাজে আসছে, প্রত্যেকেরই জীবনে আনন্দের জোগান দিচ্ছে, অথচ ও নিজে শেষ পর্যন্ত শোচনীয়ভাবে মারা যাচ্ছে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ও পরমেশ্বরের নিকট তার প্রতি অবিচারের কথা পেশ করেছে। কেনই বা মানুষের জন্ম আর কেনই বা অকালে তা শেষ করা! এই রচনাটিতে হেসে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে বাল্য এবং শৈশবের পরে মানুষের জীবনে যে পরিবর্তন দেখা দেয়—তা ক্রমশঃ তাকে পঙ্কিলতার দিকে টেনে নিতে থাকে। যেমন পবিত্রতা,

সুখ ও স্বপ্ন এবং রঙিন আশার মধ্যে মানুষের জীবনের শুরু হয়, তেমনই নোংরামির মধ্যে সমস্যা ভারাক্রান্তভাবে চরম ব্যর্থতার মধ্যে শেষ হয় অধিকাংশ মানুষের জীবন।

'ম্যলুপ' প্রকাশিত হয় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে। গোটা ইয়োরোপে তখন বলতে গেলে সর্বত্র আগুন জলছে। নব্য-জার্মানী বিভীষিকার কারণ হয়ে উঠেছে সভ্য জগতের চোখে। হেসে জাতিতে জার্মান। জার্মানীর বেশির ভাগ লেখক এবং শিল্পীই কাইজারের সাম্রাজ্য-লিপ্সার তারিফ করতে শুরু করলেন প্রকাশ্যে। বেশির ভাগ লেখকরাই এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁদের সাহিত্যের বক্তব্যের মোড় ফেরাতে চেষ্টিত হলেন। এমন ধারা গুরুত্বপূর্ণ সময়েই হেসে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, এ যুদ্ধের ফলে মানুষ হিসেবে জার্মান জাতির ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ হবে না! এই অর্থহীন যুদ্ধের জন্যে প্রাণ দেওয়া চরম মূর্খতার পরিচায়ক। প্রত্যেক বিবেকবান এবং কৃষ্টিবান জার্মানের উচিত এই যুদ্ধের বিরোধিতা করা, লোকক্ষয় যাতে বন্ধ করা যায় তার জন্য চেষ্টা করা। কী দুঃসাহস!

দুঃসাহসই বটে! হেসের এমনি ধারা প্রকাশ্য উক্তির ফলে বলতে গেলে সকলেই বিরক্ত হয়ে উঠলেন, সরকারী তরফ তো বটেই ব্যক্তিগত বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনেরাও। গোটা জার্মানীতে মুষ্টিমেয় যে ক'জন শান্তিবাদী মানুষ ছিলেন সে সময়ে, তাঁরা অনেকেই গোপনে হেসের সৎসাহসের তারিফ করলেন বটে, কিন্তু আবার একথাও বললেন যে বর্তমান অবস্থায় তোমার জার্মানী ত্যাগ করে চলে যাওয়া উচিত।

সাহিত্যসাধনার পরিণত রূপ—১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বছরের বেশিরভাগ সময়ই হেসে সুইজারল্যাণ্ডে বসবাস করতেন। এবার স্থায়ীভাবেই সংসার পাতলেন ওখানে। তারপর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জার্মানীতে উনি অনেক-বারই এসেছেন। কিন্তু সে নেহাৎ সাময়িকভাবে বেড়িয়ে যাবার জন্য। আস্তানাটা সুইজারল্যাণ্ডেই রেখেছিলেন এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে হেসে সুইজারল্যাণ্ডেরই নাগরিক হয়ে যান। কাজেই যদিও হেসে জার্মান ভাষায় লিখতেন, কিন্তু আইনের দিক থেকে মৃত্যুর সময় বা নোবেল পুরস্কার লাভের সময় উনি সুইস ছিলেন।

সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থান শুরু করবার পূর্ব পর্যন্ত হেসের সাহিত্যের সুর মোটামুটি ভাবে একটা মধ্য পন্থা অবলম্বন করে চলছিল বলা যায়। প্রায়

প্রত্যেক উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রেরই দেখা যেত একটা ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্ব, যা পাওয়া যাবে না তাকেই পাবার জন্য একটা তীব্র আকুতি এবং তার ফলে একটা মানসিক সংকট। এ যেন জার্মান জাতির চরিত্রের বিধি-নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, অনেকেই যাকে ফাউস্টীয় ঝোঁক বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। প্রতিটি কাহিনীর বাস্তব লক্ষণও উল্লেখযোগ্য এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ঈশ্বর বা কোনো সাধু-সন্তের আবির্ভাব বা পরোক্ষ প্রভাবের ফলে ঘটনাবলীর জট-ছাড়ানো হচ্ছে। অর্থাৎ একটা আধ্যাত্মিক লক্ষণ রয়েছে কিন্তু তার প্রভাব বেশ উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রযুক্ত হয়। আধ্যাত্মিক চিন্তা এই সময় পর্যন্ত হেসেকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করতে পারেনি—যদিও শিল্পের দীনতা, অসম্পূর্ণতা, ব্যর্থতা ও অসহায়তার কথা তিনি বহুবার বহুভাবেই প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তবু তাঁর আদর্শ শিল্পই ছিল, অধ্যাত্ম চিন্তা নয়।

ডেমিয়ান—১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই উপন্যাসে হেসে প্রথম মহাযুদ্ধের বিষময় ফল দেখাবার চেষ্টা করেছেন—বিশেষ করে জার্মানীর পক্ষে। পরাজিত জার্মানী, পঙ্গু জার্মানী, গোটা পৃথিবীর অভিশাপ-জর্জর জার্মানীর কি হবে? কি তার বর্তমান, ভবিষ্যৎই বা কি? কোথায় আলো? কেই বা দেখাবে পথ? একটা দারুণ হতাশা গোটা জাতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কাইজার-বিমুক্ত জার্মানীর লক্ষ লক্ষ মানুষ আগ্রহের সঙ্গে পড়লো এ বই। একদল তরুণ সুইজারল্যাণ্ডে এসে দেখা করলো হেসের সঙ্গে। তারা আবেদন জানালো হেসের কাছে পিতৃভূমিতে ফিরে যাবার জন্য। কিন্তু হেসে রাজী হলেন না। এ উপন্যাসেও হেসে দেখিয়েছেন শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি মানুষের যে মানসিক সংকট বর্তমান শিল্প সভ্যতার যুগের পৃথিবীতে তার হাত থেকে একমাত্র আধ্যাত্মিক শক্তিই মানুষকে রক্ষা করতে পারে। সুইজারল্যাণ্ডে আসবার পরে হেসের সাহিত্যে নতুন যে চিন্তা দেখা গেলো সে হলো মনোবিশ্লেষণের প্রয়াস এবং তাঁর অধ্যাত্মচিন্তায় অল্পবিস্তর নীটশের প্রভাব।

সিদ্ধার্থ—হেসের অন্যতম শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস "সিদ্ধার্থ" প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। আমাদের মতে তো এইখানাই হেসের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। সিদ্ধার্থ-এ দেখা যায় হেসে তাঁর চিন্তাজগতে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। যে আধ্যাত্মিকতা এতদিন পর্যন্ত অন্য পাঁচ রকমের চিন্তাধারণার একটিমাত্র ছিল, তা এবার স্পষ্টতই সর্বপ্রধান জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুন্দরকে সৃষ্টির মধ্যে হেসে আর তাঁর সাহিত্যসাধনা সীমিত রাখতে প্রস্তুত নন—সত্য এবং মঙ্গল

এবার ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গেলো তাঁর গল্প-উপন্যাসের বক্তব্যের মধ্যে।

আড়াই হাজার বছর আগের ভারতবর্ষের পটভূমিকায় রচিত হেসের 'সিদ্ধার্থ' উপন্যাসখানা আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও রচনাটি তাঁর বিস্ময়কর শিল্পচাতুর্যের সাক্ষ্য বহন করে। এর কাহিনী অংশে দেখা যায়: সিদ্ধার্থ, একটি ব্রাহ্মণ যুবক, অন্তরের তাগিদে সন্ন্যাস নিলো। ওর গুণমুগ্ধ বন্ধু গোবিন্দও সন্ন্যাস নিলো ওর সঙ্গে। কিছুদিন পরে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের ফলে ভারতের জনমানসে দেখা দিলো প্রচণ্ড আলোড়ন। সিদ্ধার্থ এবং গোবিন্দ—দু'জনেই এলো বুদ্ধ-দর্শনে। গোবিন্দ বুদ্ধদেবের ভক্ত হয়ে গেলো। কিন্তু সিদ্ধার্থ হলো না। সিদ্ধার্থ মনে করলো ব্রহ্মজ্ঞান এমন একটা জিনিস যা একজনের লাভ হলেই তার ফলে অন্যের লাভ হয় না। অর্থাৎ কিনা ঈশ্বর-সান্নিধ্য ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের বাস্তবজীবনে অনুভূত হওয়া উচিত—জিনিসটা কারো মারফৎ হওয়া উচিত নয়—তা সে ব্যক্তি যত উচ্চমার্গের হন না কেন। এরপর সিদ্ধার্থ এক সময় সন্ন্যাস বর্জন করলো, এলো শহরে, একটি নারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে রীতিমতো সংসারী হলো, অর্থোপার্জনের চেষ্টা করলো এবং কার্যতঃ ধনীও হ'লো। এদিকে ওর ঘরণী কমলা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলো এবং সর্পাঘাতে মারা গেলো। একটি ছেলে রেখে গেলো কমলা। সিদ্ধার্থের ছেলে। ছেলেকে নিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করলো সিদ্ধার্থ। দিন যায়। পিতাপুত্র পরস্পরের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগলো ক্রমশঃ। তারপর ছেলে একদিন নিরুদ্দিষ্ট হলো সিদ্ধার্থকে ছেড়ে।

এদিকে বিশটা বছর পার হয়ে গেছে। যৌবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রায় সবই একটি একটি করে ঝরা ফুলের মতো শুকিয়ে গেছে। একদিন হাঁটতে হাঁটতে সিদ্ধার্থ চলে এলো একটা নদীর ধারে। খেয়ামাঝি বাসুদেবের সঙ্গে বহুকাল আগে সন্ন্যাসজীবনে পরিচয় হয়েছিল একবার। দু'জনেই চিনতে পারলো দু'জনকে। অনেক সুখ-দুঃখের কথার পরে খেয়ামাঝি বাসুদেবের মুখ থেকেই সিদ্ধার্থ শুনলো অমূল্য সত্য কথাটি: "সময় অনেকটা এই নদীটার মতো, শুধু চলেছে তো চলছেই, শুরুতে স্রোত, মাঝখানে স্রোত, শেষে স্রোত,—আসলে সর্বত্রই এক, একটি স্রোত। গোটা সৃষ্টিটাই এই রকম—অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সসীম মনের বিকার মাত্র, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য বা পার্থক্যবোধ শুধু সত্যজ্ঞানের অভাবের লক্ষণ মাত্র। প্রকৃত জ্ঞান হলেই

মানুষ বুঝতে পারে যে একের সঙ্গে অন্যের আত্মার কোনো প্রভেদ নাই।" এইভাবেই চিন্তা করতে করতে সিদ্ধার্থ শেষ পর্যন্ত স্বয়ং গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে নিজের অভিন্নতা অনুভব করলো।

"সিদ্ধার্থ"-এর পর থেকে হেসের সাহিত্যসাধনা একটি সরল পথ ধরে এগোতে লাগলো। সে হলো আধ্যাত্মিকতার পথ। সরাসরিভাবে প্রবন্ধের মাধ্যমে হেসে তাঁর দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক মত প্রকাশের চেষ্টা তো করেছেনই, উপন্যাসের মাধ্যমেও এইটিই তাঁর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো।

"সিদ্ধার্থে"র ছয় বছর পরে লেখা "ষ্টেপন্‌উলফ" উপন্যাসে হেসে নৈতিকতা এবং মানসিক কৃষ্টি-বিবর্জিত নগর সভ্যতার অসাড়তা দেখাবার চেষ্টা করলেন। উচ্চতর অধ্যাত্ম চিন্তা ব্যতীত যে মানুষের মন কোনো কিছু পেয়ে শান্তি লাভ করতে পারে না—এই কথাটাই নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

ডেথ এণ্ড দি লাভার—পরিণত বয়সের শিল্পকর্ম হিসেবে এ উপন্যাসটি অসাধারণ সৃষ্টি। দু'টি পরস্পর-বিরোধী চরিত্রের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন হেসে। নারজিস একজন দর্শন-বেত্তা সচ্চরিত সুপণ্ডিত মঠাধ্যক্ষ। গোল্ডমাণ্ড মঠের একজন শিক্ষার্থী নবীন যুবক। একদিন দেখা গেলো গোল্ডমাণ্ড অকস্মাৎ মঠ ত্যাগ করবার সংকল্প ঘোষণা করলো। ও বললে: বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাকে অর্জন করতে হবে, তা না হলে কেবল পুঁথিগত বিদ্যার্জনের ফলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হতে পারে না। আমি মঠ ত্যাগ করে বাস্তব জীবনে পৃথিবীকে জানবো। সকলেই, বিশেষ করে গোল্ডমাণ্ডের গুরু নারজিস অনেক বোঝালেন ওকে, মঠ-জীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধে অনেক কিছুই বললেন। কিন্তু কোনই ফল হ'লো না। গোল্ডমাণ্ড মঠ থেকে বেরিয়ে এলো, সাধারণ মানুষের মত দুঃখকষ্ট ভোগ করবার জন্য। বাস্তব জীবনে এসে ও একটির পর একটি রমণীর লালসায় ইন্ধন জোগাতে লাগলো। ক্রমাবনতি হ'তে লাগলো ওর নৈতিক জীবনের।

হেসের প্রায় প্রতিটি উপন্যাসই জার্মানীর জাতীয় চরিত্রের কোনো না কোনো দিক প্রতিফলিত হয়েছে নানা চরিত্রের ভেতর দিয়ে। কিন্তু 'ডেথ এণ্ড দি লাভার'-এ এই জিনিসটি যতোটা পূর্ণাঙ্গভাবে ফুটে বেরিয়েছে ততোটা আর কোনো উপন্যাসেই হয়নি বলে জার্মান সমালোচকেরাই মনে

করেন। কাজেই জীবন সম্পর্কে একটা দার্শনিক ধরনের গুরুত্ববোধের যে খ্যাতি জার্মানদের আছে, নারজিস এবং গোল্ডমাণ্ড চরিত্র দু'টির মধ্যে তা পূর্ণাঙ্গভাবে দেখা যায়। আসলে ওদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা থিয়োরী এবং প্র্যাকটিসের দ্বন্দ্ব। একজন অন্যায় এবং কুশ্রীতাকে এড়িয়ে চলবার জন্য বাস্তব-জীবনটাকেই এড়িয়ে চলেছে—আর একজন মনে করে জীবন সম্পর্কে থিয়োরী যেটুকু আহরণ করা সম্ভব তা' শেষ করে তারপর তা' ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এটা করতে গিয়ে বাস্তব জীবনের নানা অভাবিত এবং জরুরী অবস্থার চাপে যেটুকু অসুন্দর অবস্থার সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে তাকে মানিয়ে চলাই শ্রেষ্ঠতর জীবনদর্শন। হেসে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে এই শেষোক্ত ধরনের জীবনযাত্রা একটা আর্ট-বিশেষ। শিল্পীর নিষ্ঠা এবং সূক্ষ্ম অনুভূতির সঙ্গেই বাস্তব জীবনকে গ্রহণ করা উচিত।

হেসের সাহিত্য-প্রতিভার আর একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি "ম্যাজিষ্টর লুডি।" সমাজের ওপরতলার মানুষেরা কী রকম অবাস্তবভাবে সমাজজীবনকে গণ্য করে থাকে, এ উপন্যাসে সেই চিত্রই দেখাবার চেষ্টা করেছেন উনি। এর প্রতিপাদ্য বিষয় শ্রেণীসংগ্রাম নয়, শুধু বাস্তববোধের অভাব। শ্রেণীসংগ্রাম হেসের মতে আজকের পৃথিবীর প্রধান সমস্যা নয়। ব্যক্তির নিজের ভেতরের সমস্যাই বেশির ভাগ সামাজিক সমস্যার মূল কারণ বলে হেসের আন্তরিক বিশ্বাস।

গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ ও উপন্যাস—সব নিয়ে হেসের মোট বইয়ের সংখ্যা চল্লিশের ওপর। তার মধ্যে মাত্র কয়েকখানা, বোধ হয় খান পনেরো এখন পর্যন্ত ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে।

আজকের দিনে যাকে বলা হয় 'অন্য জগতের মানুষ', একদিক থেকে হেসে ছিলেন তাই। রাজনীতির ধারে কাছেও যেতেন না কখনো। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেমে যাবার পর জার্মানরা যখন হেসেকে সাহিত্য-শিল্পের জন্য শ্রেষ্ঠ জাতীয় পুরস্কার 'গ্যয়টে প্রাইজ' দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো, তখন দেখা গেলো উনি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন প্রাইজটা নেওয়া ঠিক হবে কিনা, তা বুঝবার জন্য। যখন সকলেই, এমন কি সে সময়কার জার্মান সরকারেরও একাধিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি জানালেন যে "গ্যয়টে প্রাইজ" নেওয়া মানে এ নয় যে, অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের জার্মান রাজনীতির

কিছু আপনাকে সমর্থন করতে হবে—শুধুমাত্র এ-কথা পরিষ্কারভাবে জানবার পরই হেসে রাজী হয়েছিলেন পুরস্কার গ্রহণ করতে।

বর্তমান শতাব্দীর ইয়োরোপের অনেক শ্রেষ্ঠ মনীষীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন হেসে। ক্রোচে, দান্নুন্‌ৎসিও, রোঁলা, টমাস মান, হাউপ্ট্‌-মান, মেটারলিঙ্ক, ফ্রয়েড, এ্যাডলার, আইনষ্টাইন, ফ্রাঁস, কামু, সার্ত্র, হাইডেগ্‌গার প্রভৃতি অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন হেসে সম্পর্কে। টমাস মানকে এ যুগের জার্মানীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলা হয়। টমাস মান বলতেন: "সাহিত্য-স্রষ্টা হিসেবে হেসে কোনো দিক থেকেই আমার চাইতে ছোটো নন, মানুষ হিসেবে তো আমি ওঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধাই করি এবং ভালবাসি।"

উইলিয়াম ফক্‌নার

বছর পনরোর একটি ছেলে। কবিতা লেখে ছেলেটি। সে তার প্রতিটি কবিতার প্রতিটি ছত্রের মধ্যেই সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দেয়। চেষ্টা করে যাতে প্রতিটি রচনাই সাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকতে পারে, অমরত্ব লাভ করে—মানুষকে আনন্দ দিতে পারে, প্রেরণা যোগাতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতো যত্নের সৃষ্টি, এই কিশোরের প্রায় প্রতিটি রচনাই আত্মীয়স্বজন এবং পাড়াপড়শীর হাসির উদ্রেক করতে লাগলো। অবজ্ঞার হাসি, তাচ্ছিল্যের হাসি। লোকে যতো হাসতো, কিশোরটির ততই জেদ চেপে যেতো এমন কিছু রচনা করবার জন্যে, যাতে ওঁদের উপেক্ষা এবং অবজ্ঞার হাসি বন্ধ করা যায়, যাতে ওঁরা ওর রচনার তারিফ করতে বাধ্য হন।

পনরো বছর বয়সে যাঁর কবিতা পড়ে লোকে হাসতো বায়ান্ন বছরে সাহিত্য-সাধনার চরম স্বীকৃতি হিসেবে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন—তবে কবি হিসেবে নয়, ঔপন্যাসিক হিসেবে। এই বিস্ময়কর ব্যাপারটা যে ব্যক্তির বাস্তবজীবনে সত্য হয়েছিলো, তিনি মার্কিন সাহিত্যিক উইলিয়াম ফক্‌নার (William Faulkner, September 1898—6th July 1962)।

প্রথম জীবন—ফক্‌নারের জীবন সর্বতোভাবেই যাকে বলে দুঃখকষ্টের জীবন। এই দুঃখকষ্টের ভার বহুবার বালক, কিশোর এবং যুবক ফক্‌নারকে নুইয়ে ফেলেছে সন্দেহ নেই—কিন্তু তাঁকে ভাঙতে পারেনি, কখনই একেবারে পরাজিত করতে পারেনি।

সাধারণভাবে লেড়াপড়া শেখা বলতে যা বোঝায়, ফক্‌নারের ভাগ্যে তার কিছুই জোটেনি। অর্থাৎ কোনো স্কুল-কলেজের ডিগ্রি তিনি অর্জন করেননি। পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয়েছেন তা নয়, দৈন্যদশার জন্যে পড়াশুনো চালিয়ে উঠতে পারেননি বলে। যখন স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র তখন কিছুটা আকস্মিকভাবেই নিয়মমাফিক পড়াশুনোয় ইস্তফা দিয়ে জীবিকার অন্বেষণে বেরিয়ে পড়তে হলো ফক্‌নারকে। কয়েকটা বছর কাটলো নেহাৎ ছন্নছাড়াভাবে—শেষ পর্যন্ত লেগে গেলেন যুদ্ধের কাজে। প্রথম মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি ফক্‌নার কানাডায় এসে রাজকীয় বিমানবাহিনীতে

নাম লেখালেন। ওঁকে পাঠান হ'লো ফ্রান্সে। ফ্রান্সে বিমান-যুদ্ধের সময় দু'খানা শত্রু বিমান উনি ঘায়েল করেছিলেন।

স্কুলের পড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া থেকে বৈমানিক হিসেবে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত বছর আষ্টেক সময়ের মধ্যে দেখা গেলো ফকনার এতো বিষয়ে এতো বিভিন্ন রকমের এবং এতো বেশি সংখ্যায় বই পড়ে ফেলেছেন যে যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রির জন্যেও তার অর্ধেকও পড়াশুনোর প্রয়োজন হয় না একজন ছাত্রের।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যাঁরা যুদ্ধের কাজ করেছিলেন, বিশেষ করে তরুণেরা, তাঁরা পড়াশুনোর জন্যে অনেক রকম সুযোগ সুবিধে পেয়েছিলেন মার্কিন সরকার তথা মার্কিন দেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে। এর মধ্যে একটি হ'লো স্কুলের পড়া শেষ না করেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করা। এ সুযোগটা ফকনারও নিলেন। গ্র্যাজুয়েট হবার আশায় ভর্তি হ'লেন মিসিসিপির অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিছুদিন নিয়মিত ক্লাশও করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরীক্ষাটা আর দিলেন না। ছাত্র হিসেবে ফকনার প্রায় দু' বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

ছাত্র হিসেবে ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ফকনার। সে হ'লো কর্মচারী হিসেবে। প্রথমে উনি খুব সামান্য একটা কাজই নিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো বাড়িগুলিতে রং লাগাবার শিল্পীর কাজ। এ কাজটা অল্প কিছুদিন করবার পরই যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-অফিসের পোষ্টমাষ্টারের পদটা খালি হ'লো, তখন ফকনার একটা আবেদন করলেন এই চাকুরী পাবার জন্যে। কর্তৃপক্ষ মঞ্জুর করলেন ওঁর আবেদন। ফকনার পোষ্টমাষ্টার হয়ে গেলেন। কয়েক মাস পরেই এ চাকুরীটা চলে গেলো। কাজে অমনোযোগিতার জন্য চাকুরীটা গেলো। এ সময়ে ফকনারের বয়স পঁচিশের বেশি নয়, এর পরেও আর একবার অমনোযোগিতা তথা অযোগ্যতার দায়ে চাকুরী গিয়েছিল। তখন উনি নিউ ইয়র্কের একটা বইয়ের দোকানের কর্মচারী ছিলেন।

সাহিত্যসাধনার শুরু—কবি হিসেবে খ্যাতিলাভ ফকনারের হ'ক আর নাই হ'ক কাব্যচর্চার মানদণ্ড যে ওঁর কতো উচ্চগ্রামে বাঁধা হয়ে গিয়েছিলো, তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। প্রতিটি লেখা শেষ হবার পর উনি ওঁর প্রিয় কবিদের রচনার পাশাপাশি রেখে বিচার করতেন—যেই মনে হ'তো

নিজের রচনাটি তেমন সুবিধের হয়নি, তখুনি ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে উড়িয়ে দিতেন কাগজখানা এবং হয়তো নিজেই একটু অবজ্ঞার হাসি হাসতেন নিজের অক্ষমতা দেখে। নিজের কবিতার বিচার ফক্‌নার সাধারণত করতেন ওঁর সব চাইতে প্রিয় কবি ওমর খৈয়ম এবং সুইনবার্ণের রচনার পাশাপাশি রেখে।

ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ভয়ের। কারণ, এভাবে বেশিদিন চলতে থাকলে যে কোন লোকের পাগল হয়ে যাবার কথা। আর ফক্‌নারের কয়েকটা বছরই তো কেটে গেলো এইভাবে। নিজের সাহিত্যচর্চার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যন্ত সন্দিহান হয়ে উঠলেন উনি মনে মনে। এই সময়ে ভাগ্যক্রমে ফক্‌নার একজন মানুষ পেলেন—যিনি প্রকৃতই বুঝতে পারলেন ওঁকে, এবং ওঁর মনের প্রকৃত অবস্থাটা। এঁর নাম শেরউড এণ্ডারসন—সে সময়কার মার্কিন দেশের সাহিত্যক্ষেত্রের একজন দিক্‌পাল ব্যক্তি।

সেবার অক্‌সফোর্ড থেকে নিউ অরলেন্স বেড়াতে এসেছিলেন ফকনার, সেইখানেই পরিচয় হ'লো শেরউড এণ্ডারসনের সঙ্গে। এণ্ডারসন প্রথম পরিচয়েই লক্ষ্য করলেন ফক্‌নারের ভেতরের প্রতিভাকে, যদিও তখন পর্যন্ত ওঁর কোনো উল্লেখযোগ্য রচনাই বই হয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি। এ-কথা সে-কথার পর এণ্ডারসন বললেন ওঁকে—'গল্প-উপন্যাস লেখবার চেষ্টা করো না কেন?'

—'এতোদিন ধরে চেষ্টাচরিত্র করে কবিতাই পারছি না লিখতে', বিনীতভাবে ফক্‌নার নিজের অক্ষমতার কথা বললেন, 'গল্প-উপন্যাস তো আরো কঠিন ব্যাপার'।

—'প্রত্যেকটা ব্যাপারই কঠিন, পৃথিবীতে কিছুই সহজ নয় উইলিয়াম। তবে যার প্রকৃতির সঙ্গে যে কাজটা বেশি খাপ খায়, সে কাজটা তাঁর পক্ষে অন্য আর পাঁচটা কাজের চাইতে একটু সহজসাধ্য হয় এইমাত্র'। সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত এণ্ডারসন সহৃদয়ভাবে বললেন—'যখন প্রকৃতই ভেতর থেকে কোনো প্রেরণা বোধ করবে তখন কবিতা অবশ্যই লিখবে। কিন্তু আমার মনে হয় তুমি গল্প-উপন্যাস লিখলে নিজের এবং দেশের অশেষ উপকার করতে পারবে।'

কথাটা শুনে প্রকৃতই অভিভূত হয়ে গেলেন ফক্‌নার। এমন কথা, অর্থাৎ ওঁর বিদ্যাবুদ্ধি এবং সাহিত্যশক্তি সম্বন্ধে এতো বড়ো কথা আজ পর্যন্ত ঘনিষ্ঠতম বন্ধুও কেউ এমন কি মিথ্যে আশা দেবার জন্যেও বলেনি। আর আজ কিনা শেরউড এণ্ডারসন বলছেন এমন ধারা কথা?

—'অবিলম্বে উপন্যাস লেখবার চেষ্টা করো, কারো মতো লেখবার চেষ্টা করবে না, নিজের মতো লিখবে, নিজে যা জানো তাই লিখবে।' আবার বললেন এণ্ডারসন।

—'কিন্তু আমার লেখা ছাপাবে কে?' সংশয়ের সঙ্গে বললেন ফক্‌নার।

কথাটা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন এণ্ডারসন—'আরে আগ তো লেখো, ছাবাবার কাগজ, কালি, বই বিক্রির দোকান, কেনবার খদ্দের, পড়বার পাঠক—এ সবের কথা আগেই ভাবছো কেন?'

একটুক্ষণের মধ্যেই নিজের ছেলেমানুষী বুঝতে পারলেন ফক্‌নার। তাই লজ্জায় আর বললেন না কিছু এরপর। সোজা বাড়ি ফিরে এলেন, উপন্যাস রচনার জন্যে প্রস্তুত করতে লাগলেন নিজেকে।

কয়েক সপ্তাহের চেষ্টায় ফক্‌নার তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনার কাজ শেষ করে আবার এলেন এণ্ডারসনের কাছে। উদ্দেশ্য উনি একটু পড়ে দেখবেন। এণ্ডারসন ছিলেন মানুষ হিসাবে প্রকৃতই দরদী স্বভাবের। উনি শুধু ফক্‌নারের পাণ্ডুলিপি পড়েই দেখলেন না, প্রকাশের বন্দোবস্তও করে দিলেন। এতোদিনে ফক্‌নার সাহিত্যসাধনার কাজে প্রকৃত আস্থা পেলেন। এটা ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ফক্‌নারের এই প্রথম উপন্যাসের নাম হ'লো "সোলজারস পে"।

ক্ষুদ্র একখানা কাব্যগ্রন্থ "দি মার্বল ফন"-এর দু' বছর আগে ফক্‌নার প্রকাশ করেছিলেন বটে, কিন্তু সে বই সাহিত্যের আসরে ওঁকে কোনোদিক দিয়েই সাহায্য করতে পারে নি।

'সোলজারস্ পে'-র পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ফক্‌নার আরো প্রায় তিরিশখানা উপন্যাস ও গল্পের বই এবং আরো একখানা কবিতার বই প্রকাশ করেছিলেন।

পাঠক সমাজে 'সারটোরিস', 'দি সাউণ্ড এণ্ড দি ফিউরি' (১৯২৯); 'স্যাঙ্কচুয়ারি' (১৯৩১); এবং 'ইনট্রুডার ইন্ দি ডাস্ট'ই (১৯৪৮) সব চাইতে জনপ্রিয়। কিন্তু ফক্‌নারের নিজের ধারণা ছিল একটু ভিন্ন রকম। ওঁর নিজের বিশ্বাস যে 'এ্যাজ আই লে ডাইং'ই (১৯৩০) ওঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত এই কথাই বলতেন উনি। কিন্তু ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 'এ ফেবল' প্রকাশিত হবার পর থেকে উনি বলেছেন যে, এইখানাই ওঁর শ্রেষ্ঠ রচনা—'এ্যাজ আই লে ডাইং'-এর স্থান তারপর।

লেখক হিসেবে ফক্‌নার বলতে গেলে এণ্ডারসনের হাতে-গড়া মানুষ।

এণ্ডারসন ফক্‌নারকে শুধু "উপন্যাস লেখো" এই পরামর্শটাই দেননি। কি লিখতে হবে, অর্থাৎ কি লেখা ফক্‌নারের পক্ষে সম্ভব বা উচিত—সে উপদেশও দিয়েছিলেন। বিভিন্ন সময়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একটা কথাই এণ্ডারসন ফক্‌নারকে বলতেন। সে হ'লো এই যে—'যা জানো, অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার ব্যক্তিগত ধারণা আছে, সেই সম্পর্কে লিখবে।' ফক্‌নার এ সময়ে নিউ অরলেন্স-এ এণ্ডারসন পরিবারের কাছাকাছিই থাকতেন এবং রোজ বিকেলে ওঁদের মধ্যে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা হ'তো।

উপন্যাস লেখবার জন্য মানসিক প্রস্তুতির কিছুটা অভাব সত্ত্বেও কলম ধরলেন ফক্‌নার। পর পর দু'খানা উপন্যাস এণ্ডারসনের সুপারিশেই এক প্রকাশক প্রকাশ করলেন। আর্থিক দিক দিয়ে লেখক বা প্রকাশক, কারোই বিশেষ সুবিধে হ'লো না এ উপন্যাস দু'খানার জন্যে।

ফক্‌নার কিছুটা হতাশ হ'লেন নিজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। ঠিক করলেন কিছুদিনের জন্যে নিজেদের শহর অর্থাৎ অক্‌সফোর্ডে ফিরে যাবেন। এণ্ডারসন বাধা দিলেন না। শুধু আর একবার মনে করিয়ে দিলেন—'যে সম্পর্কে এবং যাদের সম্পর্কে জানো, ঘনিষ্ঠভাবে জানো, সেই সম্পর্কে এবং তাদের সম্পর্কেই লিখবে। গল্প উপন্যাসে পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকটা গৌণ, কাহিনীটা এবং তা বলার ধরনটাই প্রধান।'

অক্‌সফোর্ডে ফিরে এসে ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই স্টেশনে একটা চাকুরী নিলেন ফক্‌নার এবং শুরু হলো নতুন করে উপন্যাস লেখার আয়োজন। এবার একটা বিষয়ে উনি বদ্ধপরিকর হলেন। সে হ'লো এই যে—যা উনি ভালোভাবে জানেন, অনেকের কাছে তা যতোই তুচ্ছ মনে হ'ক না কেন, তা'ই সততার সঙ্গে বলবেন, আর যা জানেন না তা জানবার ভান করবেন না, তাতে লোকে যতই গেঁয়ো মনে করুক না কেন।

ফক্‌নার কেন দেশের বাইরে তা ইয়োরোপেই হ'ক আর আমাদের দেশেই হ'ক—অনেক মার্কিন সাহিত্যিকের চাইতে কম পঠিত, তার মূল কারণও আমরা এখানেই পাবো।

ইয়কনাপাটাওফা কি ও কেন—ফক্‌নার পরিবারের স্থায়ী বসবাস মার্কিনদেশের দক্ষিণাঞ্চলে। মার্কিন দেশ বলতেই আমাদের মনে সাধারণতঃ নিউইয়র্ক, স্যানফ্রান্সিসকো, বোষ্টন, ওয়াশিংটন এবং হলিউড প্রভৃতি সমস্ত বড়ো বড়ো শহরের পত্র-পত্রিকায়-দেখা ছবি মনে ভেসে

ওঠে। কিন্তু বাস্তবিক তা' নয়। গৃহ-যুদ্ধের পর থেকে একই রাষ্ট্রের অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণাঞ্চল ভাবধারণার দিক থেকে মার্কিন দেশের উত্তরাঞ্চলের চাইতে কিছুটা অন্যভাবে চলতে থাকে। উত্তর হয়ে উঠতে লাগলো শিল্পসমৃদ্ধ, আর দক্ষিণ পড়ে রইলো গতানুগতিকভাবে জমি আঁকড়ে। উত্তরের পারিবারিক তথা সামাজিক জীবনযাত্রায় ঘটতে লাগলো দ্রুত পরিবর্তন, আর দক্ষিণাঞ্চলে রক্ষণশীলতা দেখা দিলো প্রবলভাবে। ফক্‌নারের ছেলেবেলা পর্যন্ত ত বটেই, এমন কি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ ফক্‌নারের যখন আঠারো কি বিশ বছর বয়স সে পর্যন্ত মার্কিন দেশের দক্ষিণাঞ্চলের এই ছিলো অবস্থা। ফক্‌নার পরিবার কয়েক পুরুষ ধরেই এ অঞ্চলের বেশ অবস্থাপন্ন এবং মান্যগণ্যদের অন্যতম ছিলেন। গৃহযুদ্ধের সময়ে এঁরা সর্বস্বান্ত হয়ে যান এবং পরে আর কোনো সময়েই এঁরা পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হননি। কয়েক পুরুষ ধরে একই জায়গায় (অর্থাৎ অক্সফোর্ড শহরে) বাস করবার ফলে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা সংখ্যায় হয়ে পড়ে অনেক। উইলিয়াম ফক্‌নার ছেলেবেলায় জ্যেঠা-কাকা আর পিসিদের হিসেব ঠিক রাখতে গিয়ে রীতিমতো হিমসিম খেতেন। এর ওপর আবার ফক্‌নারদের এক উর্ধ্বতন পুরুষ—উইলিয়াম ফক্‌নারের প্রপিতামহ ছিলেন এ অঞ্চলের একজন 'হিরো' বিশেষ। ছোটো বড়ো বহু যুদ্ধের বীর সৈনিক, পরোপকারী, পরিণত বয়সে বড়ো ব্যবসায়ী এবং লেখক। এই প্রপিতামহ এবং তাঁর সময়কার গল্পই বিভিন্ন জ্যেঠা-খুড়ো এবং পিসি-জেঠি-খুড়ীর কাছে বিভিন্নভাবে শুনতে শুনতে বছরের পর বছর কেটে গেছে ফক্‌নারের এবং এর যে প্রভাব, তা থেকে উনি কখনোই নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি।

এর ফলে দক্ষিণাঞ্চলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন মনোভাবযুক্ত নরনারী ফক্‌নারের প্রতিটি গল্প, উপন্যাসে দেখা দিতে লাগলো। কাহিনীগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক, একান্ত নিজস্ব—অথচ লোকগুলিকে পরিচিত মনে হয়। একটির পর একটি উপন্যাস বেরুতে লাগলো আর প্রবীণদের মুখে এবং পত্র-পত্রিকাদিতে আলোচনা শুরু হতে লাগলো—তাইতো, অমুক সময়ে এই রকম একটা লোক তো অক্সফোর্ডে ছিল শুনেছি। আরো একটা কাজ করলেন ফকনার—একটা নতুন দেশ সৃষ্টি করলেন—রীতিমতো একটা কল্পনার রাজ্য। তাঁর কাহিনীগুলিতে অক্সফোর্ড শহরের কথাই বলা হচ্ছে, কিন্তু অন্য নামে—সেখানে শহরটির নাম জেফারসন এবং গোটা অঞ্চলটির নাম হলো

ইয়কনাপাটাওফা। এ নাম দুটো মার্কিন দেশের ভৌগোলিক মানচিত্রে নেই (শেষোক্ত নামের অবশ্য একটি ছোট নদী আছে), কিন্তু মার্কিন দেশের সাহিত্যের মানচিত্রে এ দু'টি অক্ষয় নাম।

সারটোরিস—ইয়ক্‌নাপাটাওফার যে কিংবদন্তীর রাজ্য সৃষ্টি করেছেন ফক্‌নার, তার প্রথম সূত্রপাত ঘটেছিল ওঁর 'সারটোরিস'-এ। সারটোরিস পরিবারের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে এ উপন্যাসে। এক সময়ে পরিবারটির তেজারতি ব্যবসা ছিল এবং তাঁরা প্রচুর জমির মালিক ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে দেখা যায় সারটোরিসদের সে প্রভাব-প্রতিপত্তি, তা আর কিছুই নেই। কালের স্রোতে সবই ভেসে গেছে, পরিবর্তনশীল সমাজ-জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন ওঁরা—মানসিক স্থৈর্য এবং অসাধারণ সহনশীলতা এ উপন্যাসের চরিত্রগুলির সর্বপ্রধান গুণ।

সাহিত্যসাধনার পরিণত রূপ—দি সাউণ্ড এণ্ড দি ফিউরি—ফক্‌নারের সমস্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এ উপন্যাসে দেখা যায় আর একটি পরিবারের ক্রমাবনতির কথা। অনেক পাঠক এবং সমালোচকের মতে এইখানাই ফক্‌নারের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তিনটি চরিত্রের বিগত দিনের স্মৃতিমন্থনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের মূল কাহিনী পরিবেশন করা হয়েছে। এ উপন্যাসে একটি মৌল তত্ত্বচিন্তা আছে। ফরাসী দার্শনিক এবং সাহিত্যিক জঁা-পল সার্ত্র্‌ই সেদিকে সর্বপ্রথম সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন একটি প্রবন্ধ লিখে। বিষয়টা হলো 'কাল' অর্থাৎ সময় সম্পর্কে। ফক্‌নার বলছেন: 'বিশেষ কোনও কালের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হবে—এটা মানুষের পক্ষে চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। মানুষ মাত্রেই নানা বিপদ, বাধা-বিপত্তির শিকার হয়ে পড়ে তার দৈনন্দিন জীবনধারনের জন্যে। এবং যখন সমস্ত বাধা সে অতিক্রম করতে সক্ষম হলো বলে মনে করতে পারে তখন অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হয় যে তার সত্তার সবচাইতে বড়ো বাধা—কালের গণ্ডী তাকে আরো কঠিন বাঁধনে জড়িয়ে ফেলেছে—কালের অনুশাসন মেনে চলতে চলতে সে 'বিচ্ছিন্ন কালের' দাস হয়ে পড়েছে—'মহাকালের' হাতছানি সে দূর থেকে দেখেই তৃপ্ত থাকতে বাধ্য।'

অ্যাজ আই লে ডা'ইং—এর কাহিনীতে দেখা যায় দক্ষিণাঞ্চল-বাসীদের অঞ্চলপ্রীতি, যা-কিছু স্থানীয় তার প্রতি মমতা ও তীব্র আকর্ষণ চরমে পৌঁছেচে। আনসে ব্রানডেন তাঁর মুমূর্ষু স্ত্রীকে কথা দিলেন

যে মৃত্যুর পর তাঁকে জেফারসনে এনে কবর দেওয়া হবে। বর্ষীয়সী নারী ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঝঞ্ঝাট সত্ত্বেও স্বদেশের মাটিতে শেষ আশ্রয় লাভ করা যাবে এই আশ্বাস পেয়ে শান্তিতে চোখ বুজলেন। এখান থেকে জেফারসন শহরের দূরত্ব অনেকটা, পথের বাধা-বিপত্তিও অনেক। কিন্তু সমস্ত কিছু কঠিন পরিশ্রম এবং দুঃসাহসের সঙ্গে তাঁর ছেলেরা অতিক্রম করে, তাঁর শবটি জেফারসনে এনে সমাধিস্থ করলো—এই হলো মোটামুটিভাবে গল্পাংশ। আধুনিক যুগের মানুষদের কাছে যা মনে হতে পারে একটা অর্থহীন বা যুক্তিহীন খেয়াল বা ভাবাবেগে—ঠিক সেই জিনিসটির জন্যেই ঐ নারীর পরিবারের লোকজন কী কষ্ট স্বীকারটাই না করলেন! "সেন্টিমেণ্ট" কথাটা আজকাল নেহাৎ হালকাভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফক্‌নার যে-সময়কার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন এ উপন্যাসে সে সময় ব্যক্তির "সেন্টিমেণ্ট"-ই ছিল তাঁর পক্ষে সব চাইতে প্রয়োজনীয় কথা—বলতে গেলে তাঁর সমস্ত সত্তাই এই "সেন্টিমেণ্ট" কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো—এবং পরস্পর মানুষ এই সেন্টিমেণ্টকে শ্রদ্ধা করে চলতো।

এ্যাবসালম্, এ্যাবসালম্-এ একটি দরিদ্র শ্বেতকায় ব্যক্তির লুপ্ত গৌরব ও অবস্থা ফিরিয়ে আনবার নিষ্ফল প্রয়াসের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে।

দি হ্যামলেট (১৯৪০) এবং দি টাউন (১৯৫৭)—একই সূত্রে গাঁথা দু'খানা উপন্যাস। দক্ষিণাঞ্চলবাসীদের জায়গাজমি গ্রাস করবার দুর্দমনীয় স্পৃহা হচ্ছে এ দু'টি কাহিনীর প্রতিপাদ্য বিষয়।

অঞ্চল-বিশেষকে কেন্দ্র ক'রে ফক্‌নার তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাস এবং গল্প লিখেছেন সত্যি, কিন্তু প্রতিটি চরিত্রই সঠিক গুণসম্পন্ন করবার চেষ্টা করেছেন এবং যোগ্য সমালোচকদের মতে এ দিক দিয়ে ওঁর সাফল্য অতুলনীয়। কাজেই বলতে হয়—আঞ্চলিক কাহিনী বলে ফক্‌নারের উপন্যাসের যে পরিচিতি সেইটেই শেষ কথা নয়। ওঁর যে-কোনো প্রধান উপন্যাস পড়লেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। তবে একটা কথা —ফক্‌নারের রচনাবলীর সাহিত্যরস লাভের জন্য মার্কিন দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সেন্টিমেণ্ট সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা এবং শ্রদ্ধা থাকা চাই।

মৃত্যুর পূর্বে ফক্‌নার আর্থিক অবস্থা বিশেষভাবে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পঁয়ত্রিশ একরের বিরাট খামার কিনেছিলেন উনি এবং এই

খামারের চাষবাসের কাজ উনি নিজেই দেখাশুনো করতেন। ফক্‌নার সাধারণত সকালের দিকে লিখতেন এবং বিকেলের দিকে খামারের কাজ দেখতেন, আর না হয় মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়তেন বা বন্দুক নিয়ে শিকারে বেরোতেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রেষ্ঠ গল্প রচয়িতা হিসেবে সে বছরের জন্যে 'ও হেনরী' মেমোরিয়াল পুরস্কার লাভ করেছিলেন ফক্‌নার। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 'এ ফেবল' প্রকাশিত হবার পর শ্রেষ্ঠ জাতীয় পুরস্কার—পুলিৎসার পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে লাভ করেছিলেন নোবেল পুরস্কার। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত হলিউডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন চিত্রনাট্যকার হিসেবে।

সাহিত্যাদর্শ—নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করবার সময় ফক্‌নার যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, অল্প কথায় ফক্‌নারের সাহিত্যসেবার আদর্শ তার মধ্যে পাওয়া যায়—"সমস্ত কিছু অতিক্রম করে মানুষ নিশ্চয়ই পৃথিবীতে টিকে থাকবে, কারণ মানুষের মন আছে, আত্মা আছে, হৃদয় আছে, সে আত্মত্যাগ করতে কুণ্ঠিত নয়। কবি এবং সাহিত্যিকদের কর্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত সম্পর্কে লেখা—যাতে এ যুগের মানুষ অতীত যুগের মানুষদের মতো কষ্ট স্বীকার করতে পারে, তার হৃদয় প্রশস্ত হয়, তার বুকে প্রাচীনদের মতো সাহস ও শক্তি ফিরে আসে, যাতে উপযুক্ত ক্ষেত্রে সে হাসিমুখে আত্মত্যাগে এগিয়ে আসে এবং যে-কোনো অবস্থায়ই হ'ক না কেন নিজের মর্যাদা এবং গৌরবময় অতীতের কথা যাতে মানুষ মনে রাখতে পারে—তার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রেরণা জোগানো……।"

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

বেঁচে থাকতেই কিংবদন্তীর বিষয়বস্তু হতে পারা নিশ্চয়ই একটা দুর্লভ সৌভাগ্য। কোনো রাষ্ট্রনেতা বা ধর্মনেতা বা এ যুগে চিত্রতারকাদের বেলাতেই সাধারণত দেখা যায় ঐ রকম সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে। কিন্তু যদি দেখা যায় একজন লেখকের ভাগ্যেও অমনি একটা সুযোগ ঘটেছে তা' হলে আমরা নিশ্চয়ই যুগপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত হবো। এ যুগে অবশ্য এই ব্যতিক্রমটা সত্যি কয়েকজন লেখকের বেলায় ঘটেছে, কিন্তু হেমিংওয়ের তুলনায় সে-সব কিছুই নয়। তার কারণ হেমিংওয়ের স্বভাবগত মারাত্মক এ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তা।

হেমিংওয়ে হলেন সংক্ষেপে বলতে গেলে এমন একজন ব্যক্তি বিপদকে যিনি ভালোবাসেন। প্রকৃতই এতো গভীরভাবে ভালোবাসেন যে, সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়েন তার মধ্যে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র আঠারো বছর বয়সে হেমিংওয়ের মধ্যে প্রকট হয়েছিল এই লক্ষণটা এবং একটানা প্রায় ছে'চল্লিশ বছর ধরে কেটেছে একইভাবে—যখনই সুযোগ পেয়েছেন বা সুযোগ যখন না আসতো নিজেই সুযোগ সৃষ্টি করে নিতেন একটু মৃত্যু-প্রদক্ষিণ করে আসবার জন্যে। সাহিত্যিক হলেই শান্ত, শিষ্ট, অসহায়, নিরীহ এবং গোবেচারী হতে হবে বলে যাঁরা মনে করে থাকেন, হেমিংওয়ে তাঁদের সামনে একটি জীবন্ত প্রতিবাদ। সাহিত্যিক হবার আগেও যেমন বিপদ-প্রিয় এবং দুঃসাহসী ছিলেন হেমিংওয়ে, সাহিত্যিক হবার পরে, এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করবার পরেও ঠিক তেমনিই ছিলেন। কাজেই জীবদ্দশাতেই যে কিংবদন্তীর রাজ্যে গিয়ে পড়েছিলেন হেমিংওয়ে সে তাঁর নিজেরই অনন্যসাধারণ দুঃসাহসী জীবন-যাত্রার জন্য।

প্রথম জীবন—ইলিনয়েস-এর ওক পার্কে হেমিংওয়ের জন্ম (১৮৯৯—১৯৬৪), ওঁর বাবা ছিলেন ডাক্তার। মাছ ধরা, শিকার করা এবং প্রায় সমস্ত রকম খেলাধুলোর ভক্ত ছিলেন তিনি। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে হেমিংওয়ের বাবা প্রায়ই বেরিয়ে পড়তেন গ্রামাঞ্চলে। কখনো পাখি শিকার করতে, কখনো বা মাছ ধরতে। হেমিংওয়ে তাঁর দু'বছর

বয়স থেকেই বাবার মাছ ধরার সঙ্গী হতেন। দু' বছরের শিশু হেমিংওয়ে তাঁর বাবার পাশে ছিপ ধরে বসে আছেন—এমন দৃশ্য অনেকেই দেখেছেন। মাছধরার প্রতি আমরণ হেমিংওয়ে যে একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতেন তার মূলটা এইখানে। এর পরে বলতে হয় শিকারের কথা। ডাক্তার হেমিংওয়ে তাঁর ছেলেকে সাত বছর বয়সের সময় থেকেই বন্দুক ছোঁড়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন এবং দশ বছর বয়সের সময় দেখা গেছে বালক হেমিংওয়ের লক্ষ্য অভ্রান্ত হয়ে গেছে।

স্কুল-পালানো ছেলে বলতে যে বেয়াড়া টাইপটার কথা মনে আসে বাল্যবয়সে হেমিংওয়ে তা' সত্যি ছিলেন না, কিন্তু তবু মাঝে মাঝে স্কুলে আসবার জন্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেও স্কুলে আসতেন না এ কথা সত্যি। নির্দিষ্ট সময়ে ছেলে বাড়ি ফিরে না এলে মায়ের মনে স্বভাবতই অমঙ্গলের আশঙ্কা উঁকিঝুঁকি দিতো, কিন্তু ডাক্তার হেমিংওয়ে ছেলের জন্যে মোটেই দুশ্চিন্তা করতেন না। আগে দেখতেন ছিপ ক'টা ঠিক আছে কি না, তারপর দেখতেন বন্দুকটা যথাস্থানে আছে কি না। বালকের মা হাসপাতাল এবং থানা থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে আসতেন বাড়িতে, কিন্তু বাবা একটু ভেবেচিন্তে কাছাকাছি কোনো জলাশয় বা জঙ্গলে খুঁজতে বেরোতেন ছেলেকে। সঙ্গে নিতেন একটা টর্চ আর পোষা কুকুরটি এবং বলাই বাহুল্য, প্রত্যেক বারই ছেলেকে খুঁজে আনতেন তিনি। শুধু একবার পারেন নি। সেবার হেমিংওয়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন, তখন ওঁর বয়স পনরোর কম। কয়েক সপ্তাহ বাদে অবশ্য নিজেই আবার ফিরে এসেছিলেন।

এমনি ধারা টানা-হেঁচড়ার মধ্যে হেমিংওয়ে তাঁর আঠারো বছর বয়সে স্কুলের পড়াশুনো শেষ করলেন। পড়াশুনোয় খুব ভাল না থাকলেও এবং রীতিমতো 'দুরন্ত ছেলে' হওয়া সত্ত্বেও স্কুলের এক মাস্টারমশাই বরাবরই হেমিংওয়েকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন। তিনি নিজে ছিলেন সাহিত্যানুরাগী, কাজেই ওঁর খুবই ইচ্ছে হতো তাঁর প্রিয় ছাত্রকে সাহিত্যিক হিসেবে দেখতে। কিন্তু হেমিংওয়ে যে সেদিকে মোটেই অনুরাগী নয় এবং ঐ অল্পবয়সেই অতিমাত্রায় পুরুষালী স্বভাবের এটা দেখে ব্যথিত হতেন। ছাত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি একবার প্রকাশ্যে বলেও ছিলেন যে, 'হেমিংওয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে আর যাই হোক সাহিত্যিক তো হ'তে পারবে না, কাজেই ওর সম্বন্ধে আমি আর কোনো বিশেষ উৎসাহবোধ করি না।'

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার (ডাক্তারী পড়বার জন্যে) সব আয়োজন যখন প্রায় সম্পূর্ণ, ঠিক এমনি সময় হেমিংওয়ে বাড়িতে ঘোষণা করলেন যে, ডাক্তারী উনি পড়বেন না, চাকুরী করবেন এবং সে চাকুরীর জোগাড় হয়ে গেছে। কি চাকুরী? না, একটা কাগজের রিপোর্টার। কানসাস শহরের 'স্টার' সংবাদপত্রের রিপোর্টারের কাজটা হেমিংওয়ে নিজেই জোগাড় করে বসলেন। বাবা জানতেন তাঁর ছেলের প্রকৃতি, বাধা দিতে যাওয়া মানে ওকে নিরুদ্দিষ্ট হতে বাধ্য করা। তাই বাধা উনি দিলেন না। বিষণ্ণভাবে সম্মতিই দিলেন। মাস্টারমশায়ের কানেও গেলো কথাটা। মন্তব্য করলেন: 'হুঁ! 'রিপোর্টার হওয়া মানে তো আর সাহিত্যিক হওয়া নয়। দেখো না তোমরা শেষ অবধি আমার কথা ঠিক কিনা।' হেমিংওয়ের বন্ধুবান্ধবেরা তো মহা খুশি। পর পর কয়েকদিন চললো ভোজের পালা। কাজে যোগ দিলেন হেমিংওয়ে। মাস কয়েক কেটে গেলো। আবার অকস্মাৎ একদিন হেমিংওয়েকে বাড়িতে দেখা গেলো। কি ব্যাপার?

সকলের উৎকাণ্ঠিত প্রশ্নের উত্তরে হেমিংওয়ে বললেন যে, 'বিদেশে যাবার আগে একবার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। রিপোর্টারের চাকুরী ছেড়ে দিয়েছি, একটা ভালো চাকুরী পেয়ে গেছি।' কি সে চাকুরীটি? কোনো এডিটরের পোস্ট নিশ্চয়ই? আরে না-না, হেমিংওয়ে বার কয়েক শূন্যে ঘুঁসি ছুঁড়ে, বুকের ছাতিটার পেশী সঞ্চালন করে সগর্বে বললেন, 'ওয়ারফিল্ডে এ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার।' অ্যাঁ? হ্যাঁ। কেউ বিস্মিত হ'লো, কেউ ওঁর মানসিক স্বাভাবিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করলো। মাস্টারমশাই ঈষৎ হাসলেন। ভাবটা যেন, 'এ যে হবে তা জানতুম।' মা-বাবার থমথমে মুখের চেহারাও রুখতে পারলো না হেমিংওয়েকে।

প্রথম মহাযুদ্ধ ও হেমিংওয়ে—আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে সোজা এসে ইয়োরোপে পৌঁছলেন। ওঁর কর্মস্থল ঠিক হ'লো ইতালীর রণাঙ্গন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের দিকের কথা। ইতালী সেবার ছিল মিত্রপক্ষে। ইতালীয় রণাঙ্গনে বিপরীত দিকে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া এবং তুরস্কের বিরাট বাহিনী। হেমিংওয়ে কয়েক সপ্তাহ এ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার হিসেবে আহত সৈন্যদের আনা-নেওয়া করবার পরে নিজের ওপরে বিরক্ত হয়ে উঠলেন। অর্থাৎ নিজের কাজের ওপরে। 'আরে ধ্যেৎ, এ সব কাজ তো মেয়েরাও করতে পারে। কাজের মতো কাজ করা চাই।' সুতরাং এরপর হেমিংওয়ে

সরাসরি ইতালীয় পদাতিক বাহিনীতে নাম লেখালেন। এটা ওঁর উনিশ বছর বয়সের কথা। প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের পর শত্রুব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যাবার গুরুদায়িত্ব ছিলো পদাতিক বাহিনীর ওপর ন্যস্ত। সামরিক ট্যাঙ্ক প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের দিকে বৃটেন আবিষ্কার করেছিল। সংখ্যায় সেগুলির উৎপাদন এতই কম হতো যে, প্রধান রণাঙ্গন অর্থাৎ বেলজিয়ান-ফরাসী সীমান্তেই প্রয়োজনানুরূপ পাঠানো যেতো না। অন্য ক্ষেত্রের তো প্রশ্নই নেই। সুতরাং ইতালীয় পদাতিক বাহিনীকে একমাত্র 'হেলমেট'-এর ওপর নির্ভর করেই এগিয়ে যেতে হতো। কাজেই শত্রুপক্ষের গোলাগুলিতে অল্পবিস্তর হতাহতের সংখ্যা হতো ভয়াবহ। যুদ্ধশেষে দেখা গেল, হেমিংওয়ের সারা শরীরে অসংখ্য ক্ষত। একটি হাঁটুতে বড়ো রকমের অপরারেশন করতে হয়েছিল হাউইটজারের গোলার টুক্‌রো বের করবার জন্যে। মেলাই-চাকিখানা হয়ে গিয়েছিল একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো। সার্জেনরা একখানা প্ল্যাটিনামের মেলাই-চাকি ফিট করে দিয়েছিলেন। সেই অবস্থাতেই, অর্থাৎ প্রায় পঙ্গু অবস্থায়এক বছর পরে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দেহেমিংওয়ে দেশে ফিরে এলেন। যুদ্ধের এই বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই দশ বছর পরে ইতালীর এই পটভূমিকায় হেমিংওয়ে তাঁর যুগান্তকারী উপন্যাস 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' রচনা করেছিলেন।

মাস কয়েক বিশ্রামের পরে দেখা গেল, প্ল্যাটিনাম খণ্ডটি হাঁটুর সঙ্গে বেশ খাপ খেয়েছে। কাজেই পরে আর হাঁটুর জন্যে বেগ পেতে হয় নি হেমিংওয়েকে। তবে খুব দৌড়ানো ওঁর পক্ষে বারণ ছিলো। সুস্থ হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে হেমিংওয়ে আবার একটা রিপোর্টারের চাকুরী জোগাড় করলেন, কানাডার টরেণ্টো শহরের একটা কাগজে। এ কাগজটার নামও ছিল 'স্টার'। টরেণ্টোতে কয়েক সপ্তাহ কাটাবার পরেই কর্তৃপক্ষ ওঁকে পাঠিয়ে দিলেন নিজস্ব রিপোর্টার হিসেবে তুরস্কে। তুরস্কে তখন চলছিল জনগণের মুক্তির সংগ্রাম কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে। বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে মেলামেশার এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হেমিংওয়ে করেছিলেন। এ সময়ে হেমিংওয়ের বয়স ছিল ঠিক বাইশ।

ভাবতে খুব আশ্চর্য লাগে যে, যে ব্যক্তি ভবিষ্যতে তাঁর সাতাশ বছর বয়সে একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে দিকপাল সাহিত্যরথীদের স্বীকৃতিলাভ করবেন, তিনি তাঁর এই বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত সাহিত্য পদবাচ্য

একটি ছত্রও কিছু লেখেন নি বা লেখবার চেষ্টাও করেন নি। না পদ্য, না গদ্য। এই সময় পর্যন্ত হেমিংওয়ে অনেক কিছুই করেছেন—বিস্তর মাছ ধরেছেন ছিপ ফেলে, অনেক পাখি শিকার করেছেন, এক-আধটা বুনো শূয়োরকে গুলিবিদ্ধ করেছেন, যুদ্ধ করেছেন, বেশ কয়েকটা দেশ ঘুরেছেন, পাহাড়ের ঝরণা আর নদ-নদীর জলকল্লোলে কান পেতেছেন, কিন্তু কখনো সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করেন নি।

সাহিত্যসাধনার শুরু—তুরস্ক থেকে মাঝে মাঝে প্যারিসে আসতেন হেমিংওয়ে। এখানেই, শেরউড এণ্ডারসন, এজরা পাউণ্ড এবং গারট্রুড স্টাইনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ওঁর। ওঁদের উৎসাহ এবং প্রেরণাতেই সাহিত্যসৃষ্টির আকাঙ্খা জন্মে হেমিংওয়ের। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে হেমিংওয়ে যখন দেশে ফিরে এলেন তখন মার্কিন সাহিত্যের উদীয়মান লেকখদের তালিকায় প্রথম সারির নাম হেমিংওয়ের। কারণ এরই মধ্যে ওঁর পাঁচখানা বই প্রকাশিত হয়েছিল—'থ্রি স্টোরিজ এণ্ড টেন পোয়েমস' (১৯২৩); 'ইন আওয়ার টাইম' (১৯২৪); 'দি টোরেণ্টস অব স্প্রিং' (১৯২৬); 'দি সান অল্সো রাইজেস' (১৯২৬) এবং 'মেন উইদাউট উইমেন' (১৯২৭)। এর মধ্যে শেষোক্ত বই দু'খানি, অর্থাৎ 'মেন উইদাউট উইমেন' (গল্প) এবং 'সান অলসো রাইজেস' (উপন্যাস) খুব অল্পসময়ের মধ্যে এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে অনেকেই হেমিংওয়ের এই অভাবিত এবং আকস্মিক খ্যাতিকে বায়রনের রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

দেশে ফেরবার কিছুদিন আগেই হেমিংওয়ের পারিবারিক জীবনে একটা পরিবর্তন ঘটে গেলো। কিছুদিন আগে হলো ওঁর প্রথম ছেলের জন্ম আর প্রথম বিবাহ-বিচ্ছেদ। দেশে ফিরে বিয়ে করলেন দ্বিতীয়বার। এ বিয়ের ফলে দু'টি ছেলের জন্ম হ'লো, কিন্তু বিয়ের প্রায় তের বছর বাদে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে—এ ক্ষেত্রেও বিবাহ-বিচ্ছেদ হ'লো এবং তার কিছুদিন বাদেই ওঁর তৃতীয় বিয়ে হ'লো একজন লেখিকা মার্থা গেলহর্নের সঙ্গে। কিন্তু মার্থাও হেমিংওয়েকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পেরেছিলেন বলা যায় না, কারণ এ ক্ষেত্রেও বিচ্ছেদ হ'লো ছয় বছর বাদে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে হেমিংওয়ের চতুর্থ বিয়ে হয়েছিল মেরী ওয়েলস্-এর সঙ্গে।

১৯২৭ থেকে ১৯৪০ এই তেরো বছরে হেমিংওয়ের গল্প, উপন্যাস, নাটক

মিলিয়ে মোট আটখানা বই প্রকাশিত হলো। এ বইগুলি হলো: 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' (১৯২৯); 'ডেথ ইন দি আফটারনুন' (১৯৩২); 'উইনার টেক নাথিং' (গল্প, ১৯৩২); 'গ্রীণ হিলস্ অব আফ্রিকা' (১৯৩৫); 'টু হ্যাভ এণ্ড হ্যাভ নট' (১৯৩৭); 'দি ফিফথ্ কলম' (নাটক, ১৯০৮); 'ফার্স্ট ফরটি মাইল স্টোরিজ' (১৯৩৮) এবং 'ফর হুম দি বেল টোলস' (১৯৪০)।

স্পেন-এর গৃহযুদ্ধ ও হেমিংওয়ে—স্পেনের গৃহযুদ্ধ শুরু হলো ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেলো হেমিংওয়ে স্পেনে আসবার জন্যে ব্যস্ত ; চলে এলেনও। কিন্তু পারিবারিক কারণে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁকে আবার দেশে ফিরে যেতে হলো। কিন্তু এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হেমিংওয়ে স্পেনের এতটা দেখে ফেললেন যে; একখানা আধা-ডকুমেণ্টারী পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র 'দি স্প্যানিশ আর্থ'-এর কমেণ্টারী লিখে দিতে পারলেন। দেশে ফিরে মাস দুয়েকের জন্যে আটকা পড়ে গেলেন হেমিংওয়ে। তারপরেই আবার স্পেনে চলে এলেন। কয়েকটি কাগজের রিপোর্টিং-এর দায়িত্ব নিয়ে হেমিংওয়ে স্পেনে এলেন বটে, কিন্তু মাসে একটার বেশি রিপোর্ট তিনি কখনো পাঠান নি। সেইগুলিই বিভিন্ন কাগজে একই সময়ে ছাপা হতো।

গৃহযুদ্ধে লিপ্ত স্পেনকে দেখে হেমিংওয়ে অবাক হয়ে গেলেন। জীবন এবং সংসারের যতটুকু এযাবৎকাল পর্যন্ত দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল, ওঁর মনে হলো যেন সে সমস্তই আর একবার এক জায়গাতে বেশ গুছিয়ে দেখবার সুযোগ এসে গেছে। রক্ত—রক্ত—শুধুই রক্ত। রক্তের স্রোত—রক্তের নদী—রক্তের সমুদ্র। কেউ এখানে নিরপেক্ষ নয়। কেউ রাজতন্ত্রী—কেউ সমাজতন্ত্রী—কেউ ফ্যাসিস্তপন্থী, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রতিবেশী প্রতিবেশীর সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত, ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে, বাপ-ছেলের বিরুদ্ধে—কে কার বিরুদ্ধে নয়। এক বছরেরও বেশি হেমিংওয়ে নির্ভয়ে সমস্ত দলে মেলামেশা করে বেড়ালেন। প্রখ্যাত সমালোচক লিও গারকো তাঁর 'দি এ্যাংগ্রি ডিকেড'-এ লিখেছেন : 'এই গৃহযুদ্ধটা যেন হেমিংওয়ের ভাব-ধারণার সত্যতা প্রতিপন্ন করবার জন্যেই সংঘটিত হয়েছিল। বিগত পনরো বছর ধরে হেমিংওয়ে যে ধরনের লেখা লিখেছিলেন অর্থাৎ কিনা সর্বদাই দু'টি পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত, সমস্ত জ্ঞাত রকমের দুঃসাহস আর ভীরুতার যুগপৎ পাশাপাশি নিদর্শন—এ সমস্তই এবার চাক্ষুষ দেখবার সুযোগ ঘটলো হেমিংওয়ের।' এ সমস্ত দেখবার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ হেমিংওয়ে রচনা করেছিলেন

একখানি নাটক 'দি ফিপ্‌থ কলম' এবং একখানি যুগান্তকারী উপন্যাস 'ফর হুম দি বেল টোলস'।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও হেমিংওয়ে—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতেই দেখা যায় মার্কিন কথাসাহিত্যের একজন প্রথম শ্রেণীর শক্তিশালী স্রষ্টা হিসেবে হেমিংওয়ে দেশের সর্বত্র স্বকৃতিলাভ করেছেন এবং কয়েকখানা বই, যেমন 'দি সান অলসো রাইজেস', 'মেন উইদাউট উইমেন', 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' এবং 'টু হ্যাভ এণ্ড হ্যাভ নট' লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে এবং এই লেখার উপার্জন থেকেই ফ্লোরিডাতে নিজে একখানা বাড়ি করেছেন। যুদ্ধ শুরু হবার কিছুদিন পরেই হেমিংওয়ে কিউবাতে এসে আর একখানা বাড়ি কিনলেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলে কারণ হিসেবে বলতেন যে কিউবার উপকূলে মাছ ধরার খুব সুবিধে। কিউবাতে বাড়ি কেনবার কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেলো হেমিংওয়ে মাছ ধরার একখানা ছোট্ট লঞ্চও কিনে ফেলেছেন। কয়েকটা মাস চললো উদয়াস্ত মাছ ধরার প্রচেষ্টা। ধরলেনও প্রচুর। চলছিলো এই রকমই। এমন সময় অকস্মাৎ একদিন ছেদ পড়লো এ আনন্দে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সরকারীভাবে যুদ্ধে নেমে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে হেমিংওয়ে নিজের কর্তব্য ঠিক করে ফেললেন। নিজের মাছ ধরা লঞ্চখানা, নাম দিয়েছিলেন তার 'পিলার'—তার একখানি ছবি তুলে নিয়ে কিউবাতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্র-দূতের সঙ্গে দেখা করলেন এবং স্বেচ্ছায় কিউবার উপকূলভাগের শতাধিক মাইলের প্রহরার দায়িত্ব নিতে চাইলেন, জার্মান সাবমেরিনের আকস্মিক আবির্ভাবের প্রতি নজর রাখবার জন্যে। রাষ্ট্রদূত মিঃ ব্র্যাডেন জানতেন হেমিংওয়ের প্রকৃতি; তাই বাধা দিলেন না তাঁকে, রাজী হলেন তাঁর প্রস্তাবে। এরপর দেখা যায় দু'টো বছর হেমিংওয়ে নিরলসভাবে এই কাজই করছেন। হেমিংওয়ে জার্মান সাবমেরিনের গতিবিধি সম্পর্কে নৌবিভাগকে যে সমস্ত সংবাদ পাঠিয়েছিলেন বিভিন্ন সময়ে সেই অনুসারে আক্রমণ চালিয়ে মার্কিন নৌবিভাগের রক্ষী জাহাজগুলি অনেক সময়ই জার্মান সাবমেরিন ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিল।

একটানা চার বছরেরও বেশি অক্ষশক্তির দিক থেকে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চলবার পরে এবার ক্রমশঃ যুদ্ধের মোড় ফিরতে লাগলো। দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলবার আলোচনা যেমন একদিকে শোনা যেতে লাগলো, অন্যদিকে তেমনি

বৃটিশ এবং মার্কিন বোমারুবাহিনী রাতের পর রাত জার্মানীর অভ্যন্তরে চালাতে লাগলো প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ। হেমিংওয়ে এতো সব আকর্ষণের ব্যাপার ফেলে শত্রু সাবমেরিনের প্রত্যাশায় সহস্রাধিক মাইল দূরে বসে থাকবেন তাও কি সম্ভব? 'কোলিয়ার্স'-এর রিপোর্টার হিসেবে চলে এলেন লণ্ডনে। ইয়োরোপীয় ভূখণ্ডে মিত্রবাহিনীর অবতরণের পূর্বেই দেখা গেছে হেমিংওয়ে বৃটিশ রাজকীয় বিমানবাহিনীর বোমারু বিমানে চড়ে শতাধিকবার জার্মানীর অভ্যন্তরে বোমাবর্ষণ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে এসেছেন।

কথা ছিলো যে, ফ্রান্সে অবতরণের পরে হেমিংওয়ে 'কোলিয়ার্সে'র প্রতিনিধি হিসেবে জেনারেল প্যাটনের থার্ড আর্মির সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক জেনারেল প্যাটনকে উনি পছন্দ করতেন না এবং ঘটনাচক্রে দেখা গেলো নরম্যাণ্ডি অবতরণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্যাটনের বাহিনীর সঙ্গে হেমিংওয়ে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছেন এবং সেণ্ট লো-তে (নরম্যাণ্ডির একটি ছোটো শহর) জার্মানদের সঙ্গে যে প্রচণ্ড সংগ্রাম চললো তাতে একসময় হেমিংওয়ে আবিষ্কার করলেন যে আশেপাশে সব নতুন লোক। সকলেই স্বদেশীয় অর্থাৎ আমেরিকান সৈন্য বা অফিসার, এরা থার্ড আর্মির কেউ নয়, এরা ফার্স্ট আর্মির লোকজন। একটু পরেই জানা গেলো ফার্স্ট আর্মির ফোর্থ ইনফ্যাণ্ট্রি ডিভিশনের সঙ্গে মিশে গেছেন হেমিংওয়ে। এঁদের মধ্যে একজন অফিসার ছিলেন, নাম তাঁর কর্নেল ল্যানহাম। হেমিংওয়ে যে শুধুই একজন যোদ্ধা-সাংবাদিক বা সাংবাদিক-যোদ্ধা নন, তিনি যে প্রখ্যাত সাহিত্যিক আর্নেস্ট হেমিংওয়েও বটে. সে কথা সৈন্যবাহিনীর বেশিরভাগ লোকজন বুঝতে না পারলেও কর্নেল ল্যানহাম পারলেন, শেষ পর্যন্ত এই বাহিনীর সঙ্গেই যে হেমিংওয়ে থেকে গিয়েছিলেন তা ল্যানহামেরই আগ্রহের ফলে।

এই বাহিনীর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে শুধু যে সাহিত্যের বা সংবাদ-পত্রের কলমের মালমশলা সংগ্রহ করেছেন তাই নয়, কয়েকমাস বলতে গেলে অবিশ্রান্ত যুদ্ধও করতে হয়েছিল হেমিংওয়েকে। হার্টজেন ফরেস্টের যুদ্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও ইতিহাসে একটি প্রধান ঘটনা। ল্যানহামের রেজিমেণ্ট আঠারো দিন একটানা লড়াই করেছে এখানে ৩২০০ যোদ্ধার একটি বাহিনী নিয়ে, অন্তত দ্বিগুণ সংখ্যক জার্মানদের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে ৩২০০ জনের মধ্যে ২৬০০ জন হতাহত হয়েছিল। ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে চারজন ব্যাটালিয়ান

কমাণ্ডার নিহত হয়েছিল। হেমিংওয়ে নিজেও একাধিকবার আহত হয়েছিলেন। এখানকার যুদ্ধ যখন শেষ হলো অর্থাৎ জয়লাভ হলো তখন দেখা গেলো বাহিনীটির অবশিষ্ট কয়েকশ' সৈন্যের মতো হেমিংওয়েও এগিয়ে চলবার জন্যে উন্মুখ। এই সময় সর্বক্ষণের জন্য রিপোর্টারের কাগজ-পেন্সিল থাকতো হেমিংওয়ের জামার ভেতরের পকেটে। হাতে থাকতো একটা টমিগান। কোমরে গুলির বেল্টের সঙ্গে আর একটি জিনিসও দেখা যেতো হেমিংওয়ের, দুটি বড়ো মদের বোতল সহ একজন জার্মান সৈনিকের একটা বেল্ট। একজন প্রশ্ন করেছিল: 'এ জিনিস কোথায় পেলেন মিস্টার পাপা?'

একটি বোতলের ছিপি খুলে লোকটির শুকনো গলায় কয়েক ফোঁটা ঢেলে দিয়ে হেমিংওয়ে ঈষৎ হেসে বলেছিলেন: 'এগিয়ে চলবার পথে দেখলাম একটা হতভাগ্য জার্মান মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে, নির্ঘাত আমাদেরই কারো গুলিতে মরেছে লোকটা; মনে হলো এ জিনিসগুলি শুধু শুধু নষ্ট হতে দিয়ে লাভ নেই, তাই তার কোমর থেকে খুলে নিজের কোমরে পরে নিয়েছি। তা' বাছা, তোমরা সবাই এদিকে তাকিয়ে অতো ঘন ঘন ঢোক গিলো না বলে দিচ্ছি।'

একদিন ফার্স্ট আর্মির মেজর জেনারেল বারটন একটি সাংবাদিক বৈঠকে বললেন: 'হেমিংওয়ে কখন কোথায় আছেন তা বুঝবার জন্যে আমার ম্যাপ-এ সব সময়েই একটা আলপিন ফোঁড়া থাকে। বর্তমানে আমাদের প্রধান বাহিনী থেকে হেমিংওয়ে প্রায় ষাট মাইল এগিয়ে আছেন এবং সেখানে শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর বাহিনী নিয়ে লড়াই তো করছেনই, উপরন্তু প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় শত্রু সৈন্যের গতিবিধি সম্পর্কে খবরও পাঠাচ্ছেন।'

প্যারিস অধিকার করবার সময় ঠিক হয়েছিল যে একজন ফরাসী সেনাপতির অধীনে একটি ফরাসী সৈন্যদলই প্রথম রাজধানীতে ঢুকবে, তার পেছনে পেছনে যাবে অন্য সব মিত্রবাহিনীগুলি। এই উদ্দেশ্য নিয়েই সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইজেনহাওয়ার তাড়াহুড়ো করে প্রবীণ ফরাসী সেনাপতি জেনারেল লেকলের্ককে একটি সাঁজোয়া বাহিনী গঠন করে দেন। প্যারিস অভিযানের আগে জেনারেল লেকলের্কের অফিসাররা হেমিংওয়ের কাছ থেকে প্যারিসের পথে জার্মান সৈন্যের অবস্থিতি সম্পর্কে বিস্তৃত সংবাদ সংগ্রহ করেন, কর্নেল ব্রুস-এর মতে সেই সংবাদ অনুসারে সৈন্যদল

পরিচালনা করেই জেনারেল লেকলের্ক অতো অল্পায়াসে প্যারিস দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্যারিসের দক্ষিণ সীমায় জেনারেল লেকলের্ক পৌছবার পরে কয়েকজনকে অনুমতি দিলেন নগরীতে প্রবেশ করবার জন্যে। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার রবার্ট কাপা। নগরীতে ঢুকে প্রথমেই যে হোটেল পেলেন ওঁরা ভেবেছিলেন তাতেই ঢুকবেন। কিন্তু হোটেলের প্রবেশপথে রক্ষীকে দেখেই চিনতে পারলেন কাপা, এ ব্যক্তি মিঃ পেলকে, হেমিংওয়ের বিখ্যাত ড্রাইভার।

পেলকেও চিনতে পারলেন কাপাকে। বললেন: 'এসে পড়েছেন, আসুন পাপা বেশ ভালো হোটেলই পেয়ে গেছেন। অনেক মদই ছিলো, তাড়াতাড়ি যান, হয় তো এখনো এক-আধটু পেতে পারেন।' অর্থাৎ কিনা, এ ক্ষেত্রেও সবার আগে হেমিংওয়ে।

সাহসিকতার জন্যে ব্রোঞ্জ স্টার পুরস্কার পেয়েছিলেন হেমিংওয়ে।

রণাঙ্গনের বাস্তব চিত্র—সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪। প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় সেকেণ্ড ফ্রন্টের যুদ্ধ চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। জেনারেল আইজেনহাওয়ারের নেতৃত্বে মিত্রপক্ষের সম্মিলিত বাহিনী ফ্রান্সের বেশির ভাগ মুক্ত করে এবার ঢুকে পড়েছে খাস জার্মানীর ভেতরে। আমেরিকার বিখ্যাত ফার্স্ট আর্মি ডিভিশন একাধিক জায়গায় 'সিগফ্রিড লাইনে'র দুর্গশ্রেণী অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। চতুর্দিকে সর্বক্ষণ গোলাগুলি চলছে তো চলছেই।

একদিন বিকেলবেলা আর্মি হেড কোয়ার্টারে এলেন একজন তরুণ সাংবাদিক। এঁর পেশা ছিলো ছবি আঁকা। যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে এঁকেও খাকি পরতে হয়েছে। কথায় কথায় পাবলিক রিলেশনস অফিসার বললেন: 'জানেন মিঃ গ্রথ একজন বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক বর্তমানে আমাদের কাছাকাছি আছেন। ঠিক এখুনি হয়তো তাঁকে সিগফ্রিড লাইনের আশে-পাশেই পাওয়া যাবে। বলতে গেলে তিনিই আর্মিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন'।

—'তিনি কে?' ব্যগ্রভাবে জানতে চাইলেন শিল্পী। তারপর পাবলিক রিলেশনস অফিসার হেমিংওয়ের নামের শেষ অক্ষর উচ্চারণ করবার আগেই চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললেন: 'বলেন কি? তিনি এখানে?'

—'হ্যাঁ, তিনি এখানে।'

—'আমি তাঁর কতো গল্পের ছবি এঁকেছি। অবশ্য চাক্ষুস দেখিনি কখনো। তবে নাম শুনলে তিনি নিশ্চয় চিনতে পারবেন আমাকে।'

ঠিক হলো রাতের বেলা দু'জনে মিলে যাবেন সাহিত্যিক সন্দর্শনে।

সিগফ্রিড লাইনের পূর্ব সীমা। অন্ধকার রাতের বুক চিরে অবিশ্রান্ত জার্মানদের গোলা এসে পড়ছে এদিকে। তারই মধ্যে একখানা জিপ এসে থামলো একটা বাড়ীর দোরগোড়ায়।

পাবলিক রিলেশনস অফিসারের ইঙ্গিতে শিল্পী অনুসরণ করলেন তাঁকে। দু'জনেই জিপ থেকে নেমে পড়ে চট করে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন।

শিল্পী দেখলেন লম্বা টেবিলটার শেষ প্রান্তে দরজার দিকে মুখ করে বসে আছেন সাহিত্যিক। টেবিলের দু' পাশে আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর লোকজন এবং ফরাসী গেরিলাবাহিনীর যোদ্ধারা ভীড় করে রয়েছে। টেবিলের ওপরে পিস্তল, স্টেনগান, টমিগান এবং আরো অনেক রকমের সমরাস্ত্র। সাহিত্যিকের একেবারে সামনে রয়েছে গোটা কয়েক হাত বোমা আর গোটা কয়েক বোতল।

—'এসো, এসো, নাও; তুমি কি খাবে—কগ্‌ন্যাক, কুমেল না হুইস্কি?' সুরা, যুদ্ধক্ষেত্রে যে বস্তুটির মূল্য অনেকের মতে প্রাণের চাইতেও বেশি সেই জিনিস কিনা সাহিত্যিক বিতরণ করছেন।

ইতোমধ্যে শিল্পী স্বকর্মে নিবিষ্ট হয়েছিলেন। বিভিন্ন লোকের সঙ্গে আলাপরত অবস্থাতেই সাহিত্যিকের একখানা স্কেচ তুলে ফেললেন।

যথাসময়ে শিল্পীর পালা এলো সুরাপানে অংশ নেবার জন্যে। সসম্ভ্রমে শিল্পী সাহিত্যিকের হাত থেকে পানপাত্রটি নিলেন, নিজের পরিচায়টাও দিলেন সেই সময়।

একটু ভেবে নিয়ে সাহিত্যিক বললেন: 'দেখছিলাম কি যেন আঁকছিলে একটু আগে।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার একখানা স্কেচ।'

সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখে তরুণ প্রতিভাকে বাহবা দিলে।

সাহিত্যিক বললেন: 'তোমার হাত খুব ভালো। তবে কি জানো'—গলাটা একটু নামিয়ে বললেন: 'যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা আমার যে সব গল্প তুমি ইলাসট্রেট করেছো সেগুলি কিছুই হয় নি।

অবশ্য সে জন্যে তোমার কোনো দোষ হয়নি। আসল যুদ্ধটা এমনই জিনিস যে তা না দেখলে তার ছবি শুধু কল্পনায় আঁকা যায় না। প্রকৃত যুদ্ধ যদি দেখতে চাও তো থেকে যাও আজকের রাতটা। কাল দেখিয়ে আনবো তোমাকে যুদ্ধ কাকে বলে। ভবিষ্যতে এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে।'

আর্মির হেডকোয়ার্টার থাকে আসল রণাঙ্গন থেকে অনেক পেছনে। সমর-সংবাদদাতারাও সাধারণত হেডকোয়ার্টারের আশে-পাশেই থাকেন, চটপট যাতে খবর সংগ্রহ করা যায় সেই জন্যে। আর্মির সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ কাটালেও তাই শিল্পীর পক্ষে এখন পর্যন্ত আসল যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা কিছুই হয়নি। তাই ঠিক করলেন এ সুযোগটা কাজে লাগাতেই হবে। পাবলিক রিলেশনস অফিসার ফিরে গেলেন নিজের জায়গায়, কিন্তু শিল্পী থেকে গেলেন।

শেষ রাত থেকে শুরু হলো জার্মানদের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ। প্রতি মুহূর্তেই কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো বাড়িটা। শিল্পী আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারছিলেন না। ফাস্ট' আর্মির পদাতিক বাহিনীর খুব বেশি সৈন্য এখন পর্যন্ত রণক্ষেত্রে এসে পৌঁছতে পারেনি। জার্মানরা এটা টের পেয়ে থাকলে নিশ্চয়ই প্রতি-আক্রমণ করেছে বা করবে। সবারই মুখচোখে আতঙ্কের লক্ষণ। বাড়ির সামনের দরজায় এসে শিল্পী দেখলেন সাহিত্যিক তাঁর টমি গানটার ট্রিগারের ওপর আঙুল রেখে পায়চারি করছেন। ঈষৎ হেসে বললেন: 'কি হে ঘুমুতে পারলে না বুঝি? আর একটু পরেই বেরিয়ে পড়বো আমরা।'

সকালের পানাহার শেষ করে শিল্পীকে সঙ্গে করে একটা জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সাহিত্যিক।

আমেরিকান বাহিনীর পদাতিক সৈন্যদল আর তার সঙ্গে সঙ্গে হাল্কা কামানবাহী শকটগুলি প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। যতোটা জিপে যাওয়া যায় ততটুকু গিয়ে নেমে পড়লেন শিল্পী আর সাহিত্যিক। খানিকটা দূর এবার ওঁরা পায়ে হেঁটে এগোলেন। তারপর একটু নুয়ে, আরো একটু। ঝোপঝাড়ের উচ্চতা ক্রমেই কমে আসছে। এবার একেবারে বুকে হেঁটে এগোতে লাগলেন ওঁরা দু'জনে। প্রথমে সাহিত্যিক, তাঁর পেছনে শিল্পী। ঝোপঝাড় অতিক্রম করে এবার একটা এবড়ো-খেবড়ো ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে বুকে হেঁটে এগোতে লাগলেন সন্তর্পণে। শিল্পী সাহিত্যিকের ইশারায়

গন্তব্যস্থানটি দেখলেন—মাঠের প্রায় মাঝখানে একটা 'পিলবক্স'—আমেরিকানদের গোলার আঘাতে একটা দিক প্রায় উড়ে গেছে।

'পিলবক্স'-এর কাছে এসে থামলেন সাহিত্যিক। বললেন—'এসো, এ জায়গাটা কিছুটা নিরাপদ। মনে হয় একটু আগেই জার্মানরা ছেড়ে গেছে। দেখছো না কি রকম কড়া তামাকের গন্ধ আসছে। এবার দেখতে পাবে আজকালকার যুদ্ধ কি জিনিস! আমরা সিগফ্রিড লাইন পেরিয়ে যাবার শেষ সংগ্রাম করছি। ওই যে দেখছো মেটে রঙের ঝোপঝাড়, ওরই মধ্যে জার্মান গোলন্দাজরা লুকিয়ে রয়েছে। আমাদের এখান থেকে ওদের দূরত্ব মনে হয় সাত শ' গজের বেশি নয়······'

কিছুক্ষণ দুদিক নিঃশব্দ। তারপরই শুরু হয়ে গেলো টম-টম, পম-পম। দুদিকের ব্যাটারীই সক্রিয় হয়ে উঠলো। ওদিকে মেটে রঙের ঝোপ থেকে প্রতি মুহূর্তে শত শত গোলা এসে পড়তে লাগলো এদিকে; এদিকের 'পিলবক্স'-এর পেছনের ঝোপ থেকেও অসংখ্য গোলা গিয়ে পড়তে লাগলো মেটে রঙের ঝোপের ওপর। শিল্পী শিউরে উঠতে লাগলেন প্রতি মুহূর্তে। আর সাহিত্যিক পাইপ টানতে টানতে নির্বিকারভাবে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন অগ্নি বলয়ের যাতায়াত। এক সময়ে চারদিকে অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখে হকচকিয়ে উঠলেন সাহিত্যিক। জার্মান পক্ষের ঝোপ ঝাড় অকস্মাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেলো ওদের ব্যাটারী।

—'ভয়-টয় করছে না তো', সাহিত্যিক বললেন: 'এই নাও দেখো যুদ্ধ কাকে বলে।'

বলে, নিজের গলা থেকে খুলেই সাহিত্যিক বাইনোকুলারটা এগিয়ে দিলেন শিল্পীর দিকে। এতক্ষণে জার্মানদের শুকনো ঝোপঝাড়ের আগুন প্রায় পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। শিল্পী বাইনোকুলারটা চোখে লাগিয়ে দেখলেন সারি সারি কামান—সেগুলি জড়িয়ে ধরে রয়েছে শতাধিক জার্মান—সকলেরই দেহ জ্বলছে। বাতাসে একটা বিশ্রী গন্ধ। শিল্পী সরিয়ে নিলেন বাইনোকুলারটা। সাহিত্যিক বললেন: 'বুঝলে, এই হলো যুদ্ধ, ও রকম দৃশ্য আমাদের ঝোপের মধ্যেও দেখা যাবে, তবে কিনা সংখ্যায় কিছু কম। মনে রেখো, এরা সকলেই নিজ নিজ মা-বাবার খুব আদরের ছিল, প্রেয়সীর ছিলো চোখের মণি, আর ছেলে-মেয়েদের কাছে ছিলো

প্রেরণার উৎস। কয়েক মিনিট আগেও এরা প্রত্যেকে নিজেদের সংসারের পক্ষে অপরিহার্য ছিলো। হা হা হা হা হা! এবার তুমি ফিরতে পারো, তবে আমাকে আরো এগোতে হবে···।'

আমেরিকান গোলন্দাজবাহিনীর কামানবাহী শকটগুলি ততক্ষণে মাঠ পেরিয়ে প্রায় ওদিকের রাস্তায় উঠে পড়েছে।

হেমিংওয়ের জীবন অসংখ্য দুঃসাহসিক কাজকর্ম তথা দুর্ঘটনায় ভরা। এ গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো আফ্রিকার অরণ্যের শোভা দেখতে গিয়ে প্লেন ভেঙ্গে পড়ে যাওয়ার দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকের ধারণা হয়েছিল যে হেমিংওয়ে মারা গিয়েছেন, সে কথা মনে করবার সঙ্গত কারণও ছিলো, কিন্তু একাধিক কাগজে বড় অক্ষরে শোকসংবাদ ছাপা হয়ে বেরিয়ে যাবার পরে জানা গেল যে উনি বাস্তবিকই মারা যান নি, তবে সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছেন। এই দুর্ঘটনাটি কিন্তু হেমিংওয়েকে বেশ কিছুদিন কাবু করে ফেলেছিল। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন ওঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হ'লো তখন উনি অসুস্থতার জন্যেই স্টকহলমে যেতে পারেন নি। তার আগের বছর হেমিংওয়ে স্বদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার 'পুলিৎজার প্রাইজ'ও পেয়েছিলেন।

অতি-নাটকীয়তার প্রতি যাঁর এতটা প্রবণতা তাঁর মৃত্যুটাও হয় তো অতি-নাটকীয়ভাবেই আসার প্রয়োজন ছিলো। তাই দেখা যায় হেমিংওয়ে জার্মান-ইতালীয়-অষ্ট্রিয়ান, স্প্যানিশ বা তুর্কী গোলাগুলি, স্পেনের বুনো-ষাঁড়, আফ্রিকার গহন অরণ্যের হিংস্র শ্বাপদকুল—সবাইকে ফাঁকি দিতে পারলেও নিজের বন্দুককে ফাঁকি দিতে পারেন নি। একদিন নিজের বন্দুকের গুলিতেই প্রাণত্যাগ করলেন হেমিংওয়ে; কেউ বলেন এটা নিতান্তই আকস্মিক দুর্ঘটনা, কেউ বলেন আত্মহত্যা।

সাহিত্যসাধনার পরিণত রূপ—জীবনটা যাঁর এতো রোমাঞ্চ আর দুঃসাহসিকতায় ভরা, তাঁর সৃষ্টিও যে অনেক দিক দিয়েই অভিনব হবে, এটা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমরা আগেই জেনেছি হেমিংওয়ে একটু বিলম্বে সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেছিলেন। ওঁর প্রথম বই তিনটি গল্প এবং দশটি কবিতার একটি ছোট্ট পুস্তিকা বলতে গেলে সাধারণের নজরেই আসে নি। এ সময়ে ওঁর বয়স হয়েছিল ঠিক চব্বিশ। অথচ তিন বছর বাদে এই ব্যক্তিকেই দেখা গিয়েছিল সাহিত্যের আসরে সুপরিচিত, লেখক হিসেবে তাঁর শক্তি

সম্বন্ধে সকলে নিঃসন্দেহ। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে হেমিংওয়ে এমন কি লিখলেন এই তিন বছরের মধ্যে? এই তিন বছরে দেখা যায় ওঁর তিনখানা বই বেরিয়েছিল: 'ইন আওয়ার টাইম', 'দি টোরেণ্টস অব স্প্রিং' এবং 'দি সান অলসো রাইজেস'। এর মধ্যে প্রথম দু'খানা বই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো বটে, তবে অনেক পরে! 'দি সান অলসো রাইজেস' দিয়েই হেমিংওয়ে যাকে বলে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন।

দি সান অলসো রাইজেস্—প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে ইয়োরোপীয় গণমানসে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছিলো, বিশেষ করে যুবসমাজে, তারই একখানি খণ্ডচিত্র হেমিংওয়ে এ কাহিনীতে এঁকেছিলেন। মাইক, ব্রেট, কন, জেক, রোমেয়ো এবং মাইকেল—এরা হলো কাহিনীর প্রধান চরিত্র। মাইক একজন সর্বস্বান্ত ইংরেজ, জেক একজন আমেরিকান সাংবাদিক লেখক, কন একটি দুরন্ত প্রকৃতির ইহুদী। এরা সকলেই তরুণী লেডী ব্রেট সম্বন্ধে আগ্রহশীল। যুদ্ধের ফলে যুবক পাচজনের প্রত্যেকেই কম-বেশি পীড়িত যদিও, কিন্তু শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে তারা সকলেই স্বাভাবিক পুরুষ মানুষ। কিন্তু জেক-এর জীবনে একটা শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে নিদারুণভাবে আহত হবার ফলে বর্তমানে ও একেবারেই পুরুষত্বহীন। কাজেই ওর শারীরিক তথা মানসিক যন্ত্রণা কিছুটা ভিন্ন ধরনের। লেডী ব্রেট অতিমাত্রায় যৌনবোধের জন্যে কখনো একে, কখনো বা ওকে চাইলেও আসলে ওর মনটা পড়ে থাকে জেক-এরই কাছে। কিন্তু জেক যে একেবারেই অক্ষম। এই ঘটনাস্রোতে আঘাত করেই হেমিংওয়ে একটি যুগযন্ত্রণাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। যে সমাজ যুদ্ধ বাধিয়ে মানুষকে পঙ্গু করে দেয়, দেহকে করে ফেলে অক্ষম, মনকে টেনে নামায় নোংরার মাঝে, জেকের মুখ দিয়ে হেমিংওয়ে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন সে সমাজব্যবস্থাকে।

সাহিত্য হিসেবে রসোত্তীর্ণ এবং অনেকের মতে হেমিংওয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হিসেবে বিবেচিত হলেও এ বইটার একটা বিশেষ ত্রুটিও আছে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক জেমস টি. ফ্যারেল-এর কথা: 'এ বইয়ের ইয়োরোপ যেন ট্যুরিস্টদের ইয়োরোপ। কাফে, রেস্টুরেণ্ট এবং হোটেলেই বেশিরভাগ সময় চরিত্রগুলিকে দেখা যাচ্ছে। তারা জীবন্ত কিন্তু বাস্তব নয়, মাটির সঙ্গে যোগাযোগ রহিত।'

এরপরে 'মেন উইদাউট উইমেন' গল্পসংগ্রহ এবং উপন্যাস 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' দু'খানা বই-ই হেমিংওয়ের জনপ্রিয়তা আরো বাড়িয়ে দিলো। 'দি সান অলসো রাইজেস'-এর পটভূমিকা যেমন ফ্রান্স এবং কিছুটা স্পেন 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস'-এর পটভূমিকা তেমনি ইতালী। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইতালীর রণাঙ্গনে হেমিংওয়ে যে নিজে যুদ্ধ করেছিলেন সে কথা আমরা আগেই জেনেছি। সেই জন্যেই হেমিংওয়ের চিন্তাধারা বুঝবার জন্যে এ বইখানার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

'দি সান অলসো রাইজেস'-এ আমরা দেখেছি প্রথম মহাযুদ্ধ থেমে যাবার কয়েক বছর পরের অবস্থাটা। আমরা দেখেছি মাইক, জেক, ব্রেট সকলেই যুদ্ধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত, কেউ স্বামী হারিয়েছে, কেউ আশ্রয় হারিয়েছে—কেউ বা অঙ্গহীন হয়েছে। 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস'-এ সেই আসল যুদ্ধটারই একটা খণ্ডচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কাজেই যদিও তিন বছর পরের লেখা, কিন্তু তবু অবস্থাটা ঠিক ঠিক বুঝবার জন্যে 'দি সান অলসো রাইজেস'-এর আগে 'এ ফেয়ারওয়েলস টু আর্মস' পড়লেই ভালো হয়।

এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস—এ উপন্যাসে দেখা যায় নায়ক লেফট্ন্যাণ্ট ফ্রেডারিক হেনরী একবার যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে মিলানের একটা হাসপাতালে আরোগ্যের পথে। যুদ্ধ, সমাজ, জগৎ, সংসার সবকিছু সম্পর্কেই হেনরীর বিরক্তি চরমে এসে পৌঁছেচে—বিশেষ করে এই জন্যে যে ক্যাথারিন নামে যে নার্স টিকে ও ভালোবাসে তার কাছ থেকে ওকে দূরে সরিয়ে দিতে যেন সবাই বদ্ধপরিকর। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এরই মধ্যে ডাক এসেছে, এখুনি আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সংগ্রামের মধ্যে। ক্যাথারিনের সেবা বুঝি আর ভাগ্যে নেই! একটা দ্বন্দ্বপূর্ণ মানসিক অবস্থায় হেনরী আবার যদিও যুদ্ধে যোগদানের জন্যে তৈরি হলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর পারলো না। ওর সেনাদল সে সময়ে পশ্চাদপসরণে ব্যস্ত, এমনি একটা সময়ে ও গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়লো। ক্যাথারিনের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি ক্রমে গভীর ভালোবাসার রূপ নিলো, সন্তানসম্ভবা হলো ক্যাথারিন, কিন্তু তবু হেনরীর জীবন শেষ পর্যন্ত শূন্যতায় ভরে গেলো, কারণ প্রসবের সময়েই ক্যাথারিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

ফর হুম দি বেল টোলস্—এ উপন্যাসটির পটভূমিকা গৃহযুদ্ধে প্রজ্বলন্ত স্পেন। যুদ্ধ আর যুদ্ধ—খণ্ডযুদ্ধের এবার একেবারে হুড়োহুড়ি। মৃত্যু-বিলাসী

হেমিংওয়ে মৃত্যুকে আগেই নানাভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন, সুযোগ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এবার গৃহযুদ্ধের সময় স্পেনে এসে হেমিংওয়ে যা দেখলেন সে এক সম্পূর্ণ নতুন জিনিষ। এবার আদর্শের জন্যে মানুষ মরছে এখানে। বুল-ফাইটিং-এর এনজয়মেণ্ট, স্পোর্ট বা প্লেজার নয়; কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপারও নয়—এ একটা এ্যাবসট্রাক্ট জিনিসের জন্যে মৃত্যু।

হেমিংওয়ের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ এই উপন্যাসের নায়ক রবার্ট জর্ডান একজন আমেরিকান কলেজ ইন্সট্রাক্টর। স্পেন এসেছে ও একজন লয়্যালিস্ট গরিলা হিসেবে যুদ্ধ করতে। ওর প্রণয়িনী জিজ্ঞাসা করছে—'তুমি কি কমিউনিষ্ট?'

জর্ডান বলে—'না, আমি কমিউনিষ্ট নই, আমি ফ্যাসি-বিরোধী।' হেমিংওয়ের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের মধ্যেই আমরা পেতে পারি। জর্ডান বলছে—'আমাদের জিততে হবেই, এখানে যদি আমরা জিততে পারি, তা'লে সর্বত্রই আমরা জিতবো। পৃথিবীটা সত্যি বড়ো সুন্দর, এর জন্যে নিশ্চয়ই যুদ্ধ করা যায়, এ পৃথিবী আমি ছেড়ে যেতে চাই না।'

জর্ডানের অভিজ্ঞতা মারফত স্পেনের লোকজন সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা হয় তা সত্যি আমাদের অবাক করে দেয়: স্পেনের কাউকে কখনো বিশ্বাস করো না। তারা তোমার বিরুদ্ধেও শত্রুতা করতে পারে। শুধু তোমার বিরুদ্ধেই নয়, যে-কোনো লোকের বিরুদ্ধেই তারা লাগতে পারে; আর অন্য কাউকে না পেলে তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই লাগে। স্পেনের তিনজন মানুষ এক জায়গায় জড়ো হলে দেখবে কালবিলম্ব না করে দু'জন মিলে তৃতীয়জনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে; তারপর দেখা যাবে তারা দু'জনে পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছে।

চূড়ান্ত দুঃসাহসিকতা আর নিদারুণ কাপুরুষতা, মানুষের মনের স্বর্গীয় আর নারকীয় দিক—এ সব কিছুই এ উপন্যাসে পাশাপাশি চিত্রিত হয়েছে।

'স্পেনের মানুষের চাইতে অধিকতর সুন্দর মানুষ পৃথিবীর আর কোন দেশেই নাই, এদের মতো হীন মানুষও আর হতে পারে না। যেমনি অপরিসীম এদের দয়া-মায়া তেমনি সীমাহীন এদের নিষ্ঠুরতা।'

এই রকম কঠোর ভাষাতেই হেমিংওয়ে এ উপন্যাসের বহু জায়গাতে স্পেনদেশবাসীদের সমালোচনা করেছেন। এই রকম একটি জনসমষ্টির জন্যে প্রাণ দিতে এসে তবে কি জর্ডান অনুতপ্ত? না, তাও নয়। কারণ এই

মহা যুদ্ধে সে বলতে গেলে না এসে পারে নি বলেই এসেছে। কারণ আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় তার নিজের ঠাকুরদাও যে লড়াই করেছিল।

যাই হোক নানা ভালোমন্দ দিক থাকা সত্ত্বেও 'ফর হুম দি বেল টোলস' যে হেমিংওয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এ বিষয়ে সকলেই একমত। গরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে এ বইখানাতে যে চিত্রগুলি এঁকেছেন লেখক তা সাহিত্যে অতুলনীয় বলে সর্বত্র স্বীকৃত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেখা গেছে বৃটিশ এবং মার্কিন বাহিনী ছাড়া ফরাসী এবং রুশ সৈন্যবাহিনীও এ বইয়ের অনুবাদ গরিলা যুদ্ধের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহার করছে।

এর পরেই যে উপন্যাসের কথা বলতে হয় আকারে খুবই ছোটো কিন্তু গুরুত্বে হেমিংওয়ের সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। এ হলো 'দি ওল্ডম্যান এণ্ড দি সী'—একটি বুড়ো জেলের কাহিনী।

দি ওল্ড ম্যান এণ্ড দি সী—১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যা Esquire পত্রিকায় হেমিংওয়ে জেলেদের জীবন ও মাছ ধরার আকর্ষণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। অনেক পরে লেখা বুড়ো জেলের কাহিনীর আভাস পাওয়া গিয়েছিল এই প্রবন্ধেই। গভীর সমুদ্রে যারা দিনের পর দিন মাছ ধরতে যায় তারা কি শুধু মাছের লোভেই অতোটা বিপদের ঝুঁকি নেয়? এই বিপদের মধ্যে গিয়ে যে আর্থিক লাভ হয় তার চাইতে অনেক কম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কি স্থলে থেকে যথেষ্ট উপার্জন করা যায় না? নিশ্চয়ই যায়। তবু কেন এক শ্রেণীর মানুষ দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এবং বংশ পরম্পরা করে চলেছে ঐ কাজ? হেমিংওয়ে বলেন যে গভীর সমুদ্রের একটা আকর্ষণ আছে—সাগরের সেই মায়া যে একবার অনুভব করতে পেরেছে তার হৃদয়গ্রন্থীতে, তাকে যে সাগরে যেতে হবেই। কেউ তাকে রুখতে পারবে না। সীমাহীন অতল বারিধির নীলিমা তাকে যে আচ্ছন্ন করে রাখে সর্বক্ষণ।

এ উপন্যাসের নায়ক বুড়ো জেলে সান্টিয়াগো কিউবার লোক। নেশা মধ্যে বলতে গেলে তার একটাই, সে হ'লো বেসবল সম্বন্ধে পড়াশুনো করা। মাঝে মাঝে অতীত জীবনের কথা মনে পড়ে সান্টিয়াগোর। মনে পড়ে কবে এক সময় সেই প্রথম যৌবনে আফ্রিকার উপকূলে দলে দলে সিংহদের খেলে বেড়াতে দেখেছিলো। জেলে হিসেবে সান্টিয়াগোর এককালে প্রচুর নামডাক ছিলো। এখনো সে দক্ষতার যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাতে

অনেকের ঈর্ষার সৃষ্টি হয়। হওয়াই স্বাভাবিক। সীমাহীন সাগরের মতোই সীমাহীন তার সাহস আর ধৈর্য। কারণ বর্তমানে দেখা যাচ্ছে পর পর চুরাশী দিন সে তার প্রিয় ছোট্ট মাছধরা নৌকাখানি নিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরবার আশায় আপ্রাণ চেষ্টা করছে। দিনের পর দিন বঁড়শি ফেলে অপেক্ষা করছে। এতদিন স্থানীয় একটি জেল-পরিবারের কিশোর ম্যানেলিনও ভেসে বেড়িয়েছে সান্টিয়াগোর সঙ্গে ওকে সাহায্য করবার জন্য। কিন্তু আজ পঁচাশী দিনের দিন সে ত্যাগ করল ওকে, চলে গেছে অন্য একটা নৌকোতে—যে নৌকোতে মাঝে মাঝেই ধরা পড়ছে দু' একটা মাছ। কাজেই আজ বিশাল সমুদ্রে সান্টিয়াগো একাই বেরিয়ে পড়েছে। কোন্ জায়গায় মাছ সব সময়েই কিছু না কিছু পাবার সম্ভাবনা থাকে তা সান্টিয়াগোর জানা আছে। একাই সে এসে পড়লো গভীর সমুদ্রের সেই রকম একটা জায়গাতে। অল্প কিছুক্ষণ সময় কেটে যাবার পরেই মনে হলো যেন সুতোটা ভারী হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ, সত্যি তাই, খুবই ভারী। মনে হয় একটা গোটা পাহাড়ের গায়ে বঁড়শিটা গেঁথে গেছে। সে পাহাড়কে নড়াবার ক্ষমতা কারো নেই, তার টানেই এগোতে হবে। বঁড়শিতে গাঁথা অতিকায় মাছটা টেনে নিয়ে চললো সান্টিয়াগোর নৌকা। মাঝে মাঝে জলের গভীর থেকে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ কানে এসে বাজতে লাগলো। সেদিন, সে রাত, তার পরের দিন এবং পরের রাত—মোট আটচল্লিশ ঘণ্টা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে বিরাট মাছটার সঙ্গে সান্টিয়াগো চালিয়ে যেতে লাগলো তার সংগ্রাম। সাগরের নোনা জল আর কাঁচা মাছ, এই তার খাদ্য এবং পানীয়। সেই যে সুতো ধরেছে শক্ত করে, তা আর ছাড়বার কথাও ভাবে না সে। এদিকে হাতে সুতো বসে গিয়ে রক্ত ঝরছে। সান্টিয়াগো এ বয়সে এই পরিশ্রম, অনাহার, অনিদ্রা যেন আর সইতে পারছে না। কিন্তু তবু দেখা যায় সে সয়ে চলেছে। কারণ সমস্ত রকম মাছের নাড়ী-নক্ষত্র তার জানা। সে জানে একটা মাছ শুধু মাছই, তার বেশি কিছু নয়, এক সময় সে হার মানবেই। কিন্তু মানুষ? মানুষ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, কিন্তু কখনোই পরাজিত হতে পারে না। সান্টিয়াগোও হার মানবে না।

এর পর দেখা গেলো হাতের সুতো (দড়ি) যেন একটু একটু করে ঢিল হচ্ছে। হ্যাঁ হচ্ছে। জলের তলায় যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। এমনি একটা আলোড়ন তুলে মাছটা মাথা জাগালো। সান্টিয়াগো তার সুদীর্ঘ

জীবনের অভিজ্ঞতায় কখনো এত বড়ো মার্লিন মাছ চাক্ষুষ দেখে নি। তাই অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। লম্বায় আঠারো ফুট মাছটাকে হার্পুন বিদ্ধ করে তার নৌকোর পাশে লাগিয়ে তীরের দিকে এগোতে লাগলো সান্টিয়াগো। এই একটা মাছেই কয়েক মাসের খরচ চলে যাবে মনে হতে ওর মনটা এতো কষ্টের মধ্যেও খুশিতে ভরে ওঠে। কিন্তু এ আনন্দ ক্ষণিকের। সব আনন্দই স্বল্পস্থায়ী। ক্রমে দেখা যেতে লাগলো একটি একটি করে শার্ক মাছের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে সান্টিয়াগোর মাছটার চার পাশে। শার্ক মাছগুলির যেমন শক্তি প্রচণ্ড তেমনি প্রকৃতিটাও হিংস্র। প্রথম শার্কটাকে সান্টিয়াগো মেরে ফেললো। কিন্তু সেই সঙ্গে তার হার্পুনটাও হাতছাড়া হয়ে গেল। দ্বিতীয়টাকে মারলো হাতছুরিখানা ছুঁড়ে—এমনিভাবেই চলতে লাগলো রোমহর্ষক সংগ্রাম। পরে এক সময় দেখা গেল সান্টিয়াগো একেবারেই নিরস্ত্র হয়ে পড়েছে। এদিকে শেষপর্যন্ত কূলেও এসে ঠেকলো তরী। কিন্তু মাছটা? সান্টিয়াগো দেখলো আঠারো ফুট লম্বা মার্লিনের কঙ্কালটা লেগে আছে তার নৌকোর গায়ে। কিন্তু তবু হতাশ হলো না ও। সোজা নিজের কুটীরে গিয়ে শুয়ে পড়লো, ঠিক করে নিল মনে মনে যে এবার কোন্ দিকে যাবে মাছ ধরতে, তারপর ঘুমিয়ে পড়লো। গভীর নিদ্রায় হারিয়ে গেল। যেন কিছুই ক্ষতি হয় নি ওর।

হেমিংওয়ের নায়কদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এমনিধারা। তারা মরছে কিন্তু দমছে না, মুইছে না; ঠিক যেন হেমিংওয়ে স্বয়ং। ওরা প্রত্যেকেই যেন একটি সহজাত প্রকৃতির তাগিদেই জানে যে মানুষ মাত্রেই ধ্বংস হয় এবং হবে কিন্তু মানুষ কখনো পরাজিত হতে পারে না। পরাজয় সে মানবে না।

দি সান অলসো রাইজেস-এ বুলফাইটিং-এর প্রথম যে-চিত্র দেখা গেলো তারপর থেকেই তার পুনরাবৃত্তি আরো অনেক লেখায় বহুবার বহুভাবে চিত্রিত হবার পরে এক শ্রেণীর সমালোচক বলতে আরম্ভ করেছিলেন যে—হেমিংওয়ে? হেমিংওয়ে লেখেন মন্দ নয়, তবে ওতো 'বুলফাইটিং'-এর লেখা! এবার সান্টিয়াগোর কাহিনী পড়বার পরে কিন্তু তাঁরাও স্তব্ধ হয়ে গেলেন—ফুল ছোঁড়াছুড়ি নেই, গীটার নেই, মদের ফোয়ারাও শুকিয়ে গেছে, অকারণ গুলিগোলার দুমদাম আওয়াজ নেই, বিশাল সমুদ্রের অগাধ নীলিমার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো একটি মহান্ চরিত্র। মানবচরিত্র। সে যে অজেয়। বিরূপ সমালোচকেরাও স্তব্ধ হলেন।

হেমিংওয়ে ছোটো গল্পও কম লেখেন নি। সব মিলিয়ে একশ'র মতো হবে। এবং তার মধ্যে বেশির ভাগই রসোত্তীর্ণ। কয়েকটি, যেমন 'ইণ্ডিয়ান ক্যাম্প,' 'দি আনডিফিটেড,' 'দি কিলারস,' 'স্নোজ অব কিলিমানজারো' প্রভৃতি গল্প ওপরের চারখানা উপন্যাসের মতোই বিশ্ব-সাহিত্যে স্থায়ী-সংযোজন।

জন ষ্টাইনবেক

পনরো কি কুড়ি বছর আগে খাস আমেরিকায় যাঁরা ঘোরতর ষ্টাইনবেক বিরোধী ছিলেন, আজকের দিনে দেখা যায় তাঁদের বেশির ভাগেরই সুর শুধু নরম হয়নি, তাঁরা রীতিমতো ষ্টাইনবেক-ভক্ত হয়ে উঠেছেন। এটা একটা তাজ্জব ব্যাপার নিশ্চয়ই। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এটা হয়েছে এবং ষ্টাইনবেক-এর তরফ থেকে কোনো রকম প্রোপাগাণ্ডা না হওয়া সত্ত্বেও হয়েছে। এটা যে সম্ভব হয়েছে তার একমাত্র কারণ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ পাঠক এবং সমালোচকের মনে জীবন সম্পর্কে নব-লব্ধ অভিজ্ঞতার চাপ। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে এই যে পরিবর্তন এটা অনিবার্য ভাবেই ঘটেছে, এ ছাড়া আর কিছু হতে পারতো না। লেখক হিসেবে এইখানেই ষ্টাইনবেকের শ্রেষ্ঠত্ব যে কালের ঝড়-ঝাপটা সামলেও তিনি শুধু টিকে আছেন তাই নয়, পাঠক সাধারণের রুচিতে তিনি বেশ একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন।

লেখক হিসেবে ষ্টাইনবেককে বিভিন্ন সময়ে যে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা' ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এতো মিথ্যে, এতো সুপরিকল্পিত বিরোধিতা এবং অপ্রীতিকর পরিবেশে বোধ হয় অনেকে লেখাই ছেড়ে দিতেন। কিম্বা, অন্ততঃ পক্ষে নিজের বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলে এবং আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে স্রোতের দিকে গা এলিয়ে দিতেন। কিন্তু ষ্টাইনবেক এ সমস্ত কিছুই করলেন না। মানুষের চিন্তার দৈন্য দেখে দুঃখিত হলেন, ব্যথিত হলেন, কিন্তু দমলেন না। এক সময় শোনা গেলো অনেকে বলছেন, ষ্টাইনবেক একজন পাকা কম্যুনিষ্ট, আর কম্যুনিষ্টরা বলতে লাগলেন যে ভদ্রলোক শোধনবাদী। আবার আর এক সময় (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি) শোনা গেলো একদল বলছেন যে ষ্টাইনবেক নাৎসী-দরদী! কী ভয়ঙ্কর অবস্থা! যে সময় দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ বিদেশের মাটিতে নাৎসীদের উৎখাত করবার জন্যে সর্বস্ব পণ করে লড়ছে ঠিক সেই সময় নাৎসী-দরদী আখ্যা লাভ করাটা নিতান্তই বেদনাদায়ক। কিন্তু এ অবস্থা থেকে নাৎসীরাই যা হ'ক রক্ষা করলেন ষ্টাইনবেককে। কারণ ওঁরা বলতে আরম্ভ করলেন যে—'ষ্টাইনবেক লোকটা একজন খাঁটি ইহুদী।' ষ্টাইনবেক যা হ'ক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যে এর পর আর যাই হ'ক নাৎসী-

দরদী এ কথা কেউ বলবে না। কারণ, একজন ইহুদীর পক্ষে কোনো প্রকারেই নাৎসী-দরদী হওয়া সম্ভব নয়। বলাই বাহুল্য, ষ্টাইনবেক মোটেই ইহুদী নন।

ষ্টাইনবেক তা'হ'লে কি? নিছক একজন কাহিনীকার? মোটেই তা' নয়। ওঁর যে কোনো দু'খানা উপন্যাস পাঠ করলেই পাঠক বুঝতে পারবেন যে ষ্টাইনবেক জীবনে একটা দৃঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে চলেন এবং কাহিনী ছাড়াও আরো অনেক কিছুই থাকে ওঁর রচনায়, তা সে উপন্যাসই হ'ক আর গল্পই হ'ক। সাধারণ লেখকদের মতো প্রেম বা প্রেম-কেন্দ্রিক মানসিক জটিলতার বিশদ বিশ্লেষণের মধ্যে ষ্টাইনবেক তাঁর কোনো কাহিনীই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। ধর্ম, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, নৃতত্ত্ব, সমজতত্ত্ব—অনেক সমস্যাই অধিকার করে আছে তাঁর গল্প এবং উপন্যাসের বেশির ভাগ পৃষ্ঠা। এবং এদিক থেকে ভেবে দেখলে মনে হয়, এ যুগের অনেক লেখকের চাইতেই ষ্টাইনবেক ব্যক্তি এবং সমাজের প্রতি নিজের দায়িত্ব পালনে অধিকতর তৎপর।

প্রথম জীবন—জন ষ্টাইনবেকের (জন্ম ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০২) বাবা ছিলেন সাধারণ শিক্ষিত মানুষ। সামান্য সরকারী চাকুরী করতেন, মা ছিলেন স্কুলের শিক্ষিকা। ষ্টাইনবেকের পিতৃকুল এসেছিলেন জার্মানী থেকে এবং মাতৃকুল আয়র্লণ্ড থেকে। আমেরিকার নানা জায়গা ঘুরবার পর ষ্টাইনবেক পরিবার ক্যালিফর্নিয়ারই স্যালিন্যাস-এ এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। ষ্টাইনবেকের জন্ম এই স্যালিন্যাসেই। ষ্টাইনবেক তাঁর স্কুলের পড়াশুনোও শেষ করলেন এইখানেই। স্কুলের বাঁধাধরা পড়াশুনো বা কোনো দিকেই বালক ষ্টাইনবেকের মধ্যে তেমন কোনো বিশিষ্টতা কারো চোখে পড়েনি। তবে জলজীব সম্পর্কে ওঁর কিছুটা আগ্রহের কথা অনেক মাষ্টার মশায় বলতেন।

স্কুলের পড়া শেষ করে দেখা গেলো ষ্টাইনবেক ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে উনি কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হননি বা পরীক্ষাও দেননি। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি আদায় করে ষ্টাইনবেক মোট চার বছর প্রাণি-বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনলেন। বিশেষ করে সামুদ্রিক প্রাণি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে। সামুদ্রিক জীবনের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করবার জন্যে কিশোর এবং যুবক ষ্টাইনবেককে অনেকদিন সমুদ্রতীরে কাটাতে হয়েছে।

স্কুল ছাড়বার পর একদিকে যেমন প্রাণি-বিজ্ঞান পড়তে লাগলেন ষ্টাইনবেক আর একদিকে শুরু হলো কাজকর্মের চেষ্টা। পর পর সাত রকমের কাজের চেষ্টা করেছিলেন উনি, কিন্তু কোনোটাতেই মন বসলো না। অযোগ্যতার দায়ে চাকুরীও গেলো একাধিকবার। এক এক করে বলা যাক। প্রথমেই নিউ ইয়র্কের একটি সংবাদপত্রের রিপোর্টারের চাকুরী নিলেন ষ্টাইনবেক। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এ চাকুরীটা গেলো। কাগজের কর্তৃপক্ষের অভিযোগ : 'তোমার কাজ তথ্য সংগ্রহ করা এবং সরবরাহ করা, কিন্তু তা' না করে তুমি ক্রমাগতই বিভিন্ন ব্যক্তি এবং ঘটনার উপর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেছো।' ষ্টাইনবেক চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না কাগজের মালিককে খুশী করতে। এর পরেই এক বিখ্যাত স্থপতির শিক্ষানবীশ হয়ে গেলেন ষ্টাইনবেক। এ কাজটাও মাস কয়েক করবার পর ছেড়ে দিলেন উনি। এর পর একটা বছর কাটলো দু' রকম কাজে—একজন শিল্পীর শিক্ষানবিশী এবং ছোট একটি প্রতিষ্ঠানে কেমিষ্টের সহকারীর কাজ।

পর পর এতোগুলি কাজে ব্যর্থতার জন্যে যুবক ষ্টাইনবেক এবার রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়লেন নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। আমেরিকা একটা এমন দেশ যেখানে মানুষের জন্যে জীবিকার নানা পথ খোলা রয়েছে। কিন্তু সাধারণত দেখা যায়, অধিকাংশ ছেলেরাই স্কুলের পড়া কিছুদূর এগোবার পরেই ভবিষ্যৎ জীবিকার ব্যাপারে নিজেকে তৈরী করতে আরম্ভ করেছে। বলাই বাহুল্য, ওদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাটাও এ কাজের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক। কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্কুলের পড়া শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো ছেলের পেশা কি হবে বা হতে পারে, সে বিষয়ে অভিভাবকদের ভাবতে হয় না। সমস্যাটা দেখা দেয় কাজ জোগাড় করবার ব্যাপারে। একটা কাজ জোগাড় করাই যেখানে সমস্যা, সেখানে পর পর এতগুলি কাজ জোগাড় হ'লো অথচ কোথায়ও টিঁকে থাকতে পারলেন না ষ্টাইনবেক, এটা দেখে ওঁর আত্মীয়-স্বজনেরাও বেশ একটু চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। বেশিদিন অবশ্য বেকার থাকতে হলো না ষ্টাইনবেককে। কিছুদিনের মধ্যে আর একটা চাকুরী জোগাড় হয়ে গেলো। 'লেক তাহো এষ্টেট' নামে বিরাট একটা সম্পত্তির কেয়ারটেকারের চাকুরী জুটে গেলো। এটা হ'লো ষ্টাইনবেকের পঞ্চম চাকুরী। এর পরে আরো দু'টো চাকুরী করলেন উনি। একটা হ'লো

সার্ভেয়ারের কাজ আর অপরটা ফলবাগানের তদারকী। সাহিত্যচর্চা পেশা করে নেবার আগে এতো বিভিন্ন রকমের কাজ করতে হয়েছিল ষ্টাইনবেককে।

সাহিত্যসাধনার শুরু—কোন্ এক মহাপুরুষ যেন বলে গেছেন যে প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাই মূল্যবান, প্রশ্নটা হ'চ্ছে কে কার অভিজ্ঞতাকে কিভাবে কাজে লাগাবে। কথাটা যে কতো সত্যি ষ্টাইনবেকের মতো তা বোধ হয় অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেন না। স্কুল ম্যাগাজিনেও অবশ্য একাধিক রচনা বেরিয়েছিল ষ্টাইনবেকের, কিন্তু সে কিছুই নয়। সাহিত্যিক হবার কোনো বাসনা বা দুঃসাহস সে সময় নিশ্চয়ই ছিল না ওঁর। কিন্তু পর পর চারটে চাকুরী চলে যাবার পরে এষ্টেটের কোয়ারটেকারের চাকুরীটা জোগাড় হ'তে ষ্টাইনবেক যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কারণ, এ চাকুরীতে প্রচুর অবসর আর দ্বিতীয়ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঠোকাঠুকির সম্ভাবনা অনেকটা কমে গেলো। তাঁরা চাইছিলেন একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী, এ ব্যাপারে কয়েকদিনের মধ্যেই ষ্টাইনবেক তাঁর মালিকদের আস্থাভাজন হয়ে উঠলেন। কেমিষ্টের চাকুরীটা করবার সময়ই মাঝে মাঝে লেখার কথা মনে হয়েছে ষ্টাইনবেকের। কিন্তু সে সময়ে সাহিত্যচর্চা করবার মতো ফুরসুৎ ছিল না ওঁর। এষ্টেটের কেয়ার-টেকারের চাকুরীতে ঢুকবার পর উনি এবার লেখা আরম্ভ করলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে। এ সময়ে ষ্টাইনবেকের বয়স ছিলো চব্বিশ পঁচিশ বছর। লেখা আরম্ভ করে উনি দেখলেন যে পূর্ব ব্যর্থতাগুলির মধ্যে অকল্পনীয় সম্ভাবনা রয়েছে। ঐ সমস্ত কাজকর্মের সময় আমেরিকার সাধারণ মানুষের প্রায় প্রতিটি স্তরের সঙ্গেই কম বেশি পরিচয় ঘটেছিল ওঁর। এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন ষ্টাইনবেক। পর পর অনেকগুলি ছোটো গল্প এবং দু'খানা উপন্যাস রচনা করলেন উনি। ওঁর প্রথম উপন্যাস "কাপ অব গোল্ড" (১৯২৯) যখন প্রকাশিত হ'লো তখন ষ্টাইনবেকের বয়স সাতাশ। তিন বছর পরে ছোটো গল্পগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো: "দি প্যাসচিওরস অব হেভেন"। এর পরের বছর বেরুলো ষ্টাইনবেকের দ্বিতীয় উপন্যাস: "টু এ গড আননোন"। এই তিনখানা বইতেই ষ্টাইনবেকের বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া গেলেও, বিক্রি বিশেষ হলো না, কাজেই প্রকাশের মোটারকমের লোকসান হয়ে গেলো।

পাঠক, সমালোচক বা প্রকাশক, কারো দিক থেকেই কিছুমাত্র উৎসাহজনক সাড়াশব্দ না শোনা গেলেও ষ্টাইনবেক পূর্ণোদ্যমে লিখে যেতে

লাগলেন। ভেতরে ভেতরে একটা আশ্চর্য রকমের শক্তি অনুভব করতে লাগলেন উনি। ওঁর মনে হ'লো, যে সমস্ত চিন্তা মনে আসছে একদিন না একদিন মানুষের তা নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। কাজেই অবিশ্রান্তভাবে কলম চালাতে লাগলেন ষ্টাইনবেক।

নিজের শক্তি সামর্থ্যের ওপর এই যে একটা আপাতঃদৃষ্টিতে অহেতুক আস্থা এর পেছনে অবশ্য অন্য একটা কারণও ছিলো। প্রথম বইখানা প্রকাশিত হবার কিছুদিন আগে থেকেই ষ্টাইনবেক একটি মেয়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন। মেয়েটির নাম ক্যারল। 'কাপ অব গোল্ড' প্রকাশিত হবার পরের বছর ক্যারলকেই বিয়ে করলেন ষ্টাইনবেক। ষ্টাইনবেকের জীবনে ক্যারলের প্রভাব এক কথায় অসামান্য। সমস্ত দিকে ব্যর্থতা যখন ওঁকে ঘিরে ধরেছিল—অনশন, অর্ধাশন যে সময় ওঁর প্রত্যহের সঙ্গী, সেই সময়ে এই তরুণী বান্ধবী রূপে, স্ত্রী রূপে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তরুণ ষ্টাইনবেককে। শুধু বাঁচিয়ে রাখেননি, নিজের শক্তির ওপর আস্থা রাখতে, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে এবং সংগ্রাম করতে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। তাই দেখা যায়, অনেক আশা ভরসা নিয়ে পর পর তিনখানা বই লিখে ব্যর্থতা সত্ত্বেও ষ্টাইনবেক সুখী। ব্যক্তিগত জীবনে সুখী। ক্যারলকে নিয়ে সুখী। নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী কিছু যে লিখতে পেরেছেন, সেজন্য সুখী।

কাপ অব গোল্ড—ষ্টাইনবেকের প্রথম উপন্যাসের প্রধান চরিত্রটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। সপ্তদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ বোম্বেটে হেনরী মরগ্যান-এর জীবন নিয়ে এ উপন্যাস রচিত। প্রচুর হানাহানি-মারামারি-কাটাকাটি লুঠতরাজ এ উপন্যাসের পাতায় পাতায় দেখা যায়। পরবর্তীকালে ষ্টাইনবেকের একাধিক লেখায় নরহত্যার ব্যাপার দেখা গেছে তা ঠিক, কিন্তু এ ধরনের নয়। লেখক হিসাবে যে বিশিষ্টতার জন্য ষ্টাইনবেক স্বনামধন্য হয়েছেন তার কোন লক্ষণই ওঁর এই প্রথম উপন্যাসে দেখা যাবে না। হেনরী মরগ্যানের কমবেশী-জানা জীবন কাহিনীর সঙ্গে অবশ্য একটি নারীর জীবন জড়িত হয়ে আছে। ষ্টাইনবেকের লেখায় এই নারীর চরিত্রটি স্পষ্টতর হয়েছে মাত্র, তা' ছাড়া আর কিছু নয়। হেনরী তার দস্যুপনা দিয়ে ইসোবেলকে অভিভূত করে রাখতে চায়। ও বলে—'দেখো, এই পৃথিবীটা আমাকে শেষ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর। অন্ধের মতো কিছু দেখবার শক্তি নেই, মস্তিষ্কহীনের মতো কিছু ভাববে না, হৃদয়হীনের মতো

কিছু অনুভব করবার বালাই নেই, আছে শুধু ঈর্ষা আর ঘৃণা, আর একটা বিশ্রী কৌতূহল, কোত্থেকে আমার টাকা আসছে, কোত্থেকে আসছে আমার সম্পদ তাই নিয়ে একটা বিরক্তি ঘটানো। তাই বলছিলাম, বুঝলে, একটা পোকা মারলে যেমন দোষ হয় না, কারণ মহৎ কিছু বুঝবার ক্ষমতা নেই ওর, তেমনি যারা ঐ পোকার মতো সেই মানুষদের ক্ষতি করলেও তাতে দোষের কিছু হয় না, সেটা কোনো ক্ষতিই নয়।' কিছুটা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির নারী ইসোবেলকে এ সব কথা বলে অবশ্য হেনরী মোটেই প্রভাবিত করতে পারে না। কিন্তু এই হচ্ছে ওর জীবন-দর্শন।

দি প্যাসচিওরস অব হেভেন—ষ্টাইনবেকের দ্বিতীয় বই এবং প্রথম গল্পগ্রন্থ এই বইটি পরবর্তীকালে অনেকেরই ভালো লেগেছিল। ক্যালিফর্নিয়া অঞ্চলের যে কৃষিশ্রমজীবী সম্প্রদায়ের কথা লিখে ষ্টাইনবেক নিজেকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রষ্ঠিত করেছেন তার সূত্রপাত হয়েছিলো এই বইয়ের গল্পগুলিতে।

টু এ গড আননোন—বিখ্যাত হবার পর ষ্টাইনবেকের তৃতীয় বইখানাও অবশ্য কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো। "টু এ গড আননোন" যদিও একখানা উপন্যাস, কিন্তু তবু দেখা যায় এর মধ্যে ষ্টাইনবেক রীতিমতো একটা নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করেছেন। জোসেফ অর্থাৎ এ কাহিনীর নায়ক তার পিতৃকুলের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করে এসে মেক্সিকোর সীমান্তবর্তী একটা অঞ্চলে নিজের বসবাসের জায়গা করে নিলো। সঙ্গে আছে কৃষিকর্মের জন্যে কিছুটা জমি। জোসেফ বাড়ি তৈরী করলো বিরাট একটা 'ওক' গাছের তলায়। মেক্সিকানদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ক্রমশঃ ওর মনটা নানা কুসংস্কারে ভরে উঠতে লাগলো। প্রাচীন মেক্সিকানদের মতো ভূত-প্রেত-অপদেবতা প্রভৃতির চিন্তা আচ্ছন্ন করে ফেললো ওকে। যে বিরাট 'ওক' গাছটার তলায় নিজে বাড়ি তৈরী করে-ছিলো জোসেফ ক্রমশঃ ভাবতে লাগলো যে কৃষিকর্মে ওর যে উন্নতি তার পেছনে ঐ গাছটা, অর্থাৎ গাছটার অধিষ্ঠাতা দেবতার নির্ঘাৎ কোনো হাত আছে। এক সময় দেখা গেলো খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করে ও রীতিমতো প্রাচীনপন্থী হয়ে উঠেছে। কুসংস্কারের তাড়নায় চলতে লাগলো ঐ 'ওক' গাছ-রূপী দেবতার পূজা ইত্যাদি। যেমন বিচিত্র ধারণা, তেমনি বিচিত্র তার পূজা পদ্ধতি। এদিকে জমির ফসলও ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। কাজেই 'ওক' গাছের দেবত্ব এখন তর্কের উর্ধ্বে। এদিকে জোসেফ নিজেও অবস্থাপন্ন হয়ে

উঠেছে এবং স্থানীয় সমাজে ওর রীতিমতো মর্যাদার সৃষ্টি হয়েছে। এমনি সময় অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। জমির ফসল ক্রমশঃ কমে আসতে লাগলো। জমির উর্বরা শক্তি অব্যাহত রাখতে হলে যে তাতে 'সার' দেওয়া দরকার, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জোসেফের একবারও মনে হলো না সে কথা। ও নিজের বিচিত্র পদ্ধতিতে মানৎ করে চলতে লাগলো 'ওক' গাছরূপী দেবতার কাছে। কিন্তু তাতে আর কি হবে! শেষে একটা বছর কাটলো একেবারে অনাবৃষ্টির মধ্যে। জমি সব শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো। কোনো মানতেই আর দেবতার করুণা হলো না দেখে জোসেফের উন্মাদনা দেখা দিলো। কিন্তু তবু বিশ্বাস হারালো না ও। শেষ পর্যন্ত একদিন দেখা গেলো ঐ 'ওক' গাছের তলাতেই জোসেফ আত্মঘাতী হয়েছে। এইভাবে নিজের কুসংস্কারের মূল্য দিলো ও।

প্রথম দিকের এই তিনখানা বই নিয়ে সে সময়ে তো কোনো আলোচনাই হয়নি, যদিও দ্বিতীয় এবং তৃতীয়খানা পরবর্তীকালে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু চতুর্থ বই 'তরতিলা ফ্ল্যাট' (১৯৩৫) প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্যরসিক সমাজে ষ্টাইনবেক সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। অবশ্য যে-বিশিষ্টতার জন্যে উনি বিশ্ববিখ্যাত তার লেশমাত্র নেই এ বইতে, কিন্তু তবু কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন ষ্টাইনবেক। এর প্রধান কারণ এ বইয়ের রচনার গুণ। অতি সাধারণ শ্রেণীর কতকগুলি লোকের হৈ-হুল্লোড়-মদ্যপান ইত্যাদি কেন্দ্র করে রচিত এ উপন্যাস এক সময় মঞ্চস্থ হয়েছিল, কিন্তু তেমন চলেনি। 'তরতিলা ফ্ল্যাট' একটা জায়গার নাম। এ জায়গার প্রধান অধিবাসীরা হলো স্পেনীশ, রেড ইণ্ডিয়ান এবং প্রাচীন মেক্সিকানদের সংমিশ্রণে একটা সংকর শ্রেণীর জন-গোষ্ঠী। এদের হালকা জীবনযাত্রাই হলো এ বইয়ের বিষয়বস্তু।

ইন ডুবিয়াস ব্যাটল—লেখক যদি নিজে সিরিয়াস হন তা'হলে পাঠক সিরিয়াস না হয়ে পারবেন কি করে? এ একখানা প্রকৃতই সিরিয়াস উপন্যাস। এ উপন্যাসের একটি চরিত্র (জিম কোয়াট) প্রকাশ্যেই বলছে তার মনের কথা। বলছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনতান্ত্রিক সামাজিক অবস্থা ওর সর্বনাশ করলো। খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন মার্কিন নাগরিকের মুখ দিয়ে ঐ ধরনের কথা শোনানোটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ! কিন্তু এ হেন দুঃসাহসিক কাজ ষ্টাইনবেক করলেন। শুধু তাই নয়। 'জিম' কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন সভ্যও হয়ে গেলো। কম্যুনিষ্ট পার্টিতে ঢুকবার পর

তিনজন লোকের সঙ্গে পরিচয় হ'লো জিমের। একজন ম্যাক, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, দ্বিতীয় ডিক, কর্মী হিসেবে ততটা দক্ষ নয়, কিন্তু বুদ্ধি প্রখর ; আর তৃতীয় জন। টরগাস ভ্যালীতে ফলবাগানের কর্মচারীরা ধর্মঘট করবে মনস্থ করেছে। ম্যাক চলে এলো এখানে, সঙ্গে এলো জিম। ধর্মঘটের কাজকর্ম কিভাবে চালানো হয় তা সব শিখতে হবে ওকে। টরগাস ভ্যালীতে এসে পৌঁছবার পর আরো ছ'জনের সঙ্গে পরিচিত হ'লো ওরা। একজন অল এণ্ডারসন, ও কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্য নয়, কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন সমর্থক। তা' ছাড়া আরো একটি চরিত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এর নাম লণ্ডন ; লণ্ডন বয়সে ওদের চাইতে কিছু বড় এবং স্থানীয় শ্রমিক নেতা।

ধর্মঘট যথাসময়ে আরম্ভ হয়ে গেলো। হে হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। অল-এর বাবার একটা বিরাট বাগান ছিলো। লণ্ডনের অনুরোধে এক হাজার ধর্মঘটী কর্মচারী ঐ বাগানে আশ্রয় পেলো। ডিক দায়িত্ব নিলো খাদ্য সরবরাহের, ডাঃ বারটন দায়িত্ব নিলো স্বাস্থ্যরক্ষার, লণ্ডন-এর একজন সহকর্মী হ'লো ডাকিন। ওরা দু'জনে যুগ্মভাবে ধর্মঘটী শ্রমিক সঙ্ঘের কর্ণধার। ফল-বাগানের মালিকেরা গোপনে গোপনে চেষ্টা করলো ওদের দু'জনকে হাত করে নিয়ে ধর্মঘট বানচাল করে দিতে। কিন্তু পারলো না। শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় বদ্ধপরিকর লণ্ডন এবং ডাকিন ক্রমাগতই প্রেরণা জোগাতে লাগলো ধর্মঘটী শ্রমিকদের। শ্রমিকদেরও মনোবল অটুট। এমন সময় মালিক-পক্ষ ধর্মঘট ভাঙবার জন্যে শহর থেকে ভাড়াটে লোক আমদানী করতে লাগলো। তার পরের ঘটনাগুলি সহজেই অনুমেয়। একদিকে ধর্মঘটী শ্রমিকদল এবং তাদের সমর্থকেরা, আর একদিকে ফলবাগানের মালিক-পক্ষ এবং তাদের ভাড়াটে লোকজনেরা। কয়েক দিনের মধ্যেই পরিষ্কার দু'টো ভাগ হয়ে গেলো। এবং কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে চলতে লাগলো খুনজখমের পর্ব। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারী সমর্থনটা সাধারণত মালিকপক্ষের দিকেই থাকে। খোলাখুলিভাবে না হলেও সরকার তার নিষ্ক্রিয়তার দ্বারাই মালিক-পক্ষকে প্রচুর সাহায্য করতে পারে। এ ক্ষেত্রেও তাই করলো। কয়েক হাজার মানুষের জীবন-মরণ সংগ্রামে সরকার প্রথমটা একেবারেই দর্শকের ভূমিকা নিয়ে নীরব রইলো। ফলে, মালিক-পক্ষ তাদের ভাড়াটে লোকজনের সাহায্যে একটির পর একটি খুনজখম চালিয়ে যেতে লাগলো। সমস্ত অঞ্চলটা জুড়ে চলতে লাগলো অরাজকতা। অবস্থা যখন চরমে উঠলো তখন সরকার

এগিয়ে এলো। সংবাদপত্রে এই ধর্মঘট নিয়ে যে রকম লেখালেখি আরম্ভ হ'লো তাতে এ সময়ে সরকারী হস্তক্ষেপ না হ'লে ভালো দেখায় না, তাই আসতে হলো সরকারকে। ইতোমধ্যে জন খুন হয়েছে, ডাঃ বারটন এবং ডিক নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে; অল এবং জিম গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এবং ডাকিন গ্রেপ্তার হয়েছে; অলের বাবার বাগানের আশ্রয় থেকে ধর্মঘটী শ্রমিকেরা বিতাড়িত হয়েছে।

কাহিনীর শেষের দিকে দেখা যাচ্ছে যে জিম সেরে উঠেছে এবং শ্রমিকেরা তাকে নেতৃপদে বরণ করে নিয়েছে। কিন্তু এতো অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করে, এতো রক্ত এবং অশ্রু ঝরিয়ে শ্রমিকেরা শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারলো না। কারণ, কয়েকদিন পরেই মালিক-পক্ষের লোকজনের হাতে জিম নৃশংসভাবে নিহত হলো।

সমগ্রভাবে কাহিনীটি একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে তেমন অসাধারণ কিছু নয়। একদল সমালোচক তো বললেনই যে, 'এরকম উদ্দেশ্য-মূলকভাবে একটা ধর্মঘটের ব্যাপার নিয়ে লেখবার অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামের চিত্র এরকম নগ্নভাবে আঁকবার কোনো সাহিত্যিক সার্থকতা নেই। একটা ধর্ম-ঘটের কথা কোনো মহৎ সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে না', ইত্যাদি। কিন্তু ঠিক এই সমস্ত কারণের জন্যেই অন্য একদল সমালোচকের ভালো লাগলো "ইন ডুবিয়াস ব্যাটল"। তাঁরা বললেন যে, 'এক শ্রেণীর লোককে কখনো কখনো যে প্রতিবাদের চরমপন্থা হিসেবে ধর্মঘট করতে হয়, এইটেই সমাজ এবং রাষ্ট্রের পক্ষে একটা অত্যন্ত লজ্জার কথা। এ নিয়ে দেশের সরকার এবং সাধারণ নাগরিক সকলেরই চিন্তা করা দরকার। এই উপন্যাসখানার মাধ্যমে সকলকে সেই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে ষ্টাইনবেক একটা সামাজিক কর্তব্য পালন করেছেন, এ জন্যে তিনি ধন্যবাদ দাবী করতে পারেন।' ওঁর লেখার ধারা যে ক্রমশঃ উন্নত হচ্ছে, চিন্তায় স্বচ্ছতা আসছে, প্রকাশভঙ্গীতে সাবলীলতা বাড়ছে, এ কথা অবশ্য উভয় শ্রেণীর সমালোচকেরাই স্বীকার করলেন।

"ইন ডুবিয়াস ব্যাটল"-এর পরের দু' বছরও একখানা করে নতুন বই বেরুলো—"অব মাইস এণ্ড মেন" একখানা উপন্যাস এবং ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে "দি লঙ ভ্যালী"—কয়েকটি পূর্ব-প্রকাশিত গল্পের সংগ্রহ।

"অব মাইস এণ্ড মেন"-এ কৃষিকর্মজীবী সাধারণ মানুষের জীবনের নানা সমস্যার কথা আছে, অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আছে, অল্পবিস্তর প্রেমের

চিত্র আছে কিন্তু "ইন ডুবিয়াস ব্যাট্‌ল"-এর মতো প্রত্যক্ষভাবে কোনো রাজনৈতিক সমস্যার অবতারণা করেন নি ষ্টাইনবেক।

"দি লঙ ভ্যালী"র একটি গল্প "দি রেড পনি" একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কাহিনী। ষ্টাইনবেককে বুঝবার জন্যে এ গল্পটির মূল্য অসাধারণ। আমরা পরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

সাহিত্যসাধনার পরিণত রূপ—দি গ্রেপস্‌ অব র‍্যাথ্‌।—উনিশ শ' উনচল্লিশ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার সাহিত্যের আসরে তোলপাড় শুরু হয়ে গেলো ষ্টাইনবেককে নিয়ে, কারণ এই বছরই ওঁর "দি গ্রেপস্‌ অব র‍্যাথ্‌" প্রকাশিত হ'লো। সমালোচক গাইসমার বলেছেন যে, 'এ উপন্যাসখানা বেরোবার কিছুদিনের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে অদ্ভুত সব ব্যাপার হ'তে লাগলো। কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের সরকার নিষিদ্ধ করে দিলেন এ বইখানা। তাঁরা বললেন, এ উপন্যাস পড়লে আমেরিকার জাতীয় চরিত্রে পঙ্কিলতা দেখা দেবে। কিন্তু, আবার আর একদিকে, অন্য কয়েকটি অঙ্গ-রাজ্যের সরকার জনসাধারণকে উৎসাহিত করলেন বইখানা পড়বার জন্যে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বললেন—'এ বই পড়লে ক্ষতির কোনই আশঙ্কা নেই, বরং অঞ্চলবিশেষে মার্কিন দেশে যে কী অত্যাচার-অনাচার-শোষণ এবং অবিচার চলছে মার্কিন নাগরিকদেরই ওপর, সে সম্বন্ধে গোটা দেশের মানুষের ধারণা হওয়া দরকার, এই একখানা বই পড়লেই সে ধারণা যে কোন লোকের হবে, কাজেই সকলে এ বই পড়ুক এইটেই বাঞ্ছনীয়।' যে অঙ্গরাজ্যগুলিতে নিষিদ্ধ করা হ'লো এ বই সেখানে হাজার হাজার কপি চোরাই চালান হয়ে পৌঁছতে লাগলো, আর যে রাজ্যগুলিতে নিষিদ্ধ হ'লো না সেখানে তো লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হ'তে লাগলো স্বাভাবিকভাবেই। মার্কিন দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃষি-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 'এসোসিয়েটেড ফারমার্স' প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলে যে ষ্টাইনবেক একজন পাকা কম্যুনিষ্ট, এঁর "দি গ্রেপস্‌ অব র‍্যাথ্‌" অবিলম্বে গোটা দেশে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। লেখক মহলে, পাঠক মহলে, সমালোচক মহলে এমন কি সরকারের বিভিন্ন মহলেও এ বই নিয়ে জোর আলোচনা চলতে লাগলো। কফিখানা, পানশালা, সাধারণ ব্যবসায়ী মহল, সর্বত্র। একদল যদিও উঁচু গলাতেই বলতে লাগলেন যে ষ্টাইনবেক কম্যুনিষ্ট, কিন্তু কম্যুনিষ্টরা ভুরু কোঁচকালেন, 'কম্যুনিষ্ট? হুঁ। কম্যুনিষ্ট হওয়া চাট্টিখানি কথা কিনা। ভদ্রলোক বড় জোর একজন শোধনবাদী', অর্থাৎ কিনা রিফর্মিষ্ট। দু' পক্ষের

কথাই শুনলেন লেখক। কোনো জবাব দিলেন না। এই যে বিরুদ্ধ সমালোচনা বা সৌভাগ্য এর কোনোটাতেই ওঁরা নিজস্ব চরিত্রে কোনো লক্ষণীয় পরিবর্তনই ঘটাতে পারলো না। একাধিক বিখ্যাত সংবাদপত্রের প্রতিনিধি যখন ওঁর সঙ্গে 'ইণ্টারভিউ' চাইলেন, সবিনয়ে তা' প্রত্যাখ্যান করলেন ষ্টাইনবেক।

কিন্তু দ্রুত, খুব দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে লাগলো। যা সত্যি, তা আপনার শক্তিতেই মানুষের মনে ধীরে ধীরে নিজের জায়গা করতে লাগলো। দু' বছরের মধ্যে অনেকে (যাঁদের কোনো মতেই কেউ কম্যুনিষ্ট বলতে পারে না) শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতে আরম্ভ করলেন যে ষ্টাইনবেকের "দি গ্রেপস্ অব র‍্যাথ্" এক মহান সাহিত্য সৃষ্টি, "টম কাকার কুটীর" মার্কিন সাহিত্যে যে স্থান অধিকার করে আছে, যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত, এ উপন্যাসও কালে কালে তার পাশেই স্থান পাবে এবং তারই সমান মর্যাদালাভ করবে।

একজন চিত্র-প্রযোজক যখন "দি গ্রেপস্ অব র‍্যাথ্"-এর চিত্রসত্ব কিনলেন তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকায় তখন অনেকেই ভদ্রলোকের বুদ্ধি-বিবেচনা (!) দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বহুল প্রচারিত 'লাইফ' পত্রিকা লিখলেন—'এমন কি আছে ও বইতে, যে এতো টাকায় কিনতে হ'ল ?'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটা বিরাট অঞ্চল ধুলোর বাটী (dust bowl) নামে পরিচিত। জায়গাটা নেহাৎ কম নয়। রকি পর্বতমালা যেখান থেকে ঢালু হ'তে আরম্ভ করেছে সেইখান থেকে শুরু হয়ে সমগ্র নেব্রাস্কা, কানসাস, ওক্লাওমা, টেক্সাস এবং মণ্টানা, ওয়াইওমিং, কলরাডো ও নিউ মেক্সিকোর পূর্বাঞ্চল এবং উত্তর ও দক্ষিণ ড্যাকোটার পশ্চিমাঞ্চল এই বিরাট অঞ্চলটি জনসাধারণের কাছে 'ধুলোর বাটী' বলে পরিচিত। কেন সে কথাটাও বলা দরকার। পূর্বে অর্থাৎ সভ্য-জগতের অন্তর্ভুক্ত হবার আগেত' বটেই, তার পরেও শতাধিক বৎসর পর্যন্ত এই বিরাট অঞ্চলে মানুষ বলতে একমাত্র রেড ইণ্ডিয়ানরাই বসবাস করতো। ওদের প্রধান কাজ ছিলো বাইসন শিকার করা। হাজারে হাজারে বাইসন চরে বেড়াতো এ অঞ্চলে। পরে সভ্য মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে এ অঞ্চলটা নির্দিষ্ট করা হ'ল গো-চারণ ভূমি হিসেবে। দীর্ঘদিন এই বিরাট অঞ্চলটির উন্নতির জন্য কোনো চেষ্টা করা হয়নি। কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই কৃষিকর্মের প্রয়োজনে এ অঞ্চলটা উদ্ধার করবার সুপরিকল্পিত চেষ্টা আরম্ভ হলো। ফাঁকা-ফাঁকাভাবে ছোটো বড়ো কতকগুলি শহর ও জনপদ, তা ছাড়া বাদবাকী আর সমস্ত

জায়গার জঙ্গল কেটে সাফ করা হলো—এমন কি চাষবাসের প্রয়োজনে ছোটো ছোটো আগাছা এবং ঘাসও তুলে ফেলা হলো—তার ফলে শুকনো মাটি ক্রমশঃ ধুলোয় পরিণত হতে লাগলো, আর এক দিকে চলতে লাগলো অনাবৃষ্টি। দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যে এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো যে একটু জোরে হাওয়া বইতে আরম্ভ করলেই ধুলোয় চতুর্দিক একেবারে অন্ধকার হয়ে যায়, চাই কি ধুলোর ঝড় বইতে থাকে। ওক্লাওমা এবং টেক্সাসের অবস্থাই হয়ে উঠলো সবচেয়ে শোচনীয়। শত শত বর্গ মাইল জমিতে চাষ বন্ধ হয়ে গেলো। হাজার হাজার ক্ষেতমজুর এবং কৃষি-কর্মী বেকার হয়ে পড়লো। "দি গ্রেপস্ অব র‍্যাথ্"-এ ষ্টাইনবেক এই রকম দুর্দশাগ্রস্ত একটি পরিবারের কথাই লিখেছেন।

ওক্লাওমার জোড্ পরিবার এক সময় বেশ স্বচ্ছলই ছিলো। নিজেদের ছিলো জমি কিছু। কিন্তু কালক্রমে জমি-জমা হারাতে হ'লো ওদের। কাজেই জীবিকা নির্বাহের জন্যে জোড্ পরিবারের ছেলেদের এখন দিনমজুরী করতে হয়। ধুলোর বাটী অঞ্চলে যে জায়গাতে ওরা বাস করতো সেখানে (এবং আরো অনেক জায়গাতেই) অনাবৃষ্টি এবং ধুলোর উপদ্রবের জন্যে চাষের কাজ প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। প্রায়ই বেকার বসে থাকতে হয় ওদের। ফলে অনশন এবং অর্ধাশনে কাতর হয়ে জোড পরিবার মনস্থ করলো ও অঞ্চল ছেড়ে দেবে। চলে আসবে ক্যালিফোর্নিয়ায়। কালিফোর্নিয়ার উর্বর জমিতে ফলের বাগানের কাজ সহজেই জুটে যাবার সম্ভাবনা। মজুরীও নাকি ওখানকার ফলবাগানের মালিকেরা ভালোই দেয় শুনলো ওরা। কাজেই অনেকদিনের পুরনো, জরাজীর্ণ একটা ট্রাকে করে জোড্ পরিবার ধুলোর রাজ্য ছেড়ে শস্যশ্যামল ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে, আশায় বুক বেঁধে রওনা হ'লো।

উনিশ শ' চল্লিশ খ্রীষ্টাব্দে পুলিৎসার পুরস্কারপ্রাপ্ত ষ্টাইনবেকের এই শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের কাহিনী বহু শাখাপ্রশাখা সংবলিত, প্রতিটি চরিত্রের নিজস্ব চিন্তা এবং সমস্যা রয়েছে। অসংখ্য ঘটনা—যার প্রায় প্রত্যেকটি মূল কাহিনীকে প্রভাবিত করছে। গ্র্যানপা এবং গ্র্যানমা, পরিবারের বুড়ো-বুড়ী দু'জন পথেই মারা গেলো। আর একজন, নোয়া গেলো নিরুদ্দিষ্ট হয়ে! পথের নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত যা হ'ক ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌছলো ওরা। পরিবারটির এখন কর্তাব্যক্তি দু'জন—

খুড়ো জন এবং পা জোড। জন জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত, একটু নিরিবিলি থাকতে চায়, পা নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে; কাজেই পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব এসে পড়েছে মা জোডের ওপর। নতুন জায়গায় এসে কি করে পরিবারটি দাঁড়াতে পারে কাজকর্মের মধ্য দিয়ে মা সারাক্ষণ সেই চিন্তায় বিভোর; টম, অল, রোজ, কোনি এবং দু'টি ছোটো ছেলেমেয়ে রুথী এবং উইনফিল্ড, তা' ছাড়া মা, পা এবং জন, এই নিয়ে এখন জোড্ পরিবার। ধুলোর রাজ্য থেকে ওদের সঙ্গে অন্য একটি লোকও এসেছে, সে হ'লো জিম কেসী। কেসী আগে পাদ্রী ছিল, কিন্তু নানা কারণে ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়ে ও এখন সোশ্যালিষ্ট হয়ে গেছে। চার্চের কাজ ছেড়ে ও শ্রমিক আন্দোলন করছে। ক্যালিফোর্নিয়াতে এসেও ও লেগে গেল এই কাজে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌছবার কয়েকদিনের মধ্যেই জোড্ পরিবার নিজেদের ভুল বুঝতে পারলো। নতুন জায়গায় অনেক নতুন অসুবিধে দেখা দিতে লাগলো। লেবার কন্‌ট্রাক্টর এবং স্থানীয় পদস্থ ব্যক্তিরা নতুন লোকদের সহসা সাহায্য করতে প্রস্তুত নয়। কেন এসেছো এখানে, এই এতো দূরে, রাজনীতি করো নাকি, ইত্যাদি সাত-সতেরো রকমের জটিল প্রশ্ন। কেসী গ্রেপ্তার হ'লো; গর্ভবতী কোনি পালিয়ে গেল। অনশন-কাতর জোড্ পরিবার আশ্রয় নিলো সরকারী ক্যাম্পে। এক ফলবাগানের মালিক-পক্ষের লোকজনের গুলিতে পরে কেসী নিহত হ'লো, টম হত্যা করল কেসীর হত্যাকারীকে। ইতোমধ্যে ওরা কয়েকজন একটা ফলবাগানের কাজ পেয়েছিলো। কিন্তু পর পর দু'টো খুনের পর জোড্ পরিবারের গা ঢাকা দেওয়া ছাড়া আর উপায় রইলো না। আত্মগোপন করা অবস্থাতেই টম কাজ নিলো একটা তুলো বাগানে। ক্যালিফোর্নিয়ার জীবন সম্পর্কেও হতাশ হয়ে মা শেষ পর্যন্ত টমকে বাইরে পাঠিয়ে দিলো এবং কেসীর অসমাপ্ত শ্রমিক-গঠনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লো নিজে। এই হ'লো মোটামুটিভাবে ষ্টাইনবেকের "দি গ্রেপস্ অব র‍্যাথ্"-এর কাহিনী সূত্র। এ বইয়ের প্রতিটি ছত্রে ষ্টাইনবেক যে বাস্তব-বোধের পরিচয় দিয়েছেন এবং যে-ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে জমিহারা বাস্তুহারা শ্রমজীবীদের জীবনকে আধুনিক পৃথিবীর সভ্য সমাজের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, তা দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

ধুলোর রাজ্য এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে অনেক মার্কিন লেখকই গল্প, উপন্যাস বা নাটক লিখেছেন। পার্কম্যান, এডনা ফারবার,

লিন রিগস, উইলা ক্যাথার প্রভৃতি অনেকেই এই অঞ্চলের পটভূমিকায় সাহিত্য রচনা করেছেন এবং সাহিত্য হিসেবে তাঁদের বইগুলি জনপ্রিয়ও কম হয়নি। কিন্তু তবু ষ্টাইনবেকের বইয়ের সঙ্গে ওঁদের কারোই তুলনা হয় না। কারণ, ষ্টাইনবেকের "দি গ্রেপস্ অব র‍্যাথ্" অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি তো বটেই, কিন্তু তা' ছাড়াও আরো কিছু। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিশ্রমজীবী সমাজ যে সামন্ত-যুগ-সুলভ পঙ্কিলতায় নিমগ্ন ছিল তার কবল থেকে জাতীয় জীবনকে মুক্ত করবার পথে একখানা শক্তিশালী দলিলও বটে। এবং এই কারণেই এ উপন্যাস "টম কাকার কুটীর"-এর সমতুল্য বলে সমাদৃত।

"দি গ্রেপস্ অব র‍্যাথ্" লিখে জাতীয় স্বীকৃতি লাভ করবার পরও ষ্টাইনবেক আরো বারোখানা বই প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে দু'খানা বিশেষভাবে উল্লেখনীয়।

দি পার্ল—১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এ উপন্যাসখানা বাংলাতেও অনূদিত হয়েছে। একটি মেক্সিকান উপকথা অবলম্বনে রচিত এই ছোট উপন্যাসখানা ষ্টাইনবেকের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। একটি জেলে তরুণ, নাম তার কিনো। সমুদ্র থেকে মুক্তা সংগ্রহের সময় একবার এমন বড় একটি মুক্তা পেলো, যা দেখে বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে স্বীকার করলো যে এতো বড়ো একটি মুক্তা তারা কেউ এর আগে কখনো দেখেনি। যে মুক্তা-ব্যবসায়ীরা অবজ্ঞায় কথা বলতো না কিনোর সঙ্গে, তারাই সাদরে আমন্ত্রণ জানালো কিনোকে। সাধারণত একটি মুক্তার যা দাম হয় তার দ্বিগুণ, তিনগুণ কেউ বা চারগুণ দাম বলতে লাগলো কিনোর মুক্তাটির। তার বেশি কেউই বললো না। মুক্তা-ব্যবসায়ীদের চোখ-মুখ দেখে সন্দেহ হ'লো কিনোর যে ওরা নিশ্চয়ই জোট পাকিয়েছে। এবং জোট পাকিয়েই প্রকৃত দাম কেউ দিতে নারাজ। এদিকে দালালরা ব্যতিব্যস্ত করতে লাগলো কিনোকে স্থানীয় বাজারে মুক্তাটি বিক্রয় করবার জন্যে। স্থানীয় গির্জার পাদ্রী মশায়ও এসে জুটলেন। বললেন: 'কিনো, তোমাদের বিয়েটা তো আইনত সিদ্ধ নয়, অথচ তোমার ছেলে অবধি হয়ে গেছে। মুক্তাটি তুমি গির্জাকে দান করো, আমরা তোমার বিয়ে আইনতঃ এবং ধর্মতঃ সিদ্ধ করে দেবো।' এই সমস্ত ব্যাপারের পর কিনোর ধারণাটা বদ্ধমূল হ'লো যে মুক্তাটি অতি মূল্যবান। জুয়ানাও সত্যি ভালোবাসে ওকে। কারণ, আনুষ্ঠানিক বিয়ে না হওয়া সত্ত্বেও ও একত্র বসবাস করতে রাজী হয়েছে। ওদের ছেলেও হয়েছে একটি। শিশুটির

দিকে তাকালে আশায় কিনোর বুকখানা ফুলে ওঠে। কিছুদিন আগে মনে পড়ে একটা বিছে কামড়েছিলো ছেলেটাকে। পয়সার অভাবে ডাক্তারবাবু একটু ওষুধ পর্যন্ত দিতে রাজী হননি। অর্থ! অর্থ! অর্থই তো সব কিছু পৃথিবীতে। কিনো ঠিক করে ফেললো মনে মনে, অর্থ সংগ্রহের একটা সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, তখন তার সদ্ব্যবহার করতেই হবে। ও মনস্থ করলো, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে বেচবে না মুক্তাটি, চলে যাবে বড় কোনো শহরে। ন্যায্য দাম আদায় করে নেবে। তারপর নতুন করে ভদ্র ভাবে শুরু করবে সংসারযাত্রা। ছেলেকে ভালো ভালো পোশাক কিনে দিতে হবে, লেখাপড়া শেখাতে হবে। হ্যাঁ, এই একটি মুক্তা দিয়েই করা যাবে এই সমস্ত কিছু। শুধু ন্যায্য মূল্য পাওয়া দরকার। কিনোর অনুমান মুক্তাটির মূল্য কয়েক হাজার ডলার। কিনো ঠিক করলো রাতের অন্ধকারে স্ত্রী, পুত্র এবং মুক্তাটি নিয়ে পালিয়ে যাবে। যথা সময়ে বেরিয়েও পড়লো। ও ঘর ছেড়ে বেরোবার একটু পরেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো ঘরখানা। লোভী দুষ্ট-লোকেরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে কিনোদের পুড়িয়ে মারবার জন্যে। কিনো স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে হট্টগোলের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়লো। পরদিন রাতের ঘটনা। আত্মগোপন করে থাকা অবস্থায় ওদের অনুসরণকারী একটি দুষ্টলোকের গুলিতে মারা গেলো শিশুটি। শোকে স্তব্ধ হয়ে গেলো কিনো আর জুয়ানা। ওরা ভাবলো সম্পদই জীবনের সব চাইতে বড়ো শত্রু। মৃত শিশু-সন্তানটিকে নিয়ে আবার গ্রামে ফিরে এলো ওরা। অসীম ঘৃণায় কিনো মহামূল্য মুক্তাটি সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

বারনিং ব্রাইট—১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই নাট্যোপন্যাসেই ষ্টাইনবেক যৌনজীবন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সব চাইতে স্পষ্ট এবং জোরালো-ভাবে বলেছেন। এই কাহিনীটিতে দেখা যায় একটি মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক জো সল, পুরুষত্বহীন হয়ে পড়েছে। এর ফলে নিজেকে খুবই ছোট ভাবতে আরম্ভ করেছে ও। স্বামীর এই অবস্থা দেখে জো'র দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী স্ত্রী ভাবলো, কোনোরকমে একটি সন্তান হলে স্বামী নিশ্চয়ই হীনমন্যতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে। সল পরিবারের এক সুহৃদ এড-এর পরামর্শ মতো জো'র স্ত্রী ভিক্টর নামে একটি যুবকের দ্বারা সন্তানসম্ভবা হলো। ও স্বামীকে বোঝালো যে, এ সন্তান তারই, সে-ই এই সন্তানের পিতা। জো খুশীতে আত্মহারা হয়ে উঠলো। কিন্তু এমন সময় ভিক্টর সত্য কথা ফাঁস করে

দেবার ভয় দেখালো। এত অবিলম্বে হত্যা করলো ভিক্টরকে। এর পর নিজের সম্বন্ধে জো'র সন্দেহটা আরো বেড়ে গেলো। তাই এক ডাক্তারের কাছে গেলো ও। এই ডাক্তার পরিষ্কার জানালো: 'তুমি একেবারেই পুরুষত্বহীন।' জো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো স্ত্রীর ওপর। কিন্তু ওর স্ত্রী যথাসময়ে সন্তান প্রসব করবার পর আবার দেখা যাচ্ছে জো উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে এবং সরবে বলছে যে, প্রত্যেকটি পুরুষই প্রত্যেকটি শিশুর পিতা। অর্থাৎ কিনা নবজাতকের পিতৃত্বের প্রশ্নে জো'র মনে আর কোন ক্ষোভ নেই। একটি নতুন জীবন পৃথিবীতে এসেছে এইটাই বড় কথা, এইটাই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা। যৌন-জীবনে বা দাম্পত্য-জীবনে নীতিধর্মের অনুশাসন জো'র মনে আর কোনো অশান্তির কারণ ঘটায় না।

মানুষের জীবন এবং মনুষ্যেতর জীবন সম্পর্কে অনেক সময় তুলনা করেছেন ষ্টাইনবেক, এটাও দেখা যায়। 'দি গ্রেপস্ অব র‍্যাথ্'-এ উনি মানুষের সঙ্গে কুকুরের তুলনা করেছেন। 'অব মাইস এণ্ড মেন'-এ একটা বুড়ো কুকুর হত্যার ব্যাপার একটি বৃদ্ধ লোককে হত্যার ঘটনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'ইন ডুবিয়াস ব্যাট্‌ল'-এ কতকগুলি কুকুরের খেয়োখেয়ির একটি ঘটনাকে কতকগুলি মানুষের মারপিট-এর একটি ঘটনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ওঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে এমনধারা অনেক ব্যাপারই ছড়ানো রয়েছে। ষ্টাইনবেককে বুঝতে হ'লে এর প্রত্যেকটিই গুরুত্বপূর্ণ। 'দি রেড পনি'তে ষ্টাইনবেক তাঁর নিজস্ব চিন্তা অনেকখানি ঢেলে দিয়েছেন। একটি ঘোটকীর মৃত্যু এবং একটি অশ্বশাবকের জন্ম—প্রধানতঃ এই সামান্য ব্যাপার দু'টির মধ্য দিয়ে একটি কিশোরকে তিনি জীবন-মৃত্যুর চিন্তায় উদ্‌বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন।

ষ্টাইনবেকের চিন্তার নানা বৈশিষ্ট্য—এতক্ষণে ষ্টাইনবেকের চিন্তার মূল সূত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রাচীন আমেরিকার, বিশেষ করে পেরু এবং মেক্সিকোর অসংখ্য উপকথা আছে। কিন্তু তার ভেতর থেকে কিনোর এই উপাখ্যানটি বেছে নেবার একটি বিশেষ কারণ আছে। সম্পদের সঙ্গে সাদামাটা জীবনের বৈপরীত্য এ কাহিনীতে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে এবং এইটেই ষ্টাইনবেকের মূল চিন্তা। জীবনের প্রতি একটা অনন্যসাধারণ শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ থেকে উদ্‌বুদ্ধ হয়েই ষ্টাইনবেক সাহিত্য রচনা করেন। 'ইন ডুবিয়াস ব্যাটল্' বা 'দি গ্রেপস্ অব

র‍্যাথ্'-এর উদ্দেশ্য মোটেই কম্যুনিজম বা কোনো রকম রাজনীতি চর্চা করা নয়। সমাজের বিশেষ কোনো অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কাঠামোর জন্যে মানব জীবন যখন বিপন্ন হয়ে ওঠে তখন ষ্টাইনবেকের বিশ্বাস তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ হওয় উচিত এবং এই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ কিছুমাত্র কালক্ষেপ না করে হওয়া দরকার। কম্যুনিষ্টরা যতক্ষণ এই কাজকে প্রাধান্য দেন, সে পর্যন্ত ষ্টাইনবেক কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে চলতে রাজী। এই জন্যেই 'ইন ডুবিয়াস ব্যাটল্'-এ ম্যাক্-এর মুখ দিয়ে রীতিমতো প্রোপাগাণ্ডা চালিয়েছেন। কিন্তু মানুষের দুর্দশা অবিলম্বে দূর করবার চেষ্টা না করে, তাকে মূলধন হিসেবে গ্রহণ করে, দুর্দশাগ্রস্তদের দেখিয়ে কম্যুনিষ্ট প্রোপাগাণ্ডার সুযোগ করে নেবার বিরোধী ষ্টাইনবেক। মানুষের জীবন যে কোনো প্রকার, চাই কি সমস্ত প্রকার "ইজম"-এর চাইতেও অনেক বেশি মূল্যবান—এ কথা ষ্টাইনবেক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

শুধু যে সম্পদের সঙ্গে জীবনের বৈলক্ষণ্য দেখিয়েছেন ষ্টাইনবেক তা নয়। 'মুক্তা'য় দেখিয়েছেন সম্পদের সঙ্গে বৈলক্ষণ্য, 'ইন ডুবিয়াস ব্যাট্ল' এবং 'দি গ্রেপস্ অব র‍্যাথ্'-এ দেখিয়েছেন প্রধানতঃ সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বৈলক্ষণ্য। খ্রীষ্টধর্মের কিছু কিছু সমালোচনাও ষ্টাইনবেক করেছেন 'দি গ্রেপস্ অব র‍্যাথ্'-এ। পাদ্রী কেসী নিষ্ঠা এবং সততার সঙ্গেই করতো তার কাজ। বহু লোককে ও খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওর মনে হ'লো ব্যাপারটা আত্মপ্রতারণার সামিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ, খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার ফলে কারো জীবনেই যে কোনো পরিবর্তন ঘটেছে তা ওর মনে হয় না। একদিন তো জিজ্ঞাসাই করে ফেললো টমকে: 'টম, তোমাকে ত আমি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলাম?' টম স্বীকার করলো। কেসী জিজ্ঞাসা করলো: 'তার পর থেকে তুমি কি নিজের ভেতর ভালো কিছু অনুভব করছো?' টম বললো: 'না।' কেসী আবার জিজ্ঞাসা করলো: 'খারাপ কিছু?' টম এবারও সত্যি কথাই বললো: 'না, খারাপ কিছুও অনুভব করছি না।' 'বাঃ', কেসী ভাবলো, 'ভালোও হচ্ছে না, খারাপও হচ্ছে না, তা' হলে এই বাজে ভড়ং-এর জন্যে জীবনপাত করবো কেন?' পাদ্রীর কাজ ছেড়ে ও শ্রমিক সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলো।

'টু এ গড আননোন'-এ আমরা দেখেছি পরিণত বয়স্ক একটি লোক কী ভাবে ধর্মীয় সংস্কারের ফলে মৃত্যুকে বরণ করে নিলো। এ রচনায় জীবনের

সঙ্গে কুসংস্কারের বৈলক্ষণ্য দেখিয়েছেন ষ্টাইনবেক। 'দি প্যাস্‌চিওরস অব হেভেন'-এ একটি গল্প আছে, 'জুনিয়াস মাণ্টবি', খুব সম্ভব এইটিই ষ্টাইনবেকের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প। সভ্যতার কৃত্রিমতার সঙ্গে জীবনের বৈলক্ষণ্য দেখিয়েছেন ষ্টাইনবেক এ গল্পটিতে।

নীতিধর্মের নামে কতকগুলি প্রচলিত নিয়মকানুন যেখানে জীবনকে ব্যাহত করে, ষ্টাইনবেক তারও কঠোর সমালোচনা করেছেন বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে। কেসী এক জায়গায় বলছে যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে—'অবিশেষিত যৌন মিলনে কোনো পাপও হয় না, পুণ্যও হয় না। পাপ-পুণ্য মনের বিকার মাত্র।' এ সম্পর্কে পা বলছে : 'যে যা করে তা' না করে পারে না বলেই করে, ...কাজেই তার পক্ষে এইটেই ঠিক।'

হ্যালডোর ল্যাক্‌স্‌নেস

বর্তমান শতাব্দীর শুরুতেই দেখা গিয়েছিল ইয়োরোপীয় সাহিত্যে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলির লেখকগণ প্রভাব বিস্তার করেছেন। এ শুধু স্টাইল বা বাচনভঙ্গীর প্রভাব নয়—এ প্রভাব অনেক গভীরে এবং ব্যাপকভাবে প্রবিষ্ট হয়েছিল।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া বলতে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক এবং ইস্‌ল্যাণ্ডকে বোঝায়। হ্যালডোর কিলিয়ান ল্যাক্‌স্‌নেস ইস্‌ল্যাণ্ডের অধিবাসী। শিল্প-সাহিত্যের সমস্ত দিকেই ইস্‌ল্যাণ্ড স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার অন্য তিনটি দেশের চাইতে অনেক অনগ্রসর তো বটেই, ঐ দেশগুলির অনুগামীও বটে।

কয়েক বছর পূর্ব পর্যন্তও ইস্‌ল্যাণ্ড ডেনমার্কের একটি উপনিবেশ বলে গণ্য হতো। কিন্তু আজকের ইস্‌ল্যাণ্ড স্বাধীন। ইস্‌ল্যাণ্ডের সাহিত্য অন্যান্য স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলির সাহিত্যের ধারার সঙ্গে এমন ভাবে যুক্ত যে রাষ্ট্রগত স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও ইস্‌ল্যাণ্ডের সাহিত্যসেবীদের মধ্যে নরওয়ে, সুইডেন এবং ডেনমার্কের পূর্বসূরিগণের অনুসরণ প্রচেষ্টা যে কোনো মনোযোগী পাঠকেরই কৌতূহল উদ্রেক করে।

প্রথম জীবন—ল্যাক্‌স্‌নেস (জন্ম ২৩শে এপ্রিল, ১৯০২) জন্মগ্রহণ করেন ইস্‌ল্যাণ্ডের রাজধানী রেকিয়াভিকে। ওঁর বাবা ছিলেন একজন অবস্থাপন্ন কৃষিজীবী। ওঁদের আসল পাদবী গুডজনসন। হ্যালডোরের বাবার বিরাট একটি খামার ছিল রাজধানী থেকে উত্তরে গ্রামাঞ্চলে। প্রথম জীবনের দশটা বছর এই খামারেই কেটেছিল ওঁর। খামারটির নাম ছিল ল্যাক্‌স্‌নেস। তরুণ বয়সে নিজেকে এমন গভীরভাবে উনি এই খামারের সঙ্গে জড়িত করে ফেলেছিলেন যে অনেকটা নূট হামসুনের মতো নিজের নামের সঙ্গেই যুক্ত করে দিলেন খামারের নামটা পদবী হিসেবে।

ইস্কুলের পড়াশুনো শেষ করবার পরে বছরখানেক কলেজেও পড়েছিলেন ল্যাক্‌স্‌নেস। এবং এই কলেজে পড়াশুনোর সময়তেই অনেক উদীয়মান লেখকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ওঁর। এর প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ দেখা যায় ষোলো বছর বয়স থেকেই ল্যাক্‌স্‌নেস একটু একটু লেখার চর্চা করছেন।

সাহিত্যসাধনার শুরু—সতরো বছর বয়সে একটি ছোটো উপন্যাসও রচনা করে ফেললেন ল্যাক্স্‌নেস। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই ছোট্ট বইখানির নাম 'চাইল্ড অব নেচার'। এ বইখানা সাহিত্য হিসেবে আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। তবে এর পরে দেখা যায় সাহিত্যসেবাই ল্যাক্স্‌নেস পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

নিতান্ত হাল্কা মনোভাবসম্পন্ন যাঁরা তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু যাঁরা একটু সিরিয়াস মনোভাবের মানুষ, তাঁদের প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যৌবনে পা দিয়েই কিম্বা তার কিছু পূর্ব থেকেই ভেতরে ভেতরে একটা তাড়না অনুভব করতে আরম্ভ করেন। কারো বেলায় দেখা যায় এর প্রভাবেই তিনি ব্যক্তি হয় তো নেহাৎ আকস্মিকভাবে রাজনীতির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, কেউ বা হঠাৎ অধ্যাত্মবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন; কারো বা নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটে, কেউ বা ভাবুক হয়ে পড়েন। বাস্তবিক পক্ষে যে শক্তি মানুষের ভেতরে এই অস্থিরতার সৃষ্টি করে তাকে ব্যক্তিবিশেষের স্বাভাবিক পথে পরিচালিত করতে পারলে হয় তো অনেক সাধারণ মানুষই তার কর্মজীবনে অসাধারণত্ব অর্জন করতে পারে। কিন্তু এ জিনিসটি কদাচিৎ ঘটতে দেখা যায়। ল্যাক্স্‌নেসের জীবনেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনের অনেক কিছুই দেখেছেন ল্যাক্স্‌নেস।

কুড়ি-একুশ বছর বয়সে দেখা গেল ভেতরের তাগিদে ল্যাক্স্‌নেস বাড়ি ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েছেন। দেশভ্রমণের নেশায় পেয়ে বসলো ওঁকে। ইস্‌ল্যাণ্ডের ছোট-বড়ো নানা শহর এবং গ্রামে গ্রামে কিছুদিন ঘুরে বেড়াবার পর একদিন হঠাৎ নরওয়েগামী এক জাহাজে উঠে বসলেন। একে একে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া এবং ফ্রান্স-এর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন ল্যাক্স্‌নেস। বলা বাহুল্য সাহিত্যচর্চার কাজ এ সময়ও পুরোদমেই চলছিল। এই সময় কোপেনহেগেনের একটি পত্রিকায় নিয়মিত গল্প লেখার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন ল্যাক্স্‌নেস।

তরুণবয়সে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবে—ফ্রান্সে থাকতেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ল্যাক্স্‌নেসের। উনি ছিলেন কিছুটা ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ। ভদ্রলোকের গম্ভীর ধার্মিক প্রকৃতি এবং দৃঢ়বিশ্বাসের প্রভাবে জীবনে অনভিজ্ঞ এবং ভাবুক প্রকৃতির তরুণ ল্যাক্স্‌নেস অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রীতিমত প্রভাবিত হয়ে পড়লেন এবং মনস্থ করলেন

যে খ্রীষ্টধর্মের মূলে প্রবেশ করতে হবে। বলাই বাহুল্য খ্রীষ্টধর্মই যে সকল ধর্মের সার এবং বিশ্বচরাচরের সমস্ত চূড়ান্ত সত্যের সন্ধানও যে এই ধর্মানুশীলনের মধ্যেই লাভ করা যাবে অন্ততঃ এই সময়ে কিছুকালের জন্যে ল্যাক্স্‌নেসের সে বিশ্বাস হয়েছিল। ঐ ভদ্রলোকের সুপারিশ নিয়েই তরুণ ল্যাক্স্‌নেস চলে এলেন লুক্‌সেমবুর্গ-এ। এখানে একটা মঠে কয়েকজন গৃহত্যাগী সাধক এবং পেশাদার পাদ্রীর সঙ্গে প্রায় একটা বছর কাটালেন ল্যাক্স্‌নেস। এ সময়কার চব্বিশ ঘণ্টার প্রতিটি মিনিট ওঁর কাটতো ধর্মচর্চায়। কখনো একা পড়াশুনোয় মগ্ন থাকতেন, কখনো বা আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলে যীশুখ্রীষ্টের জীবন এবং তাঁর শিক্ষার কোন না কোন দিক সম্বন্ধে জোর আলোচনায় মত্ত হতেন।

এই মঠে প্রবেশের কিছু পূর্ব থেকেই ল্যাক্স্‌নেসের অন্তরে সাহিত্যপ্রীতি সুদৃঢ়ভাবে জায়গা করে নিয়েছিলো। কাজেই ধর্মচর্চার ফাঁকে ফাঁকে এক-একদিন কিছু লেখবার জন্যেও ভেতর থেকে একটা তাগিদ অনুভব করতেন। এ সময়ে ওঁর বয়স ছিল একুশ-বাইশ বছর। এক বছর এই মঠে কাটাবার পরে ল্যাক্স্‌নেস শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন সংসার ত্যাগ করবেন না। বরং আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই প্রাত্যহিক সমাজ জীবনের যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করে চলবেন এবং তারই মধ্যে এমনভাবে ধর্মানুশীলনে নিযুক্ত রাখবেন নিজেকে যে তা' দেখে আর সবাই আদর্শজীবন যাপন সম্পর্কে একটা চাক্ষুষ নজির পেতে পারে। নিজে ক্যাথলিক হিসেবে দীক্ষিত হলেন ল্যাক্স্‌নেস এবং সারা জীবন খ্রীষ্টের বাণী প্রচারের প্রতিজ্ঞা নিয়ে মঠ ত্যাগ করলেন। চলে এলেন লণ্ডন।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলির সঙ্গে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জবাসীদের যোগাযোগ স্মরণাতীত কাল থেকে। বলতে গেলে ইংরেজরা আধা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান। বিভিন্ন আর্ট গ্যালারী এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ মিউজিয়মে এসে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সঙ্গে বৃটেনের যোগাযোগ সম্পর্কে কিছু ঐতিহাসিক শিক্ষালাভ করাই ছিল ল্যাক্স্‌নেসের লণ্ডনে আসার প্রধান আকর্ষণ। এ কাজ তো করতে লাগলেনই কিন্তু তার চাইতে দ্বিগুণ উৎসাহে উনি লণ্ডনের নেতৃস্থানীয় ক্যাথলিক পাদ্রী এবং শিক্ষা-গুরুদের সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করলেন।

এ ভাবটা অবশ্য ল্যাক্স্‌নেসের খুব বেশিদিন ছিল না—কম-বেশি তিন বছরের মতো। তবে যতদিন ওঁর কেটেছে এ ভাবে তার মধ্যে কোনো

ফাঁকিও দেখা যায়নি। তার প্রমাণ হলো এ সময়কার লেখা। এই তিন বছরে ছোটো ছোটো খানকয়েক বই লেখেন ল্যাক্‌স্‌নেস, যার মধ্যে সবচাইতে নামকরা হলো "এ্যাট দি হলি মাউন্টেন।" সকলেই এ বিষয়ে একমত যে এই রচনাগুলির সাহিত্যমূল্য কিছুই নয়—কারণ ধর্ম ওঁকে এতটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল যে এ বইগুলি সাহিত্য না হয়ে ধর্মপ্রচারমূলক পুস্তিকা হয়ে দাঁড়ালো। শোন যায় অনেক ক্যাথলিক পাদ্রী মহলে ধর্মান্তর-করণের সহায়ক হিসাবে এখনো ল্যাক্‌স্‌নেসের এই সময়কার রচনাগুলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

খ্রীষ্টধর্ম ও সাহিত্যের দোটানায়—এইভাবে মাস কয়েক লণ্ডনে কাটাবার পরে ল্যাক্‌স্‌নেস চলে এলে রোমে। এটা ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের একেবারে শেষের দিকের কথা। সুকুমার-শিল্পের প্রতি ধীরে ধীরে ওঁর মনে যে প্রীতি জন্মেছিল রোমে আসবার পর ল্যাক্‌স্‌নেস নিজেই অনুভব করতে লাগলেন তা যেন এবার ওঁকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেললো। নিজের ভেতর বোধ করতে লাগলেন একটা বিরাট সংঘাত। একদিকে ধর্ম আর একদিকে সাহিত্য। কোন্‌টা করবেন? কোন্ কাজে জীবনটা ব্যয় করা অধিকতর সমীচীন হবে? কার দাবী অধিক গ্রাহ্য? মঠ ত্যাগ করবার সময় নিজে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ল্যাক্‌স্‌নেস তা মনে হতে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়তেন নিশ্চয়ই, কিন্তু ঠিক পরক্ষণেই রোমের দারিদ্র্য-প্রপীড়িত অঞ্চলের অধিবাসীদের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতো। দেখতে পেতেন উঠতি ফ্যাসিস্ত গুণ্ডাদের যথেচ্ছ ব্যবহার। এ সবই হচ্ছে রোমে—হ্যাঁ রোমে। রোম—যার শাসনে একদা খ্রীষ্টের প্রাণনাশ করা হয়ে থাকলেও পরবর্তীকালে যার আগ্রহে এবং শ্রমে সারা বিশ্বে খ্রীষ্টের বাণী প্রচারিত হয়েছিল। স্বর্গ এবং নরক—দু'টো জিনিসেরই কিছুটা যেন পরশ পেলেন ল্যাক্‌স্‌নেস রোমে বসে। কয়েকটা সপ্তাহ অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করলেন ল্যাক্‌স্‌নেস নিজের সঙ্গে, তারপর ঠিক করলেন ঈশ্বরের যে সামান্যটুকু নিজের ভেতরে অনুক্ষণ অনুভব করা যায় তারই নির্দেশ মেনে চলবেন—নিজের বিবেককে মেনে চলবেন—সাহিত্য-চর্চাই করবেন, ধর্মপ্রচার নয়।

দি উইভার অব কাশ্মীর—এটা ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। দু'মাসের চেষ্টায় একখানা ছোটো কাহিনী রচনা করলেন ল্যাক্‌স্‌নেস 'দি উইভার

অব কাশ্মীর।' এ বই প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ল্যাক্‌স্‌নেস ইয়োরোপের সাহিত্যরসিক তথা ধর্মে আগ্রহশীল সকলেরই দৃষ্টি কাড়লেন। কারণ এ বইতে তরুণ ল্যাক্‌স্‌নেস তাঁর স্বভাবসুলভ জোরালো প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে বলে ফেললেন যে, 'খ্রীষ্টধর্মের কিছু উপকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা সুদূর অতীত কোনো কালে হয় তো কিছু ছিল, কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর বাস্তব জীবনযাত্রার পক্ষে খ্রীষ্টের বাণী কোনোই কাজে লাগতে পারে না,' অর্থাৎ কাজে লাগানো যেতে পারে না। বর্তমানের পৃথিবীর 'জটিল সমাজ-জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলির সমাধান না করে খ্রীষ্টের কথা বা খ্রীষ্টধর্মের কথা বলা অবাস্তব তো বটেই কিছুটা ভণ্ডামীও বটে।' ব্যস্‌। একথা আর কারো বুঝতে বাকী রইলো না যে, ল্যাক্‌স্‌নেসের চিন্তাধারায় একটা মৌল পরিবর্তন ঘটে গেছে। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক বাস্তবের সংস্পর্শে এসে রীতিমতো খ্রীষ্ট-বিরোধী হয়ে উঠেছেন। ব্যাপারটা সত্যি তাই হয়েছিল।

খ্রীষ্টধর্মের বিরোধিতা—ল্যাক্‌স্‌নেস কখনো ভাবের ঘরে চুরি ঘটাবার চেষ্টা করেননি। যখন খ্রীষ্টধর্মকে তাঁর সব কিছু সম্পর্কে চরম কথা বলে মনে হতো সে-কথাও জোর গলায় বলে বেড়াতেন; আবার যখন তার উল্টোটা মনে হতে লাগলো, সে কথাটাও সমান উৎসাহ, আগ্রহ এবং জোরের সঙ্গে বলতে লাগলেন। ল্যাক্‌স্‌নেস মনে করেন জীবনে যত বেশি জিনিস সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায় ততোই লাভ। তাই খ্রীষ্টধর্মের জন্যে উনি যে তিনটে বছর ব্যয় করেছেন সে সম্পর্কে কোনো অনুশোচনা নেই। জিজ্ঞাসা করলে স্পষ্ট গলায় বলে থাকেন: 'সত্যি যে খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে কিছু নেই তা নিজে ঐভাবে পরীক্ষা করেছিলাম বলেই তো জোর গলায় বলতে পারছি, তা না হলে হয় তো সারা জীবন একটা "কিন্তু, কিন্তু" ভাব দেখা দিতো মনে। সব সময়েই মনে হতো বুঝি ঐদিকে গেলেই মানুষের সব দুঃখ ঘুচতো। আজ বুঝতে পারছি ওসব কতো মিথ্যে।'

রোম থেকে স্বদেশে ফিরে এলেন ল্যাক্‌স্‌নেস। বিরাট একখানা উপন্যাস রচনায় হাত দিয়ে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন উনি। তারপরে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কিছুটা আকস্মিকভাবেই চলে এলেন আমেরিকায়। ছোটো-বড়ো নানা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, পত্র-পত্রিকাদির অফিস দেখে বেড়াতে লাগলেন এবং সেই সঙ্গে অনেক খ্যাতনামা লেখকের সঙ্গে পরিচিত হলেন ল্যাক্‌স্‌নেস —তাঁদের মধ্যে আপটন সিনক্লেয়ার এবং আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে প্রধান।

হেমিংওয়ের উপন্যাস 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' পরে এক সময় অনুবাদও করেছিলেন ল্যাক্‌স্‌নেস।

রোমে এসে বর্তমান পৃথিবীর বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ল্যাক্‌স্‌নেসের মন সজাগ হয়ে উঠেছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসবার পরে দেখা গেলো সেই বাস্তববোধ ওঁকে প্রায় বিদ্রোহী করে তুললো। আমেরিকার সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অত্যন্ত তীব্র সমালোচনা করে স্বদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচুর লেখা পাঠাতে লাগলেন ল্যাক্‌সনেস। কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো ল্যাক্‌স্‌নেসের রচনা এবং খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক সংবাদপত্র তথা প্রভাবশালী ব্যক্তি সরকারকে সুপারিশ করলেন আর দেরি না করে ল্যাক্‌স্‌নেসকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করতে বাধ্য করবার জন্যে। কিন্তু তার প্রয়োজন হলো না। সত্য কথা শুনতে বিমুখ তখনকার আমেরিকার সংবাদপত্র-জগতের ওপর রীতিমতো বিরক্ত হয়ে ল্যাক্‌স্‌নেস নিজেই আমেরিকা ত্যাগ করে আবার স্বদেশে ফিরে এলেন। সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের যে রূপ ল্যাক্‌স্‌নেস আমেরিকায় দেখলেন প্রধানত তার ফলেই ওঁর চিন্তাধারায় সমাজতন্ত্রের প্রতি একটা প্রবণতা খুব ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে দানা বেঁধে উঠতে লাগলো। ল্যাক্‌স্‌নেস বুঝতে পারলেন বর্তমানে পৃথিবীতে মানুষ যন্ত্রের দাস মাত্র এবং এই যন্ত্রের দাসত্বের ফলে তার মস্তিষ্কের সৃজনধর্মিতা ক্রমশঃ কমে আসছে, অনুভূতি ক্রমশঃ তার শক্তি হারাচ্ছে, মনুষ্যত্ব অপমানিত হচ্ছে, সত্য ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। প্রাত্যহিক জীবনধারনের পক্ষে আরাম-দায়ক অনেক কিছুই সে পাচ্ছে যার প্রচুর ক্রয়ক্ষমতা আছে; কিন্তু এই ক্রয়ক্ষমতা যার নেই মানসিক শান্তি তার চাইতে সে বেশি পাচ্ছে না। তা'হলে শেষ পর্যন্ত সে পেলো কি? কেবল ছুটোছুটিই সার, অর্থহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তাড়াহুড়ো।

অনেক দেশের অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার পর ল্যাক্‌স্‌নেস এবার মনস্থ করলেন স্বদেশেই স্থায়ী আস্তানা পাতা দরকার। তাই রেকিয়াভিকের একটি পল্লীতে ছোটো একটা বাড়ি কিনলেন এবং বিয়ে করলেন। এ সময়ে ওঁর বয়স ছিল আটাশ।

সাহিত্যসাধনার পরিণত রূপ—এর দু'বছর পরে কয়েক বছরের পরিশ্রমে লেখা ল্যাক্‌স্‌নেসের সুবৃহৎ উপন্যাস দু'খণ্ডে প্রকাশিত

হলো—'ও পিয়োর ভাইন,' 'বার্ড অব দি শোর'। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সালকা ভলকা' নাম দিয়ে এ উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হলো। 'সালকা ভলকা' প্রকাশিত হবার পর থেকে স্বদেশে যেমন সাহিত্যসেবী হিসেবে ল্যাক্‌স্‌নেস নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলেন, দেশের বাইরে ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, এবং রুশ ভাষাভাষী অঞ্চলেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। কারণ এ চারটি ভাষাতেই প্রায় একই সময়ে 'সালকা ভলকা' ছাড়াও ওঁর আরো দু' একটি রচনার অনুবাদ প্রকাশিত হলো। স্বদেশের সরকার ঘোষণা করলেন যে, এখন থেকে সারাজীবন সাহিত্যসাধনার পথ সুগম করবার জন্যে ল্যাক্‌স্‌নেসকে একটা বাৎসরিক ভাতা দেওয়া হবে।

সালকা ভলকা—ইস্‌ল্যাণ্ডের উত্তরে একটি বন্দর আছে, তার নাম ওসেরি। শিগুরলিনা আর তার মেয়ে সালকা প্রধানত এই দু'টি নিঃসহায় মানুষ, মা ও মেয়ের জীবনকে কেন্দ্র করে ল্যাক্‌স্‌নেস স্বদেশের একটি শহরের নিম্নবিত্তদের কাহিনী পরিবেশন করলেন। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান সাহিত্যিকদের কৃষকজীবন-কেন্দ্রিক সাহিত্যরচনার যে প্রবণতার কথা আমরা আলোচনার গোড়াতেই বলেছি 'সালকা ভলকা'তে ঠিক তা নেই, কিন্তু হামসুনের বাস্তববোধ এবং বয়ারের মুক্তিকামী মানবাত্মার ক্রন্দন শোনা যায়—একটু পরিচ্ছন্ন জীবন, সকলের সামনে অকপটে মুখ তুলে দাঁড়ানো যায় এরকম একটু সরলতার পরশ—এটুকুও কি মানবজীবনে আশা করা যেতে পারে না? শিগুরলিনা আর সালকা চোখের ওপর দেখতে পায় চতুর্দিকে চোর, বদমায়েস, ফাঁকিবাজ মানুষের ভীড়; কেউ লালসা-সর্বস্ব, কেউ বা সম্পদ-সর্বস্ব, কেউপ্রকাশ্যে নিষ্ঠুর, কেউ কপট, ধূর্ত। পবিত্র স্বভাবের কিশোরী সালকার চোখে একদিন তার মা-ও ধরা পড়ে গেলো। ও জানলো যে মা-ও আদর্শ মানুষ নয়। সালকা ভলকা উপন্যাস ট্রাজিকধর্মী। তরুণী সালকা ঘটনার আবর্তে এক সময়ে নাবিকদের একটি সরাইখানার সঙ্গে যুক্ত হলো। ওর পূর্ব-পরিচিত একটি যুবক আর্নালদুর একজন নাবিক। এবার নতুন করে আবার ঘনিষ্ঠতা হলো আর্নালদুরের সঙ্গে। কিন্তু এর পরিণতি মধুর হলো না। একদিন তার জাহাজ রওনা হলো দক্ষিণে আর ফিরলো না। সালকার জীবন হয়ে উঠলো সম্পূর্ণ রিক্ত—আধুনিক পৃথিবীর বাস্তব রূপ।

'সালকা ভলকা' প্রকাশের পর কয়েক মাসের জন্যে ল্যাক্‌স্‌নেস আর একবার বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। এবার দেখলেন রাশিয়া, জার্মানী আর স্পেন।

দি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপল্—স্বদেশে ফিরে এসে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করলেন 'দি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপল্।' এ উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হলো ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। এবং তারপর থেকে দেশ-বিদেশের সাহিত্য সমালোচক-মহল একবাক্যে স্বীকার করে আসছেন যে, ল্যাক্‌স্‌নেস বর্তমান শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টা। এ উপন্যাস ল্যাক্‌স্‌নেসের নিজস্ব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি তো বটেই, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ধারার সার্থক এবং উন্নততর সাক্ষ্যও বটে। কৃষকজীবনকে কেন্দ্র করে সেলমা লেগারলফ, সিগ্রিড উনসেট, ন্যুট হামসুন, জোহান বয়ার বা এণ্ডারসন নেক্‌সো যে বিশেষ ধরনের সৃষ্টির জন্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন 'দি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপল্' রচনা করবার পরে এ কথা বলা চলে যে, ল্যাক্‌স্‌নেস তাঁর পূর্বসূরিগণের পাশে নিজের যোগ্যস্থান করে নিলেন।

'দি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপল্'-এ ল্যাক্‌সনেস স্বদেশের কৃষক সমাজের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেছেন পাঠক সমাজের সামনে। এ বই এ যুগের একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি তো বটেই, একটা দেশের কৃষক সমাজের বাস্তব অবস্থার নিখুঁত চিত্রও বটে! 'দি গ্রেট হাঙ্গার'-এর নায়কের মতো এ উপন্যাসের নায়ক বিয়ার্তুরও বলতে গেলে একটা অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করে চলেছে নানা প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে। কখনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে, কখনো কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। পার্ল বাকের ওলানের মতো নিঃস্ব নিঃসঙ্গ কৃষক নিজের শ্রমশক্তির ওপর ভরসা রেখে এক সময় জীবন শুরু করলো। ক্রমে প্রতিষ্ঠা এলো ওর জীবনে। বিয়ে করলো। ছেলে মেয়ে হলো। স্ত্রী ওকে ছেড়ে চলে গেলো। মেয়ে এবং ছেলে দু'টি প্রকৃতির দান স্বাধীনতার স্পৃহায় বাপের অবাধ্য হলো। যে বিত্তের অধিকারী হয়েছিলো বিয়ার্তুর তা'ও শেষ পর্যন্ত আবার ঋণের দায়ে হাতছাড়া হয়ে গেলো—যে কাহিনীর শুরুতে বিয়ার্তুর একা সমাপ্তিতেও সে একা। এই রকমই ঘটে থাকে জীবনে।

'লাইফ অফ দি ওয়ার্লড', 'দি বেল অব থাইল্যাণ্ড', এবং 'দি হ্যাপি ওয়ারিয়রস' ল্যাক্‌সনেসের অন্যান্য জনপ্রিয় উপন্যাস। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাক্‌সনেস স্তালিন পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লাভ করেন নোবেল পুরস্কার।

আলবের্তো মোরাভিয়া

ইয়োরোপের সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ব্রিটিশ যুগে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই হয়েছিল। এবং ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য যে কী উন্নত, কতো বিরাট, স্বাধীনতালাভের পূর্ব পর্যন্ত তা' আমরা স্কুল-কলেজে মুখস্থ করতে বাধ্য হতাম। ক্রমে, গোটা ভারতে ইংরেজী শাসন এবং শিক্ষা কায়েম হবার পরে ইংরেজী বইয়ের মাধ্যমেই আমরা জানতে পেরেছি ইতালীর কাছে ইংরেজী সাহিত্য কতটা ঋণী। ইংলণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁরা প্রকৃতই স্তম্ভবিশেষ, সেই চসার, স্পেন্সার, সেক্সপীয়ার, ড্রাইডেন, মিলটন প্রভৃতি ইতালীর কাব্য-সাহিত্য ও ইতিহাস থেকে মালমশলা বা ভাবধারা গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। এঁদের পরবর্তীকালে বায়রন, শেলী, কীটস্, ব্রাউনিং, ল্যাণ্ডর প্রভৃতি তো সশরীরেই আসতেন ইতালীতে নতুন নতুন প্রেরণা লাভের আশায়।

নেহাৎ কল্পিত, প্রায়-অসম্ভব কেবলই 'রসঘন' এ রকম রোমান্সের কদর কমে এসেছে। কিন্তু অনেক দেশে এর কিছুটা ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যে পরিমাণে বাস্তব জীবনের সমস্যা সাহিত্যে প্রতিফলিত হওয়া উচিত ছিলো কার্যতঃ তা হয়নি—রোমান্টিকতার আতিশয্য রয়ে গেছে। বর্তমানের ইতালী এই রকম একটি দেশ। ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের তুলনায় আজকের ইতালীয় সাহিত্যে জীবনের বৈচিত্র্যের খুবই অভাব। ইতালীয় সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য আজকের দিনেও রোমান্স। আধুনিক ইতালীয় সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী লেখক আলবের্তো মোরাভিয়া এ কথার সাক্ষ্য দেন। কাজেই এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, প্রাচীন রোম নয়, আধুনিক ইতালী, চার পাঁচ শ' বছর কেন, এমন কি দেড় শ' বা দু'শ বছর আগেও যেমন ইয়োরোপকে মহৎ সৃষ্টিতে প্রেরণা জুগিয়েছে, আজকের ইতালী সে গৌরবের আসন থেকে চ্যুত হয়েছে।

প্রথম জীবন—রোমের এক বিখ্যাত স্থপতির ছেলে আলবের্তো মোরাভিয়ার (Alberto Moravia, born in 1909) একেবারে বাল্যবয়স থেকেই আশা ছিলো বাবার মতো স্থপতি হবার। বাবার পরিকল্পনায় তৈরী বড় বড় প্রাসাদোপম চার তলা পাঁচ তলা বাড়ির সামনে থমকে দাঁড়াতেন মোরাভিয়া, আর কল্পনায় নিজের ভবিষ্যৎ দেখবার চেষ্টা করতেন। বারো

বছর বয়সের সময় স্কুল ছুটির পরে অনেক সময়ই মোরাভিয়াকে দেখা যেতো অন্যান্য সমবয়সীদের সঙ্গে খেলা ধুলোয় না মেতে বাড়িতে বাবার অফিস ঘরে বাড়ি-ঘরের প্ল্যানগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। এক সময়ে বাবা বাড়িতে ঘোষণাও করলেন যে আলবের্তোকে স্থপতির কাজেই লাগানো হবে স্কুলের পড়াশুনা শেষ করবার পরে।

তখনো দু'বছর বাকী স্কুলের শেষ পরীক্ষার। মহা উৎসাহে পড়াশুনো চালিয়ে যেতে লাগলেন মোরাভিয়া। কিন্তু ঠিক এক বছরের মাথায় এক মহাসঙ্কট দেখা দিলো। প্রায়ই বিকেলের দিকে জ্বর জ্বর ভাব, ভয়ঙ্কর কাশি সর্বক্ষণ, ক্ষিদে বলতে কিছু নেই, রাতে বেশ একটু একটু করে ঘাম হ'তে লাগলো কিছু দিন ধরে। পরপর কয়েকজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করলেন মোরাভিয়ার আত্মীয়-স্বজনেরা। ডাক্তারবাবুরা পরস্পর-বিরোধী কথা বলতে লাগলেন। কেউ বললেন দুর্বলতা, কেউ বললেন ব্রঙ্কাইটিস আবার কেউ সরাসরি টি. বি. হয়েছে বলে ঘোষণা করলেন।

একথার পর মোরাভিয়ার বাবা একটা স্যানাটোরিয়ামে ওঁর থাকবার বন্দোবস্ত করলেন। স্থাপত্যবিদ্যার ওপর কতকগুলি বই একটা বড়ো স্যুটকেশে পুরে নিয়ে একদিন স্যানাটোরিয়ামের উদ্দেশে রওনা হলেন মোরাভিয়া। স্যানাটোরিয়ামে আসবার পরে প্রথম কয়েকটা মাস স্থাপত্যবিদ্যার বই ছাড়া আর কিছুই পড়তেন না উনি। কিন্তু স্যানাটোরিয়ামের অন্যান্য বয়স্ক রোগীদের সঙ্গে মেলামেশার পর কিছু কিছু সাহিত্যের বইও পড়তে আরম্ভ করলেন। বিশেষ করে ইংরেজী এবং ফরাসী গল্প ও উপন্যাসের ইতালীয় অনুবাদ। এই ভাবে বছর খানেক কাটবার পরে মোরাভিয়া ঠিক করলেন ইংরেজী এবং ফরাসী দু'টো ভাষাই শিখে ফেলবেন। ইতিমধ্যে ডাক্তারবাবুরা জানিয়েছিলেন যে পুরো দুটো বছরই কাটিয়ে যেতে হবে স্যানাটোরিয়ামে। মোরাভিয়া তাই ঠিক করলেন যে স্যানাটোরিয়াম ছাড়বার আগেই ইংরেজী এবং ফরাসী, এ ভাষা দুটো তো মোটামুটি আয়ত্ত করতেই হবে, উপরন্তু এক-আধটা গল্প লেখবারও চেষ্টা করতে হবে।

সাহিত্যসাধনার শুরু—দু'বছর বাদে স্যানাটোরিয়াম থেকে বাড়ি ফিরে কয়েক মাসের চেষ্টায় একটি লেখা শেষ করলেন মোরাভিয়া। বেশ ছোট্ট একখানা উপন্যাস। নাম করলেন 'দি ইনডিফারেণ্ট ওয়ানস্'। অনেক চেষ্টা তদ্বির করবার পর এক প্রকাশক রাজী হলেন বইখানা

ছাপিয়ে বার করতে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ছাপার অক্ষরে বেরোলো 'দি ইনডিফারেণ্ট ওয়ানস'। এ বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী একজন হবু স্থপতিকে হারালো, কিন্তু সাহিত্য জগৎ পেলো একজন সত্যিকারের স্রষ্টাকে। এ বই প্রকাশের পাঁচ-ছ মাসের মধ্যে খাস ইতালীয় সাহিত্য রসিক মহলে একজন তরুণ এবং উদীয়মান লেখক হিসেবে আলবের্তো মোরাভিয়ার নাম সুপরিচিত হয়ে উঠলো। মোরাভিয়ার আসল পদবী হলো "পিনকারলি" 'আলবের্তো পিনকারলি'—সাহিত্যের আসরে নেমে উনি নিজের নতুন নামকরণ করলেন 'আলবের্তো মোরাভিয়া,' এ নাম আজ বিশ্বসাহিত্যে অমরত্ব অর্জনে অভিলাষী।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বাইশ বছরে মোরাভিয়ার প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে উনিশ শ' পঁয়ষট্টি খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আরো তেইশখানা বই বেরিয়েছে ওঁর, যার মধ্যে অন্ততঃ এগারোখানার বহুল প্রচার হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এ বইগুলি হলো—'দি উয়োম্যান অব রোম,' 'বিটার হনিমুন,' 'কনজুগাল লাভ,' 'দি ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি,' 'এ গোস্ট এ্যাট মুন,' 'রোমান টেলস,' 'টু উইমেন,' 'দি ওয়েওয়ার্ড ওয়াইফ,' 'টু এ্যাডলেসেণ্টস্,' 'দি হুইল অব ফরচুন,' 'দি কনফরমিষ্ট' প্রভৃতি।

মোরাভিয়ার উপজীব্য বিষয়—বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে ব্যক্তিমানুষ বা গোষ্ঠী কিম্বা গোটা সমাজের নানা বিচিত্র অবস্থা নিয়ে যে পরীক্ষাকার্য চলছে, মোরাভিয়ার রচনায় তার কোনো বলিষ্ঠ ছায়া পড়েনি। কোনো বিরাট পরিবেশ বা বিরাট রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্যা নিয়ে মোরাভিয়া তাঁর কোনো গল্প বা উপন্যাসে কোনো মতবাদ প্রচার করতে প্রয়াসী হননি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী খুবই সীমাবদ্ধ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মোরাভিয়ার রচনার বিষয়বস্তু মানুষের যৌন সমস্যা বা প্রেম। বিংশ শতাব্দীর উপন্যাসে জীবনের একটা সমগ্র রূপ আঁকবার যে প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে, মোরাভিয়া সে-দিকটা সতর্কভাবে এড়িয়ে এসেছেন এখন পর্যন্ত। সেইজন্যই এক শ্রেণীর পাঠক ও সমালোচক স্পষ্টই বলে থাকেন যে, মানুষের লালসাবোধে ইন্ধন জোগানোই মোরাভিয়ার উদ্দেশ্য। মহৎ সাহিত্যসৃষ্টির কথা উনি ভাবতে পারেন না। অথচ জীবন সম্পর্কে যে মোরাভিয়ার অভিজ্ঞতা কম তা' নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে

মেলামেশা করেছেন মোরাভিয়া, নানা বিষয়ে পড়াশুনোও ওঁর প্রচুর, বেশ কিছুদিন সাংবাদিকতা করেছেন, বিভিন্ন দেশ ঘুরেছেন।

টু এ্যাডলেসেণ্টস্—মোরাভিয়ার বিভিন্ন রচনায় নানা বয়সের চরিত্র আছে। কিন্তু মনে হয় সব চাইতে দক্ষতা দেখিয়েছেন উনি কিশোর এবং কিশোরীদের চরিত্র-চিত্রণে। কিশোর মানসিকতার সম্বন্ধে সাধারণত যে-সব ধারণা প্রচলিত, মোরাভিয়ার "টু এ্যাডলেসেণ্টস্" বা "টু উওমেন" পড়লে তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সন্দেহ জাগবে মনে। প্রসঙ্গত "টু এ্যাডলেসেণ্টস্"র কথা বলা যেতে পারে। এর একটি কাহিনী 'এ্যাগসটিনো'তে দেখা যায়, একটি কিশোর তার মায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কিছুদিন কাটাবার পর কার্যত ভুলতে বসেছে যে সে তার মা। কিশোরের চিন্তায় এমন অনেক মুহূর্ত দেখা যাচ্ছে যখন মা আর তাঁর স্বাভাবিক, সুস্থ এবং সুন্দর মর্যাদামণ্ডিত আসনে থাকছেন না, নিছক একজন নারী হিসেবে কিশোরের কাছে প্রতিভাত হচ্ছেন। 'ঈডিপাস কমপ্লেক্স'কে কেন্দ্র করে এই যে কাহিনী রচনা এটা মোরাভিয়ার এমন কিছু নিজস্ব নয়। স্বয়ং সোফোক্লেস থেকে আরম্ভ করে অনেকেই লিখে গেছেন এ সম্পর্কে। সোফোক্লোসের ঈডিপাস শারীরিক এবং মানসিক পীড়নের মধ্য দিয়ে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে কালজয়ী নিদর্শন রেখে গেছে। তার পরবর্তীগণ বেশির ভাগই সমস্যাটার অনিবার্যতা উপলব্ধি করলেও বেশ কিছুটা আদেশ, উপদেশ, বা নির্দেশ দিয়ে কিশোরের মনকে সংযত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু আসলে সমস্যটার গভীরতাটাকে বেশির ভাগ সাহিত্যস্রষ্টাই এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছেন, কিম্বা আদৌ বুঝবার চেষ্টা করেন নি। এ ক্ষেত্রে মোরাভিয়ার একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো তিনি সমস্যাটা বুঝবার চেষ্টা করেছেন। উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায়, নীতি-বিরুদ্ধ এবং নীতি-সঙ্গত কাজ বা চিন্তা এ সম্বন্ধে কিশোর মনে যে দ্বন্দ্ব, এবং এই দ্বন্দ্ব সমাধান না করতে পারার জন্য যে একটা অসহায় অবস্থা তা মোরাভিয়ার এই কাহিনীতে আশ্চর্যরূপে ফুটে বেরিয়েছে।

টু উওমেন—কিশোর বয়সের অনেকগুলি চরিত্রই সৃষ্টি করেছেন মোরাভিয়া। তবে সব দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে মনে হয় "টু উওমেন"এ রোসেটার চরিত্রই সবার উপরে স্থান পাবার যোগ্য। রোসেটা এক বিধবার মেয়ে। বিধবা হলেও রোসেটার মায়ের বয়স খুব বেশি নয়। রোসেটাই

মায়ের প্রথম এবং একমাত্র সন্তান। রোসেটা যখন কৈশোরে পা দিলো, ওর মায়ের তখন বলতে গেলে ভরা যৌবন। একমাত্র সন্তানকে নিয়ে সুখে দুঃখে একভাবে কাটছিল বিধবার। এমন সময় শুরু হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডব। শহরে বোমা পড়তে আরম্ভ হলো। মেয়ের নিরাপত্তার আশায় বিধবা শহর ছেড়ে চলে এলো দূর শহরতলীর এক গণ্ডগ্রামে। শহরে থাকতে এক দোকানদারের সঙ্গে মায়ের মেলামেশাকে ভালো চোখে দেখতো না রোসেটা। লোকটা যেন কেমন করে তাকায়, মুখে কথাটি না বললেও চোখে চোখে যেন ওরা কত কিছুই ব্যক্ত করে—সব কিছুই নজরে আসে রোসেটার। কিন্তু কিছুই ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারে না।

তরুণী বিধবাটি যৌবনের তাড়নায় প্রতিমুহূর্তেই ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে মরছে তা ঠিক, কিন্তু মেয়ের সুখসুবিধা, আদর যত্ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও তার কিছুমাত্র ত্রুটি দেখা যায় না। মেয়েই তার প্রাণ। জীবনে যখনই কোনো পুরুষের সংস্পর্শে এসেছে রোসেটার মা তখনই দেখেছে ওরা নারীর দেহের প্রতি কি জঘন্যভাবে এবং কতো অনায়াসে আকৃষ্ট হয়, তার মনের দিকটা ভুলে গিয়ে। স্বভাবত বুদ্ধিমতী রোসেটার মা তাই পুরুষমানুষদের কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখে। যে গ্রামে এসে আশ্রয় নিলো ওরা সেখানে আরো কয়েকজন নরনারী ইতিমধ্যেই এসে আশ্রয় নিয়েছিলো। রোসেটা অবাক হয়ে যায় তার মাকে নরনারী নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সমানতালে মিশতে দেখে। এইখানেই একটি পরিবারের ছেলে মাইকেলের সঙ্গে পরিচয় হলো মা-মেয়ের। ছেলেটি বয়সে তরুণ, শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, সবার উপরে কথা হলো ও সৎ-প্রকৃতির। রোসেটার মা সারা জীবনে এই প্রথম একজন পুরুষমানুষের সাক্ষাৎ পেলো যে তার দেহের প্রতি কুনজর দেয় না। কাজেই বেশ একটু আকৃষ্ট হলো ও মাইকেলের দিকে। এদিকে রোসেটারও বয়স বাড়ছে। কেমন যেন একটু ভাল লাগে মাইকেলকে, অথচ ঠিক কেন যে ভালো লাগছে তা বুঝে উঠতে পারছে না। মাকে অনেক সময় অগোছালো-ভাবে প্রশ্ন করে বসে রোসেটা মাইকেল সম্বন্ধে। অভিজ্ঞ তরুণী বিধবা সবই বুঝতে পারে। মেয়ের কথা চিন্তা করে রোসেটার মা ক্রমশ মাইকেলের প্রতি নিজের দুর্বলতাকে দমন করতে আরম্ভ করে। দেখতে দেখতে মাইকেলের প্রতি রোসেটা মনে মনে বেশ খানিকটা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। মাইকেল হয়ে উঠলো ওর স্বপ্নের আদর্শ পুরুষ। এদিকে যুদ্ধের মোড়

ঘুরলো। ইতালী আত্মরক্ষা করতে অক্ষম প্রতিপন্ন হলো। দেশের সর্বত্র জার্মান সৈন্যদল টহলদারী শুরু করেছে। এই রকম একদল জার্মান সৈন্য একদিন মাইকেলকে ধরে নিয়ে গেলো পথ-প্রদর্শক হিসেবে। ক্রমশঃ গ্রামে খাদ্যাভাব দেখা দিলো। সবাই মিলে এক জায়গায় না খেয়ে মরার চাইতে যে যেদিক সম্ভব আশ্রয় এবং খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। রোসেটাকে নিয়ে ওর মা-ও অনির্দিষ্টভাবে পথে নামলো।

অনিশ্চিতভাবে পথে পথে ঘুরলেও রোসেটা মাইকেলের কথা ভুলতে পারে না। পথ চলতে চলতে মেয়ে মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে তা মায়ের চোখ এড়ায় না। হয়ত একটা ধমক দেয়, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও ভাবে যে নিশ্চয়ই মাইকেলের সঙ্গে আবার দেখা হবে, মেয়েটার মুখেও আবার হাসি ফুটবে। একদিন রাতের বেলা পথ চলার ফলে হতশ্রান্ত মা-মেয়ে বোমায় বিধ্বস্ত একটা গির্জায় আশ্রয় নিলো। এইখানেই সর্বনাশ হলো রোসেটার। একদল সৈন্যের কবলে পড়লো ওরা। রোসেটা হলো ধর্ষিতা। মা দেখলো একটুক্ষণের ব্যবধানে মেয়ের মুখ থেকে সমস্ত পবিত্রতা লুপ্ত হয়ে গেছে। ফুলের মতো সুন্দর তার মেয়েটার সর্বাংগে পুরুষের নারকীয় রিরংসার পরশ। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো দুঃখিনী জননী। প্রতিকার চাইলো মানুষের কাছে, ভগবানের কাছে। শেষ পর্যন্ত আশ্রয় আবার একটা পেলো ওরা। কিন্তু জীবন ওদের অনেক বদলে গিয়েছিলো। জীবন সম্পর্কে পবিত্রতার ধারণা একেবারেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল রোসেটার। এখন ও স্বেচ্ছায় নিজের দেহ বিকোতে শুরু করলো। মা শাসন করতে চাইলো, কিন্তু পারলো না। ভাগ্যের ওপর অভিমানেই যে রোসেটা নিজেকে পঙ্কিলতার অতল জলে ডুবিয়ে দিচ্ছিলো তা ও অবশ্যই বুঝতে পেরেছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় রোসেটা আবার নিজেই নিজেকে উদ্ধার করলো সংযমের পথে—যেদিন জানতে পারলো যে মাইকেল আর ইহজগতে নেই। জার্মান সৈন্যরা মেরে ফেলেছে ওকে।

এই ছোট কাহিনীটির মধ্যে মোরাভিয়ার শিল্পনৈপুণ্য দেখলে বিস্মিত হতে হয়। লালসা উদ্রেককারী রচনার প্রতি তাঁর প্রবণতা সম্বন্ধে যে অখ্যাতি আছে তা' স্বীকার করেও কৈশোর আর তারুণ্যের সন্ধিক্ষণকে যে দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন মোরাভিয়া, তাও নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। এ রচনাটিতে যৌনতা যতটুকু দেখা যায় তা কিছুটা স্বাভাবিকভাবে এসেছে।

শুধু মাত্র যৌনজীবনে রঙ ফলাবার জন্যই যৌনতার অবতারণা করা হয়নি। কিশোর বয়সের যৌন জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে যেটুকু বলা হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি বিশ্লেষণ করা হয়েছে কিশোর বয়সে জীবন সম্পর্কে যে পবিত্রতার ভাবটা থাকে সে সম্বন্ধে।

সাহিত্যসাধনার পরিণত রূপ—দি উওম্যান অব রোম— ইয়োরোপ-আমেরিকার সমালোচক এবং সাহিত্যরসিক মহলের বেশির ভাগই একথা স্বীকার করে থাকেন যে, মোরাভিয়ার "দি উওম্যান অব রোম" সাহিত্যশৈলীর দিক থেকে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এ বিষয়ে আমরাও একমত। কিন্তু এ বইয়ের বিষয়বস্তু এবং নীতিবোধের দৈন্য দেখে অনেকেই ব্যথিত হয়েছেন। রচনাটির কাহিনী ভাগ এই রকম—একটি তরুণী মেয়ে, নাম তার আদ্রিয়ানা। সংসারে মা ছাড়া আর কেউ নেই ওর। কাজেই মা যেমন মেয়ের প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট, মেয়েও প্রায় সমান আকৃষ্ট মায়ের প্রতি। আদ্রিয়ানা একেবারে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে তার মা দর্জির কাজ করে অতি কষ্টে সংসার চালায়। মায়ের কষ্ট লাঘব করবার জন্য ও সব কিছুই করতে প্রস্তুত। আদ্রিয়ানার মা মাঝে মাঝেই ওকে একটা কথা শোনায়। সে হলো : 'আমার যা কিছু দুঃখ কষ্ট তা তোমারই জন্য।' ব্যাপারটা হ'লো—আদ্রিয়ানার মা একটা ষ্টুডিয়োতে মডেলের কাজ করতো। সেইখানেই একটি লোকের সঙ্গে ওর প্রথম পরিচয়, তারপর বেশ ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার ফলে একদিন টের পেলো নতুন একজন আসছে, তাই বাধ্য হয়ে বিয়ে করতে হলো লোকটিকে। যথাসময়ে জন্ম হলো আদ্রিয়ানার।

আদ্রিয়ানার বাবা ছিল রেল বিভাগের একজন কর্মচারী। বাবার মৃত্যুর পরে আদ্রিয়ানার মা-ই সংসার চালাচ্ছে। ওদের চলছে অতি কষ্টে। ষ্টুডিওতে ফিরে গিয়ে আর রোজগারের আশা নেই, কারণ আদ্রিয়ানার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে এসেছে দারুণ পরিবর্তন। কাজেই দর্জির কাজ করতে হচ্ছে ওকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও। আদ্রিয়ানাও যাতে ভুল না করে তার মতো, সেইজন্য মায়ের চিন্তার অবধি নেই। সময় এবং সুযোগ পেলেই মেয়েকে ও মাঝে মাঝে উপদেশ দেয় : 'কাউকে যেন কখনো ভালোবেসে ফেলো না। বাঁচতে হলে আমাদের টাকা চাই। এবং সে টাকা তোমার দেহকে সম্বল করেই রোজগার করতে হবে। আপাততঃ তোমাকেও ষ্টুডিয়োর

মডেল হতে হবে। আর সব সময় মনে রাখবে ভবিষ্যতে বিত্তবান লোকজনের সঙ্গে জানাশোনা এবং যোগাযোগের একটি সোপান হচ্ছে ষ্টুডিয়ো।'

মায়ের মতো জীবনে কোনো ব্যর্থতার তিক্ত অভিজ্ঞতা নেই, তা' ছাড়া স্বভাবতই কিছুটা সরল প্রকৃতির তরুণী আদ্রিয়ানা মায়ের প্রতিটি কথা সত্যি বুঝবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না। তার কারণ ওর মনটা ছেলেবেলা থেকেই একটু অন্য ধাঁচে গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল। নিজেদের অসীম দারিদ্র্য, উপযুক্ত পোশাকের অভাব এবং সঙ্গীসাথীর অভাবে ছেলেবেলা থেকেই বলতে গেলে আদ্রিয়ানা বাড়ির ঘরোয়া আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। নিজের রূপের যাতে উপযুক্ত সুযোগ নিতে পারে ও সেজন্য বেশ কিছুদিন ধরেই মা ওর মন তৈরী করবার চেষ্টা করে আসছে। ওর রূপ যে সত্যি অসামান্য—এ রকম চোখ যে আর হয় না, এ রকম উন্নত বক্ষ যে ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদের লক্ষণ, ওর প্রতিটি অঙ্গের গঠনের যে একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে এসব কথাগুলি একেবারে কিশোরী বয়স থেকেই প্রতিনিয়ত বেশ জোরের সঙ্গে আদ্রিয়ানা শুনে আসছে ওর মায়ের কাছ থেকে। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। অর্থাৎ ওর মা যা চেয়ে আসছে এতদিন ধরে ঠিক তার বিপরীত একটা মানসিকতা দেখা দিয়েছে আদ্রিয়ানার ভেতরে। নিজের রূপের পুরো সুযোগ নেবার জন্য আদ্রিয়ানার অবতেচন মন ক্রমশঃ তৈরী হতে লাগলো। এবং তা বিত্তবান লোকদের ঠকাবার জন্য নয়—মনের মতো মানুষকে জয় করবার জন্য। ঘর বাঁধবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো আদ্রিয়ানার সমস্ত দেহ-মন। এমনি ধারা মিষ্টি মনোভাবসম্পন্ন একটি মেয়েকে পেটের জন্য এবং মায়ের পরামর্শমতো জীবন শুরু করতে হচ্ছে এক আর্টিষ্টের ষ্টুডিয়োতে এসে এবং এ বইয়ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতেই দেখা যাচ্ছে ষোড়শী আদ্রিয়ানা সম্পূর্ণ বিবসনা হয়ে একটি ষ্টুডিওতে দাঁড়িয়ে। আর তার মা রীতিমতো বক্তৃতা শুরু করলো গোবেচারা আর্টিষ্টকে লক্ষ্য করে: 'দেখুন তো, দেখুন, কী বুক, কী নিতম্ব, আর পা দু'খানি? আঃ! এ রকম আর কোথায় পাবেন!'

বইয়ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থেকে এই যে নায়িকার আবরণ কেড়ে নেওয়া শুরু হলো, গোটা বইখানার ওপর, পুরো তিন শত একাশি পৃষ্ঠা জুড়ে দেখা যায় তার ছাপ। কার্যত আদ্রিয়ানাকে বিবস্ত্র করে ফেলার বর্ণনা অবশ্য যে পাতায় পাতায় হয়েছে তা' নয়—মোট হয়তো দশ-বারো বার হয়েছে, কিন্তু

আগে-পরে ওর দেহসৌষ্ঠবের যে-বর্ণনা মোরাভিয়া দিয়েছেন তাতে প্রায় সমস্তক্ষণই মেয়েটা যেন তার সমস্ত নগ্নতা নিয়ে পাঠকের চোখের সামনে ভাসতে থাকে। এটা একদিক থেকে যেমন মোরাভিয়ার শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেয়, তেমনি তাঁর ভাবধারার দৈন্য প্রকাশ করে। শুধুমাত্র লালসা উদ্রেক করার জন্যই মোরাভিয়া বইখানা লিখেছিলেন তা হয়তো সরাসরি বলা যায় না, কিন্তু একথা স্বতঃই পাঠকের মনে দেখা যায় যে এইরকম একটা শিল্পদক্ষতা কি একটা মহত্তর সৃষ্টির জন্য—একখানা 'লা মিসারেবল', 'ওয়ার এণ্ড পীস্', 'টেল অব টু সিটিজ' বা নেহাৎ এ যুগের একখানা "ষ্টর্ম"-এর মতো সাহিত্যসৃষ্টির জন্য নিয়োগ করা যেতো না? একেবারে প্রথম লেখা থেকেই দেখা যায় মোরাভিয়া সাহিত্যের আসরে যখন নামছেন তখনই তিনি এক কথায় যাকে বলে একজন finished writer. প্রচুর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য তাঁর পড়া শেষ হয়েছিল বলে এবং বিরাট ইতালীয় Tradition তাঁর মধ্যে সহজাতভাবে রয়ে গেছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

মোরাভিয়া যে সমতুল্য দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও কখনো টলস্টয়, হুগো, ডষ্টয়েভস্কি, স্তাঁদাল, ডিকেন্স বা এরেনবুর্গ কিম্বা গোর্কির সমান স্তরে উন্নীত হতে পারেননি বা কখনো পারবেন বলেও মনে হয় না, তার কারণ জীবন সম্পর্কে ওঁর মহত্তর এবং উচ্চতর আদর্শের অভাব। 'লা মিসারেবল'-এ হৃদয়হীন লালসা বা নিষ্ঠুর দারিদ্র্য কম নেই, সেখানে তো মেয়েটাকে দাঁত এবং চুল পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছিল পেটের দায়ে। কিন্তু তবু লেখকের আদর্শবাদ ছিল, তাই যখন তাঁর নায়িকা নগ্ন বা প্রায়-নগ্ন হয়ে পড়েছে তখনো পাঠকের নজর তার দেহের দিকে না পড়ে মনের দিকে পরিচালিত হচ্ছে। মোরাভিয়াও যে তাঁর নায়িকার মন সম্পর্কে একবারে নির্বিকার তা নয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি তা হলো দেহ-উদ্দীপিত মন। মোরাভিয়ার আদ্রিয়ানাকে দেখলে এক বাঙালী পুরুষ-কবি এক সময় স্ত্রী-মানসিকতা সম্বন্ধে যে উক্তি করেছিলেন সেই কথাটা মনে পড়ে: 'দেহ ছাড়া আর কি আছে ওদের'। কোনো মহিলা এরকম উক্তি করলে যা মূল্য হয়, পুরুষদের উক্তি বলেই তা হয় না। আসল কথা হচ্ছে মোরাভিয়ার প্রধানতম উদ্দেশ্য হল গল্প বলা, নিছক গল্পই তিনি বলে যান, কোনো রকম সামাজিক বা রাজনৈতিক আদর্শের তোয়াক্কা না করে, তাই চরিত্রগুলি এমন কি পোশাক-আশাকে ঢাকা থাকলেও লালসার উদ্রেক করে।

যাই হক, আবার বইয়ের কথায় আসা যাক। ইতালীয় নায়িকাদের একটা ঝোঁক দেখা যায় পতঙ্গের মতো পুড়ে মরবার। আদি কবি ভার্জিলের এক নায়িকা কার্থেজের রাণী দিদোকে আমরা দেখেছি এনেসকে দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজেকে সমর্পণ করতে চাইলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে সোজা চিতা সাজিয়ে আত্মাহুতি দিলো। এবার দেখা যাক মোরাভিয়ার আদ্রিয়ানা কি করছে।

রোজ ষ্টুডিয়োতে যাবার জন্য যে ট্রাম ষ্টপে ওকে অপেক্ষা করতে হয় সেখানে দাঁড়িয়ে ও রোজই দেখে একটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক একটা গাড়ী ধোয়া-মোছা করছে এবং নানা অছিলায় তাকাচ্ছে ওর দিকে। যুবকটিকে ঘিরে ক্রমশঃ আদ্রিয়ানার চিন্তা দানা বাঁধতে আরম্ভ করলো এবং শেষ পর্যন্ত একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেই আদ্রিয়ানা যুবকটির দিকে এগিয়ে এলো। যুবকটি গাড়ীর দরজা খুলে দিলো। ও গিয়ে বসলো ভেতরে। গাড়ী ষ্টার্ট দিলো যুবকটি। পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি, নব্বই মাইল বেগে চলতে লাগলো গাড়ীটা। যুবকটির নাম গিনো। এক বড়লোকের ড্রাইভার। প্রেমে মশগুল হয়ে উঠলো আদ্রিয়ানা। মনে করতে আরম্ভ করলো ওর ঘর বাঁধবার বাসনা সত্যে পরিণত হতে চলেছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিয়ের কথাবার্তা উঠলো। মায়ের অমত সত্ত্বেও আদ্রিয়ানা ঠিক করলো গিনোকে বিয়ে করবে। সেই নিশ্চয়তায় একদিন আত্মদান করতেও দ্বিধা করলো না। আদ্রিয়ানার নিজের ভাষায়: "আমরা অনেকক্ষণ অন্ধকারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইলাম। আমরা তখন পরস্পরকে চুমো দিচ্ছিলাম। এ যেন একটা শ্রান্তিহীন চুমো। আমি যতোবার থামতে চাইছিলাম, গিনো আমাকে ছাড়ছিল না। আবার গিনো ছাড়তে চাইলে আমি ছাড়ছিলাম না। তারপর গিনো আমাকে ঠেলে দিলে···।"

আদ্রিয়ানার এই বিয়ের প্রস্তাবে ওর মায়ের প্রথম থেকেই কিছুমাত্র সমর্থন ছিলো না। কারণ, ওর দৃঢ় বিশ্বাস যে গিনো আদ্রিয়ানাকে প্রতারণা করবে। হ'লোও তাই শেষ পর্যন্ত। আদ্রিয়ানার ঘর বাঁধবার সুখস্বপ্ন শূন্যে মিলিয়ে গেলো। এরপর থেকে আদ্রিয়ানার ক্রমশঃ নৈতিক অধঃপতন হতে লাগলো। এবং ও একেবারেই সাধারণ গণিকাদের পর্যায়ে নেমে এলো। একটির পর একটি পুরুষ আসতে লাগলো ওর জীবনে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ও অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে এমন একজনের দ্বারা যাকে ও রীতিমতো ঘৃণা করে।

অকস্মাৎ একজনকে যদিও বা ভালো বাসলো কিন্তু সেও আদ্রিয়ানা এবং তার সন্তানের দায়িত্ব নেবার মতো শক্ত মানুষ নয়। আদ্রিয়ানার জীবনে দেখা দিলো বিরাট শূন্যতা। সারাজীবন ভালোবাসার জন্য ব্যাকুল একটি তরুণী বারবার আঘাত পেতে পেতে সমাজের সব চাইতে নীচুর ধাপে, নারীত্বের চরম অমর্যাদা মাথা পেতে নেবার পরেও আমরা দেখতে পাই সে এখনো ভালোবাসার জন্য ব্যাকুল।

আদ্রিয়ানার শেষ ভালোবাসার পাত্র মিনোর আত্মহত্যার পরে দেখা যায় ওর জীবনে এবং চিন্তাধারায় বিরাট পরিবর্তন এসেছে। ঘর বাঁধবার সামান্য আশাটা পূর্ণ হবার যে আর কোন সম্ভাবনাই নেই সেটা এতোদিনে বুঝতে পারে ও। তাই শেষ পর্যন্ত দেখা যায় আদ্রিয়ানা গির্জায় এসে যীশু ক্রোড়ে স্বয়ং মেরীর প্রতিমূর্তির সামনে ব্যর্থতার বিক্ষোভ, হতাশার যন্ত্রণা এবং নিদারুণ ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে এই বলে যে ভবিষ্যতে আর কোনদিন কোন পুরুষকে তার দেহস্পর্শ করতে দেবে না। ভালবাসার বাসনা মনে যতো সহজে দানা বাঁধে, বাস্তব জীবনে তার সাফল্য যে ততোই দুর্লভ বস্তু এতদিনে আদ্রিয়ানার মত সরল, ঈশ্বর-বিশ্বাসী, ঘরোয়া-প্রকৃতির মেয়েও সে কথা বুঝতে পারে।

এতো বড় ব্যর্থতার পর আদ্রিয়ানার আত্মহত্যা করা উচিত ছিলো বলে অনেক পাঠক-বন্ধুকে বলতে শুনেছি, অনেক সমালোচকও সে রকম কথা আভাসে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় আদ্রিয়ানার আত্মহত্যার কোন প্রয়োজন দেখা দেয়নি। কারণ অন্তত: তিনটি পুরুষের কাছ থেকে সে তার ভালবাসার কিছুটা প্রতিদানও পেয়েছে। প্রথমতঃ গিনো, যদিও প্রতারণা করেছে, কারণ সে যে বিবাহিতা, এমন কি একটি মেয়েও আছে তার, একথা চেপে গিয়ে ও আদ্রিয়ানার সঙ্গে মেলামেশা করেছে, ওর হৃদয় জয় করেছে ভালবাসা দিয়ে এবং বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেহও জয় করেছে। আদ্রিয়ানা দেহ বিক্রয় করেছে অনেকের কাছেই, গিনোকে ও দেহ বিক্রয় করেনি, দান করেছে। তাই আদ্রিয়ানা ক্রমে গিনোর স্ত্রী এবং কন্যার কথা জানতে পেরে যখন সরাসরি প্রশ্ন করলো গিনোকে—'এরকম চাতুরী করলে কেন?' গিনো স্পষ্ট এবং দ্বিধাহীন চিত্তে জোরের সঙ্গেই জবাব দিলো—"কারণ, আমি তোমাকে ভালবাসতাম।" "যদি প্রকৃতই তুমি আমাকে ভালবেসেছিলে," আদ্রিয়ানা বললো, "তাহলে নিশ্চয়ই তোমার চিন্তা করা

উচিত ছিলো গিনো, যে সত্যি কথাটা জানাবার পর আমি কত বড় আঘাত পাবো।…" "আমি সত্যি ভালবাসতাম তোমাকে," গিনো বাঁধা দিয়ে সংক্ষেপে শেষ করলো, "আর সেই ভালোবাসার জন্য আমার মাথার ঠিক ছিলো না।" আদ্রিয়ানার মতো ভালোবাসা পাবার জন্য ব্যাকুল মেয়ের কাছে এরপরে আর কোনো কৈফিয়ৎ প্রয়োজন হবাব কথা নয়। আর তা ছাড়া আইনের চোখে, সমাজের চোখে ব্যাপারটা চরম ভণ্ডামী এবং প্রতারণা মনে হলেও, এটা যে ভালবাসার জয় সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি। অস্তারিতা এবং মিনোর কাছ থেকেও আদ্রিয়ানা তার ভালবাসার কিছুটা প্রতিদান পেয়েছে। কাজেই একদিক থেকে আদ্রিয়ানার ভালবাসার ক্ষুধা কিছুটা তৃপ্ত হয়েছে। ও যে আত্মহত্যা করেনি তার প্রথম কারণ হলো এইটে। দ্বিতীয়ত, সমাজের চোখে ও পথের ধূলোর সামিল হয়ে গেলেও ও মা হতে চলেছে। অর্থাৎ এখন নিজেকে কিছুটা ভুলে থাকবার সময় এসে গেছে। কাজেই আদ্রিয়ানা যে আত্মঘাতিনী না হয়ে তার ভাবী সন্তানের কথা ভেবে নতুনভাবে পবিত্র জীবন শুরু করবার সিদ্ধান্ত নিতে পারলো এটা নিশ্চয়ই মোরাভিয়ার উচ্চতর মানবিকতাবোধের পরিচয় দেয়।

"দি উওম্যান অব রোম"-এ যৌন-মনোদর্শনের তথা স্ত্রী-মানসিকতার একটা জটিল সমস্যার অবতারণা করা হয়েছে। ব্যাপারটা আদ্রিয়ানার সন্তানের পিতৃত্বের সঙ্গে জড়িত। আদ্রিয়ানা জানে যে তার সন্তানের পিতা হলো রাজনৈতিক কর্মী সনজগ্‌নো—যাকে কখনোই ও ভালোবাসেনি। অথচ ও বলছে: "আজ পর্যন্ত যতো পুরুষের সংস্পর্শে এসেছি তাদের মধ্যে সনজগ্‌নো আমাকে যতটা পুরোপুরি অধিকার করতে পেরেছে, আমার সত্তার যতোটা গভীরে এবং অন্তরতম স্থলে প্রবেশ করতে পেরেছে ততোটা আর কেউই পারেনি। আমি যে তাকে মোটেই পছন্দ করতাম না এবং তাকে রীতিমতো ভয় করতাম, এবং সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার কাছে বিকোতাম এ সবই সত্যি—কি এসব সত্বেও বলতে হয় সনজগ্‌নো আমাকে যতোটা পুরোপুরি অধিকার করতে পেরেছিলো ততোটা আর কেউই পারেনি—গিনো, অস্তারিতা, এমন কি মিনোও নয়।…সেইজন্যই আমি এই রকম একটা ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছি যে এক শ্রেণীর পুরুষ মানুষের প্রকৃতি হলো প্রেমে পড়ে খুশী থাকা, আর এক শ্রেণীর কাজ হলো সন্তান উৎপাদন করা। কাজেই সনজগ্‌নো যে আমার সন্তানের জন্মদাতা এটা ঠিকই হয়েছে,

যদিও আমি ওকে আন্তরিক ঘৃণা করি এবং ওর কাছ থেকে পালিয়ে আসি মিনোর কাছে, কারণ প্রকৃতই মিনোকে আমি ভালোবাসি।"

কনজুগাল লাভ—যৌনক্ষুধার তৃপ্তি যে মানুষের জীবনের সার্থকতায় কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ সে কথা একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন মোরাভিয়া তাঁর "কনজুগাল লাভ" উপন্যাসে। এক জন তরুণ উদীয়মান ঔপন্যাসিক সিলভিয়ো এবং তাঁর স্ত্রী লেডা—এরা দু'টি এ বইয়ের প্রধান চরিত্র। সিলভিয়ো বিরাট একখানা উপন্যাস লিখবে মনস্থ করেছে। স্ত্রীকে ও সত্যি ভালোবাসে। কিন্তু নিজের অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখলো যে দাম্পত্য দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে চলবার জন্য লেখার দিকে মোটেই এগোতে পারছে না। শরীর এবং মন দু'দিকেই মাঝে মাঝে ক্লান্তি দেখা দেয়। তাই ওরা স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে ঠিক করলো যে ঐ বিরাট উপন্যাসখানা লেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওরা পরস্পরকে সবদিক দিয়েই এড়িয়ে চলবে। এর ফলে কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেলো লেডা তার স্বামীর এক বন্ধুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে—যার হাতে প্রচুর সময় আছে ওর সঙ্গে ব্যয় করবার মতো এবং যে ওর সমস্ত রকম খেয়াল মেটাতে পারে।

এ গোষ্ট এ্যাট মুন এবং **দি ওয়েওয়ার্ড ওয়াইফ**-এও আমরা দেখতে পাই মেরোভিয়া, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, সন্দেহ প্রভৃতির নানা সাধারণ পরিবেশ সৃষ্টি করে মানুষের জীবনে যৌনক্ষুধার প্রাধান্য এবং প্রবলতা প্রতিপন্ন করতে সাধ্য-মতো চেষ্টা করেছেন। এদিক থেকে ওঁর গল্পের বই **বিটার হনিমুন** এবং **রোমান টেলস্‌** কিছুটা ভিন্ন ধর্মী রচনা। মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা যে যৌনতৃপ্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়, একাধিক গল্পের মধ্যে মোরাভিয়া সে কথা বলবার চেষ্টা করেছেন।

দি ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি—"দি ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি" এবং "দি কনফরমিষ্ট" অন্য সমস্ত বইয়ের চাইতে একটু ভিন্ন, তথ্যের দিক থেকে এ দু'টি বইতে মোরাভিয়াকে দেখা যায় কিছুটা সমাজ-সচেতন লেখক হিসেবে। এর মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ "দি ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি"-র একটি বিশেষত্ব আছে। এক কথায় গণতন্ত্র-বিরোধীদের নিয়ে বেশ কিছুটা ব্যঙ্গ করেছেন মোরাভিয়া তাঁর এ বইতে। বইখানি প্রকাশের ব্যাপারও কিছুটা নাটকীয়। মোরাভিয়া ছিলেন ফ্যাসি-বিরোধী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের কথা, মুসোলিনী ছিলেন তখনকার ইতালীর সর্বময় কর্তা। তখন ওদেশে নিয়ম ছিলো,

ছাপার অক্ষরে কিছু প্রকাশ করতে হলে আগে সরকারী দপ্তর থেকে তা অনুমোদিত হওয়া চাই। তা' না হ'লে কোনো প্রেস তা ছাপবে না, কোনো প্রকাশক প্রকাশ করবে না। যথাসময়ে মোরাভিয়া তাঁর "দি ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি"-এর পাণ্ডুলিপি অনুমোদনলাভের আশায় সরকারী দপ্তরখানায় পেশ করলেন। মোরাভিয়ার পাণ্ডুলিপি এসেছে শুনে আগ্রহ করে মুসোলিনী স্বয়ং পড়লেন সে পাণ্ডুলিপি। মোরাভিয়ার শিল্প-সৌষ্ঠবে মুগ্ধ হয়ে মুসোলিনী নিজেই প্রকাশের জন্য অনুমোদন করলেন বইখানা। ছেপে বেরোবার মাসখানেকের মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেলো ফ্যাসিষ্ট পার্টির দপ্তরে। কী ব্যাপার?—না, মোরাভিয়া ইতালীর বর্তমান সরকারকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন তাঁর বইতে। একাধিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মুসোলিনীর নজরে আনলেন ব্যাপারটা। মুসোলিনী প্রথমে কান দিলেন না তাঁদের কথায়। বললেন—'একটু আধটু ব্যঙ্গে কিছু যায় আসে না, বরং ফ্যাসিবাদ যে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যস্রষ্টাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এইটেই বড় কথা।' কিন্তু এতে খুশী হলেন না মুসোলিনীর চেলা-চামুণ্ডরা এবং তাদের চাপেই শেষ পর্যন্ত বইখানা নিষিদ্ধ করে দিলেন মুসোলিনী সমগ্র ইতালীয় সাম্রাজ্যে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেলো, ইতালীর সবচাইতে জনপ্রিয় লেখকদের অন্যতম হলেন মোরাভিয়া। জাতীয় সাহিত্যে মোরাভিয়া যাঁদের তাঁর নমস্য বলে প্রকাশ্যে বলতেন, সেই ড্য আনুনৎসিও এবং পিরান্দেলোর চাইতেও মোরাভিয়ার বইয়ের চাহিদা পাঠকমহলে আজকের দিনে অনেক বেশি। এবং এই জনপ্রিয়তা ক্রমশঃই বাড়ছে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে যোগ্য সমালোচকগণ কর্তৃক রোমাঁ রোলাঁ, ডস্টয়েভস্কি এবং লরেন্সের সঙ্গেও মোরাভিয়ার সাহিত্যের তুলনা করা হচ্ছে।

লিও টলস্টয়

বিশ্বসাহিত্যের আসরে রাশিয়া ইয়োরোপের অন্যান্য বড় দেশগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত নবীন। পুশ্‌কিন (১৭৯৯-১৮৩৭)-ই প্রথম সর্বপ্রকারে বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত হয়ে রুশ ভাষায় প্রকৃত প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য রচনা করেন। পুশ্‌কিনের "দি ক্যাপটেইন্‌স ডটার" পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং আজো এই বই পাঠকেরা আগ্রহের সঙ্গেই পড়ে থাকেন।

বিশ্বসাহিত্যের আসরে রাশিয়ার আবির্ভাব বিলম্বে হ'লেও অগ্রগতি কিন্তু মোটেই বিলম্বিত হয়নি; বরং গল্পরচনার ক্ষেত্রে রুশীয়গণের অগ্রগতি এতই তড়িৎগতিতে হ'য়েছে যা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কারণ "দি ক্যাপটেইন্‌স ডটার"-এর রচনাকাল ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ আর টলস্টয়ের 'রেসারেকশন'-এর প্রকাশকাল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ। অর্থাৎ এই সত্তর বৎসরকাল সময়ের মধ্যে পুশ্‌কিন থেকে শুরু করে গগোল (১৮০৯-১৮৫৯), তুর্গেনীভ (১৮১৮-১৮৮৩), ডস্টয়েভ্‌স্কি (১৮২১-১৮৮৩), অষ্ট্রোভ্‌স্কি (১৮২৩-১৮৮৬), টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০) ও চেক্‌ভ (১৮৬০-১৯০৪) তাঁদের প্রধান গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এঁদের যে কোনো একজনের রচনাই তাঁর দেশ তথা ভাষাকে আন্তর্জাতিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উচ্চতম পর্যায়ে আসীন করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

প্রথম জীবন—কাউন্ট লিও নিকোলায়েভিচ টলস্টয় (Count Leo Nikolaevich Tolstoy, 1828—1910)-এর সুদীর্ঘ বিরাশী বৎসরের জীবন নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। টলস্টয়ের পূর্বপুরুষ ছিলেন তুলা প্রদেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের মান্যগণ্য লোক। কাজান এবং মস্কোয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের তত্ত্বাবধানে টলস্টয়ের শিক্ষাজীবন নির্ঝঞ্ঝাটেই কেটেছিল। ইতিহাসবিখ্যাত ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় টলস্টয় জারের সৈন্যবাহিনীতে গোলন্দাজ বাহিনীর অন্যতম অফিসার হিসেবে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। নারীর বাহুপাশ থেকে রণক্ষেত্রের তাণ্ডব পর্যন্ত অনেক কিছুর অভিজ্ঞতাই টলস্টয় অর্জন করেছিলেন সাতাশ-আটাশ বৎসর বয়সের মধ্যে। ওঁর আত্মকথামূলক রচনাগুলির মধ্যে প্রথম জীবনের কয়েকটি দিকের আমরা কিছু কিছু আভাষ পাবো।

সাহিত্যসাধনার শুরু—বাল্যকালে এক শিক্ষক মহাশয় টলস্টয়কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'ছেলেটি একটি খুদে মলিয়ের হবে'। টলস্টয় অবশ্য নাটকও লিখেছিলেন, যদিও সে নাটক মলিয়েরের কোনো নাটকের সমপর্যায়ভুক্ত হবার দাবী রাখে না, কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে টলস্টয় সর্বযুগের ফরাসীগণকে হার মানিয়েছিলেন, একথা অবশ্য স্বীকার্য।

টলস্টয়ও ফরাসীদিগের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁরা বিপ্লবোত্তর যুগের কেউ নন, তাঁরা অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের ঝড়ের সঙ্কেতকারী লেখকগণ; সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় প্রথমতঃ রুশো, আর, দ্বিতীয়তঃ স্তাঁদাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন শেষ হবার পূর্বেই টলস্টয় পরিপূর্ণভাবে রুশোর ভাবধারায় একনিষ্ঠ বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন।

টলস্টয়ের লেখার অভ্যাস ছিল ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদানের পূর্ব থেকেই। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ওঁর প্রথম বই 'চাইল্ডহুড' প্রকাশিত হয়েছিল। এর দু' বছর বাদে 'বয়হুড' এবং তার তিনবছর বাদে 'ইয়ুথ' প্রকাশিত হয়েছিল। আত্মকথামূলক শেষ রচনা 'এ কনফেশন' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে।

চাইল্ডহুড—টলস্টয় তাঁর শৈশবের স্মৃতি যা লিখে গেছেন তাতে অনেক কথাই আছে। দেশের বাড়িতে টলস্টয় পরিবারের জীবনধারন পদ্ধতি—মাষ্টারমশায় কার্ল আইভানিচ-এর কথা—মা, বাবা, দিদিমা, বোন, বাড়ির চাকরবাকর, রাজকুমার-রাজকুমারী, এমন কি ওঁর বাবার পোষা কুকুর 'মিলকা'র কথাও বলতে ভোলেন নি। তবে সব চাইতে দরদ দিয়ে বলেছেন উনি মায়ের কথা। মা-ছেলের সম্পর্ক মানুষের আদিমতম সম্পর্কগুলির অন্যতম, কিন্তু এই সাধারণ ব্যাপারটাই টলস্টয় যেভাবে বলেছেন—তা' উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হ'য়ে উঠেছে। ব্যক্তি নির্বিশেষে, এমন কি কুকুরটার সঙ্গেও টলস্টয় তাঁর যে আত্মিক সম্পর্কের পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে বাবার কথা টলস্টয় মোটেই শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেন নি। উনি স্পষ্টই জানাচ্ছেন যে, পৃথিবীতে ওঁর বাবার সব চাইতে প্রিয় হচ্ছে তাস আর স্ত্রীলোক।

বয়হুড—বাবার সম্বন্ধে ঠিক ঐ জাতীয় কথা উনি ওঁর দিদিমার মুখ দিয়েও বলিয়েছেন। টলস্টয়ের বাল্যের স্মৃতির মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'লো ওঁর দিদিমার মৃত্যু; শহর জীবনের (মস্কোতে) প্রথম বিচিত্র অভিজ্ঞতার আস্বাদ; এক ভাইয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ উপলক্ষে পরিবারের সকলের আনন্দ প্রকাশের কথা ও ডিমিট্রি নেকলুডফ নামে এক রাজপুরুষের সঙ্গে ওঁর

পরিচয়। অনেক সময় ওঁরা দু'জনে নির্জনে বসে নানা তত্ত্ববিষয়ক আলোচনা করতেন। বাস্তবিক পক্ষে এই রাজপুরুষই টলস্টয়ের ভবিষ্যৎ মহান্ জীবনের সূচনা করে দেন।

'চাইল্ডহুড' এবং 'বয়হুড'-এর একটা সাধারণ মনোহরণকারী বৈশিষ্ট্য এই যে অল্পবয়সের নানা বিচিত্র খেয়াল এবং চিন্তাকে প্রায় মনোবিজ্ঞানীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেছেন টলস্টয়। এ দু'খানা বই নির্ভেজাল সত্যের তালিকা নয়, প্রচুর কল্পনার অবকাশও ঘটেছে; এবং বাস্তব ও কল্পনা—এই দুই রাজ্যের সীমারেখাকে মুছে দিয়ে একান্তই Convincing একটা নূতন রাজ্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন টলস্টয়।

ইয়ুথ—টলস্টয় তাঁর যৌবনের স্মৃতি আরম্ভ করেছেন ষোল বছর বয়স থেকে। এ সময়ের প্রধান ঘটনা হ'লো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সময় এক অধ্যাপকের হাতে ওঁর নাজেহাল হওয়ার কথা। ল্যাটিন খুব ভালভাবেই শিখেছিলেন, এত ভালোভাবে যে ঐ অল্প বয়সেই উনি সিসিরো বা হোরেসের যে কোন প্রধান রচনা অভিধান ছাড়াই স্বচ্ছন্দে অনুবাদ করতে পারতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য পরীক্ষা দেবার সময় এক অধ্যাপক ওঁর প্রতি এমনই বিরূপ হ'য়ে ওঠেন যে ওঁর পরীক্ষা সবার চাইতে ভালো হওয়া সত্ত্বেও উনি অনেকের চাইতে কম নম্বর পান।

টলস্টয়ের বাবা আবার বিয়ে করেন। তিনি তাঁর তরুণী স্ত্রীকে নিয়ে নাচগানের মজলিসে যেতেন প্রায়ই। দাদাও যেতেন নানা মজলিসে।

টলস্টয়ের নিজেরও এখন নাচগানের আসরে যোগদানের ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে। দেখা গেল একদিন বাড়ি থেকে মনস্থ করে বেরিয়েছেন খুব নাচবেন বলে। কিন্তু নাচের আসরে যখন এক রাজকুমারী (কোয়নাকোভা) ওঁকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর সঙ্গে নাচবার জন্যে, তখন স্বভাব-লাজুক টলস্টয় অকস্মাৎ লজ্জায় এতই বিব্রত হয়ে পড়লেন যে উনি নাচতে জানেন না বলে রাজকুমারীকে জানালেন।

এ কনফেশন—টলস্টয়ের আত্মকথার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ খণ্ড হলো 'এ কনফেশন'। যে টলস্টয় ঋষি হিসেবে বহুজনপূজ্য তাঁর চরিত্রের ক্রমবিকাশ এবং অন্তরের নানা সমস্যা ও দ্বন্দ্ব অত্যন্ত সরলভাবে আলোচিত হয়েছে এ বইতে। টলস্টয় অনেকটা বিচারকের দৃষ্টি দিয়ে নিজের অতীত জীবনটা দেখবার চেষ্টা করেছেন। যে আধ্যাত্মিক সমস্যাগুলির কথা উনি বলেছেন

তা বোধ হয় প্রত্যেক মানুষের জীবনেই ঘটে—এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করেন না—কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে জীবনের বোঝাটা বয়ে নিয়ে যান মাত্র। কিন্তু ঐ আধ্যাত্মিক সমস্যাগুলি জোড়াতালি দিয়ে সমাধান করবার চেষ্টা না করে কিম্বা ওগুলি এড়াবার চেষ্টা না করে বরং যদি ঐ সমস্যাগুলি মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা সমাধান করবার চেষ্টা করেন, তা হলে জীবনটা আর বোঝাস্বরূপ মনে হয় না।

'ইয়ুথ'-এর পরে এবং 'ওয়ার এণ্ড পীস্' এর আগে টলস্টয় ছোট-বড়ো আরো অনেকগুলি কাহিনীই রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে 'দি কসাক্স', 'টু হুসারস', 'থ্রি ডেথস', 'দি উডফেলিং', 'সিভাস্তোপোল স্কেচেস্', 'ফ্যামিলি হ্যাপিনেস,' 'পলিকুশা', 'খলস্টোমার: দি ষ্টোরি অব এ হর্স', বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। 'দি কসাক্স' স্বয়ং তুর্গেনিভের একখানা প্রিয় বই ছিল। এ কাহিনীর 'ড্যাডি এরোস্কা' টলস্টয়ের এক অমর চরিত্রসৃষ্টি। খলসটোমার-এ টলস্টয় সর্বপ্রথম তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবধারা প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রচনাটি সাহিত্য হিসেবে যথেষ্ট পরিণত না হওয়ার জন্য পাঠক সাধারণের যথাযোগ্য সমাদরলাভ করে নি।

সাহিত্যসাধনার পরিণতরূপ

ওয়ার এণ্ড পীস্—সাত বছর ধরে লেখা এবং ক্রমাগত সংশোধনের পরে "ওয়ার এণ্ড পীস্" আত্মপ্রকাশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বসাহিত্যে টলস্টয়ের স্থায়ী আসন স্থির নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। 'ওয়ার এণ্ড পীস্' শুধু একটি কাহিনীই নয়, এ যেন একটি দ্বিতীয় সৃষ্টি—বিশ্বকে নতুন করে রচনার একটা অসমসাহসিক প্রয়াস। সুবিরাট পটভূমি, অসংখ্য চরিত্রের মিছিল, অথচ কেউ তার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে না, কারোই হারিয়ে যাবার উপায় নেই। যে কোন একটি চরিত্র—যে এমনকি দু'বার কোন কথোপকথনে অংশ নিয়েছে, তৃতীয়বার শুধু কানে শুনেও পাঠক বুঝতে পারেন যে কথাটা কোন বিশেষ চরিত্রের মুখ থেকে বেরোচ্ছে—প্রতিটি চরিত্র এমনই স্বাতন্ত্র্য মণ্ডিত। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের objective পদ্ধতির চরমোৎকর্ষ হওয়া সত্ত্বেও এ বই মনোবিশ্লেষণেও মৌলিকতার দাবী রাখে। পাঠক কদাচিৎ বোধ করেন যে তিনি কোন কাহিনী পাঠ করছেন—সর্বক্ষণই মনে হয় যেন

জীবন রঙ্গমঞ্চে স্বাভাবিকভাবেই ঘটনাগুলি ঘটছে এবং তিনি তারই একজন দর্শক—লেখক এমনই সম্পূর্ণভাবে নিজেকে দমন করে রাখতে সক্ষম হয়েছেন তাঁর এই সুবৃহৎ রচনার মধ্যে।

১৮০৫ থেকে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ—এই দশ বছরের রাশিয়ার পাঁচটি বড়ো পরিবারের প্রায় পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস 'ওয়ার এণ্ড পীস্'-এর মধ্যে ফুটে বেরিয়েছে। বলাই বাহুল্য, এ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত হলো নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযান। অভিজাত-সম্প্রদায় এবং কৃষকশ্রেণী, মোটা মোটা অফিসার এবং সাধারণ সৈনিক, রাজপুরুষগণ এবং রাজনীতিবিদগণ, নগরজীবন এবং গ্রাম্যজীবন, নানা বিচিত্র পরিবেশে প্রেম বিনিময়, জন্ম, মৃত্যু আবার জন্ম, খেলাধূলো-আমোদ-ফুর্তি-মজা-হাসি-কান্না আহত এবং নিহিত হওয়ার ঘটনা—দুই বিরাট বাহিনীর সম্মুখ যুদ্ধ—অনেক কিছুরই সমাবেশ ঘটেছে এই কালজয়ী উপন্যাসে।

রোস্টভ পরিবার অনেকটা টলস্টয় পরিবারের আদর্শে চিত্রিত। নায়িকা নাটাশার চরিত্র শোনা যায় টলস্টয় তাঁর সুন্দরী ও ব্যক্তিত্বশালিনী শ্যালিকা তাতিয়ানাকে দেখে সৃষ্টি করেছিলেন।

প্রিন্স আঁদ্রেই বলকোন্স্কি-র অবিকল এবং প্রাণবন্ত প্রতিরূপ দেখা যায় পিয়ের বেজুকভের মধ্যে।

প্রিন্সেস হেলেন এবং প্রিন্সেস মেরী হলো অন্য দু'টি বিচিত্র নারী চরিত্র—যারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আদর্শ রূপায়ন।

রাশিয়ার সাধারণ মানুষের প্রতীকস্বরূপ হলো প্ল্যাতন কারাতায়েভ—এ চরিত্রটি টলস্টয়ের পরবর্তী অধ্যাত্মকেন্দ্রিক সাহিত্যসাধনা, এবং নৈতিক জীবনসাধনার পূর্বাভাষ দেয়।

নেপোলিয়ানের বিরাটত্ব, মহত্ব, তাঁর ব্যক্তিচরিত্র বা কীর্তিকে উপজীব্য করে বহু ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এবং তার অধিকাংশই লক্ষ লক্ষ নরনারীর অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট এবং অপমৃত্যুর কারণ এই নেপোলিয়ান ও তাঁর উৎকট যুদ্ধসজ্জার জয়গানে পঞ্চমুখ। এর বলিষ্ঠ ও সার্থক প্রতিবাদ অবশ্য খাস ফ্রান্সেই দেখা গিয়েছিল এর্কম্যান-শার্তিয়ানের দু'খানা উপন্যাসে, 'দি কনসক্রিপট' (১৮৬৪)-এবং 'ওয়াটারলু' (১৮৬৫)। এ দু'খানা উপন্যাসে লেখকদ্বয় যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলস্বরূপ সামরিক তথা অসামরিক জনগণের নানা দুর্ভোগ ও হয়রানির কথা, বহু শোচনীয় অপমৃত্যুর কথা,

এবং সর্বশেষে যুদ্ধবাজদের নিরর্থক দাম্ভিকতা ও অপরিণামদর্শীতার লজ্জাকর মত্ততার কথাও বিবৃত করেছেন। কিন্তু একটি দিককে এঁরা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন, সে হলো যুদ্ধেরই একটি মহত্তর দিক—সে হলো স্বাধীনতাপ্রিয় সাধারণ মানুষের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নির্ভীক প্রতিরোধের কথা।

প্রসঙ্গতঃ বুকাননের "শ্যাডো অব দি সোর্ড"-এর কথা মনে আসা স্বাভাবিক। যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য হিসেবে যে রচনাটি যথেষ্ট রসোত্তীর্ণ হয় নি, তার কারণ এর প্রধান চরিত্রগুলির অন্তরের দৈন্য; ঘৃণাই এদের প্রধান সম্পদ। ঘৃণাকে আশ্রয় করে আর যাই হক মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না।

আনা কারেনিনা—এ উপন্যাসে প্রধানতঃ তিনটি পরিবারের কাহিনী বিধৃত। পার্শ্বচরিত্র হিসেবে অবশ্য অন্য অনেকগুলি পরিবারের লোকজনও আছে। প্রধান তিনটি পরিবারের মধ্যে প্রথমতঃ হচ্ছে আনার পিতৃকুল অবলন্স্কি পরিবার; দ্বিতীয়তঃ আনার ভাইয়ের শ্বশুরকুল শেবরাটস্কি পরিবার, এবং তৃতীয়তঃ আনার শ্বশুরকুল কারেনিন পরিবার।

আর্থিক অবস্থা এবং সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে প্রত্যেকটি পরিবারই সচ্ছল এবং অভিজাত। তবে কারেনিন পরিবারের স্থানই সবার উর্ধ্বে। আনার স্বামী আলেক্সি আলেকজান্দ্রোভিচ কারেনিন জারের সরকারের সর্বোচ্চ পদাধিকারীদের একজন। আলেক্সি ব্যক্তিগতভাবে সৎ, সর্বপ্রকার কাজকর্মে সুদক্ষ, সরকারী মহলে তাঁর অসীম ক্ষমতা; প্রভাব-প্রতিপত্তি। আনার ভাই যে মস্কোর একটা আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট তাও আলেক্সির সুপারিশেই সম্ভব হয়েছে। আলেক্সিকে সরকারী কাজকর্মে এতই ব্যস্ত থাকতে হয় সর্বক্ষণ যে পারিবারিক কোনো ব্যাপারে তাঁর কিছুমাত্র নজর দেবার সময় থাকে না। নানা গুণের অধিকারিণী ও ব্যক্তিত্বশালিনী রূপসী আনার জীবন তাই একান্তই নিঃসঙ্গ। ওদের একমাত্র সন্তান হলো একটি ছেলে, শেরোসা। স্বামী একেবারেই নাগালের বাইরে; ছেলের প্রতি আনার আকর্ষণ তাই স্বভাবতঃই একটু বেশি।

স্বামী-সাহচর্য বঞ্চিত আনা সেণ্ট পিটারস্‌বার্গ, মস্কো এবং দেশের বাড়ি ঘুরে ঘুরেই বেশির ভাগ সময় কাটায়। অবশ্য সমাজের যে ওপরতলার মানুষ ওরা তাতে নানা উৎসব-আয়োজন-অনুষ্ঠানে মেলামেশার জন্যও কাটে বেশ কিছুটা সময়।

আনার ভাই স্তেপান আর্কাডায়েভিচ সুন্দর, সুপুরুষ, বিদ্বান, বুদ্ধিমান ব্যক্তি। স্ত্রী ডলি এবং একটি ছেলে একটি মেয়েকে নিয়ে ওদের সুখী পরিবার। ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী ও বিশেষ সুনামের সঙ্গেই করছে। হঠাৎ ওদের সংসারে অশান্তি দেখা দিল, স্তেপানের নিজেরই কর্মদোষে। ছেলে-মেয়েদের জন্য নিযুক্ত গৃহশিক্ষিকার প্রতি দুর্বলতাটা স্ত্রীর কাছে অকস্মাৎ ফাঁস হয়ে গেলো। ওদের সংসার ভেঙে যাবার উপক্রম হলো। এমন সময় একদিন খবর এলো আনা আসছে ভাইয়ের কাছে বেড়াতে। এতে স্তেপান খানিকটা আশ্বস্তবোধ করলো। কারণ, বোনের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর ওর অসীম বিশ্বাস। তা' ছাড়া নিজের কৃতকর্মের জন্য ও রীতিমত অনুতপ্ত। কাজেই আনা এসে পড়লে ফাটল-ধরা সংসারটা আবার জোড়া লাগতেও পারে, এইরকম একটা আশা হ'লো স্তেপানের। ডলিও আনাকে যথেষ্ট মানে। এখন প্রয়োজন শুধু ওর মন থেকে সন্দেহের জালটা সরিয়ে ফেলা।

আনা স্তেপানের বাড়ি এসে পৌছবার পরে সত্যি সত্যি ওদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা ওর সাহায্যে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলো।

স্তেপানের স্ত্রী ডলি হ'লো শেরবাট্স্কি পরিবারের বড় মেয়ে। কুমারী জীবনে একজন গ্রাম্য অবস্থাপন্ন যুবক কনস্টান্টিন লেভিন ওর পাণিপ্রার্থী ছিল। তার পরে মেজ বোন ন্যাটালিকে চেয়েছিল ও স্ত্রী রূপে। কিন্তু সেও ওকে হতাশ করে একজন রাজনীতিবিদকে বিয়ে করেছিল। বর্তমানে ও ওদের ছোট বোন কিটিকে বিয়ে করবার জন্য বদ্ধ পরিকর। কিন্তু কিটি চায় না ওকে। কিটির অন্য আর একজন পাণিপ্রার্থী আছে। তার নাম কাউন্ট ভ্রন্স্কি। কিটি চায় ভ্রন্স্কিকে। তাই লেভিনের সরাসরি প্রস্তাব ও সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলো। কিন্তু লেভিন কোন কিছুতে ভ্রূক্ষেপ না করে কিটির প্রতি নিজের মনোভাবকে সর্বদা স্থির রাখে।

ভাইয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেই আনার সঙ্গে ভ্রন্স্কির প্রথম পরিচয় হ'লো। এদিকে ভ্রন্স্কির পক্ষে ব্যাপারটা অনেকটা "প্রথম দর্শনেই প্রেম"-এর মতো হ'লো। ভাইয়ের বাড়ি থেকে সেণ্ট পিটার্সবার্গ ফিরে যাবার সময় দীর্ঘ পথ আনার ট্রেনে সহযাত্রী হ'লো ভ্রন্স্কি। নানা আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে এবার আনাও ভ্রন্স্কিকে মনে মনে পছন্দ করতে শুরু করলো। ভ্রন্স্কির পক্ষে ব্যাপারটা কিন্তু ক্রমেই জটিল হয়ে উঠতে লাগলো। কারণ, এতদিন সবাই জানতো যে ও কিটিকে ভালোবাসে, কিটির সঙ্গেই ওর বিয়ে

হবে। ভ্রন্স্কির নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষাও অনেকটা এই রকম ছিল। বিদ্বান-বুদ্ধিমান, শহরের অভিজাত সম্প্রদায়ের ওপরতলার মানুষ ভ্রন্স্কিকে স্বামী-রূপে পাবার নিশ্চয়তায় কিটি লেভিনকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাই লেভিনকে সাধারণত ও এড়িয়ে চলে।

সেণ্ট পিটার্সবার্গ এসে বিভিন্ন পরিবেশে আনার সঙ্গে বেশ কয়েকবার মেলামেশার সুযোগ করে নিল ভ্রন্স্কি। ক্রমে ও বুঝতে পারলো যে মনে মনে আনাকে ও আন্তরিক ভালোবেসে ফেলেছে। চাক্ষুষ দেখাশুনো হ'লেই আনার হাব-ভাব দেখে ভ্রন্স্কির মনে হয় যে আনাও চায় ওকে। আনার প্রতিটি চলন, চোখের চাহনি এবং কথার ধরনে এই বিশ্বাস হ'লো ভ্রন্স্কির। তারপর একদিন ভ্রন্স্কি নিজের মনোভাবটা ব্যক্ত করলো আনার কাছে। আনার দিক থেকে কোনই বাধা এলো না।

ব্যাপারটা অল্পেতেই একটু বেশি জানাজানি হয়ে গেলো। বিভিন্ন মহলে আনা এবং ভ্রন্স্কি সম্পর্কে চাপা আলোচনা চলতে লাগলো। আলেক্সির কানেও কথাটা এসে পৌঁছল এক সময়। আলেক্সি মৃদু তিরস্কার করলেন স্ত্রীকে। আনা কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই হেসে উড়িয়ে দিল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায় ওদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে বেশ ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেছে। ভ্রন্স্কির সঙ্গে ওর অবৈধ সম্পর্কটাকে আনা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও কার্যত পারেনি। আলেক্সির সন্দেহটা নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে ক্রমশঃই বদ্ধমূল হতে লাগলো।

বিদ্যাবুদ্ধি, রূপ গুণ সব দিকেই ভ্রন্স্কি একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী তরুণ। খুব দক্ষ ঘোড়সওয়ার হিসেবে রীতিমত নাম ডাক ছিল ওর। একবার প্রতিযোগিতামূলক এক ঘোড়দৌড়ে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে ভ্রন্স্কি পড়লো দুর্ঘটনায়। আট-দশজন প্রতিযোগী ঘোড়াসহ উল্টে পড়লো। ভ্রন্স্কিও তাদের মধ্যে একজন। দর্শক হিসেবে বহু নরনারীর মধ্যে কারেনিন পরিবারও ছিল ঘোড়দৌড়ের মাঠে। ভ্রন্স্কি ভূতলশায়ী হবার সঙ্গে সঙ্গে আনার মুখ চোখের উদ্বিগ্ন ভাবটা আলেক্সির নজরে পড়ে। বাড়ি ফেরবার পথে গাড়ীতে বসে কেঁদে ফেললো আনা। স্বামীর দু' একটা প্রশ্নের উত্তরে অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো ও। চীৎকার করে বলে উঠলো : 'হ্যাঁ, ভ্রন্স্কিকেই আমি ভালোবাসি। তোমাকে শুধুই ভয় আর ঘৃণা করি। তোমার যা খুশী করতে পারো।'

দিন যায়। আলেক্সি প্রস্তাব করলো যে সত্যি কথাটা যাই হক, সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য জীবনযাত্রার বর্তমান অবস্থাটাই যাতে চালু রাখা হয়। অর্থাৎ যেন কিছুই হয়নি কারেনিন পরিবারে। কিম্বা, আলেক্সি একথাও জানালো যে আনা যদি ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে দেয় তা হলে উনি তাকে মার্জনা করতেও প্রস্তুত।

আরো কিছুদিন যায়। আলেক্সি আর আনা এখনো একই বাড়িতে আছে, কিন্তু অপরিচিতের মতো। দেখা হয়, কিন্তু কথাবার্তা হয় না কখনো কিছু। ভ্রন্‌স্কি কখনো আসে না কারেনিনদের বাড়িতে। তবে আলেক্সি জানেন যে আনা অন্যত্র নিয়মিত মেলামেশা করে ওর সঙ্গে।

কিছুদিন পরের কথা। আনা চলে এসেছিল দেশের বাড়িতে। সেখান থেকেই অকস্মাৎ একদিন টেলিগ্রাম এলো আলেক্সির কাছে: 'আনা মৃত্যু-শয্যায়, আপনার দর্শনপ্রার্থিনী।'

আলেক্সি উদ্বিগ্ন চিত্তে এসে দেখেন সত্যি আনা মৃত্যু শয্যায়। একটা মারাত্মক জ্বর হয়েছে ওর। ভ্রন্‌স্কির সঙ্গেও দেখা হলো। কিন্তু কোন বাক্যবিনিময় হলো না। আনা অনুশোচনায় বিদগ্ধ। যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে মার্জনা চাইলো স্বামীর কাছে: 'সবই আমি বুঝতে পেরেছি এতদিনে, বুঝতে পেরেছি তুমি কতো মহৎ, কতো উদার।'

ভ্রন্‌স্কি নিজের বাড়িতে ফিরে এলো। অনুশোচনার উত্তেজনায় পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না।

এদিকে আনাও ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলো। ওদের স্বামী-স্ত্রীর বিষিয়ে-ওঠা সম্পর্ক এবং সংসার-যাত্রা আবার ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু অকস্মাৎ আবার একদিন ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে আনার মনে পুরনো প্রেমের মাদকতা দেখা দেয়।

এর পরে দেখা গেলো আনা একদিন ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে গৃহত্যাগ করলো। ওরা চলে গেলো দেশের বাইরে। ইউরোপের বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়িয়ে শেষে ঘর বাঁধলো এসে ইতালীর একটা শহরে। কিছুদিন বাধাবন্ধহীন জীবনযাপন করবার পরে দু'জনের মনেই দেখা দিল চরম ক্লান্তি এবং বিরক্তি। কেউ যেন আর কাউকে সহ্য করতে পারে না। উদগ্র প্রেমের জায়গায় ওদের পরস্পরের মন এখন চরম ঘৃণা আর বিতৃষ্ণায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

স্বামীর প্রতি নিদারুণ অবিচার করবার কথা মাঝে মাঝে মনে হয়

আনার। কিন্তু ও এই কথাটা ভেবে খানিকটা সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে যে কৃতকর্মের জন্য ওর নিজের দুঃখ এবং শাস্তিটাও কম হচ্ছে না।

আরো কিছুদিন দুঃসহ জীবন একত্রে কাটাবার পরে আনা আর ভ্রন্স্কি দেশে ফিরবে মনস্থ করে রওনা হলো।

পথে একটা স্টেশনে চলন্ত ট্রেনের তলায় গলা পেতে দিয়ে আত্মঘাতিনী হলো আনা। ভ্রন্স্কির প্রতি আনার শেষ উক্তি ছিল: 'তোমাকে অনুতাপ-ভোগ করতে হবে।' এখন আনার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন মাথাটি দু'হাতে তুলে নিয়ে ওর আধো-মেলা ঠোঁট দু'খানির প্রতি তাকিয়ে ভ্রন্স্কির ঐ কথাটাই বার বার মনে হতে লাগলো।

টলস্টয়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোনটি?—লিও টলস্টয়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোনখানা? 'ওয়ার এণ্ড পীস্' না 'আনা কারেনিনা'? এ সম্বন্ধে যেমন সাধারণ পাঠক সহসা কোন সরল সিদ্ধান্ত করতে পারেন না, পেশাদার সমালোচকের পক্ষেও তেমনি কোন দ্ব্যর্থহীন উক্তি করা সম্ভব হয় না। 'ওয়ার এণ্ড পীস্' বিরাট, মহৎ, মানুষের সৃজনীপ্রতিভার প্রায় সীমাহীন সম্ভাবনার পরিচয় বহন করে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে 'আনা কারেনিনা'র সূক্ষ্ম-শিল্পানুভূতিও বিশ্বের যে কোন ভাষার কথাসাহিত্যে বিরল বললেই চলে।

উপন্যাসের লক্ষণ বা চরিত্র কি? এ নিয়ে বর্তমান শতাব্দীতে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। সার্থক উপন্যাস কখনো একখানা হাতে পড়লে আমরা অনায়াসেই বলে দিতে পারি যে এই রচনাটি একখানা আদর্শ উপন্যাস। কিন্তু একেবারে সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করে যদি বলতে হয় তা' হলে, উপন্যাসের রূপ কি?—এ প্রশ্নটার জবাব দেওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। 'ওয়ার এণ্ড পীস্' সম্বন্ধে Charles du Bos বলেছিলেন: If life could speak, life would speak thus. 'আনা কারেনিনা' সম্বন্ধে তেমনি আবার Matthew Arnold বলেছিলেন: The mountain peak of European fiction.

'ওয়ার এণ্ড পীস্'-এর বিরাট পটভূমি, অসংখ্য ছোট-বড়ো চরিত্রের ভীড়, বলতে কি নেপোলিয়নের বাহিনীর পাঁচ লক্ষ সেনা এবং প্রতিরোধী রুশ বাহিনীর ততোধিক সংখ্যার রণমত্ত বীর সেনানীর পদধ্বনি যেন কানে বাজে মনোযোগী পাঠকের।

'ওয়ার এণ্ড পীস্'-এর কয়েকটি পরিচ্ছেদে ইতিহাস এবং যুদ্ধ সম্পর্কে যে দীর্ঘ তত্ত্বমূলক আলোচনা রয়েছে, তা অনেকের কাছে বিরক্তিকর লাগা

অসম্ভব নয়, অন্ততঃ বর্তমান লেখকের কাছে তাই মনে হয়েছে। কিন্তু সমগ্র 'আনা কারেনিনা'-তে এ রকম ছ'টি পৃষ্ঠা পাওয়া যায় না যা অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। বরং, মনে হয় লেখকের বিরুদ্ধে পাঠক সংক্ষেপে সেরে দেওয়ার অভিযোগ আনতে পারেন। আসলে এটাই হলো আর্ট। একেবারে পরিমিতভাবে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথাটি বলে লেখক কাহিনী-রূপ রাজপথের এক পাশে সরে দাঁড়াচ্ছেন—যাতে পাঠক বাধা না পান।

'ওয়ার এণ্ড পীস্'-এর ইতিহাস এবং যুদ্ধ সম্পর্কে পরিচ্ছেদগুলি, বর্তমান লেখকের মতে হুগোর 'লা মিসারেবল'-এর ('ওয়ার এণ্ড পীস্'-এর তিন বছর পূর্বে প্রকাশিত), দৃষ্টান্তে রচিত বলেই মনে হয়। জাঁ ভ্যালজীন-এর arresting কাহিনী পড়তে পড়তে ওয়াটালু'র যুদ্ধ-দর্শন সম্পর্কে অবিনশ্বর ফরাসী প্রতিভার থিসিস যেমন অনেকেরই boring মনে হয়—টলস্টয়ের ক্ষেত্রেও সে কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

'আনা কারেনিনা'র সঙ্গে তুলনায় 'ওয়ার এণ্ড পীস্'-এর আর একটি বড়ো দৈন্য হলো বিভিন্ন দিকে কল্পনা শক্তির যথোপযুক্ত বিকাশের অভাব। টলস্টয় নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযান প্রত্যক্ষ করেননি সত্য, কিন্তু ওঁর বাবার মুখে (যিনি এই যুদ্ধের সময় জারের বাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন) বহুবার বহুভাবে এর বর্ণনা শুনেছেন। তা' ছাড়া টলস্টয় নিজে অন্ততঃ একটা বড়ো যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন (ক্রিমিয়ার যুদ্ধ)। মূল কাহিনীটি যদিও টলস্টয়ের নিজস্ব, কিন্তু এ যুগে রচিত মমের 'দি মুন এণ্ড সিক্স পেন্স'-এর মতো অনেকগুলি প্রধান চরিত্রই বাস্তব জীবন থেকে তুলে এনে বইয়ের পাতায় পুনঃ রোপিত হয়েছে। কিন্তু 'আনা কারেনিনা'র বেলায় সে কথা প্রযোজ্য নয়। এর মূল কাহিনীটি যেমন টলস্টয়ের নিজস্ব, চরিত্রগুলিও তাই—কল্পনা-শক্তির ব্যাপক প্রসার দেখে পাঠক হতবাক হয়ে যাবেন। আনাকে মাদাম বোভারীর সঙ্গে অনেকে তুলনা করতে ভালবাসেন, কিন্তু সেটা সঙ্গত হয় না। কারণ, আনার তুলনায় মাদাম বোভারী শুধু অপরিণতই নয়, নৈতিক অনুভূতির অভাবে ও চরিত্রটি নিতান্তই Pathetic হয়ে গেছে, Tragic রসের আস্বাদ ওর মধ্যে পাওয়া যায় না। অবশ্য এটা হলেও হতে পারে যে, মাদাম বোভারীই টলস্টয়কে প্রেরণা জুগিয়েছিল।

পটভূমি হিসেবে 'ওয়ার এণ্ড পীস্' 'আনা কারেনিনা' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি, খুব সম্ভব গোটা পৃথিবীতেই শ্রেষ্ঠতম। মনোবিশ্লেষণ হিসেবে 'আনা কারেনিনা'

শ্রেষ্ঠতর—অবশ্য মনোবিশ্লেষণই এখানে আসল কথা। মানুষের অসহায়তা এখানে আশ্চর্যভাবে ফুটে বেরিয়েছে, যে জিনিসটার রূপ দেবার জন্য 'ওয়ার এণ্ড পীস্'-এ যুদ্ধ-পরিস্থিতির সাহায্য নেবার প্রয়োজন হয়েছিল। বহির্বিশ্বের ঘটনাস্রোতকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ব্যক্তি মানুষের নেই, কিন্তু সে কথা বাদ দিয়ে তার নিজের মনটাকে আয়ত্তাধীন রাখাও যে তার পক্ষে সময় বিশেষে কতো অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে আনা চরিত্র তারই সাক্ষ্য বহন করে।

'ওয়ার এণ্ড পীস্'-এর moral message খুব স্পষ্ট নয়, কিন্তু 'আনা কারেনিনা'য় ও জিনিসটি খুবই সুস্পষ্ট। অনেকে এটাকে শেষোক্ত গ্রন্থের একটা ত্রুটি মনে করেন। কিন্তু বর্তমান লেখকের ধারণা যে এই একটি কারণেও 'আনা কারেনিনা' বিশ্বসাহিত্যের একখানা অমর সৃষ্টি। কেন না টলস্টয় সাহিত্যবস্তুর কোনরূপ হানি না ঘটিয়েও moral message দিতে পেরেছেন। এবং ঠিক পরবর্তীকালে যেখানেই তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে moral message দিতে গিয়ে সাহিত্যকে কোণঠাসা করেছেন, সেইখানেই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন—'রেসারেকশন' এবং অন্যান্য রচনা তার প্রমাণ।

রেসারেকশন—অধ্যাত্ম চিন্তায় রূপান্তর সম্পূর্ণ হবার পরে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে টলস্টয় এই দীর্ঘ উপন্যাসটি প্রকাশ করেছিলেন। এতে দেখা যায় নেকলুডফ একজন অভিজাত শ্রেণীর হালকা চরিত্রের মানুষ, একটি তরুণীকে ও নানা মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে ঘরের বার করলো—কিন্তু তার কোনপ্রকার দায়িত্বই ও নিলো না, এবং শেষ পর্যন্ত এই প্রবঞ্চণার ফলে তরুণীটি পতিতাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হলো।

তরুণীটির নাম কাট্যায়া মাসলোভা। কাট্যায়া সম্পূর্ণ নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও একটা বিচারে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দণ্ড লাভ করলো। এবার নেকলুডফের মনে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা দেখা দেয় এবং সে কাট্যায়াকেই বিয়ে করে নিজের পাপস্খালন করবে বলে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে সাইবেরিয়ায় ওর সহযাত্রী হলো। ওর প্রেম কাট্যায়ার মনের দুঃখ অনেকটা লাঘব করলো বটে, কিন্তু বিয়েতে সে সম্মতি দিলো না।

শিল্পসাহিত্যকে নিয়মের আওতার মধ্যে আনবার জন্য পৃথিবীতে অনেকেই অনেকভাবে চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন যুগে। কিন্তু এ প্রচেষ্টায় প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই ব্যর্থতা বিস্ময় উদ্রেক করে। এক রাশিয়াতেই দু'দু'বার এর নজির দেখা গেছে। প্রথমতঃ টলস্টয়ের অধ্যাত্মনীতি, দ্বিতীয়তঃ সোভিয়েত রাজনীতির চাপ।

'আনা কারেনিনা'র পরে 'রেশারেকশন'-এ টলস্টয়ের সাহিত্য প্রতিভা রীতিমত দুর্বল হয়ে পড়েছিল বলা চলে।

টলস্টয়ের শিল্পচিন্তা—হোয়াট ইজ আর্ট—যথার্থ আর্ট কি? বা আর্ট কাকে বলে? এ প্রশ্নের উত্তরে লিও টলস্টয় যা লিখে গেছেন তার ফলে রীতিমত একটা নতুন নন্দনশাস্ত্র তৈরী হয়েছে বলা যায়। যে আর্টের বাণী অপরের মধ্যে সঞ্চালিত বা সংক্রামিত হয় না, সে আর্ট টলস্টয়ের মতে আর্টই নয়। পাঠক যখন একান্ত সহানুভূতির সঙ্গে লেখকের কথা শুনতে বা মানতে বাধ্য হন এবং সেই মত নিজের জীবনের নবরূপায়ণের জন্য কার্যত চেষ্টা করেন, কেবল তখনই টলস্টয়ের মতে শ্রেষ্ঠ শিল্প সৃষ্ট হয়েছে বুঝতে হবে। 'লা মিজারেবল', 'এ টেল অব টু সিটিজ' বা 'এ্যাডাম বিডি' টলস্টয়ের মতে শেক্সপীয়ারের যে কোন নাটক বা ওয়াগনারের যে কোন অপেরার চাইতে শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি।

টলস্টয়ের শিল্প-ধারণাবলী নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে, এবং শেষ জীবনে ধর্ম এবং নীতির প্রতি তাঁর অতিমাত্রায় প্রবণতার জন্য এ রকম একটা ধারণার প্রচলন হয়েছে যে টলস্টয় বুঝি শিল্পকে ধর্ম বা ঈশ্বর কেন্দ্রিক করতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু না, সে-কথা আদপে সত্য নয়।

হেগেল থেকে শুরু করে বিভিন্ন দার্শনিক (প্রধানতঃ জার্মান) আর্টকে God, Absolute বা Idea-র দাস করবার জন্য যে চেষ্টা করে গেছেন, টলস্টয় তার ঘোর বিরোধী ছিলেন। (Art is not as the metaphysicians say, the manifestation of some mysterious Idea of beauty or god.—*What is Art.*)

নিজের শিল্পচিন্তাকে টলস্টয় আশ্চর্য সরলতার সঙ্গে প্রকাশ করে গেছেন। শিল্পের উদ্দেশ্য যেমন ভালো খায় দায় এরকম অবসর প্রাপ্ত শ্রেণীর অতিরিক্ত Energy-র প্রকাশ ঘটানো নয়, তেমনি কেবল মনের আবেগের শব্দ বা চিত্র বা সুরের সাহায্যে প্রকাশ ঘটানোও নয়, নিছক সুন্দর কিছু সৃষ্টি করাও এর উদ্দেশ্য হতে পারে না—এবং আনন্দদান উদ্দেশ্য হিসেবে শিল্পের পক্ষে নিম্নগতি নির্দেশ করে। আর্ট তা হলে কি? টলস্টয় সুস্পষ্টভাবে বলছেন যে মানুষে মানুষে (ভগবানের সাথে মানুষের নয়) আবেগ, চিন্তা ও অনুভূতির ঐক্য সৃষ্টিই হলো আর্টের উদ্দেশ্য—যার সাহায্যে ব্যক্তিগতভাবে মানুষ তথা সমগ্রভাবে মানব-

সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলসাধনের পথ সুগম হয়—এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের নিশ্চিত উপায় হিসেবে আর্ট মানুষের জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। (......it is a means of union among men joining them together in the same feelings, and indispensable for the life and progress, towards well being of individuals and of humanity.—*What is Art*, p. 123 ; Maud's Translation)

টলস্টয়ের ধর্ম, অধ্যাত্ম ও সমাজচিন্তা—টলস্টয় বিবাহ করেছিলেন, তখনকার দিনকাল অনুসারে একটু বেশি বয়সে (চৌত্রিশ বছর বয়সে)। যাকে বিবাহ করে ছিলেন তিনি বয়সেই যে অনেক ছোট ছিলেন তাই নয়, বুদ্ধিবৃত্তি, রুচি এবং চিন্তাধারা—সব দিক দিয়েই শোচনীয় দৈন্য ছিল তাঁর। এই নারী—বিয়ের পরে অন্ততঃ প্রথম বারো বছর যার প্রতি টলস্টয় তাঁর মনের সমস্ত সুধা ঢেলে দিয়েছিলেন, বলতে গেলে ইনি পরবর্তী জীবনে তাঁর পক্ষে একটা কাঁটা স্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন। কারণ, বিয়ের চৌদ্দ বছর পরে যখন টলস্টয়ের অধ্যাত্ম-চিন্তায় আমূল পরিবর্তন অন্ততঃ তাঁর নিজের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো, তখন দেখা গেল, তাঁর প্রিয়তম স্ত্রী-ই সে কথা বা চিন্তার মর্ম বোঝেন না, চাই কি তা নিয়ে বিদ্রূপ করতে কুণ্ঠিত হন না।

যাই হক টলস্টয়—'ওয়ার এণ্ড পীস্'-এর অসংখ্য দৃঢ়চেতা মানুষের স্রষ্টা টলস্টয়ের বিশ্বাসের দৃঢ়তা কোন বিশেষ নারীর খেয়াল-খুশী বা অভিরুচির জন্য নড়চড় হবার নয়, তাই দেখা গিয়েছিল পারিবারিক জীবনে চরম অশান্তির ঝুঁকি নিয়েও টলস্টয় পরবর্তী জীবনে নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করেছিলেন এবং আরো অনেকগুলি বই রচনা করে ছিলেন।

'আনা'র রচনাকালে টলস্টয়ের জীবনে ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দরের যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল 'এ কনফেশন'-এ তারই পরিণতি বিবৃত হয়েছে। টলস্টয়ের সামন্ততান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ নিশ্চয়ই সুষ্ঠু বা ত্রুটিহীন নয় এবং স্বয়ং লেনিন এ সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিরুদ্ধ সমালোচনা করে গেছেন, কিন্তু এই ত্রুটি বা খ্রীষ্টধর্মকে তার নিজস্ব যথার্থ ভিতের ওপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে সংকীর্ণ জাতীয়তা বা সর্বপ্রকার স্থানীয় স্বার্থের উর্ধ্বে যীশুর বাণীর অন্তর্নিহিত সুগভীর নীতিবোধকে মানবমনে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য তাঁর উগ্র একাগ্রতা এক সময়ে টলস্টয়ের শিল্পবোধকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

বাস্তবিক পক্ষে নিজের শিল্পচিন্তার সঙ্গে সুসমঞ্জস ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরবর্তী জীবনে টলস্টয় যা কিছু রচনা করে গেছেন তার শিল্প বা সাহিত্যমূল্য অনেক কম। অবশ্য Twenty Three Tales-এর কয়েকটি কাহিনী কিছুটা ব্যতিক্রম।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে টলস্টয় রুশিয়ার অর্থোডক্স চার্চের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক প্রকাশ্য ভাবে ছিন্ন করেন এবং খ্রীষ্টের বাণীর নতুন ব্যাখ্যা শুরু করেন, যার মূল কথাই হলো Non-resistance to evil—এক কথায় সম্পূর্ণ অহিংসা।

টলস্টয়ের অধ্যাত্ম ও সমাজচিন্তাকে আশ্রয় করে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে একটি সুসংগঠিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল।

টলস্টয়ের চিন্তার এই নতুন দিক সম্বন্ধে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য রচনা হলো পাঁচখানা : **এ্যান একজামিনেশন অব ডগমাটিক থিয়োলজি** (১৮৮০) : রাশিয়ার সরকারী ধর্ম অর্থোডক্স চার্চের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রচনা। **হোয়াট আই বিলিভ** (১৮৮৪) : টলস্টয়ের ধর্ম ও অধ্যাত্ম-চিন্তার সারসংগ্রহরূপ রচনাটি সাহিত্য হিসেবেও কিছুটা সার্থক। **হোয়াট দেন মাষ্ট উই ডু** (১৮৮৬) : আজকের দিনে বিজ্ঞান সম্মত সমাজতন্ত্রবাদ বলতে যা বোঝায়, তার সমর্থক না হয়েও টলস্টয় এ রচনাটিতে বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের নিঃসীম দারিদ্র্য, দারিদ্র্যজনিত জীবনের ব্যর্থতা ও কদর্যতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে, নিজের সমাধান উপস্থাপিত করেছেন। **দি কিংডম অব গড ইজ উইদিন ইউ** (১৮৯৪) : এই গ্রন্থেই টলস্টয় তাঁর অহিংসার ধারণার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন এবং সর্বক্ষেত্রেই যে গভর্ণমেণ্ট একটা নীতিবিরুদ্ধ সংগঠন এবং সর্বত্রই ধনী, আরামপ্রিয় এবং শক্তিধর মুষ্টিমেয় মানুষের আরো ধনসংগ্রহ, আরো আরাম এবং আরো শক্তি সংগ্রহ এবং সাধারণ মানুষের পীড়নের জন্য এ জিনিসটি চালু রয়েছে, সে কথা খোলাখুলি-ভাবেই আলোচনা করেছেন। **আই ক্যান নট বি সাইলেণ্ট** (১৯০৮) : ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মার্কসপন্থী বিপ্লবীগণ জারের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক উত্থান ঘটাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এ প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সাময়িকভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। তার পরেই কিছু সংখ্যক বিপ্লবীকে জার সরকার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। আলোচ্য রচনাটিতে টলস্টয় তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

ইলিয়া এরেনবুর্গ

বর্তমান পৃথিবীর শিল্পসাহিত্যের আসরে এক বিস্ময়কর পুরুষ ইলিয়া এরেনবুর্গ। নিজস্ব বিশিষ্ট মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি, সাহিত্য সমালোচনার দক্ষতা; অপরের, এমন কি বিরুদ্ধবাদীর বক্তব্য শুনবার এবং বুঝবার মতো উদার মানসিকতার জন্যে আজকের পৃথিবীতে সাহিত্যক্ষেত্রে যে সামান্য কয়েকজন মানুষ জাতি, দেশ, বা রাষ্ট্রের গণ্ডীর বাইরে বিশ্বমানবের শ্রদ্ধালাভে সক্ষম হয়েছেন এরেনবুর্গ তাঁদেরই একজন।

প্রথম জীবন—ইলিয়া এরেনবুর্গের (জন্ম, ২৭শে জানুয়ারী, ১৮৯১) জন্ম হয় রাশিয়ার কিয়েভ শহরে এক অবস্থাপন্ন ইহুদী পরিবারে। ওঁর যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স তখন এরেনবুর্গ পরিবার চলে আসেন মস্কোর এক শহরতলীতে। এ অঞ্চলের অবস্থাটা যে সে সময়ে কেমন ছিলো এরেনবুর্গ পরবর্তীকালে সে সম্বন্ধে লিখেছেন: 'নোংরা, ভীষণ নোংরা, মদের কড়া গন্ধে সমস্ত পরিবেশটা থেকে বিশুদ্ধ বাতাস যেন একেবারেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। লোকগুলিও প্রায় সমস্ত সময় মদ খেয়ে খেয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে রাখতো, ঘর-সংসারে, খেত-খামারে, পথে-ঘাটে এবং সর্বত্র যে প্রায় এক যুগ এখানে কাটালেও এদের প্রকৃত স্বভাব ও প্রকৃত মনোভাব সম্বন্ধে খুব সম্ভব আমার কিছুই জানা সম্ভব হয়নি।'

এই রকম একটা পরিবেশে এরেনবুর্গ মোট প্রায় বারো বছর কাটিয়েছিলেন, তার মধ্যে আটটা বছর কেটেছে একটানা। আশ্চর্যের বিষয় পরিবেশের এই বিষাক্ত আবহাওয়া ওঁকে আদৌ স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু একদিক থেকে বেয়াড়া হয়ে উঠেছিলেন এরেনবুর্গ। সে হলো দুরন্তপনায়। দুরন্ত বললে বোধ হয় কিছুই বলা হবে না। রীতিমতো ডানপিটে বেপরোয়া প্রকৃতির হয়ে উঠতে লাগলেন উনি। মা-বাবার হয়রানি চরমে উঠতো এক এক সময় বালক এরেনবুর্গের দুরন্তপনার জন্যে। ওঁরা থাকতেন একটা হোটেলে—হোটেল রয়্যাল কোর্ট। হোটেলের গেটকীপার থেকে কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত দিনের মধ্যে একাধিকবার বালক এরেনবুর্গের বিরুদ্ধে নালিশ করতে বাধ্য হতেন ওঁর বাবার কাছে। কখনো হয়তো অকারণে কলিং বেল টিপে বেয়ারাদের ছুটোছুটি করাতেন, কখনো বা "হারিয়ে" গিয়ে কর্তৃপক্ষকে নাজেহাল করাতেন—এই রকম সব ব্যাপার।

এই দুরন্তস্বভাবের জন্যে একাধিক শিক্ষক মহাশয় অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বালক এরেনবুর্গকে পড়াবার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছিলেন। একটা স্কুলে অবশ্য ভর্তি করা হয়েছিল ওঁকে, কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন কয়েকদিন পরেই যে বাড়িতে পড়াশুনোর বিশেষ বন্দোবস্ত না করতে পারলে এই 'সম্ভাবনাপূর্ণ' ছেলেটি নষ্ট হয়ে যাবে। 'সম্ভাবনাপূর্ণ' কারণ, ওঁরা এটা লক্ষ্য করেছিলেন যে যদিও বালককে বইপত্র নিয়ে বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখা যায় না, কিন্তু যে সামান্য সময়টুকু ও বইপত্র নিয়ে থাকে তার মধ্যে ওর অসাধারণ মেধার পরিচয় কর্তৃপক্ষ পেয়েছিলেন। এরেনবুর্গের বাবা শেষ পর্যন্ত এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করলেন। ছেলেকে লেখাপড়া শেখানোর জন্যে একজন পেশাদার সম্মোহনকারী নিয়োগ করলেন। উদ্দেশ্য, বালককে সম্মোহন করে বশে এনে লেখাপড়া শেখানো হবে। হলোও তাই। এই পেশাদার সম্মোহনকারীর কাছেই বালক এরেনবুর্গের অক্ষর পরিচয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে হয়েছিল বৎসরাধিককাল।

এরেনবুর্গের যখন বয়সমাত্র তেরো বছর তখন একদিন দেখা গেলো বালক হোটেলে নেই। পাড়ার ছেলেরাও কেউ জানে না ওর হদিস। বাবা এবং হোটেলের কর্তৃপক্ষ প্রাণপণ খুঁজতে লাগলেন, পুলিশে খবর দিলেন। কিন্তু কয়েকদিন, বোধহয় দিন পাঁচেক পর্যন্ত কোন খোঁজখবর পাওয়া গেল না। কিন্তু তারপর একদিন নিজেই নিজের হদিস দিলেন। বার্লিন থেকে এক টেলিগ্রাম এলো ওঁর বাবার হোটেলে: 'আমি বার্লিন চলে এসেছি। টাকা পয়সা যা ছিলো সব খরচ হয়ে গেছে। শীগগির কিছু পাঠাও।'

মা-বাবার কাছে ফিরে আসবার পরে এবার বালক এরেনবুর্গের একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটলো। ওঁর আশঙ্কা ছিলো, বাবা যাবার খরচটা যদিও পাঠিয়েছেন কিন্তু ফিরে যাবার পরে নিশ্চয়ই উত্তম মধ্যম পড়বে। যেমন অনেক সময়ই পড়তো। কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম ঘটলো। মা-বাবা মোটেই মারধোর করলেন না এরেনবুর্গকে। কোনো ধমক-টমকও দিলেন না, কেন অমনধারা অন্যায়টা করলেন তা জিজ্ঞাসা পর্যন্ত না। মা-বাবা শুধু নীরবে চোখের জল ফেললেন। এবং তাতেই কাজ হ'লো সব চাইতে বেশি। দুরন্ত বালক এরেনবুর্গ মা-বাবাকে প্রকৃত ভালবাসতেন। তাই ওঁদের চোখের জল দেখে নিজের প্রকৃতিকে নানাভাবে ধিক্কার দিতে লাগলেন এবং

তারপর কয়েকদিন পরে একদিন নিজেই কান্নায় ভেঙে পড়ে মাকে জড়িয়ে ধরে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, আর কোনো দিন এমন করে না বলে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবেন না। এর পর থেকে নাবালক বয়সে এরেনবুর্গ সত্যি আর কখনো পালিয়ে গিয়ে বাড়ির মানুষদের হয়রান করেন নি। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে সাবালক হবার পর ওঁকে বহুবার বহু জায়গা থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছে, পালিয়ে বাঁচতে হয়েছে। কখনো জারের পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে পালাতে হয়েছে ওঁকে। কখনো বা রাশিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে হয়েছে, কখনো বা খাস সোভিয়েত সরকারের পীড়ন এড়াবার জন্যে পালিয়ে ফিরতে হয়েছে ওঁকে—যদিও আজকের রাশিয়ায় তিনি অন্যশ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভাবলে স্বীকৃতিলাভ করেছেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে—উনিশ শ পাঁচ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সে সময় এরেনবুর্গের বয়স ছিল চৌদ্দ। একদিন দেখা গেলো অপেক্ষাকৃত বয়স্ক তরুণদের সঙ্গে মিলে জারের পুলিশের সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং এই সময়ই স্কুল থেকে পুলিশের নির্দেশে ওঁর নাম কাটা গেলো। কারণ, উনি সেই বয়সেই নিয়মিতভাবে বিপ্লবীদের ইস্তাহার বিলি করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ওঁদের স্কুলে একবার যখন অকস্মাৎ ধর্মঘট হলো, তখন পুলিশী তদন্ত চালাবার পর প্রকাশ হয়ে পড়লো যে সে-ধর্মঘট সংগঠনের প্রধান দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন কিশোর এরেনবুর্গ।

স্বভাব-অশান্ত কিশোরের বিরক্তিকর দুরন্তপনা এবার একটা নির্দিষ্ট পথে ক্রমশঃ প্রকাশ পেতে আরম্ভ করলো। এরেনবুর্গ এখন থেকে পুরোপুরি এবং সর্বক্ষণের জন্য সক্রিয়ভাবে বিপ্লবীদের দলে যোগ দিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন ওঁর ঠিক উনিশ বছর বয়স তখন একবার গ্রেপ্তার হবার পর বিচারে কারাদণ্ড হলো এরেনবুর্গের। এবং আটমাস রাশিয়ার বিভিন্ন জেলে অমানুষিক অবস্থার মধ্যে কাটাতে হলো ওঁকে। কোনো জেলে নিয়মিত চাবকাতো জারের পুলিশ, কোথাও ক্ষুধার্ত ইঁদুর ছেড়ে দেওয়া হতো ওঁর "সেল"-এর ভেতর; কোথাও বা কয়েকজনে মিলে একযোগে কিল-চড়-ঘুঁষি চালাতো! ফলে একবার উনি রক্তবমি করতে আরম্ভ করলেন। তারপর অনন্যোপায় হয়ে জেলের মধ্যেই অনশন ধর্মঘট শুরু করলেন এরেনবুর্গ সরকারী অত্যাচারের প্রতিবাদ হিসেবে। ছয়দিন চললো অনশন। অত্যাচার

উৎপীড়নের সঙ্গে এবার এ কয়দিনের অনশনের ফলে ওঁর শারীরিক অবস্থা রীতিমত আশঙ্কাজনক হয়ে উঠলো। সাতদিনের দিন কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন ওঁকে মুক্তি দেবেন। মুক্তি দেওয়া হ'লো কয়েকটি শর্ত আরোপ করে। তার মধ্যে একটি শর্ত হ'লো যে বাড়িতে উনি থাকতে পারবেন না, এমন কি কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গাতেও দু'-এক রাতের বেশি কাটাতে পারবেন না। ক্রমাগত ঘুরে বেড়াতে হবে। এই শর্ত আরোপের সরকারী উদ্দেশ্য হ'লো এই যে, এরেনবুর্গ যাতে বিপ্লবীদের কোনোভাবে সাহায্য করতে না পারেন। যার কোনো ঠিকানা নেই তার সঙ্গে আর অপরে যোগাযোগ স্থাপন করবে কি করে? জার-শাসিত রাশিয়ার শেষের দিকে বিপ্লবীদের "ঠাণ্ডা" করে দেবার জন্যে যতো রকম পরিকল্পনা করা হয়েছিল এ হ'লো তারই একটি। একে বলত "ট্রাভেল-পারমিট" সহ জেল থেকে মুক্তি-দেওয়া।

যাই হ'ক এরেনবুর্গের পক্ষে কিন্তু ব্যাপারটা শাপে বর হয়ে যাবার সামিল হলো। মস্কোর এবং তার শহরতলীর সীমাবদ্ধ গণ্ডী ছাড়িয়ে এবার বিরাট রাশিয়ার অসংখ্য ছোটো বড়ো শহর এবং গ্রাম ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন এরেনবুর্গ। সঞ্চয় করতে লাগলেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণী সম্বন্ধে নানা বিচিত্র জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা। কারখানা শ্রমিক, কৃষিজীবী, কেরাণী, দোকান কর্মচারী, ছাত্র, শিক্ষক এবং অধ্যাপক—সবার সঙ্গেই মিশতে আরম্ভ করলেন এবার। বলাই বাহুল্য নিজের খেয়াল খুশী মতো এই মেলামেশা চলতো না। পুলিশী ব্যবস্থা অনুসারে পূর্ব-নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে থানায় দেখা করে আসতে হতো ওঁকে। কাজেই দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে উদ্দেশ্যমূলকভাবে মেলামেশার কাজটা বেশ সতর্কভাবেই করতে হ'তো। তবে এ সমস্ত সময়েও বিপ্লবের কাজ থেকে এরেনবুর্গ কখনোই খুব দূরে থাকেন নি। এবং কোনো না কোনো গুপ্ত সংস্থার সঙ্গে সর্বদাই যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন।

সাহিত্যসাধনার শুরু—স্রষ্টাদের জীবনে প্রেরণা যে কখন কিভাবে আসবে তার কোনই স্থিরতা নেই দেখা যায়। কেউ হয়তো অকস্মাৎ একটি সানাইয়ের সুর শুনে কবিতা রচনার প্রেরণা লাভ করেন। কেউ বা কোন ব্যক্তিগত সুখ, দুঃখ, প্রেম, হতাশার ফলে উদ্বুদ্ধ হন সাহিত্যসাধনায়। কেউ বা প্রেরণা লাভ করেন প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং বিরাটত্ব দেখে। এরেনবুর্গের বেলায় দেখা যায়, তাঁর সাহিত্য প্রেরণার মূল কথা হলো

মানুষ এবং এই প্রেরণা উনি লাভ করেছিলেন "ট্রাভেল-পারমিট" নিয়ে দণ্ডভোগের সময়েই। বিরাট রাশিয়ার নানা বিচিত্র জাতি এবং ধর্মের মানুষ, তাদের রুচির বৈচিত্র্য, ধ্যান-ধারণার বিভিন্নতা—সব কিছুই নজরে আসতে লাগলো এরেনবুর্গের। এবং দেশের মানুষকে এইভাবে দেখতে দেখতেই এক সময় ওঁর ভেতর সাহিত্য রচনার বাসনা দানা বাঁধতে আরম্ভ করলো। এ সময়ে ওঁর বয়স কুড়ি কি একুশ। প্রথম দিকে সাধারণত যা হয়ে থাকে তাই, অর্থাৎ কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন এরেনবুর্গ। তাঁর কয়েকটি কবিতা পরবর্তীকালে কাব্যরসিক মহলে রীতিমতো প্রশংসা লাভ করেছিল।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে এক সময় পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে এরেনবুর্গ রাশিয়ার সীমানা পার হয়ে এলেন। ইয়োরোপের কয়েকটি দেশ ঘুরে চলে এলেন ফ্রান্সে। প্যারিসে সে সময়ে রাশিয়ার বিপ্লবীদের রীতিমতো একটা চক্র ছিল। আর তা' ছাড়া ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের চাইতে সাংস্কৃতিক দিক থেকে ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিয়ার যোগাযোগটাও ছিলো ঘনিষ্ঠতর। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে রাশিয়ার শাসক-গোষ্ঠী যখন মনস্থ করেছিলেন যে রাশিয়াকে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় দীক্ষিত করে সব দিক দিয়েই ইয়োরোপের প্রথম সারির দেশগুলির অন্যতম করে তুলতে হবে, তখন তাঁরা প্রধানতঃ ফরাসী শিল্পসাহিত্য এবং বিদ্বৎসমাজের সাহায্যই নিয়েছিলেন। কারণ সে সময়কার ইয়োরোপে জ্ঞানগরিমার দিক থেকে ফরাসীরাই শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন।

লেনিনের সান্নিধ্যে—প্যারিসেই সোভিয়েত রাশিয়ার মহান স্রষ্টা লেনিনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটেছিল এরেনবুর্গের। লেনিন শুধু একজন বিপ্লবীই ছিলেন না। সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি সম্পর্কে পুঁথিগত বিদ্যাও তাঁর যা ছিলো তা কদাচিৎ এক ব্যক্তির করায়ত্ত হতে দেখা গেছে। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে লেনিনের এ ক্ষমতা ছিলো যে একপলক দেখেই তিনি বুঝতে পারতেন যে কে কোন্ কাজের পক্ষে সব চাইতে উপযুক্ত—কে কোন্ কাজ করলে তার নিজের এবং বৃহত্তর দিক থেকে গোটা দেশ তথা সমাজের সর্বাধিক উপকার হবে।

একেবারে কিশোর বয়সেই প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে পড়লেও পরবর্তী কয়েক বছরে এরেনবুর্গের ভাবনা-চিন্তা এবং স্বভাবচরিত্রের মধ্যে

একটা যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল, তা হয়তো উনি নিজেও টের পান নি। কিন্তু সত্যদ্রষ্টা লেনিন স্পষ্টই বুঝতে পারলেন এই তরুণ যুবকের ভেতরে ভেতরে কী বিপ্লব প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলেছিল। এবং লেনিনের সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলবার পর এরেনবুর্গ নিজেও বুঝতে পারলেন নিজের অবস্থাটা। ভেতরটা যেন স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো হয়ে গেলো কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। বুঝতে পারলেন যে কোনো সময় হয়ত বোমা তৈরী করা, থানা আক্রমণ করা বা সরকার বিরোধিতা করা মানুষের বৃহত্তর স্বার্থের দিক থেকে একটা অপরিহার্য প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু সবাইকে যে অন্য সব কাজ ফেলে রেখে ঐ একই ধরনের কাজে লিপ্ত হতে হবে তার কোনো মানে নেই। আরো অনেক কাজ আছে যা মানুষের অনেক প্রয়োজনে আসে এবং সে অনেক বেশি কঠিন কাজ, আরো বেশি মহৎ কাজ। বোমা ফাটিয়ে ফললাভের চাইতে এ কাজের যে ফললাভ তার স্থায়িত্ব অনেক বেশি। তাই প্যারিসে বসেই সিদ্ধান্ত নিলেন এরেনবুর্গ নতুন কাজের বিষয়। ঠিক করলেন কিছু লিখবেন। কবিতা লেখার অভ্যাস আগেই শুরু হয়েছিল, এবার আরো বেশি উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে আরম্ভ করলেন কাব্যচর্চা, সেই সঙ্গে ছোটো ছোটো প্রবন্ধ রচনাও করতে লাগলেন। এ সবের সঙ্গে চলতে লগেলো পড়াশুনো। ফরাসী সাহিত্যের বাছাই করা গল্প, উপন্যাস, নাটক এবং কবিতা, প্রবন্ধ ও জীবনী কিছুই বাদ দিতেন না এরেনবুর্গ। এ সময়ে অন্তত কয়েকটা বছর সব সময়ই এরেনবুর্গের হাতে কিছু-না-কিছু বই দেখা যেতো। হোটেল, রেঁস্তোরায়, দোকান-পসারে, পার্কে, কোনো রেলষ্টেশনে বা রাস্তায় যেখানেই যখন যেতেন, ফুরসৎ পেলেই যাতে কিছুটা সময় পড়ে নেওয়া যায় সেইজন্য সর্বদা বই সঙ্গে রাখতেন এরেনবুর্গ।

নিজেকে তৈরী করবার জন্যে এই যে ঐকান্তিকতা, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার ফল দেখা গেলো। কারণ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলো তখন রাশিয়ায় তরুণ এবং উদীয়মান কবি হিসেবে এরেনবুর্গ রীতিমতো 'নাম' করেছিলেন। মহাযুদ্ধের শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে এরেনবুর্গ ফরাসী সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানালেন ফ্রান্সের হয়ে যুদ্ধে যোগদানের জন্যে অনুমতি চেয়ে। ফরাসী কর্তৃপক্ষ অনুমতি যদিও দিলেন কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না এরেনবুর্গ। পরীক্ষকরা বললেন, 'শরীর অসম্ভব দুর্বল, এ শরীর নিয়ে ও যুদ্ধ করতে পারবে না।'

তেমন কোনো ভারী রোগ এরেনবুর্গের ছিল না। শুধু দুর্বলতা। চব্বিশ বছরের একজন তরুণের শরীর এমন কি দুর্বল হতে পারে যে সে যুদ্ধে যেতে অক্ষম হয়ে পড়লো ? হঠাৎ শুনলে এটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার মনে হয়। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে বছরের পর বছর ক্রমাগত অনিয়মিত অপ্রচুর আহার এবং আর্থিক অনিশ্চয়তাজনিত মানসিক সঙ্কট খুব মারাত্মকভাবে ওঁর শরীরকে দুর্বল করে ফেলেছিল। ১৯১০ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত প্যারিসে এরেনবুর্গ সব সময়েই নিজের খরচ নিজেই রোজগার করেছেন এবং এইভাবেই পড়াশুনো চালিয়ে যেতেন। সে সময়ে ওঁর মতো সাধারণ লেখাপড়া জানা একজন বিদেশী ফ্রান্সের মতো জায়গায় কী-ই বা এমন কাজ আশা করতে পারতো। টুকটাক কিছু করতেন এরেনবুর্গ, লিখেও কিছু কিছু রোজগার হতো। তবে সে যৎসামান্য। যুদ্ধ শুরু হবার কয়েকমাস পরে দেখা গেলো এরেনবুর্গ বেশি পারিশ্রমিকের একটা কাজ যোগাড় করেছেন। কাজটা হলো রেল-ওয়াগনে মারাত্মক বিস্ফোরকের ভারী ভারী বাক্স বোঝাই করা। একটু হাত ফস্‌কে গেলেই একেবারে……

যা হ'ক সৌভাগ্যবশতঃ এরেনবুর্গের হাত কখনো ফস্‌কায়নি এবং তাঁকে কেউ কখনো অসতর্কও দেখেনি কোনো ব্যাপারে। তখনো নয়, বা তারপরেও কখনো নয়।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। যুদ্ধ তখনো শেষ হয়নি। এদিকে রাশিয়ায় বিপ্লব শুরু হয়ে যাবার কথা প্যারিসে জানাজানি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এরেনবুর্গের মনে হলো এ সময় অবশ্যই রাশিয়ায় গিয়ে পৌছতে হবে। রাশিয়ার সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে আসতে হবে। তাই স্বদেশে চলে আসবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ফ্রান্স থেকে রাশিয়ায় যাবার স্বাভাবিক পথ অর্থাৎ মধ্য ইয়োরোপে তখন সমর তাণ্ডব। তাই দেশে ফিরতে হলো এরেনবুর্গকে ইংলণ্ড, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড ঘুরে।

রাশিয়ায় ফিরেই সরাসরি কিয়েভ-এ চলে এলেন এরেনবুর্গ। চাষী এবং মজুরদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আরম্ভ করলেন একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে গতানুগতিক লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া এবং সেই সঙ্গে নাচ-গান-থিয়েটার শেখাবার আয়োজনও ছিলো। কিন্তু বিপ্লবীরা তখন পর্যন্ত গোটা রাশিয়ায় পুরোপুরি সাফল্যলাভ করতে সক্ষম হন নি। তার ওপর দেশের সাধারণ মানুষদের সকলের, বিশেষ করে বয়স্কদের মধ্যে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে সব জায়গায়

সমান ভালো ধারণাও ছিল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ যাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্কুল আরম্ভ করেছিলেন এরেনবুর্গ তারাই ওঁর পেছনে লাগলো। একদিন ওরা কয়েকজন জারের পুলিশের কাছে খবর পাঠালো—ফলে আবার পালাতে হলো এরেনবুর্গকে। এবার ঘুরতে ঘুরতে চলে এলেন মস্কোতে। এর মধ্যে খাস মস্কো এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পুরোপুরিই বিপ্লবীদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসে পড়েছিল। মস্কোয় এসে যদিও প্রথমটা আশ্রয় পেলেন 'সর্বহারা লেখক সংঘে' এবং আবার মস্কোতেই শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের নিয়ে নানা সংগঠন গড়ে তুলতে মনোনিবেশ করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মস্কো ছাড়তে হলো এরেনবুর্গকে। কারণ যারা নতুন ক্ষমতায় আসীন হয়েছিল তাদের সব কাজকর্ম অন্ধের মতো সমর্থন করতে পারতেন না এরেনবুর্গ। প্রায় সময়ই মনে হতো ফ্রান্সের Reign of terror এর মতো একটা অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং কায়েম হতে চলেছে রাশিয়াতে। বিবেকবান এবং রুচিবান এরেনবুর্গ বন্ধু-বান্ধবদের কাছে এ অবস্থার জন্য প্রতিবাদ জানালেন, কিন্তু দেখলেন তাঁরা বেশির ভাগই হয় বিপ্লবীদের কঠোরতার সমর্থক, আর না হয় এতোটা ভীত যে এ সম্পর্কে ওঁর সঙ্গে কোন রকম কথা বলতেই নারাজ।

হতাশ হয়ে আবার প্যারিসে ফিরে এলেন এরেনবুর্গ। যে প্যারিস একসময় দীর্ঘ সাত আট বছর আশ্রয় দিয়েছে ওঁকে, শিল্প-সাহিত্যের নানা বিষয়ে অধ্যয়ন এবং চর্চার সুযোগ দিয়েছে, এবার সে প্যারিসও নারাজ হলো। প্যারিসে পৌছবার কয়েকদিন পরেই একদিন পুলিশ এসে জানালো এখুনি চলে যেতে হবে।

'কোথায়? প্যারিস ছেড়ে কোথায় যাবো?'

'শুধু প্যারিস ছেড়েই নয়, ফ্রান্স ছেড়েই যেতে হবে।'

প্রথমটা ভেঙ্গে পড়লেও মনে মনে নিজেকে তৈরী করে নিলেন এরেনবুর্গ। এদিকে মনে মনে একখানা উপন্যাস রচনার সমস্ত পরিকল্পনা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল। এমন সময় রাশিয়ায় ফিরে গিয়েও নির্বিবাদে কাটানো যাবে না, আর নির্বিবাদে না থাকতে পারলে অন্তত কিছুদিন, লেখার কাজেও এগোনো যাবে না। তাই অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলেন এক বন্ধুর আশ্রয় নেবেন। উনি থাকতেন বেলজিয়মে। এর পরে আর কালবিলম্ব না করে বেলজিয়ম চলে এলেন এরেনবুর্গ।

সাহিত্যসাধনার পরিণত রূপ—বেলজিয়ম ছোট্ট দেশ হলেও অনেক ঐতিহাসিক ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে এ দেশে। এই দেশেই মার্কস্-এঙ্গেলস্-এর "ম্যানিফেষ্টো অব দি কমিউনিষ্ট পার্টি" প্রথম সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা হয়েছিল। এই দেশে বসেই এরেনবুর্গ তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনা করলেন—"দি একষ্ট্রাঅর্ডিনারী এ্যাডভেঞ্চারস্ অব জুলিও জুরেনিটো এণ্ড হিজ ডিসাইপ্‌ল্"। এ উপন্যাস বার্লিন থেকে প্রকাশিত হলো ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। এরেনবুর্গের তখন বয়স ঠিক তিরিশ।

এই প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইয়োরোপের উদীয়মান ঔপন্যাসিকগণের অন্যতম হিসেবে এরেনবুর্গ স্বীকৃতি লাভ করলেন। এবং দেখা গেলো সৃজনধর্মী সাহিত্যিকের যা প্রধান গুণ তা অতি আশ্চর্যভাবে আয়ত্ত করে ফেলেছেন এরেনবুর্গ—স্পষ্টভাবে সত্য কথা বলতে কিছুমাত্র ভীত বা কুণ্ঠিত নন। এই উপন্যাসে একদিকে যেমন ইয়োরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির চিরাচরিত অন্ধ-জাতীয়তার অর্থহীনতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এরেনবুর্গ, তেমনি তীব্রভাবে সমালোচনা করলেন সোভিয়েত রাষ্ট্রের পুলিসী ব্যবস্থাকে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই বই খাস রাশিয়াতে বিক্রী হতে পারে না বা রাশিয়ান ভাষায় এর অনুবাদও কিছু বেরোয় নি।

এর পর থেকে আরো প্রায় পাঁচিশখানা বই লিখেছেন এরেনবুর্গ। বেশির ভাগই উপন্যাস, কয়েকখানা প্রবন্ধের বই এবং একখানা কবিতার বইও আছে তার মধ্যে। ওঁর বইগুলির মধ্যে সব চাইতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে "দি লাইফ ষ্টোরি অব লাসিক", "দি সামার অব ১৯২৫," "এ ষ্ট্রীট ইন মস্কো," "আউট অব কেয়স", "টেন হর্স পাওয়ার", "ফল অব প্যারিস", "দি ষ্টর্ম", "দি থ" এবং "রাইটার এণ্ড হিজ ক্র্যাফট" প্রভৃতি। এর মধ্যেও কয়েকখানা খাস রাশিয়ায় প্রকাশিত হতে পারে নি। এর থেকেই বোঝা যায় যে একেবারে প্রথম থেকে আজ অবধি সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এরেনবুর্গের কখনো পুরোপুরি বোঝাপড়া হয় নি। প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হবার পর থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বারকয়েক এরেনবুর্গ রাশিয়ায় এসেছেন যদিও, কিন্তু কখনো খুব বেশি দিন থাকেন নি।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় পুলিশী সন্ত্রাস—ষ্ট্যালিনের আমলে গোয়েন্দা পুলিশ কী রকম সন্ত্রাসের রাজত্ব তৈরী করে তুলেছিল সে সম্পর্কে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে মে মস্কোতে একটি প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েছিলেন এরেনবুর্গ।

এরেনবুর্গ বলছেন যে সরকারী নির্দেশমতো যাঁরা সাহিত্য রচনা করতে সক্ষম না হতেন তাঁরা সব "হাওয়ায়" মিলিয়ে যেতেন। এরেনবুর্গ বলছেন যে: 'স্পেনের গৃহযুদ্ধে রিপোর্টারের কাজের ফাঁকে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর যখন মস্কো এসে লেখক-বন্ধুবান্ধবদের খোঁজখবর করতে লাগলাম, দেখেছিলাম বেশির ভাগই পুলিশের হেপাজতে।' এক বন্ধু পরামর্শ দিয়েছিলেন (ইনি মস্কোতেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করতেন): কারো সম্বন্ধে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না, এমন কি অপর কেউ যদি আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে চান, তাতে যেন ভুলেও যোগ দেবেন না। কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না জানবেন।'

পরদিন "ইজভেস্তিয়া" কাগজের অফিসে গেলেন এরেনবুর্গ। সেখানে সবাই খুব ভদ্র ব্যবহার করলো বটে ওঁর সঙ্গে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কাউকেই উনি চিনতে পারলেন না, সব নতুন মুখ, একজনও দু'বছর আগের পরিচিত পাওয়া গেলো না। আর একদিন অফিসে গিয়ে লক্ষ্য করলেন সংবাদপত্রটির পদস্থ কর্মচারীদের কারো ঘরের সামনেই নেম-প্লেট নেই। একটি বেয়ারাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করতে সে নির্বিকারভাবে বললো: 'কি লাভ মশাই নেম-প্লেট তৈরী করে, কেউ হয়তো আজকে চেয়ারে বসছেন, তারপর কালই হাজতে চলে যাচ্ছেন' (অর্থাৎ কি না নেম-প্লেট তৈরী করতে যে সময়টুকু লাগে একজন অফিসারের আয়ুষ্কাল ততটুকুও নয়)।

এই সময়কার রাশিয়ার একজন প্রখ্যাত লেখক আইজাক ব্যাবেল-এর একটি উক্তির উল্লেখ করে বলেছিলেন এরেনবুর্গ: 'জানেন মশাই, আজকের রাশিয়াতে কেউই নিজের স্ত্রী ছাড়া আর কারো সঙ্গে মন খুলে কথা বলে না, তা'ও রাতে বিছানায় শুয়ে এবং কম্বল মুড়ি দিয়ে।'

প্যারিসের খোলা আবহাওয়ায় লালিত এরেনবুর্গের শিল্পীসত্তা কোনো-মতেই সোভিয়েত পুলিশী ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব করার কোনো ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে পারেনি। এমন কি সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়েও নয়। আজকের দিনের রাশিয়াতে এমন কেউ নেই পশ্চিম ইয়োরোপের শিল্পসংস্কৃতি সম্বন্ধে এরেনবুর্গের চাইতে যিনি বেশি বোঝেন। এরেনবুর্গ শুধু যে বোঝেন তা নয়, তার কতকগুলি দিককে যে উনি ভালোবাসেন সে কথা খোলাখুলিভাবেই বলেন। তার কতকগুলি দিক যে সোভিয়েতের শিল্পাদর্শের চাইতে শ্রেষ্ঠতর এবং মহত্তর সে কথাও প্রকাশ্যে

বলতে কুণ্ঠিত বা ভীত হন না। তাই সোভিয়েত রাষ্ট্রের গোঁড়া কর্ণধাররা কখনো তাঁকে সুনজরে দেখেন নি।

প্রবল জনমতের চাপে পড়ে সোভিয়েত সরকার দু'বার এরেনবুর্গকে ষ্ট্যালিন পুরস্কার দিয়েছেন বটে, কিন্তু আর একদিক থেকে সোভিয়েত লেখক সংঘের কর্মকর্তাদের সর্বক্ষণই তাগিদ দিয়ে আসছেন ওঁর লেখা বা শিল্পমতের বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্যে। একবার প্রাভ্দা লিখেছিল: 'এরেনবুর্গ কলাশিল্পকে খাড়া পর্বতের ওপর থেকে ঠেলতে ঠেলতে এমন একটা অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছেন যে এটা অতি সহজেই সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ে চূড়ান্ত সংস্কৃতিহীনতায় ডুবে যেতে পারে। আমরা যদি এরেনবুর্গের কথা শুনতাম, তাহলে বহু পূর্বেই পশ্চিম ইয়োরোপের কেতাদুরস্ততার পতাকাতলে গিয়ে দাঁড়াতাম; রাশিয়ার বাস্তবধর্মী বিশুদ্ধ রুশ কলাশিল্পের প্রতি প্রীতিশূন্য হয়ে পড়তাম এবং প্রধানতঃ ফরাসী ধরনের বিভিন্ন 'বাদী'দের সঙ্গে প্রণয় পাশে আবদ্ধ হতাম।'

মস্কোতে এরেনবুর্গের বাসায় তাঁর বন্ধু এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী পাবলো পিকাসোর অনেক ছবি সযত্নে রক্ষিত আছে এবং পিকাসো যে এ যুগের একজন অসামান্য প্রতিভা এ কথা সরকারী হুকুকনামা অগ্রাহ্য করেও এরেনবুর্গ বহুবার বলেছেন, বহু জায়গায় লিখেছেন এবং এখনো লিখতে বা বলতে ভীত বোধ করেন না।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে—সত্য কথা যে কতো নির্ভয়ে মানুষ বলতে পারে তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হলো রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এরেনবুর্গের উক্তি। আমাদের দেশের কম্যুনিষ্ট বন্ধুরা এমন একটা সময় ছিল যখন "বুর্জোয়া-কবি" রবীন্দ্রনাথের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখতে পান নি; বিশেষভাবে বলবার মতো তাঁর লেখার মধ্যে বা তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে কিছুই পান নি। অথচ এরেনবুর্গ ভারতবর্ষে এসেছিলেন; শ্রেণীনির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মেশবার চেষ্টা করেছিলেন এবং তারপর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জোর গলায় বলে গেছেন: 'ভারতের যা কিছু মহৎ, যা কিছু স্থায়ী, যা কিছু প্রকৃতই বিরাট রবীন্দ্রনাথে তার সমন্বয় ঘটেছে—রবীন্দ্রনাথ এমন একটি বিস্ময় যার কাছে দাম্ভিক পশ্চিম, সাম্রাজ্যলোভী পশ্চিম সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছে।'

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে এরেনবুর্গ মোটামুটি ভাবে মস্কোতেই বাস করছেন বলা যায়। কারণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে রিপোর্টার

হিসাবে উনি যে সমস্ত চোখে-দেখা সংগ্রামের সংবাদ পাঠাতেন—রাশিয়া তথা বাইরের পৃথিবীতে, তার বহুল প্রচারের ফলে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে যে এরেনবুর্গকে কোনো কারণে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ আর ঘাঁটাতে সাহস পাচ্ছেন না—দেশের ভেতরে তাঁর আজ এতই জনপ্রিয়তা।

লাসিক—এরেনবুর্গের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোন্‌খানা এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কেউ বলেন 'দি ষ্টর্ম' কেউ বলেন 'জুলিও জুরেনিটো', কেউ বলেন 'আউট অব কেয়স', কেউ বলেন 'লাসিক'ই ওঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এ উপন্যাসখানাতে যেমন রয়েছে সাহিত্যরস, তেমনি রয়েছে বিভিন্ন জীবন-দর্শন সম্পর্কে চিন্তাপূর্ণ আলোচনা। কম্যুনিজম সম্পর্কে এরেনবুর্গের বক্তব্যগুলি খুব স্পষ্ট এবং গোছানোভাবে পাওয়া যায় এ উপন্যাসের মধ্যে। অনেকের ধারণা, এরেনবুর্গ তাঁর নিজের জীবনকে কেন্দ্র করেই এ উপন্যাসখানা লিখেছিলেন।

সাহিত্যসৃষ্টি হিসেবে শ্রেষ্ঠ না হলেও 'লাসিক' এরেনবুর্গকে বুঝবার জন্য একখানা অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ।

দি ষ্টর্ম—জাত উপন্যাস কাকে বলে বা কি রকম হওয়া উচিত এ যুগে রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে তার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো এরেনবুর্গের 'দি ষ্টর্ম'। 'ওয়ার এণ্ড পীস্' অপেক্ষা আয়তনে অনেক ছোট, কিন্তু বিরাটতর পটভূমিকায় লেখক এ যুগের মানুষের মুক্তির জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টাকে যেন মূর্ত করে তুলেছেন এ উপন্যাসে। পশ্চিমে ফ্রান্স এবং পূর্বে রাশিয়া—অর্থাৎ গোটা Continental Europe হচ্ছে এর পটভূমি; সময় স্পেনের গৃহযুদ্ধের কিছু পর থেকে নাৎসী জার্মানীর পতন পর্যন্ত—অর্থাৎ প্রায় দশ বছর। স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা-দুঃখ-অর্থনৈতিক সঙ্কট-যুদ্ধ-রাষ্ট্রবিপ্লব ভাবী পৃথিবীতে মানুষের ধ্যান-ধারণায় নানা পরিবর্তনের সম্ভাব্য ইঙ্গিত, অনেক কিছুই আছে এ উপন্যাসে। উপন্যাসে নায়ক-নায়িকা অবশ্যই থাকবে—কিন্তু তাদের চাপে যদি অন্যান্য চরিত্রগুলি কোণঠাসা হয়ে পড়ে, তা'হলেই দেখা যায়, আমরা সমাজের একটা সমগ্র চিত্র পাই না। কাজেই তা উপন্যাস হিসেবে ব্যর্থ হয়। এই জন্যই দেখা যায় অনেক সময় ৫০০ পৃষ্ঠার কাহিনী উপন্যাস হয়ে ওঠে না, গল্প থেকে যায়; আবার ৫০ পৃষ্ঠার কাহিনী রীতিমত উপন্যাস হয়ে ওঠে।

এদিক থেকে এরেনবুর্গের 'দি ষ্টর্ম' বিংশ শতাব্দীর একখানা অন্যতম সার্থক উপন্যাস। নায়ক-নায়িকা আছে—কিন্তু সমগ্র কাহিনীতে তারা অহেতুক প্রাধান্য বিস্তার করেনি। দি ষ্টর্ম-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রধানত রুশ বাহিনীর কঠোর আদর্শ নিষ্ঠা এবং বিজয়গাথা ঘোষিত হলেও সমগ্র ইয়োরোপের একটি নিখুঁত চিত্রও এতে পাওয়া যায়।

মিখাইল শোলোখভ

আজকের পৃথিবীতে রাশিয়া সব দিক দিয়েই প্রথম সারির দেশগুলির অন্যতম—যদিও মাত্র এক শ' বছর আগেও ইয়োরোপের পিছিয়ে-পড়া দেশগুলির কথা আলোচনা করতে হলে প্রথমেই রাশিয়ার কথা বলতে হতো। কারণ সে সময়কার রাশিয়া আয়তনে যেমন বিশাল ছিল, রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের সর্বস্তরে ও-দেশে অন্ধকারও ছিল তেমনি অন্ধ-করা। আজকের রাশিয়া আয়তনে তেমনি বিরাটই আছে, বা হয় তো আরো বেড়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার সমস্ত দিকে উন্নতি যা হয়েছে তা'ও এক কথায় বিস্ময়কর।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে নিজস্ব সৃষ্টি বলতে গেলে রাশিয়ার প্রায় কিছুই ছিল না। পিটার দি গ্রেটের সময় থেকে সেই যে ফ্রান্সের কাছ থেকে গ্রহণ করা শুরু হয়েছিল, বলতে গেলে এক শতাব্দী ধরে তাই চলতে লাগলো। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যা কিছু ফরাসী তাই আদর্শস্থানীয় বলে গণ্য হতে লাগলো। ফ্রান্সের গুণীজ্ঞানী ব্যক্তিদের রুশ রাজদরবারে অতি মাত্রায় মর্যাদার সঙ্গে আসন দেওয়া হতে লাগলো। ইংরেজ কবি-সাহিত্যিকদের কিছু কিছু রচনা যে রাশিয়ায় দেখা যেতো সে সময়ে তা'ও ফরাসীর মাধ্যমেই প্রচারিত হতো।

একদিক থেকে দেখতে গেলে সে সময়কার রাশিয়ার অবস্থা অনেকটা ঊনবিংশ শতাব্দীর বা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের ভরেতবর্ষের মতো ছিল বলা চলে। আমাদের দেশে যেমন কে কতো শিক্ষিত তার বিচার হতো কে কী পরিমাণ ইংরেজী জানে তাই দিয়ে, রাশিয়ায় তেমনি লোকের শিক্ষা-দীক্ষার পরিমাপ হতো ব্যক্তিবিশেষে ফরাসী ভাষা এবং সাহিত্যে দখল থেকে। যদিও, আমরা যেমন আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ইংরেজের কাছে হারিয়েছিলাম, রাশিয়ানরা কখনোই সে-ভাবে ফ্রান্সের কাছে পরাজিত হয় নি। কাজেই আমরা ইংরেজী শিখেছিলাম বাধ্য হয়ে, কিন্তু রাশিয়ানরা শিখেছিল স্বেচ্ছায়।

যাই হোক, এইভাবে এক শ' বছর বা তারও বেশি সময় প্রধানতঃ ফরাসী সাহিত্য-সংস্কৃতির আওতায় কাটাবার পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর

দ্বিতীয় দশকে রাশিয়ার খাঁটি রুশ-সাহিত্য সৃষ্টির লক্ষণ দেখা দিলো। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পুশকিনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হ'লো এবং পুশকিনকেই সাধারণত বিশ্বসাহিত্যের আসরে স্থান পাবার উপযুক্ত প্রথম রুশ-প্রতিভা বলে গণ্য করা হয়। পুশকিনের পর গোগোল, তুর্গেনিভ, ডষ্টয়েভস্কি এবং টলস্টয় পর্যন্ত এসে আমরা দেখতে পাই রুশ-সাহিত্য, বিশেষ করে রাশিয়ার উপন্যাস সমস্ত দিক দিয়েই পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের তিরিশ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে টলস্টয়ের উপন্যাস সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে প্রখ্যাত ইংরেজ কবি ও সমালোচক ম্যাথু আর্ণল্ড বলেছিলেন যে,…'ফরাসী উপন্যাসের আর আগের মতো জনপ্রিয়তা নেই। বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিকগণ গত হয়েছেন, তাঁরা কেউই তাঁদের সমান শক্তির অধিকারী কোন উত্তর সাধক রেখে যান নি।…উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাই আমরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নবাগত রাশিয়াকে পাচ্ছি। বর্তমানে রাশিয়ার উপন্যাসের যুগ চলছে এবং ন্যায্যতই চলছে। ভবিষ্যতে যদি রুশ-সাহিত্যের মান আরো উন্নত হয় বা রাশিয়াতে উপন্যাসের বর্তমান মানও বজায় থাকে, তা হ'লে অবশ্যই আমাদের সকলকে রুশ ভাষা শিক্ষা করতে হবে।' টলস্টয়ের পর থেকে বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত রুশ-সাহিত্যের মান আর উন্নত না হোক অন্তত নেমে যে যায় নি গোর্কি, চেখভ, বুনিন ও আন্দ্রেয়েভ প্রভৃতির আবির্ভাব সে কথায় সাক্ষ্য দেয়।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে সংঘটিত রুশ বিপ্লব নিঃসন্দেহে মানুষের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা। রাষ্ট্রবিপ্লব এর আগেও অনেক হয়েছে পৃথিবীতে, কিন্তু, পূর্ববর্তী সমস্ত বিপ্লবের চাইতেই এই বিপ্লব ভিন্ন ধরণের—গুণগতভাবে ভিন্ন। এর পর থেকেই রুশ সাম্রাজ্যের কাঠামো ভেঙ্গে-চুরে সোভিয়েত রাশিয়ার জন্ম হ'লো। টলস্টয়ের পর যে চারজন লেখকের কথা আমরা একটু আগে বলেছি, তার মধ্যে এক চেখভ ছাড়া আর তিনজনই অক্টোবর বিপ্লবের সময় জীবিত ছিলেন। তা' ছাড়াও আমরা পাই কবি হিসেবে ব্লক, মায়াকোভস্কি এবং পাস্তেরনাককে এবং ঔপন্যাসিক হিসেবে কুপরিন এবং আলেক্সি টলস্টয়কে। বিপ্লবের সময় এঁরা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলা চলে।

বিপ্লবের দশবছর পরে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহিত্যের আসরে নতুন নতুন প্রতিভার আবির্ভাব ঘটতে লাগলো, বিপ্লবের সময়ে যাঁরা বেশির ভাগই বালক বা কিশোর ছিলেন। কাজেই এই লেখকগণ সর্বতোভাবেই বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার মানুষ বলা চলে। এঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই জন্ম হয়েছিল জারের শাসনের শেষের দিকে অরাজক বা প্রায়-অরাজক রাশিয়ায়। পুরনো সমাজ-ব্যবস্থায় বলতে গেলে আকর্ষণের কিছুই এঁরা পান নি। সোভিয়েত রাশিয়ার এই শেষোক্ত নতুন যুগের সাহিত্যস্রষ্টাগণের মধ্যমণি হলেন মিখাইল শোলোখভ।

প্রথম জীবন—মিখাইল আলেকজান্দ্রোভিচ শোলোখভ (জন্ম ১৯০৫) নিজে একজন খাঁটি কসাক। উনি সাহিত্যক্ষেত্রে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিতও করেছেন প্রধানতঃ কসাকদের জীবনের শব্দচিত্র এঁকে। ডন নদীর তীরে ভেসেনস্কায়া গ্রামে ওঁর জন্ম হয়েছিল; বাবার আর্থিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছলই ছিল বলা চলে। উনি ব্যবসায়ী ছিলেন।

সাহিত্যিক হিসেবে শোলোখভের জীবনে একটা অত্যাশ্চর্য রূঢ় বাস্তবের প্রকাশ দেখা যায়। স্কুলের প্রাথমিক পড়াশুনোর পরে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে ছাত্র হিসেবে ভর্তি হলেন শোলোখভ। কিন্তু বেশিদিন চললো না পড়াশুনো। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর সেনাবাহিনী রাশিয়া আক্রমণ করে বসলো। রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সমস্ত স্কুল কলেজ গেলো বন্ধ হয়ে। হাজার হাজার ছাত্রের সঙ্গে শোলোখভেরও পড়াশুনো বন্ধ হয়ে গেলো।

প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শুরু হলো তখন থেকেই অর্থাৎ মাত্র নয় বছর বয়সের সময় থেকেই শোলোখভ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বিপ্লবের সময় দেখা গেলো এগারো-বারো বছরের বালক শোলোখভ বলশেভিক নেতৃবৃন্দের নির্দেশে ছোটো-বড়ো নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র সতরো বছর বয়সে শোলোখভকে দেখা যায় একটা জেলার পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটীর একজন সদস্য হিসেবে কাজ করছেন।

শুধুমাত্র রাজনীতি নিয়ে থাকলেও যে শোলোখভ সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে একজন হতে পারতেন এ কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। শোলোখভের মতো সৎ, বিশ্বাসী, নির্ভরযোগ্য এবং পরিশ্রমী

কর্মী নিশ্চয়ই কোনো দেশের রাজনৈতিক দলেই কখনো বেশি দেখা যায় নি। মার্কস্‌বাদ-লেলিনবাদে উনি ছিলেন একান্ত বিশ্বাসী। এবং বিপ্লবের পরে রাশিয়াতে রাষ্ট্র ও সমাজের কাঠামোতে যে-সমস্ত মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভবপর হয়েছিল, সে সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে শোলোখভ নিজে সশরীরে কাজ করে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন।

সাহিত্যসাধনার শুরু—সমসাময়িক কালের স্বদেশের সাহিত্য পড়ে হতাশ বোধ করতেন শোলোখভ। ওঁর মনে হতো বিভিন্ন লেখকেরা যা লিখছেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সে-সম্পর্কে তাঁদের বাস্তব ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। বিপ্লবের একজন সক্রিয় শরিক হিসেবে দেশের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে যে বাস্তব জ্ঞান হয়েছিল, শোলোখভের মনে হলো, তা' চেষ্টা করলে সাহিত্য হিসেবে রূপায়িত করা যেতে পারে। তাই দেখা যায় আঠার বছর বয়সের সময় কলম ধরলেন উনি। এই সময়ের লেখা ওঁর কয়েকটি গল্প বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এগুলি একত্র করে হয়েছিল—'টেলস অব দি ডন।' এই প্রথম বই প্রকাশের সময় শোলোখভের বয়স ছিল ঠিক কুড়ি বছর। এটা ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। এই সময়েই শোলোখভ তাঁর যুগান্তকারী উপন্যাস রচনা শুরু করলেন এবং তিন বছরের পরিশ্রমের ফলে প্রকাশিত হ'লো "এণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন"-এর প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো পরের বছর। এই সুবৃহৎ উপন্যাসের শেষ দুই খণ্ডের ইংরেজী নাম হলো—"দি ডন ফ্লোজ হোম টু দি সি" যথাক্রমে ১৯৩৩ এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণের কিছুদিন পূর্বে। এ ছাড়া শোলোখভের অন্যান্য প্রধান উপন্যাস হলো "ভার্জিন সয়েল আপটারন্‌ড," "দে ফট ফর দেয়ার কানট্রি" এবং "এ ম্যান্‌স্ লট"। সংখ্যার দিক থেকে বেশি না হলেও এই ক'খানা উপন্যাস রচনা করেই শোলোখভ যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তাতে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উনি সোভিয়েত রাশিয়ার প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তো বটেই, এ শতাব্দীতে গোটা পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান স্রষ্টাও বটে।

সাহিত্যসাধনার পরিণত রূপ—কসাক-কাহিনী—'এণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবার পর Maurice Hindus লিখেছিলেন: "আমরা দেখতে পাচ্ছি, মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে শোলোখভ

প্রথম শ্রেণীর ইয়োরোপীয় সাহিত্যিকগণের পাশে নিজের স্থান করে নিয়েছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার আবির্ভাব ঘোষণা করার কাজটা যে-কোনো সমালোচকের পক্ষেই একটা অত্যন্ত প্রীতিকর দায়িত্ব।"

কসাকদের নিয়ে রাশিয়ায় অনেকেই একাধিক কাহিনী রচনা করেছেন। মহান টলস্টয়ও ওদের নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখেছিলেন। কিন্তু এ কথা সকলেই স্বীকার করে থাকেন যে, শোলোখভ কসাকদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করে যেমন অমরত্ব লাভ করেছেন, ঠিক অতোটা সাফল্যলাভ আর কেউই করেননি—এমন কি টলস্টয়ও নন।

এই কসাকরা কারা? কী তাদের বৈশিষ্ট্য? একাধিক কবি-সাহিত্যিকের রচনায় সাধারণ পাঠকের মনে কসাকদের সম্পর্কে এমন একটা চিত্র ভেসে ওঠে যে, এই বুঝি উন্মুক্ত তরোয়াল চালাতে চালাতে অশ্বারোহী দুর্দম সাহসী এবং কিছুটা নিষ্ঠুর পেশাদার যোদ্ধা আমাদের আশেপাশে উপস্থিত হলো। কসাকদের এই যে চিত্রটি এটা একেবারে মিথ্যে নয়, কিন্তু এইটাই সব কথা নয়।

'কসাক' কথাটার অর্থ সম্পর্কে সকলে একমত নন। আমরা কথাটার সবচেয়ে বেশি স্বাভাবিক এবং সম্ভবপর অর্থ ধরে নেবো। অনেকের ধারণা কসাক কথাটা একটি তাতার শব্দ। এর অর্থ স্বাধীন। তাতারগণ মধ্য এবং উত্তর-পূর্ব এশিয়া অঞ্চল থেকে এক সময়ে গোটা রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছিল। ওদের ছড়িয়ে পড়া মানে হলো বিশৃঙ্খলভাবে জয় করা। এটা অন্তত পাঁচশ' বছর আগের ব্যাপার। এইভাবে ক্রমশঃ জয় করতে করতে ওরা ইয়োরোপীয় রাশিয়ার একটা বৃহৎ অংশে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। একমাত্র ডন প্রদেশ ভিন্ন আর কোথাও কেউ সাফল্যের সঙ্গে তাতারদের গতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি। অর্থাৎ এই ডন অঞ্চলবাসীরাই নিজেদের স্বাধীন সত্তা বাজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তাই তাতাররা এদের বলতো স্বাধীন জনসমষ্টি—ওদের ভাষায় 'কসাকস্'। এই অঞ্চলবাসীরা একাধিক ঐতিহাসিক কারণে এমন কি আজ পর্যন্ত, তাতারদের প্রতিরোধ করবার সময় যে-সমস্ত গুণাবলীর সমন্বয় করতে পেরেছিল তাদের চরিত্রে—তার অনেকখানি বজায় রাখতে পেরেছে।

তাতার সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়বার সময় থেকেই দেখা গেছে রাশিয়ার শাসকদের একটি বৃহৎ গোষ্ঠীকে কসাকদের সাম্রাজ্য রক্ষা করার হাতিয়ার

হিসেবে ব্যবহার করে আসছিল। সে সময়কার রুশ সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে এদের বসবাস বলে সরকারের বিধান অনুসারেই কসাকরা বরাবর অস্ত্র রাখতে পারতো এবং বংশানুক্রমে এইভাবে চলবার ফলে ওরা ক্রমশঃ সুদক্ষও হয়ে উঠলো অস্ত্রের ব্যবহারে।

আর একটা ব্যাপারও হয়েছিল। রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পলাতক দাস এবং আইন ও শৃঙ্খলার পক্ষে বিপজ্জনক ব্যক্তিদেরও ধরে এনে ডন অঞ্চলে বসবাস করতে বাধ্য করা হতো।

এইভাবে কয়েক পুরুষ কাটবার পরে ডন অঞ্চলের কসাক হিসেবে যারা সারা দেশে প্রসিদ্ধলাভ করলো তাদের স্বাধীনতাপ্রিয়তা এবং চরিত্রের দৃঢ়তা, কষ্ট সহ্য করবার শক্তি এবং সাহসিকতা শুধু রাশিয়া নয়, গোটা পৃথিবীর মানুষের পক্ষে একটা আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে রাশিয়ার পক্ষে সীমান্তের অনিশ্চয়তার ভাব অনেকটা কেটে গেছে। বহিঃশত্রুর চাইতে গৃহশত্রু এবং অবাধ্য জন-গোষ্ঠীই ক্রমে জার বংশের কাছে একটা স্থায়ী সমস্যারূপে দেখা দিলো। পৃথিবীর কোনো বড়ো দেশের শাসককুলই বোধ হয় কখনো জারদের মতো অযোগ্যতার পরিচয় দেয় নি রাজ্যশাসনের ব্যাপারে। ওদের কাছে শাসন করা উৎপীড়ন করারই নামান্তর হয়ে উঠেছিল স্বল্পকালের মধ্যে। জারগণ এবার কসাকদের অন্যভাবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করলো। জারের সামরিক-অসামরিক পুলিশ বাহিনীতে হাজার হাজার কসাককে ভর্তি করা হতে লাগলো। বেছে বেছে নেতৃস্থানীয় এবং প্রভাবশালী কসাক পরিবারদের জমিজায়গা দান করতে লাগলো জারগণ। রাষ্ট্রের কাছ থেকে আরো নানা রকম বিশেষ সুবিধা পেয়ে অল্পকালের মধ্যেই কসাকরা রাশিয়ার প্রায় অন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের চক্ষুঃশূল হয়ে উঠতে লাগলো। এবং এই সমস্ত ব্যাপার চলবার সময়ে কসাকদের নিজেদের মধ্যে একটি রূপান্তর ঘটে গেলো। কৃষিকার্য বলতে গেলে ওরা প্রায় ভুলেই গেলো। পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীতে যারা ঢুকে পড়তো তারা প্রায় বংশানুক্রমেই করতো ঐ কাজ—অনেকটা এক সময়ের ভারতবর্ষের শিখ, ডোগরা, পাঠান এবং গুর্খাদের মতো আর কি। এবং পুলিশ বা সামরিক বাহিনীতে যারা ঢুকতো না, বা ঐ সমস্ত বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করতো তাদের কাছে শিকার এবং মাছ-ধরাই পেশা হয়ে উঠলো। নৃ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কসাক বলতে আজ আমরা

যাদের বুঝি, গত কয়েক শ' বছরের মধ্যে তাদের জীবনযাত্রায় যে পরিবর্তন ঘটে গেছে সামাজিক ইতিহাসে নিঃসন্দেহে তা একটা আশ্চর্য হয়ে যাবার মতো ব্যাপার।

যাই হোক, এই যে কসাক সম্প্রদায়, এদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাত্রা, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, এবং ব্যক্তিগত জীবনে প্রেম, হিংসা, দ্বেষ ও ভয়ঙ্করতার শব্দ-রূপ দিয়েই শোলোখভ সাহিত্যক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কসাকদের কেন্দ্র করে রাশিয়ায় একাধিক প্রথম সারির লেখক কাহিনী রচনা করে গেছেন—শোলোখভের অনেক আগেই, যেমন গোগোল এবং টলস্টয়। গোগোলের "টারাস বালবা" এবং টলস্টয়ের 'দি কসাকস' সুখপাঠ্য রচনা সন্দেহ নেই। যোগ্য সমালোচক মাত্রেই এ কথা স্বীকার করে গেছেন যে, বাস্তবনিষ্ঠ কসাক-কাহিনী হিসেবে টলস্টয়ের চাইতে গোগোলের উপন্যাস শ্রেষ্ঠতর রচনা। কিন্তু শোলোখভের কসাক-কাহিনী প্রকাশিত হবার পরে এ কথা সকলেই স্বীকার করেছেন যে, সমস্ত দিক থেকেই গোগোলকে শোলোখভ ছাড়িয়ে গেছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, টলস্টয় এবং গোগোল যেন নেহাত বাইরে থেকে একটি পরিবারের কথা লিখেছেন, আর শোলোখভ লিখেছেন ভেতর থেকে, সেই পরিবারের যাবতীয় সুখদুঃখের একজন শরিক হয়ে। তা ছাড়া তাঁর গঠনমূলক সামাজিক দৃষ্টিকোণের স্বতন্ত্র মূল্য ত রয়েছেই।

শোলোখভ তাঁর গদ্য মহাকাব্যের সূচনায় কসাকদের প্রিয় একটি কবিতার কয়েক লাইন তুলে দিয়েছেন। বাঙলায় তর্জমা করলে কবিতাটি অনেকটা এই রকম দাঁড়ায়:

লাঙল দিয়ে চাষ করি না আমরা মোদের ভূমি
ঘোড়ার খুরের দারুণ ঘায়ে তৈয়ারি হয় জমি,
সেই জমিতে বীজ হলো লাখ কসাকের শির
দেখো, দেখো ডনের শোভা, কি বা শোভা বিধবা নারীর!
সারা দেশের শোভা বাড়ায় অনাথ শিশুর দল
ডনের ঢেউয়ের তালে তালে ভাসে বাপ-মায়ের চোখের জল!

'এণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন' শোলোখভ শুরু করেছেন প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু পূর্ব থেকে। পুরুষানুক্রমে কসাকরা কেমন জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, সমষ্টিগতভাবে সে সম্পর্কে এবং মানুষ হিসেবে তারা কে কেমন, প্রেম-ভালবাসা, আচার-অনুষ্ঠান ও নানা সংস্কার তাদের জীবনকে কতখানি

জড়িয়ে ফেলেছিল তা' বুঝতে আমাদের সুবিধে হয় প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু পূর্ব থেকে কাহিনী শুরু করা হয়েছে বলে। একদিকে কসাক পুরুষরা যেমন মাছ ধরতে ওস্তাদ, তেমনি পটু তারা বন্য হিংস্র পশু শিকারে। প্রেমে তারা দুর্দম এবং হয় তো বেশ কিছুটা নিষ্ঠুরও। নারীরা পুরুষদের এই নিষ্ঠুর প্রকৃতির সঙ্গেই নিজেদের অভ্যস্ত করে নিয়েছে দেখা যায়; অবশ্য তারা নিজেরাও অনেক সময় নিষ্ঠুরতায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমরা আগেই দেখেছি দুষ্ট জারশাসকগণ সম্প্রদায় হিসেবে কসাকদের কী ভাবে নানা সুবিধে সুযোগ দিয়ে দেশের অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে পৃথক করে রেখেছিল। কিন্তু এর ফলে আর একটা ব্যাপারও হয়েছিল। খাস কসাকদের মধ্যেও দু'টি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এক, যারা সরকারের তরফ থেকে যথেষ্ট সুবিধে সুযোগ পেত, আর দ্বিতীয়তঃ যারা যথেষ্ট পেত না, বা হয় তো কিছুই পেত না। কাজেই যুদ্ধ (প্রথম মহাযুদ্ধ) যখন শুরু হলো আমরা দেখতে পাই সম্প্রদায় হিসেবে কসাকরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতাপ্রিয়তা কসাকদের একটা সাধারণ গুণ। কাজেই যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর কসাকদের (অর্থাৎ পুরুষানুক্রমে যারা যথেষ্ট বিশেষ সুবিধে-সুযোগ ভোগ করে এসেছে) মধ্যে একটা প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ পেলো কেন্দ্রীয় সরকারের এই অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ নিয়ে স্বাধীন কসাক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। কিন্তু নিম্ন বা সাধারণ কসাকগণ (অর্থাৎ সরকারী সুযোগ সুবিধে যাদের ভাগ্যে যথেষ্ট জুটতো না) এতে রাজী হচ্ছে না দেখা গেলো। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের তিক্ত এবং কষ্টকর অভিজ্ঞতার ফলেই মনে মনে জানতো সমগ্র ভাবে দেশের মুক্তি ভিন্ন প্রকৃত মুক্তি আসবে না। তাই দেখা যায় একদিকে যুদ্ধের প্রচেষ্টা এবং অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট খণ্ড-বিদ্রোহ বা ব্যাপক বিপ্লবের তোড়জোড়—এই দুই বিপরীতমুখী ঘটনা-স্রোতের মুখে কসাক সম্প্রদায় দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়েছে: একশ্রেণী হয় জারের দাসত্ব কায়েম রাখতে বদ্ধপরিকর, আর না হয় স্বাধীন কসাকরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টিত, আর এক শ্রেণী ক্রমাগত তাদের বিরোধিতা করছে; অর্থাৎ তারা জারকে যেমন চায় না, তেমনি চায় না স্বাধীন কসাকরাজ্য; তারা চায় বৃহৎ রাশিয়ার মধ্যে নিজেদের উপযুক্ত স্থান—এ একটা মস্ত বড় মৌল দ্বন্দ্ব। এই শ্রেণীর কসাকরাই বরাবর প্রধান বিপ্লবী সংগঠন অর্থাৎ বলশেভিক পার্টির সঙ্গে সর্ববিষয়ে সহযোগিতা করে এসেছে।

কিন্তু এর ফলে ব্যাপার যা দাঁড়াল তা গৃহযুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়। কসাকভূমিতে এই গৃহযুদ্ধের চিত্রই শোলোখভ এঁকেছেন তার উপন্যাসের দুটি খণ্ডে।

অক্টোবর বিপ্লবের মাস ছয়েক পরের কথা। দেশের অভ্যন্তরে বলতে গেলে অরাজকতা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, কসাকভূমি কার্যত উত্তর আর দক্ষিণে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রে পরিবর্তন ঘটে গেছে বটে, কিন্তু সরকারী ক্ষমতা যথেষ্ট সুসংহত নয় এবং দেশের সর্বত্রই ক্ষুদ্রবৃহৎ গোলমাল লেগেই রয়েছে। নায়ক গ্রেগর মেলেখভের অন্তরে দেখা দিয়েছে বিরাট দ্বন্দ্ব। বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে দেখা যায় যে, পরিবর্তনের সূচনায় (এমন কি ভালোর দিকে হলেও) মানুষের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাই বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেবার প্রশ্নে গ্রেগরের মনে দেখা দেয় নানা প্রশ্ন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও যোগ দিলো বিপ্লবীদের সঙ্গে। কিছুকালের মধ্যেই দেখা দিলো আর এক সমস্যা। বিপ্লবীরাও দু'দলে বিভক্ত—লাল এবং সাদা। পরিবর্তনশীল ঘটনা প্রবাহের প্রকৃতি বুঝে উঠতে না পারার জন্যেই আমরা দেখতে পাই গ্রেগর ভুল করে বসলো, লালদের ছেড়ে সাদাদের দলে ভিড়ে পড়লো। কিন্তু তারপর ও নিজেই বুঝতে পারলো নিজের ভুলটা। তাই দেখা গেলো সাদাদের দল থেকেও নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে ও এবং আত্মগোপন করে রইলো কিছুকাল। তারপর একসময়ে কিছুটা নিজের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়েই আবার আত্মসমর্পণ করলো লালদের কাছে।

ইতিমধ্যে জীবন সম্পর্কে বিচিত্র এবং ব্যাপক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফেলেছে গ্রেগর। নারী-সংসর্গের অভিজ্ঞতা তার মধ্যে একটি। কসাক নারীর সমস্ত দোষগুণের সমন্বয় ঘটেছে নায়িকা আকসিনিয়ার চরিত্রে। গ্রেগরের অনেক ভুলের মূল কারণ এই আকসিনিয়া তা ঠিক, কিন্তু তবু গ্রেগরের প্রতি ওর প্রেম যথার্থই মহৎ। গ্রেগরের চরিত্র যে বিশ্বের কথা-সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এ বিষয়ে কোনো সমালোচককেই দ্বিমত হতে দেখা যায়নি। নানা বিপরীতমুখী ঘটনাস্রোতে ভেসে ভেসে গ্রেগর একসময় অনুভব করে যে, পৃথিবীতে এমন কোনো সাধারণ সত্য নেই সমস্ত মানুষ যার পক্ষপুটে নিরাপদ আশ্রয়লাভ করতে পারে। ব্যক্তি মাত্রেরই একটা নিজস্ব জগৎ আছে আর তার সত্যও একান্তভাবে তার নিজস্ব। এই নিজস্ব সত্যোপলব্ধির তাড়নার ফলেই মানুষ সর্বদা কাজ করে চলেছে বলেই ব্যক্তিতে

ব্যক্তিতে আদর্শের সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এক টুকরো রুটি, মাথা গুঁজবার মতো একটু জায়গা, নিজের বিশ্বাস মতো বাঁচবার অধিকার—এর জন্যেই মানুষ চিরকাল সংগ্রাম করে এসেছে, এ সংগ্রামের কোনোদিনই বিরতি ঘটবে না যতদিন পর্যন্ত তার জীবন আছে।

সমাজচিত্র-হিসেবে কসাক-কাহিনীর দ্বিতীয় খণ্ডে শোলোখভ অধিকতর শিল্পনৈপুণ্য এবং মানসিক স্থৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। বিরাট চিত্র আঁকবার এই যে দক্ষতা, সমস্ত সামাজিক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যে ঐতিহাসিক মূল্য, তার প্রতি সদাসতর্ক দৃষ্টি রেখে সাহিত্যরস সৃষ্টির যে নিপুণতা দেখিয়েছেন শোলোখভ, বিশেষ করে সেই জন্যে স্বদেশে এবং বিদেশে শোলোখভকে অনেকেই এমন কি মহান টলস্টয়ের সঙ্গেও তুলনা করেছেন।

ভার্জিন সয়েল আপটারনড—এ উপন্যাসে শোলোখভ প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ার সূত্র ধরে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের চিত্র এঁকেছেন। জার-শাসিত রাশিয়ার নিদারুণ বিশৃঙ্খল অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় এ উপন্যাসে। কুলাকদের কবলে দরিদ্র ও উৎপীড়িত চাষীদের সম্পর্কে ঠিক এ ভাবে আর কোনো রুশ লেখকই কখনো সাহিত্য রচনা করেন নি। যৌথ খামার প্রবর্তনের জন্যে বিপ্লবীদের যে কী মেহনত করতে হয়েছিল, তারও পরিচয় পাওয়া যায় এ রচনায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানরা রাশিয়া আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেলো শোলোখভ রণক্ষেত্রে। দেশরক্ষার সংগ্রামে রত থাকতে থাকতে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যে রিপোর্ট শোলোখভ পাঠাতেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার ফলে সামরিক এবং অসামরিক উভয় শ্রেণীর মানুষের মনেই সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে নতুন মমতাবোধের সৃষ্টি হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে বসেই শোলোখভ একদিন শুনলেন যে বাড়িতে তাঁর মা জার্মানদের বোমা-বর্ষণের ফলে প্রাণত্যাগ করেছেন।

এর পরে শোলোখভের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে দু'খানা বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে, 'দে ফট্ ফর দেয়ার কাউন্ট্রি' এবং 'এ ম্যানস্ লট'।

অক্টোবর বিপ্লবের পরে অনেকেরই লেখক-জীবনের শুরু হয়েছে রাশিয়াতে কিন্তু তাঁদের মধ্যে কম সংখ্যককেই বিপ্লব বা তারপরের সংগঠনমূলক কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে দেখা গেছে। অন্তত শোলোখভের মতো কথা ও কাজে পুরোপুরি সংগ্রামী নিশ্চয় আর কাউকেই দেখা যায় না। তাই আজকের

সোভিয়েত রাশিয়াতে মিখাইল শোলোখভ সর্ববাদী সম্মতভাবেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক।

কসাকদের জাতীয় চরিত্রের সমস্ত গুণের সমন্বয় শোলোখভের চরিত্রেও দেখা যায়। ওঁর ব্যক্তিগত চরিত্রে খাঁটি কসাকের দুঃসাহসিকতার চরম প্রকাশ ঘটেছিল ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। বিপ্লবের ষোলো বছর পরের ঘটনা। ডন অঞ্চলের সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার নামে যথেচ্ছাচার চলছিল সে সময়। কারোই মান-মর্যাদা বা জীবনের কিছুমাত্র নিশ্চয়তা ছিল না। এ হেন পরিস্থিতিতে দেখা গেলো দুঃসাহসী শোলোখভ এগিয়ে এলেন। সোজা চিঠি পাঠালেন স্টালিনকে। উনি লিখলেন: 'শস্য সংগ্রহ এবং কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার নামে এ অঞ্চলে জনসাধারণের ওপর অকথ্য অত্যাচার চলছে, মান-মর্যাদা হানি থেকে আরম্ভ করে "হারিয়ে" যাওয়া পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চলছে। এর প্রতিকার চাই।' বলাই বাহুল্য স্টালিন প্রতিকার কিছুই করলেন না। তবে শোলোখভ যে "হারিয়ে" যাননি তা তো দেখাই যাচ্ছে। সোজা কথা হলো শোলোখভের জনপ্রিয়তার জন্যে স্টালিন তার বিরুদ্ধে কিছুই করতে সাহসী হন নি।

বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য

সাহিত্য ও ক্ষুধিত আত্মার ক্রন্দন—বহু শত লক্ষাব্দ পূর্বে জড়ের জড়ত্বকে কঠিন বিদ্রূপ হেনে একদা প্রাণের প্রকাশ ঘটেছিল। সেদিনের সেই অ্যামীবা থেকে আজকের দিনের মানুষ পর্যন্ত ক্রমবিকাশের কাহিনী বিস্ময়কর নিশ্চয়ই। কিন্তু এই মানুষের মনের কার্যকলাপ বিস্ময়েরও অধিক। এই মন যখন আবার শিল্প-সাহিত্য-কাব্য-সঙ্গীত সৃষ্টিতে বা ঐ সমস্তের মাধ্যমে সৃষ্ট রসোপলব্ধিতে ব্যাপৃত হয় তখন মনের সে অবস্থাকে ভাষায় ব্যক্ত করবার মতো যথোপযুক্ত শক্তি পৃথিবীর কোনো ভাষাই এখনো পর্যন্ত লাভ করেনি। কারণ, অ্যামীবার তুলনায় যেমন পৃথিবীতে মানুষ অনেক নবীন, মানুষের ভাষা তেমনি মানুষের তুলনায়।

ধর্মের সত্য, দর্শনের সত্য বা বিজ্ঞানের সত্য সম্বন্ধে আজকের শিক্ষিত মানুষের মোটামুটি একটা ধারণা হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যের সত্যের নিশানা মনে হয় এখন পর্যন্ত, এমন কি কালজয়ী স্রষ্টাদের মধ্যেও এক-আধজন পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। অথচ তার প্রতি মানুষ জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলিতে একটা অদম্য আকর্ষণ বোধ করে থাকে। রসসৃষ্টির মধ্যেই সাহিত্যের সত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে কিনা—সেটা বিতর্কের বিষয়। তবে সার্থক রসের আস্বাদনে মানুষের ক্ষুধিত আত্মা যে অনেকটা পরিতৃপ্ত হয়, এটা আমরা অনুভব করতে পারি। তাই নৈর্বক্তিক অরূপ সৌন্দর্যকে যেমন অনেক সময় রঙ ও রূপের সাহায্যে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়, অসীমকে সীমার মাঝে প্রকাশের নানা হাস্যকর উপায় উদ্ভাবন করা হয়, তেমনি আমরাও অক্ষমের মতো একটা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, সার্থক রসসৃষ্টিই শিল্প-সাহিত্যের প্রথম ও শেষ কথা, চরম লক্ষ্য।

অবশ্য রসসৃষ্টিতেই সকলের না হক, অধিকাংশের মন যখন পরিতৃপ্তি লাভ করে, তখন আদর্শ হিসেবে এটা একটা গ্রহণযোগ্য জিনিস বৈকি। সীমাহীনের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত রেখে, এই সীমিত লক্ষ্যের সাধনার যে ফলশ্রুতি তার মধ্যে সভ্যতার সার্থকতার অনেকখানিই নিহিত আছে।

জীবনের নানাদিকে পরাজয়ের গ্লানিতে নিমজ্জমান বাঙালী বিংশ শতাব্দীর এতখানি এসে, আজকে যে-ভাবে সাহিত্যের রসসৃষ্টিতে এবং

তার রসগ্রহণে সমর্থ, তাতে মনে হয় ছোট ছোট ভুল অনেক করলেও, সৃষ্টি ও সভ্যতার একদিকে তার বিরাট সাফল্যই হয়েছে, তার ভাষা এবং সাহিত্য আজ বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)—বাংলা বা ভারতবর্ষ কেন, রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভার আবির্ভাব পৃথিবীর যে-কোন দেশের পক্ষে যে-কোন সময়েই একটা একান্ত অভাবিত, প্রায় অকল্পিত, আকস্মিক—Accident বলেই মনে হয়। পুরাপুরিভাবেই দুই শতাব্দীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ কেবল বিংশ শতাব্দীতেও যা সৃষ্টি করে গেছেন, তার সমস্তটাও যদি ইংরেজী কিংবা ফরাসী ভাষায় হতো, অর্থাৎ তিনি যদি ইংলণ্ড বা ফ্রান্সে জন্ম নিতেন, তা'হলেও তাঁর আবির্ভাব সমান বিস্ময়কর হয়েই থাকতো। কাজেই এ হেন রবীন্দ্রনাথকে কোন বিশেষ দেশের বা কালের সাহিত্যের Standard মনে করা অত্যন্ত ভুল। এক বন্ধু এক সময় বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর পক্ষে অনাকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। কথাটা মিথ্যে নয়। মানুষ সাহিত্যের যে-কোন বিভাগে শত দুঃসাহস করেও যা চাইতে পারতো না, রবীন্দ্রনাথ তদপেক্ষা অনেক বেশি দিয়ে গেছেন। মানুষ, অক্ষর আবিষ্কার করবার পর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত সাহিত্যস্রষ্টার আবির্ভাব হয়েছে, তাঁদের মধ্যে চার কি পাঁচজন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয়—তা'ও সমগ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিনা, সে-কথা সন্দেহাতীত নয়। আর একজন বেদব্যাস, কি আর একজন শেক্‌সপীয়ার, কিংবা গ্যয়টে বা হুগোর কথা যেমন ভাবা যায় না, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব তেমনি সত্য হলেও আমাদের কল্পনার সীমার বাইরের ব্যাপার। তিনি এ দেশে জন্মেছিলেন এ জন্য আমরা ধন্য, আমাদের ভাষা গৌরবান্বিত। হাজার বছর পরের মানুষ নিশ্চয়ই তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে একই ব্যক্তির সৃষ্টি বলে মানতে রাজী হবে না। কবি রবীন্দ্রনাথ, গীতিকার রবীন্দ্রনাথ, সুরকার রবীন্দ্রনাথ, নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ, গল্পকার রবীন্দ্রনাথ, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ, প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ, এবং শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী হয়ত দশজন না বিশজনের কীর্তি, তাই নিয়ে গবেষণা চলবে।

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই একজন সাধক ছিলেন। চিন্তা, সাহিত্যসৃষ্টি বা কর্ম—জীবনে সমস্ত কিছুতেই তাঁর মধ্যে সাধকের মনোভাবই ছিল প্রবলতম। এবং সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয় যে "রবীন্দ্রনাথের সাধন-পন্থা না এ দেশীয় না

বিদেশীয় কোন সাধন-পন্থার সঙ্গে মেলে না" (কাব্য পরিক্রমা : অজিতকুমার চক্রবর্তী)। দেশ-কাল নির্বিশেষে যখনই যে-কোন দেশের শিল্প-কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে তাঁর মনের মতো কিছু পেতেন, তা' আত্মীকরণের এক অত্যাশ্চর্য পদ্ধতিতে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে সৃষ্টির সাধনায় নিমগ্ন হতেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর নানা উপাধি, বা তাঁকে সম্বোধনের অসংখ্য নামের মধ্যে 'বিশ্বকবি' কথাটিই সর্বাপেক্ষা সুপ্রযুক্ত। বিংশ শতাব্দীরূপ বিশেষ কালের সাহিত্যমানের সর্বোচ্চ সীমাও যাঁর কাছে মাথা নুইয়ে ধন্য হয়েছে—এ হেন প্রতিভা রবীন্দ্রনাথকে বর্তমানের এই সামান্য আলোচনা থেকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গেই বাদ দিলাম।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ও বিশ্বসাহিত্য—শুধু আমাদের দেশ বলে নয়, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই সাধারণের মধ্যে এ রকম একটা ধারণা রয়েছে যে, সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার না পেলে বুঝি আর কারো সৃষ্টি বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে স্থান পেতে পারে না। এ ধারণাটা একেবারেই ভুল। নোবেল পুরস্কার প্রবর্তিত হয়েছে মাত্র পঁয়ষট্টি বছর—তার আগে তাহলে এ বিচার হতো কিভাবে? আর নোবেল পুরস্কার প্রবর্তিত হবার পরেও বহু কালজয়ী সাহিত্যস্রষ্টা যেমন ইবসেন, টলস্টয়, ম্যাকসিম গোর্কি প্রমুখ অনেককেই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়নি—তারই বা যুক্তি কি? বাস্তবিক পক্ষে গ্রহণীয় যুক্তি কিছু নেই। সংশ্লিষ্ট মহল হয়ত বলবেন অনেক কথাই—কিন্তু সে শুধু সত্যকে চাপা দেবার জন্য। যে কথাটা আলো-আঁধারে আছে, তার ফলে তা ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।

আসল কথা হলো আলফ্রেড নোবেল-এর উদ্দেশ্য যতই মহৎ থাক না কেন, সুইডিশ একাডেমী কদাচিৎ তাঁর উইল-এর তাৎপর্য অনুযায়ী সাহিত্যের পুরস্কার দিতে সক্ষম হয়েছেন। কথাটা প্রিয় নয়, কিন্তু সত্য। জিনিসটা আরো পরিষ্কার হয়ে যায় রাশিয়ার লেখকগণের কথা বিচার করলে। টলস্টয়, চেকভ বা গোর্কিকে না দিয়ে ওঁরা নোবেল পুরস্কার দিলেন আইভান বুনিনকে। খাস স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার যে সমস্ত লেখক-লেখিকাদের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, তাঁদের অনেকের চাইতেই বুনিন মহত্তর স্রষ্টা সন্দেহ নেই, কিন্তু টলস্টয়, চেকভ এবং গোর্কিকে বাদ দেওয়ার পেছনে এক রাজনীতি ভিন্ন অন্য কোন কারণ নেই। পশ্চিমী দুনিয়ার পক্ষে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক বক্তব্য না থাকলে কারোই যে নোবেল

পুরস্কার পাওয়ার আশা নেই—ওঁদের কার্যাবলীর দ্বারা এ সিদ্ধান্তে অবশ্যই আসা যায়।

এশীয় এবং ঔপনিবেশিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও বিয়াল্লিশ বছর পূর্বের ভারতের রবীন্দ্রনাথ যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন তা তাঁর সাহিত্য কীর্তির জন্য ততোটা নয়, যতোটা বন্ধুভাগ্যের জন্য। য়েটস এবং তাঁর কয়েকজন প্রভাবশালী বন্ধু-বান্ধব যাঁরা সাময়িকভাবে কিছুদিন শিল্পীর মনোভাবদ্বারা চালিত হয়েছিলেন, তাঁদের সহায়তা ভিন্ন রবীন্দ্র-ভাগ্যেও কোনদিন নোবেল পুরস্কারের সিকে ছিঁড়তো না।

যাই হ'ক এ কথা আজ চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীনতায় বিশ্বাসী প্রত্যেক মানুষের বোঝা উচিত যে, শুধু নোবেল পুরস্কার নয়, যে-কোন দেশের যে-কোন সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া এবং নেওয়ার পেছনে নানা প্রকার বিধি-নিয়ম ও বাধানিষেধ আছে—ছিলও, থাকবেও—সেগুলি বোঝা যায়; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আবার ব্যাপার যা ঘটে, তাকে রহস্য ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

শতাধিক বছরের ইংরেজী ভাষার সান্নিধ্য আশা করা যায় আমাদের মানসকে অন্ততঃ এটুকু দৃঢ় করেছে, এবং আমাদের বিচারবুদ্ধিকে এটুকু সক্ষম করে তুলেছে যে, ইয়োরোপ-আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য (যার বেশির ভাগই ইংরেজী ভাষায় সহজলভ্য) তা পাঠের পরে আমরা নিজেরা সে-সমস্ত সম্বন্ধে নিজেদের ধারণা গড়ে তুলতে পারবো। সেই সঙ্গে আর একটা কাজও করা দরকার—তা হলো সর্বভারতীয় না হ'ক, অন্ততঃ বাঙালী লেখকগণের যথাযোগ্য সমাদর করা। বাঙালী লেখকগণের মধ্যে বিংশ শতাব্দীতে এখন পর্যন্ত এ রকম অন্ততঃ পঁচিশজন লেখকের আবির্ভাব হয়েছে, যাঁরা বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ের সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন এবং অন্ততঃ পাঁচজন এ রকম অসাধারণ প্রতিভাধরকে আমরা পেয়েছি যাঁদের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলে, নোবেল পুরস্কারের যে মর্যাদাহানি ঘটেছে বিগত ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরে, তার অনেকখানিই পুনরুদ্ধার হতো। বর্তমান লেখকের ধারণায় এঁরা পাঁচজন হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র। এঁরা বিংশ শতাব্দীর পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের সমকক্ষ। রচনার ঔৎকর্ষ, দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার, কল্পনার ঐশ্বর্য, লিপিমাধুর্য, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, চিন্তার বৈশিষ্ট্য—প্রত্যেক দিক থেকেই কথাটা সত্য। কিন্তু এখন পর্যন্ত নোবেল পুরস্কার এঁরা পাননি, পাবার

সম্ভাবনাও নেই (কারণ এঁদের কারোরই বন্ধুভাগ্য যথেষ্ট সুপ্রসন্ন বলে মনে হয় না)। কিন্তু তবু এঁদের সৃষ্টি যে বিশ্বসাহিত্যের উচ্চতম পর্যায়ের সাহিত্য, সে-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কোনদিন এঁদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি যে কোন প্রধান ইয়োরোপীয় ভাষায় অনূদিত হলে—এ কথার যাথার্থ্য অনুভূত হবে।

কাব্য—মধুসূদনের (১৮১৪-১৮৭৩) মহপ্রয়াণে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "…মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক! …হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা রোদন করিব না।" (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০)।

একসময়ে, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কবি **হেমচন্দ্রের** (১৮৩৮-১৯০৩) আসন যে বাংলা কাব্যজগতে কোন্ শ্রেণীভুক্ত হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ অল্প কয়েকটি কথা দিয়েই তা বোঝা যায়। অবশ্য হেমচন্দ্রের যে আধিপত্য সেটা কখনোই তাঁর একার ছিল না, **নবীনচন্দ্রের** (১৮৪৭-১৯০৯) সঙ্গে যুগপৎ তিনি বাংলা কাব্যজগৎ শাসন করে গেছেন। নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রই দু'বছর বাদে লিখেছিলেন: "…নবীনবাবুকে আমরা অধিকতর উচ্চ আসন দিতে পারি না পারি, তাঁহাকে বাঙ্গালার বাইরণ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি…।" (বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক ১২৮২: 'পলাশীর যুদ্ধ'-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে)। এ হেন শক্তিধর দুই কবির পরিণাম শেষ পর্যন্ত কি হ'ল? তাঁরা কেন অতো স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিলেন? বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই তাঁরা ক্রমে দূরে সরতে সরতে বিশ বছরের মধ্যেই বাঙালী মানস থেকে প্রায় বিস্মৃত কেন হয়েছিলেন? কারণ রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যের সমস্ত দিকে বিশ কি তিরিশ বছরের মধ্যে এমন পরিবর্তন ঘটালেন যে, একদিকে যেমন তাঁর পূর্বসূরিগণ ম্লান হয়ে গেলেন, অন্যদিকে তেমনি উত্তরসূরিগণের পক্ষে আত্মপ্রকাশ বা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে দেখা দিল বিরাট সমস্যা। অনেক কবি রবীন্দ্রের ঔজ্জ্বল্যে একেবারেই লোকচক্ষে পড়লেন না, এবং অঙ্গুলিমেয় কয়েকজন মাত্র নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হলেন। রবীন্দ্রের এই অন্ধ-করা দীপ্তি আত্মসাৎ করে যাঁরা কবি হিসেবে নিজেদের পরিচয় সুস্পষ্ট রাখতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদের কাব্য-প্রতিভা অসাধারণ বৈকি।

কথায় বলে, কবির দেশ বাংলা দেশ। কথাটার কিছুটা তাৎপর্য আছে। পশ্চিমবঙ্গে তিন কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে যত লোক কাব্যচর্চা করে থাকেন, পৃথিবীর আর কোন দেশে আনুপাতিকভাবে বিচার করলে তত কবি পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বাংলা দেশের কাব্যচর্চার আর একটা বৈশিষ্ট্যও আছে, তা হলো যে-হারে বাঙালী কবিগণ কাব্যচর্চা বর্জন করে থাকেন। ছাত্রজীবনে একটা বিশেষ বয়স পর্যন্ত বাংলা দেশে কে কবিতা লেখে না, সেইটেই খুঁজে বের করতে হয়, কিন্তু যথাসময়ে, প্রভাতের শিউলির মতো তাদের বেশির ভাগই টুপটাপ ঝরে নিঃশেষ হয়ে যায়। এর থেকে আর একটা বিষয় বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠে—তা'হলো এই যে, কাব্যচর্চা করলেও আসলে সেটা অধিকাংশের পক্ষেই নেশা বা পেশা কিছুই নয়—নিছক বয়সের দোষ মাত্র।

এই 'দোষ-যুক্ত' বয়সের সীমা পেরোবার পরেও যাঁরা কাব্যচর্চা করে গেছেন বা এখনো করছেন, তাঁদের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে আসে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথা, বিশ্বকবির জীবদ্দশা থেকেই যাঁর বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (জন্ম ১৯০৪)—কাব্য-সাধনার প্রথম যুগে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের অভিলাষ ছিল তিনি 'যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুঁতোরের, মুটে মজুরের' কবি হবেন। তাঁর এ আকাঙ্ক্ষার আন্তরিকতায় বাঙালীর মনে কখনো সন্দেহ দেখা দেয় নি, কিন্তু ওদের কবি হতে পারা প্রকৃতই খুব কঠিন কাজ—ওদের একজন না হলে ওদের যথার্থ কবি কেউ কোনদিন হতে পারবেন কিনা সে বিষয়ও সন্দেহাতীত নয়। কিন্তু, শিক্ষিত অথচ গরীব 'ভদ্রলোক'দের কবি তিনি অবশ্যই হতে পেরেছেন। সেটাও কম কথা নয়। বরং আমাদের ত মনে হয়, কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র যাদের কবি হয়ে উঠেছেন, বা যা হয়ে উঠেছেন এইটেই স্বাভাবিক ছিল তাঁর পক্ষে, বাস্তব অবস্থার বাইরে যে তিনি যান নি, তাতেই তাঁর কাব্যের সৌন্দর্য পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শিল্পের যেটুকু প্রসার আমাদের দেশে ঘটেছে এবং তার ফলে যে শিক্ষিত বিত্তহীন শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে (যাদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছে) তাদের বক্তব্য, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আকৃতি প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো নিখুঁতভাবে আর কেউ কাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেন নি। ('একটি ইটের ব্যবধান রেখে পাশাপাশি থাকি শুয়ে,—এ ছাতের জল ও ছাতে গড়ায় ভিৎ গাড়ি একই ভুঁয়ে।—...শুধু

কোনদিন সঙ্গবিহীন বিদ্রোহ করে প্রাণ; কঠিন দেওয়ালে করাঘাত করে ঘুচাইতে ব্যবধান।')

লিরিক-ধর্মিতার চরম প্রকাশ ঘটেছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যে, অথচ তা গীতিধর্মী নয়। রবীন্দ্র-উত্তাপের ঈষৎ দহন তাঁর সর্বত্র দেখা গেলেও, নিজস্বতার ছাপই বেশি—সব চাইতে বড়ো কথা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্য 'আধুনিক,' চাই কি, 'অতি-আধুনিক' অথচ ইন্দ্রিয়পর নয় এবং অকারণ বুদ্ধির-বিদগ্ধ-পীড়নে ও বিরক্তিকর যৌনতার পরিপ্লাবনে ক্লেশদায়ক নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্য সহজ সাবলীলতার ঐশ্বর্যমণ্ডিত। দেহবাদ-শ্রেণীসংগ্রাম-কঠিন কঠোর প্রাকৃতিক বিষয় বৈচিত্র্যের প্রতি তাঁর চেতনা সদাসতর্ক ত বটেই, কিন্তু তার বাইরেও সাধারণ মানুষের মনের যে একটা বিশেষ উদাসী কাব্যপ্রবণতা আছে, যার অস্তিত্ব অনেকেই অনুভব করেন অথচ প্রকাশে সমর্থ হন না, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যে সে-রকম অনেক আশ্চর্য মুহূর্তের প্রকাশ ঘটেছে (নীল! নীল!—সবুজের ছোঁয়া কিনা, তা বুঝি না,—ফিকে গাঢ় হরেক রকম—কম-বেশী নীল!—তার মাঝে শূন্যের আনমনা হাসির সামিল —ক'টা গাঙচিল)।

এই সমস্ত নানা কারণে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যের নিজস্বতা রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধক যে-কোন বাঙালী কবির রচনার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করলে যে-কোনও পাঠকের বিস্ময়ের কারণ হবে নিশ্চয়ই। এজরা পাউণ্ড, ই. ই. কামিংস, টি. এস. এলিয়ট, জন ম্যাজফিল্ড, ডব্লু. বি. য়েট্‌স বা এঁদের কালের যে কবি-গোষ্ঠীর প্রভাব আজকের অনেক বাঙালী কবির মধ্যেই অত্যন্ত প্রকট, প্রেমেন্দ্র মিত্র আশ্চর্যভাবে নিজেকে তার বাইরে রাখতে সমর্থ হয়েছেন। গেরার্ড ম্যানলী হপকিন্স, অস্টিন ডবসন, ডব্লু. এইচ. অডেন প্রভৃতি অপেক্ষা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্য কোনও অংশে নিকৃষ্ট নয়।

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর কাব্যাদর্শ সম্পর্কে কখনো কোথাও কিছু লিখেছেন কিনা সঠিক জানা নেই, কিন্তু তাঁর রচনার মধ্য থেকে যে রোমান্টিক সুর জেগে ওঠে, তা' নানা দিক দিয়েই ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যাদর্শের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিলে যায়। সেই সহজ প্রকাশভঙ্গী, সাধারণে রসগ্রহণে সমর্থ এমনি পরিচিত শব্দ প্রয়োগ, কাব্যের বিশেষ সজ্জা ব্যাতিরেকেই বিশিষ্ট কাব্যসৃষ্টি; কখনো-পূর্ণ-হবেনা-জেনেও-স্বপ্নে-বিভোর-অথচ-ঠিক-হতাশা-নয়, এ হেন অক্ষম মনে দিকচক্রবালের নানা

রঙ যে হাতছানি দেয় তার প্রতি পরিপূর্ণ সচেতনতা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যকে নব্য বাংলার একান্ত আপনার করে তুলেছে। (তুলনীয়: ওয়ার্ডসওয়ার্থের কয়েকটি কথা "......what is meant by the word Poet? What is a poet? To whom does he address himself? And what language is to be expected from him?—He is a man speaking to men: a man, it is true, endowed with more lively sensibility...who rejoices more than other men in the spirit of life that is in him..." (Preface to the *Lyrical Ballads.*)

সবিশেষ স্বীকৃতি-প্রাপ্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোট গল্প সম্বন্ধে নতুন করে বলবার কিছু নেই, শুধু এ কথা বললেই চলে যে ছোট গল্পের ক্ষেত্রে তাঁর Art প্রায় perfection-এ পৌঁছে গেছে। বড় গল্প বা উপন্যাসে তাঁর দক্ষতা ততোটা সন্দেহাতীত নয় (অবশ্য 'পাঁক' একটি ব্যতিক্রম)।

গদ্যলেখক হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবশ্যই কিছু বলা প্রয়োজন। হাস্য-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-আজগুবী সাহিত্য সম্পর্কে বাংলা ভাষার দৈন্য সুবিদিত। পশ্চিমের দেশগুলি, জনগণ এবং সাহিত্যের নানা দিক সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক সময় এদিকে তাঁর সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলেন। প্রভূত সম্ভাবনা নিয়ে এদিকে প্রমথ চৌধুরী আপন লেখনী সঞ্চালিত করলেও তা যে একটা পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে পারে নি এটা বাঙালীর দুর্ভাগ্য বলতে হবে। এবং তারপর থেকে এবিষয়ে ওঁদের যথার্থ উত্তরসাধক আমাদের সাহিত্যে দেখা যায় নি। এদিক থেকে মনে হয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ঘনাদা'র গল্পগুলি কেবল বাংলা সাহিত্যেরই একটি অপরিণত দিকের পুষ্টিসাধন করছে তা নয়, এ গল্পগুলির মধ্যে তাঁর convincing style-এর যে বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটেছে তাতে মনোযোগী পাঠকের র‍্যাবেলের 'গারগানতুয়া ও প্যান্টাগ্রুয়েল'-এর অমর কাহিনীর কথা মনে আসা স্বাভাবিক।

অন্যান্য প্রধান কবিগণ—কাজী নজরুল ইসলামের (জন্ম ১৮৯৯) কাব্যকে যাঁরা একান্তই time-serving বলে মনে করেন, আমরা তাঁদের অন্তর্ভুক্ত নই। একেত আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম এখনো শেষ হয় নি (মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রাম কখনো শেষ হয় না), দ্বিতীয়তঃ নজরুলের কাব্যকে

অতো সীমাবদ্ধ করে ফেলা অসঙ্গতও বটে। মানুষের নানা বিচিত্র অনুভূতির এমন অনেক সত্য ওঁর তেজোদীপ্ত শব্দ-ছন্দে বন্দী হয়ে আছে, যার প্রয়োজন চিরকাল থাকবে। ভূপেন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, নজরুল হলেন: "শ্রেণীচ্যুত বুদ্ধিজীবী (declassed intellectual) ভারতের স্বাধীনতাকামীদের প্রতীক···।" তাঁর মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় যথার্থই লক্ষ্য করেছিলেন বাঙালীর মনের মানুষকে। "···এ খাঁটি মাটি হইতে উঠিয়াছে···মানুষে একাত্মসাধন এ অতি অল্পলোকেই করিয়াছে—কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে মনুষ্যাত্মক বুদ্ধি দেখিতে পাই।···" (কল্লোল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬)। প্রসঙ্গতঃ তুলনীয় টলস্টয়ের শিল্পাদর্শ: "···it (art) is a means of union among men joining them together in the same feeling···"। ('গাহি তাহাদের গান—ধরণীর হাতে দিল যারা আনি, ফসলের ফরমান।') বাঙলার নজরুলের কাব্যের যে বাণী (message) ও আহ্বানধ্বনি (call) তার আবেদন সার্বজনীন (universal); ভের্লেন অপেক্ষা স্পষ্টতর, সুইনবার্ণ অপেক্ষা কম মুখর নয়।

'বেনু ও বীণা', 'কুহু ও কেকা' এবং 'তীর্থ-সলিল'-এর কবি **সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত** (১৮৮২-১৯২২)—এর এমন দুর্লভ একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যা অন্ততঃ কবিদের মধ্যে পৃথিবীতে কদাচিৎ দেখা গেছে। কথাটা হয়ত অনেকের কানে লাগবে, কিন্তু এইটেই সত্য কথা। যে-কোন দেশেরই হোক না কেন, কবিগণ সাধারণতঃ subjective অর্থাৎ অন্তর্মুখীন হয়ে থাকেন—সত্যেন্দ্রনাথ তার একটি বিশিষ্ট ব্যতিক্রম। বহির্বিশ্বের সৌন্দর্য তাঁর মানসে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো, তার বেশির ভাগটাই সর্বজনগ্রাহ্য বিষয় বা বস্তু। কাব্যিক spiritualism-এর দুর্বোধ্যতা-বর্জিত; অথচ শব্দে, ছন্দে, বর্ণে তা কাব্যও বটে। রোমান কবি লুক্রেসিয়াসের De Natura-র স্বাদ পাওয়া যায় তাঁর রচনায়। ('রূপের গোলাপ রোজ ফোটে না বুলবুলে তা জানে গো,—গোলাপ ঘিরে পরস্পরে তাই তারা ঠোঁট হানে গো';) The Testament of Beauty-র কবি Robert Bridges অপেক্ষা সত্যেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যানুভূতি তীব্রতর ছিল বলেই মনে হয়।

ইংলণ্ডের স্থপতি-কবি টমাস হার্ডির মতো ছিলেন বাংলার এঞ্জিনীয়ার-কবি **যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত** (১৮৮৭-১৯৫৪)। প্রচ্ছন্ন চিন্তা এবং ভাব প্রকাশের সাবলীলতায় যতীন্দ্রনাথ হয়ত হার্ডি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর শিল্পীই ছিলেন।

জীবনের নানা বিষাদ-যুক্ত জিজ্ঞাসা তাঁর 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া' ও 'নিশান্তিকা'র সর্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। বিষাদের যে মূর্চ্ছনায় মহাকাব্য সৃষ্টি হয়, তার সমস্ত লক্ষণই যতীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল। ('খেটেখুটে ফিরি শূন্য কুটীরে, দেহখানা আজ কী অবসন্ন!—কে তুমি ঠাকুর? এ অপরাহ্নে গরীবের দ্বারে কিসের জন্য?...মুখখানি দেখে মনে হয়, আহা, কতদিন যেন জুটেনি অন্ন।')

যে পুরুষালী বলিষ্ঠতা বঙ্কিমে শুরু এবং বিবেকানন্দে শেষ হয়েছিল, তার পুনঃপ্রকাশ ঘটেছিল **মোহিতলাল মজুমদার** (১৮৮৮-১৯৬৩)-এর কাব্যে ও প্রবন্ধমালায়। "তাঁর কবিতায় প্রচণ্ড আবেগও দৃঢ় অকম্পিত রেখায় রূপায়িত, তাঁর কাব্যে তাই ভাস্কর্যের কঠিন সূক্ষ্ম সুষমা, স্থাপত্যের মহান অটল গাম্ভীর্য" ('সুনির্বাচিত কবিতা'র ভূমিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্র)। 'স্বপন পসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মরগরল', 'হেমন্ত গোধূলি' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যে ক্লাসিক পর্যায়ভুক্ত হয়ে আছে। ইংলণ্ডের রাজকবি জন ম্যাজফিল্ডের সঙ্গেই মোহিতলালের কাব্যের সর্বাধিক সাদৃশ্য দেখা যায়। তবে বলিষ্ঠতায় এবং বীরোচিত পুরুষকারের মাধুর্য প্রকাশে মোহিতলাল ম্যাজফিল্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। ('এতদিন পরে উঠিল কি আজ সুরাসুরজয়ী যুগাবতার? মানুষের পাপ করিতে মোচন, দেবতারে হানি ভীম প্রহার,—কালাপাহাড়?...')

মোহিতলালের সাহিত্যপ্রতিভার দ্বিতীয় স্ফুরণ ঘটেছিল মৌলিক প্রবন্ধ রচনায়। এই জিনিসটির অভাব প্রায় প্রত্যেক ভাষায়ই কমবেশি দেখা যায়—বাংলা ভাষার ত কথাই নাই। কিন্তু একা মোহিতলাল যৌবন পার হয়ে এ কাজে হাত দিয়ে যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, গুণ এবং পরিমাণ দু'দিক থেকেই তা একজনের পক্ষে কদাচিৎ সম্ভব হতে দেখা গেছে। সাহিত্যাশ্রয়ী তাঁর এই প্রবন্ধমালা, বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে, বাঙলা ভাষার অমূল্য সম্পদ। Gissing, Delattre কিংবা Chesterton ডিকেন্স সম্বন্ধে যা করতে না পেরেছিলেন, মোহিতলাল তাঁর সাহিত্যাদর্শের প্রতীক, পর্যুদস্ত ভারতের মুক্তিমন্ত্রের উদ্‌গাতা বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তদপেক্ষা অনেক বেশিই করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে মনে হয়। মৌল প্রবন্ধ রচনায় Hazlitt-এর সমকক্ষ এই বাঙালী প্রতিভার এখনো যথোচিত স্বীকৃতি হলো না—এটা সাধারণভাবে পাঠকের অক্ষমতা ব্যতীত আর কিছু নয়।

বুদ্ধদেব বসু (জন্ম ১৯০৮) শুধু কবিতাই নয়, বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের নানা দিকে সৃষ্টির ইতিহাস রচনা করবার মতো শক্তি নিয়ে আসরে নেমেছিলেন। কাব্যের ক্ষেত্রে 'বন্দীর বন্দনা', 'কঙ্কাবতী', 'নতুন পাতা'য় ওঁর রচনার বৈশিষ্ট্য যেমন দৃষ্টি এড়াতে পারে না, ছোট গল্প ও উপন্যাস (সাড়া, তিথিডোর) এবং প্রবন্ধের (কালের পুতুল) বেলায়ও সে-কথা সমভাবে প্রযোজ্য। আমার মনে হয় বুদ্ধদেব বসুকে বাঙলার আঁদ্রে জিদ্ বললে (রাজনীতি, ধর্ম বা অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ বাদে) জিদের কোনই অসম্মান ঘটবে না। একটা কথা আছে—words charged with utmost meaning-ই হলো সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্য—সেদিক থেকে বুদ্ধদেব বসু যাই লিখুন না কেন, তাঁর নিজস্বতায় আশ্চর্য রকমভাবে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাংলা গদ্যের যে নতুন রীতি নিয়ে তিনি পরীক্ষা করছেন তা বীরবলের মতো সরস না হক, বীরবলের মতো সংক্ষেপিত। Style হিসেবে এর স্বাতন্ত্র্য অবশ্য স্বীকার্য। কি কাব্য আর কি গদ্য, তাঁর লেখায় সত্যি in between lines মানে খুঁজতে হয়। এ কলমে নাটক রচিত হলে অস্কার ওয়াইল্ডের মতো ঝুলঝুরি দেখা যেতো। কাব্য-ধর্মিতা ও বিশ্লেষণ-প্রিয়তা এঁর রচনার প্রধান গুণ। যদিও অতিমাত্রায় যৌন-সচেতনতা অনেক সময় পাঠকের বিরক্তির কারণ ঘটায়, এ কথাও মিথ্যে নয়। ('…তোমারে যে পেয়েছিনু—সর্ব-সঙ্গে, মর্মে-মনে প্রাণে,—পেয়েছিনু বিরহের স্পন্দমান অন্ধকারে,—মিলনের প্রফুল্ল বাসরে—সে কথা কহিতে চাই আকাশেরে, ধরণীরে,—তৃণপত্রে, সমুদ্রের কানে।') দুর্দমনীয় রোমান্টিক আবেগ-প্রবাহে বুদ্ধদেবের কাব্যের মনোযোগী পাঠক অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েন।—অথচ তা মিস্টিক কিছু নয়। বোদলেয়র, পউণ্ড, য়েটস্, কামিংস্, প্রভৃতির অনেক দুরূহ চিন্তাকে বুদ্ধদেব নতুন করে নিজের মধ্যে অনুভব করতে সক্ষম হয়েছেন, এর ফলে বাংলা কাব্য আজ পশ্চিমের নানা ভাবের দ্যোতনা-পুষ্ট।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)-এর 'বনলতা সেন', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'রূপসী বাংলা' প্রভৃতি কবিতা-গ্রন্থে বাংলা কাব্যের যথার্থ ছন্দ-মুক্তি ঘটেছে। প্রতীকধর্মী, রোমান্টিক, সুতীব্র শ্লেষ, নিসর্গ-সৌন্দর্যে উদ্দীপিত—নানা জাতের কবিতাই জীবনানন্দের কলমে আশ্চর্য রসের সঞ্চার করেছে। Southey-র Battle of Blenheim অপেক্ষা ভিন্ন জাতের কিন্তু তীক্ষ্ণতর

একটি শ্লেষ : 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ—যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে ছাখে তারা।—যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই—পৃথিবী অচল আজ তাহাদের সুপরামর্শ ছাড়া।'

'ক্রন্দসী'র কবি **সুধীন্দ্রনাথ দত্ত** (১৯০১-১৯৬১) ক্লাসিকধর্মী কবি ছিলেন। এঁর কাব্যের রস মনে হয় এখনো বাঙালী পাঠক পুরোপুরি পান নি। শব্দ-চয়ন, ভাবের বৈচিত্র্য, বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গী—সব দিক দিয়েই বিংশ শতাব্দীর বাঙলা কাব্যের একজন বিশিষ্ট রচয়িতা ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। ('...কোথায় পালিয়ে বাঁচি? বিদ্রোহ কি সর্বত্র বাতিক?—নীলিমানিমগ্ন আমি; চতুর্দিকে নীলিমা, নীলিমা॥')

এঁরা বাদেও বাংলা কাব্যের এমন আরো অনেক লেখক এখনো আছেন যাঁদের কবিত্বশক্তি নতুন করে স্বীকারের অপেক্ষা রাখে না, যদিও তাঁদের অনেকেরই সৃষ্টি পরিণতির অপেক্ষা রাখে। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন: **অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত, হুমায়ুন কবীর, সমর সেন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, দীনেশ দাস,** গোপাল ভৌমিক, উমা দেবী, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, কামাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, সুশীল রায়, সুনীল বসু, অরুণ ভট্টাচার্য, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচি, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অসিত ভট্টাচার্য, সুশীলকুমার গুপ্ত ও বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি।

বিশেষভাবে বলতে হয় দু'জনের কথা। প্রথমতঃ 'পদাতিক'-এর কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আর দ্বিতীয়তঃ এ যুগের বাংলার চ্যাটারটনের অধিক—সুকান্ত ভট্টাচার্যর (১৯২৬-১৯৪৬) কথা। কবি সুভাষ বাংলা কাব্যামোদিগণের কাছে নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন বলা যায়। 'পদাতিক'-এর বিষয়বস্তু এবং Tone-এর ক্রমশঃ বিকাশ ঘটলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যথার্থই একজন গণ-কবি হয়ে উঠতে পারতেন।

সুকান্তর কাব্য পাঠকের একটি স্থায়ী জিজ্ঞাসা হলো: অতো অল্প বয়সে জীবনের পাদপীঠে আছড়ে-পড়া একজন বাঙালীর মধ্যে কাব্যশক্তি, সমাজ-সচেতনতা, শ্লেষ এবং বিদ্রূপের অমন দুর্লভ শক্তির সমন্বয় ঘটেছিল কি করে? এ একটা যথার্থই বিস্ময়কর ব্যাপার। জীবন সম্পর্কে সুকান্তর মমত্ববোধ উইলফ্রেড ওয়েন বা সিগফ্রিড সেসুন অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না। ('আমরা সিগারেট...তোমাদের আরাম: আমাদের মৃত্যু—আর আমরা

বন্দী থাকব না—কৌটায় আর পকেটে-আঙুলে আর প্যাকেটে :—রাণার! রাণার?—এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে?—রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে?...শোন রে মজুতদার—তোদের প্রাসাদে জমা হ'লো কত মৃত মানুষের হাড়—হিসাব কি দিবি তার?') কবিত্বশক্তির অনির্দেশ্য প্রকৃতির চমৎকার দৃষ্টান্ত ছিল সুকান্ত।

কাব্যশক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথা অবশ্যই বলতে হয় যে বর্তমান বাংলায় এ রকম অনেকেই রয়েছেন যাঁদের কাছ থেকে দেশ অনেক কিছুই আশা করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কাব্যশক্তি রয়েছে অথচ তাঁরা শ্রেষ্ঠ কিছু সৃষ্টি করতে পারছেন না কেন? এ প্রসঙ্গে হয়ত অনেক কিছুই বলবার আছে, কিন্তু দীর্ঘ আলোচনার স্থানাভাব, তাই বর্তমান যুগের একজন কবির ভাষায়ই বলি : "......The poet must be very conscious of the main current, which does not at all flow invariably through the most distinguished reputations. (T. S. Eliot : *Tradition and Individual Talent.*)

এই main current-এর প্রতি যথোচিত সচেতনতার এবং নিষ্ঠার অভাব আমাদের অনেক কবি-সাহিত্যিকের প্রতিভা স্ফুরণের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে আছে বলে মনে হয়।

নাটক—কেবল ইংরেজী বা ফরাসী নয়, ইয়োরোপের অনেক ভাষাতেই, যেমন পূর্ববর্তী যুগসমূহে, তেমনি বিংশ শতাব্দীতেও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে বেশ কিছু নাটক দেখা যায়। সে-সব নাটক হয়ত কোন-না-কোন সময় অভিনীতও হয়েছে, কিন্তু সেইটেই আসল কথা নয়। মঞ্চস্থ হবার আগে এবং পরেও সাহিত্য হিসেবে সে-সব নাটক সমাদর লাভ করেছে। অর্থাৎ বিদেশে নাটক কেবল অভিনীতই হয় না, নাটক পাঠকেরা পড়েও থাকেন, কারণ, সে-সব পড়বার মতোও হয়। কিন্তু আমাদের বাংলা দেশে নাটকের পাঠক-সংখ্যা খুব সন্তোষজনক কি ?

একটা ফরাসী কথার ইংরেজী তর্জমা শুনেছিলাম এক সময় : The fate of a book depends upon the head of its reader. কথাটা ভাববার মতো। আমাদের দেশের পাঠক অভিনয় দেখতে যতই ভালোবাসুন না কেন—নাটক পড়ে রসগ্রহণ করতে তিনি

এখনো আশানুরূপ অভ্যস্ত হননি। ফলে, খুব শক্তিশালী নাট্যকারও নিছক মঞ্চের দিকে তাকিয়েই নাটক রচনা করে থাকেন; নিজের শক্তিকে খর্ব করে চলেন—সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস তার মধ্যে কদাচিৎ ঘটে থাকে। লেখক এবং পাঠকের পারস্পরিক বোঝাপড়ার যে অদৃশ্য সম্বন্ধটি একজন লেখককে কালজয়ী সৃষ্টির পেছনে প্রেরণা জোগায়, আমাদের ভাষার নাটকরচয়িতাগণ দুর্ভাগ্যবশতঃ সে-সম্পদ থেকে বঞ্চিত। তাই বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পাবার উপযুক্ত বিষয়বস্তু সংবলিত নাটক বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে রচিত হলেও তার অন্তর্নিহিত 'সাহিত্যবস্তু'র দৈন্য প্রকৃতই ক্ষোভের বিষয়। এর ব্যতিক্রম হিসেবে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৩০-১৯১০)—গিরিশচন্দ্রের পঁয়তাল্লিশখানা নাটকের প্রায় সবই বিগত শতাব্দীর শেষের দিকের রচনা, কিন্তু তাঁর প্রভাব প্রধানতঃ এ শতাব্দীর প্রথম পাদেই দেখা গিয়েছিল। 'ম্যাকবেথ'-এর অনুবাদে গিরিশচন্দ্র বাংলা ভাষার ওপর তাঁর যে দখল এবং সাহিত্যবস্তু সম্পর্কে তাঁর যে শক্তির পরিচয় রেখে গেছেন, তাতে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাবার মত তাঁর একাধিক নাটক থাকা উচিত ছিল। কিন্তু "তিনি রঙ্গালয়ে যে দর্শক সম্প্রদায়ের জন্য নাটক রচনা করিয়া রঙ্গালয়ের আয়বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সে সম্প্রদায়ের 'রসবোধের পরিধি তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না'। সেইজন্য তাঁহাকে স্থানে স্থানে লঘুতার অবতারণা করিতে হইত—হয়ত প্রতিভার সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ করিতে হইয়াছে।" (বাঙ্গালা নাটক: হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ)।

রাবণ-বধ, চৈতন্যলীলা, বুদ্ধদেব চরিত, জনা, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, অভিমন্যু-বধ, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ-বর্জন প্রভৃতি পৌরাণিক; শঙ্করাচার্য, অশোক, আলাদীন প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও কিংবদন্তীমূলক এবং প্রফুল্ল, বলিদান প্রভৃতি উচ্চমানের সামাজিক নাটক গিরিশচন্দ্র রচনা করেছিলেন। অর্থাৎ নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশ যে তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে (বাংলা নাট্যসাহিত্যও যার ব্যতিক্রম নয়), তার প্রতি গিরিশচন্দ্রের পূর্ণ লক্ষ্য ছিল। গিরিশচন্দ্রই যথার্থভাবে বাংলা নাট্যসাহিত্যের বনিয়াদ রচনা করেছিলেন। তাঁর সামাজিক ও পারিবারিক নাটকের ট্রাজেডি "কেবল গিরিশচন্দ্রের জীবনেরই নহে—বাঙ্গালীর বহু পরিবারের বক্ষের উপর দিয়া ইহার রথচক্র নির্মমভাবে চলিয়া গিয়াছে,—অস্থিপঞ্জর চূর্ণ করিয়াছে"

—(হেমেন্দ্রপ্রসাদ)। সমাজজীবনের এক সন্ধিক্ষণের সার্থক চিত্র এঁকেছিলেন গিরিশচন্দ্র। কাহিনী গ্রন্থনে তাঁর দক্ষতা কনগ্রেভ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না, কিন্তু মঞ্চের স্থূল প্রয়োজন মেটাতেই তা নিঃশেষিত হয়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬০-১৯২০)—বাংলা নাট্যসাহিত্যের দ্বিতীয় স্তম্ভ ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। "তিনি বাঙালীর পথপ্রদর্শক, তিনি 'স্বদেশী' মন্ত্রের মহাকবি। তিনি একনিষ্ঠ ভগীরথের মতো বাঙালীর অবদান হিমাচলে অধিষ্ঠিত দেশাত্মবোধ—মহাদেবের জটাজুট হইতে দেশভক্ত ভাগীরথীর পবিত্র প্রবাহ আনিয়া কোটি কোটি ভারত সন্তানের জীবন্মুক্তির সাধন করিয়া গিয়াছেন।"—(সুরেশচন্দ্র সমাজপতি)।

দ্বিজেন্দ্রলালও গিরিশচন্দ্রের মতো প্রায় সর্বশ্রেণীর নাটকই রচনা করেছিলেন। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, এবং প্রহসন-শ্রেণীর— কোনটাই বাদ দেন নি। সীতা, পাষাণী, পরপারে, বঙ্গনারী, কল্কি অবতার, বিরহ—প্রতিটিই সার্থক সৃষ্টি সন্দেহ নেই; তবে দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো ঐতিহাসিক নাটক সৃষ্টিতে। সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, মেবার পতন, দুর্গাদাস—যে-কোনও ইয়োরোপীয় ভাষায় রচিত হলে হয়ত বাঙালী পাঠক নাট্যকারের যথাযোগ্য সমাদর করতে সক্ষম হতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নানা দিক দিয়েই টমাস হার্ডির 'দি ডাইনাস্টস'-এর সঙ্গে তুলনীয় সৃষ্টি এবং 'চন্দ্রগুপ্ত' স্বয়ং এ্যাডিসনের 'ক্যাটো' অপেক্ষা কম মহৎ নয়। শেষোক্ত তুলনাটি কিছু পিছিয়ে পড়া যুগের সঙ্গে হয়ে গেলো। কিন্তু আমাদের মনে হয় সেইটেই সঙ্গত; কারণ, ইংরেজী বা ফরাসী সাহিত্য যেমন বিগত দু শ বছর ধরেই "আধুনিক", আমাদের সাহিত্য তেমনি বড়জোর সত্তর-আশি বছর ধরে।

দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে আর একটি কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। ওঁর মধ্যে নানা রসের যে বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছিল তা' সত্যি বিস্ময়কর। ওঁর মাধ্যম ছিল প্রধানতঃ কাব্য। কিন্তু তারই সাহায্যে তিনি বীররস, বিষাদ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-হাস্যরস প্রভৃতির আশ্চর্য প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

সংখ্যার দিক থেকে দেখতে গেলে ***শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত*** সামাজিক নাটকই রচনা করেছিলেন বেশি ('স্বামী-স্ত্রী', 'তটিনীর বিচার', 'সংগ্রাম ও শান্তি'); কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক নাটক 'সিরাজদ্দৌলা'ই সাহিত্য হিসেবে

সর্বাপেক্ষা সার্থক সৃষ্টি। জন ড্রিঙ্কওয়াটারের 'এব্রাহাম লিঙ্কন' অপেক্ষা জটিলতর পটভূমি ও পূর্ণতর রসের সার্থক সৃষ্টি শচীন্দ্রনাথের 'সিরাজদ্দৌলা' একখানি বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ের নাটক।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে আজ মনে হয় বাঙালী নাট্যকারগণের আদর্শ হলো ইবসেনের ও স্ট্রীণ্ড্বার্গের সামাজিক নাটকগুলি; দ্বিতীয়তঃ পিনেরো ও বার্ণার্ড শ', তৃতীয়তঃ পিরান্দেলো, সিঙ্গ, লেডী গ্রেগরী, ইউজেনী ও' নীল, টেনেসী উইলিয়ামস্ এবং সার্ত্রে প্রভৃতি। তাই নানা বিচিত্র আইডিয়ার মিছিল এবং তীক্ষ্ণ, বৈদগ্ধ্যপূর্ণ কথোপকথন আমাদের নব-নাট্য-আন্দোলনের তরুণ নাটক রচয়িতাগণের মানসে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। এঁদের মধ্যে বিশেষ প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কয়েকজন হলেন: শম্ভু মিত্র, (কাঞ্চন-রঙ্গ); উৎপল দত্ত (অঙ্গার, ফেরারী ফৌজ, কল্লোল); ধনঞ্জয় বৈরাগী (রূপোলী চাঁদ, এক পেয়ালা কফি, রজনীগন্ধা); এবং সলিল সেন (নতুন ইহুদি)।

গল্প ও উপন্যাস—সব দেশের মতো আমাদের দেশেও গল্প-উপন্যাস রচিত হয় বেশি এবং প্রকাশিত ও পঠিতও হয় সর্বাধিক। আর বর্তমান যুগটা বিশ্বসাহিত্যে, প্রধানতঃ গল্প-উপন্যাসের যুগ হওয়ার জন্য যে-কোনো দেশের মতোই, সৎ এবং মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যেও গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রেই সর্বাপেক্ষা বেশি আন্তরিকতার সঙ্গে চলছে বলে মনে হয়।

পৃথিবীর কথা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় লেখকগণ দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত। এক হলেন যাঁরা 'যে ভাবেই হোক' কাহিনীটি পরিবেশন করতে ব্যগ্র; আর দ্বিতীয়তঃ হলেন তাঁরা যাঁরা 'কাহিনীর প্রতি নজর না রেখে', 'বক্তব্যকে প্রাধান্য না দিয়ে' প্রকাশের নূতনতর শৈলীর চর্চায় নিমগ্ন। দেখা গেছে প্রকৃত মহৎ সাহিত্য, কালজয়ী সাহিত্য তাঁরাই সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, যাঁদের ঐ উভয় দিকে নজর প্রায় সমান সমান থাকে; যাঁরা ঐ দু'দিকেই সমান দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হন।

বাংলা কথাসাহিত্যের আসরে বিংশ শতাব্দীতে এরকম অন্ততঃ বিশ জন লেখকের আবির্ভাব হয়েছে যাঁদের মধ্যে অনন্যসাধারণ শিল্পীর ঐ লক্ষণ দেখা গেছে, বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে স্বীকৃত হবার মতো সাহিত্যসৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই রকমই কয়েকজনের কথা আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করবো।

আজকের অনেক দেশের মতোই আমাদের দেশের লেখকগণও গল্প ও উপন্যাস দু'রকমই রচনা করতে সক্ষম এবং তা করেও থাকেন, তাই আমরা এ প্রসঙ্গ একসঙ্গেই আলোচনা করবো।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)—শরৎচন্দ্রের মতো দরদী কথাশিল্পী পৃথিবীর যে-কোন ভাষাতেই হোক না কেন, সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাবার যোগ্য। বাঙালীর স্বভাব, বাঙালীর চরিত্রের সমস্ত দোষগুণ শরৎচন্দ্রের রচনায় যে-রকম দর্পণের মতো ধরা পড়েছে, এ রকম বোধ হয় আর কারো রচনাতেই নয়। বিদেশী লেখকগণের সঙ্গে তুলনা যাঁরা বেশি পছন্দ করেন, তাঁদের জন্যে বলা যায় যে, শরৎচন্দ্র বাংলার বিয়ার্ণসন তো বটেই, হয়ত তুর্গেনিভও।

শরৎ-সাহিত্যে কল্পনার দৈন্য স্বভাবতঃই একটু মনে লাগে, কিন্তু একটা কাল-বিশেষের যে বাস্তব-চিত্র তিনি এঁকে গেছেন, Original-এর সঙ্গে তার হুবহু মিল দেখে মনে তদপেক্ষা বিস্ময় কম জাগে না। অনাড়ম্বর সরল প্রকাশভঙ্গী, পরিবেশ ও পটভূমির সঙ্গে প্রকাশভঙ্গীর আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য মনকে স্তব্ধ করে দেয়। অকিঞ্চিৎকর, নেহাত সামান্য এবং তুচ্ছ সমস্ত পারিবারিক ব্যাপারের মধ্যে থেকে যে সমস্ত ঘটনাস্রোতকে তিনি সাহিত্য-রূপে প্রবাহিত করাতে সক্ষম হয়েছেন, তা অবাক হয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। কষ্ট-কল্পিত 'আইডিয়ার' মারপ্যাচ নেই, দুর্বোধ্য কিছু নেই, চেনা মানুষের চেনা মহলের একান্ত পরিচিত সমস্ত সমস্যা, অথচ তার ভেতর থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে সাহিত্য।

শরৎ-সাহিত্যের বেশির ভাগটাই জুড়ে রয়েছে পারিবারিক চিত্র। বৃহৎ পরিবার তিন যুগ আগে ছিল ভাঙনের মুখে। আজ তার অস্তিত্ব কদাচিৎ দেখা যায়। আমাদের যৌথ-পরিবার ব্যবস্থা লোপ পাবার সঙ্গে সঙ্গে শরৎ-সাহিত্যের উপযোগিতা কমে যাবে বলে অনেকের ধারণা। আমাদের তা মনে হয় না। কারণ বাস্তবিকই শরৎ-প্রতিভা ঠিক অতোটা ক্ষণস্থায়ী সাহিত্যবস্তুর সৃষ্টির জন্য ব্যয়িত হয় নি। যৌথ-পরিবার বিলুপ্ত হয়ে গেলেও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যতদিন থাকবে, ততদিন শরৎ-সাহিত্যের মানব-দরদী দৃষ্টিভঙ্গী পাঠক সমাজকে আনন্দ দেবে। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, ভাই-বন্ধুর সম্পর্ক—এক কথায় মানুষের আবিষ্কৃত

পারস্পারিক সম্পর্কের যে-কোন অবস্থার উর্ধ্বে নিছক মানুষ হিসেবে একের সঙ্গে অন্যের যে একটা সম্বন্ধ আছে, শরৎ-সাহিত্যের মূলতত্ত্ব হচ্ছে সেই বিষয়টি অনুধ্যান করা।

কাশীনাথ, দেবদাস, চন্দ্রনাথ বা পরিণীতার মতো সাদা-মাটা রোমান্স থেকে বৈকুণ্ঠের উইল ও নিষ্কৃতির মতো জটিল পারিবারিক চিত্র ; গৃহদাহ, চরিত্রহীন, দত্তা, পল্লীসমাজ, বিপ্রদাস, দেনা-পাওনা ও শেষ প্রশ্ন-এর মতো সমাজচিত্র অনেক কিছুই শরৎ-প্রতিভার প্রকাশে উজ্জ্বল। ত'াছাড়া একটা ঔপনিবেশিক জাতির মুষ্টিমেয় শিক্ষিত জনের মানসে একসময়ে 'পথের দাবী' যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে অন্ততঃ আগামী দু'এক যুগের মধ্যে ম্লান হবার নয়। "...স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ কথা নয়। ধর্ম, শান্তি, কাব্য, আনন্দ —এরা আরও বড়। এদের একান্ত বিকাশের জন্যই স্বাধীনতা, নইলে এর মূল্য ছিল কোথায় ?" (পথের দাবী)—সব্যসাচীর এ উক্তি কি নিতান্তই দু' এক শতাব্দীর মধ্যে বিস্মৃত হবার মতো ?

কিন্তু এসবের মধ্যেই শরৎ-প্রতিভা নিঃশেষিত হয়নি। প্রতিদিনই মনে পড়ে 'শ্রীকান্ত'-এর কথা। সমগ্র শ্রীকান্ত নিঃসন্দেহে বিশ্বের কথাসাহিত্যে একখানা অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। কথাটা শুধু বিংশ শতাব্দীর পক্ষেই সত্য নয়, পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলির পক্ষেও সমভাবে সত্য। এ কথায় যাঁদের মনে কোন সংশয় দেখা দেবে তাঁদের উদ্দেশে বর্তমান লেখকের সবিনয় অনুরোধ কেবল সরব প্রচারে না ভুলে, স্বদেশের লেখক বলেই চোখের সামনে দেখা নিতান্ত সহজ approachable ছিলেন এরকম মানুষের লেখা বলেই অবহেলা না করে, প্রত্যেকে নিজে বিচার করবার চেষ্টা করবেন। চিন্তার দায়িত্ব, বিচারের পরিশ্রম সবটাই যদি সাহিত্য সমালোচকদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তা হলে একে ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের যথার্থ রসাস্বাদনে তাঁরা বঞ্চিত হবেন, তা ছাড়া হামেশাই অযোগ্যের অহেতুক সমাদর এবং যোগ্যের যথাযোগ্য স্বীকৃতি ও সম্মানপ্রদর্শন সম্ভব না হতে পারে।

বিশ্ব-কথাসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ, বিভিন্ন যুগের কয়েকখানা ইয়োরোপীয় গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করলেই 'শ্রীকান্তে'র মূল্য যে-কোনো মনোযোগী পাঠকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমরা দু'খানা তুলনীয় উপন্যাসের নাম করেই ক্ষান্ত হচ্ছি : স্কট অনবদ্য মনে করতেন এ-হেন Le Sage-এর The Adventures of Gil Blas de Santilana (Tobias Smollet-এর অনুবাদ) ;

এবং গ্যয়টের Wilhelm Meister-এর (কার্লাইলের অনুবাদ) সমকক্ষ রচনা শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত।

নারীচরিত্র সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের দক্ষতার কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এই অল্প দু'টি শব্দের মধ্যে যে বিরাট প্রসঙ্গটি রয়েছে সে-সম্পর্কে আমরা কদাচিৎ ভেবে থাকি। আমরা ভুলে যাই যে, মানবজাতির অর্ধেক নারী। কাজেই নারীজাতিকে তার পূর্ণ মর্যাদার আসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার যে প্রয়াস শরৎসাহিত্যে ঘটেছে তা একটা অসাধারণ ব্যাপার সন্দেহ নাই। জাতির পরাধীন অবস্থায় শরৎচন্দ্র এ কাজ করতে পেরেছিলেন বলে ব্যাপারটা আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। মনীষী ভূপেন্দ্রনাথ এক সময় আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন যে, শিক্ষিতা মহিলা কিরণময়ী থেকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতা দুঃস্থা নারীকেও আমাদের সাহিত্যে কেবল ভোগের বস্তু বলেই দেখানো হয়। কথাটা মিথ্যে নয়, কিন্তু শরৎচন্দ্রে এর যথেষ্ট ব্যতিক্রম ঘটেছিল—শরৎচন্দ্রের পরে বাঙালী আজ তার নারীসমাজকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতে শিখেছে। এ তাঁর একটা অসাধারণ কাজ বৈকি।

বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৬-১৯৫০)—কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণের সৃষ্টি কেবল বাংলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্বসাহিত্যেরই এক বিস্ময়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ গদ্যে লিখলে যা হতো, কিম্বা এখনো ম্যাথু আর্নল্ড নির্বাচিত ওয়ার্ডসওয়ার্থের রচনাবলীর যোগ্য গদ্যরূপ দিতে পারলে যা হয় বা হতে পারে, বিভূতিভূষণের সাহিত্য হলো তাই।

বিশ্বকবি তাঁর বালক বয়সের কথা বলতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন যে, 'আমি যেন গাছ হয়ে উঠেছিলুম', কিন্তু সে নিতান্তই বালক বয়সের কথা। পরিণত বয়সে, পঞ্চাশ পেরিয়েও ঐ ধরনের কথা মনে হয় স্বয়ং বিশ্বকবিও বলতে পারতেন না, কারণ, সে রকম তিনি বাস্তবিকই অনুভব করতেন না। কিন্তু বিভূতিভূষণ সে কথাটা ঠিক ঐভাবে না বললেও তাঁর সাহিত্যে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে কখনো কখনো ঐ রকম তিনি আমরণই বোধ করতেন—এইটেই হলো বিভূতিভূষণের বিশেষত্ব।

প্রকৃতির নৈকট্য অনুভব করা এক কথা, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে প্রায় শিশুমানসসদৃশ একাত্মতা অনুভব করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা, বিভূতিভূষণের ভেতর প্রকৃতি-অনুভূতি যে এই প্রায়-স্বর্গীয় পবিত্রতার স্তরে উন্নীত হয়েছিল 'পথের

পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক' ও 'ইছামতী' তার স্বাক্ষ্য বহন করে। এ বইগুলি কখনো ইয়োরোপীয় ভাষায় অনূদিত হলে পশ্চিম বিস্ময়াবিষ্ট হবে—প্রকৃতির যে অন্তরঙ্গ রূপ এবং মানব মনের যে পবিত্র পরিচয় ওঁর সৃষ্টির মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে বিধৃত, রোমাঁ রোলাঁর জাঁ ক্রিস্তফ-এ তা কেবল স্থানে স্থানেই দেখা যায়।

বনফুল (জন্ম ১৮৯৯)—বাংলা সাহিত্যের নানা বিভাগের এক বিচিত্র স্রষ্টা হলেন বনফুল। সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে, নানা বিষয়বস্তু নিয়ে গল্প, নাটক, উপন্যাস—প্রভৃতি নানা মাধ্যমে অসংখ্য উৎকৃষ্ট রচনার স্রষ্টা বনফুলকে বোধ হয় ইংলণ্ডের এক সমারসেট মমের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। বর্তমানযুগে পৃথিবীর অনেক দেশেই, এমনকি অসাধারণ শক্তিশালী লেখকদের অনেকেও দেখা যায় জীবনের সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে যেতে চান, কাউকে বা সে-সবকে নস্যাৎ করতেও ব্যস্ত দেখা যায়। কিন্তু বনফুলের প্রকৃতি একটু ভিন্ন ধরনের। যে কোন সমস্যা—শিক্ষিত বেকারের চাকুরী সংগ্রহ থেকে দুরারোগ্য কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত হতভাগ্যের চিকিৎসার যে সমস্যা—বনফুল সব কিছুরই গভীরে প্রবেশ করবার দুঃসাহস রাখেন। এবং অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় তার রচনায় মধ্য দিয়ে সে-সবের সমাধানেরও একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাঠকের মনে সৃষ্টি হয়।

মমের সঙ্গে বনফুলের তুলনাটা নেহাত কথার কথা নয়—নানাদিক থেকেই মনে হয় ব্যাপারটা সঙ্গত। মম ডাক্তার ছিলেন, বনফুলও ডাক্তার। মম ডাক্তারী জীবনের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে একাধিক গল্প উপন্যাস লিখেছিলেন, বনফুলও লিখেছেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যে মমের প্রথম জীবনের Liza of Lambeth এবং বনফুলের নির্মোক-এর কথা। মম Liza রচনার সময় যথেষ্ট পরিণত ছিলেন না (যদিও এ উপন্যাস প্রকাশের পূর্বে তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যানুশীলনের কথা স্মরণীয়) ; নির্মোক-এর সময় পর্যন্ত 'বনফুল' অর্ধ-পরিণত বলা যায়। কিন্তু এ দু'খানা উপন্যাসই পড়া আছে এ রকম যে কোনও পাঠক স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, অনেক দিকে (যেমন চরিত্র সৃষ্টি, আকস্মিক ঘটনা সৃষ্টি প্রভৃতি) অন্ততঃ সাহিত্যসাধনার একটা বিশেষ কাল পর্যন্ত বনফুল মমের চাইতেও সূক্ষ্মতার শিল্পবোধসম্পন্ন লেখক ছিলেন।

জীবনের পূর্ণতর অভিজ্ঞতার চিত্র, মমের পরিণত সাহিত্য এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'অব হিউম্যান বণ্ডেজ'—এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলেও

স্বীকৃত। 'অব হিউম্যান বণ্ডেজ'-এর মহত্ত্ব অবশ্য স্বীকার্য, কিন্তু এর পাশাপাশি বনফুলের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'জঙ্গম' (তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ) পড়লে পাঠকের এই ধারণাই বদ্ধমূল হবে যে মম অপেক্ষা বনফুলের পরিণতিও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। ফিলিপের জীবনবোধে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় তার অনুভূতির তীব্রতা, তার সময়ে হয়ত ঐটিই মধ্যবিত্ত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল; কিন্তু বনফুলের শঙ্কর যথার্থই আধুনিক পৃথিবীর মানুষ, আধুনিক জগতের দ্রুত প্রবহমান ঘটনাবলী এবং সদাপরিবর্তনশীল মানবচরিত্রের নানা বৈচিত্র্য সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যের মহান্ বোদ্ধা।

'হাট বাজারে'-তে বনফুলের আর্ট মনে হয় মমকেও নিশ্চিতভাবে ছাড়িয়ে গেছে—ডাঃ সদাশিব বিশ্বসাহিত্যের অক্ষয় সৃষ্টি।

বনফুলের ছোট গল্প যথার্থই ছোট গল্প; এই দক্ষতাটি বাংলা তথা পৃথিবীর অনেকের মধ্যেই দেখা যায় না। তাঁর গল্পের আকর্ষণ প্রায় অপ্রতিরোধ্য বললেই হয়। গল্পের বিষয়বস্তু এবং তা' বলার টেকনিক উভয় দিকেই বনফুল সমান সচেতন। ছোট গল্পের যে স্বতন্ত্র রস তা যেমন বনফুলের ছোট গল্পে পাওয়া যায়, তেমনি যথার্থ উপন্যাসের (মৃগয়া, স্থাবর, জঙ্গম, ত্রিবর্ণ, হাটে-বাজারে, সীমারেখা, মানসপুর) রস পরিবেশনেও তিনি সমান দক্ষ।

নারী এবং পুরুষ, উভয়েরই বিভিন্ন বয়সের নানা জাতের চরিত্র সৃষ্টিতে বনফুলের দক্ষতাও অবশ্য স্বীকার্য। বনফুলের সৃষ্ট চরিত্রগুলির একটি বৈশিষ্ট্য হলো জীবনের নানা দিক সম্বন্ধে তাদের অদম্য আগ্রহ। পুরোপুরি ভাবে বাঁচবার জন্য একটা অত্যাশ্চর্য ঐকান্তিকতা, একটা প্রায় অবিশ্বাস্য সজীবতা—এ যেন বঙ্কিমী বলিষ্ঠতার মতো মনে হয়।

প্রেম নামক বস্তুটি বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের অনেক অসাধারণ শক্তিশালী লেখকের রচনাতেও তার অনন্যসাধারণ মর্যাদা থেকে একটা বিকারে পরিণত হয়েছে দেখা যায়। কিন্তু জীবনপ্রেমিক বনফুলের আত্মসচেতন পাত্রপাত্রীরা কদাচিৎ প্রেমে পড়লেও আধুনিক রীতির ব্যতিক্রম ঘটায়। আসল কথা হলো জলো, প্রেম ছাড়াও যে লেখবার মতো অনেক বিষয়বস্তু আছে বনফুল তার সন্ধান সাহিত্য সাধনার শুরু থেকেই পেয়েছিলেন। ফলে মানবচরিত্র তথা পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রিক যে-কোন পরিস্থিতি বিশ্লেষণের অন্তরঙ্গতায় বনফুলের চিন্তাশীল পাঠক রোমাঞ্চনে বাধ্য হন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৯৮)—শোলোখভের লেখায় ডন নদীর দু' পাশের মানুষ যেমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, তারাশঙ্করের ক্যামেরাতেও ঠিক তেমনি বীরভূম এবং পশ্চিমবঙ্গের আরো কয়েকটি অঞ্চলের মানুষ আজ আমাদের একান্ত আপনার হয়ে উঠেছে। এরা আমাদেরই দেশের মানুষ। শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা পাশাপাশি বসবাস করে আসছিলাম, কিন্তু তারাও যে মানুষ, তারাও যে বাঙালী এ কথাটা তারাশঙ্করের পরে আজ যেমন করে মনে হচ্ছে, তেমন আগে কখনো হতো বলে মনে হয় না। তাদের মনের খবর আজ আমরা জেনেছি, এ পরিচয়ের ফলে একদিকে যেমন আমাদের মমতা জন্মেছে, তেমনি আরো জানবার জন্য আমরা উদগ্রীব। তারাশঙ্করের চরিত্রগুলি বাস্তবানুগ, এবং প্রাণবন্ত—তাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসও যেন পাঠকের কানে বাজে—তাকে ভাবিত করে তোলে।

তারাশঙ্কর গল্প ও উপন্যাস দু' রকমই রচনা করে থাকেন যদিও—কিন্তু তিনি যথার্থই একজন জাত ঔপন্যাসিক। তাঁর মেজাজ ঔপন্যাসিকের মেজাজ। ফলে তাঁর দীর্ঘ রচনাগুলি—'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা', 'কালিন্দী', 'ধাত্রীদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'মন্বন্তর', 'বিচারক', 'আরোগ্য নিকেতন', 'কবি', 'গণদেবতা', 'কালান্তর', 'যোগভ্রষ্ট', 'ভুবনপুরের হাট' যেমন সার্থক উপন্যাস, পনরো কি বাইশ পৃষ্ঠার গল্পগুলির মধ্যেও তেমনি উপন্যাসের স্বাদ পাওয়া যায় (তারিণী মাঝি, খাজাঞ্চিবাবু, নাগিনী, ইমারত, বন্দিনী কমলা, বেদেনী, ব্যাঘ্রচর্ম, হারানো সুর, জলসাঘর, রায়বাড়ী, কুলীনের মেয়ে, পদ্ম বউ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখনীয়)।

তারাশঙ্করের মত সমান শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক বর্তমান পৃথিবীর যে-কোন দেশেই হ'ক না কেন, জীবিতদের মধ্যে বেশী নেই। তাঁর প্রকাশভঙ্গী অত্যন্ত সরল এবং অনাড়ম্বর। মানুষের জীবনের এমন অনেক গভীর সমস্যা উনি স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছেন যা তিনি এই বিংশ শতাব্দীর মানুষ হয়ে যে কিভাবে পারলেন—এই কথাটা মনে হতেই বিস্ময় জাগে। বিশ্বসাহিত্যের মহাকাব্যধর্মী বিশখানা প্রথম সারি উপন্যাসের নাম করতে হলে আমরা অনায়াসে দু'খানা বাংলা উপন্যাসের নাম করতে পারি। প্রথমতঃ 'গোরা' এবং দ্বিতীয়তঃ 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'। বিশ্বসাহিত্যে হাঁসুলিবাঁকের তারাশঙ্করের আসন চিরস্থায়ী বলেই মনে হয়। এই রকম একখানা অনন্য-সাধারণ মৌলিক উপন্যাসের সুযোগ্য অনুবাদ হলে পশ্চিম চমৎকৃত হবে

নিশ্চয়ই। হামসুনের 'গ্রোথ অব দি সয়েল', স্টাইনবেকের 'দি গ্রেপস অব র‍্যাথ' বা ল্যাক্স্‌নেসের 'দি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপল' অপেক্ষা নানাদিকেই শ্রেষ্ঠতর রচনা 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'। মানুষের মিছিল সৃষ্টি করেছেন তারাশঙ্কর এ উপন্যাসে, অথচ প্রতিটি চরিত্রবিন্যাস তাঁর এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও অসাধারণ যে তার ফলে পাঠক যেমন মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান দেখে অভিভূত হন, তেমনি শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে মানুষ সম্পর্কে তাঁর সহানুভূতির আন্তরিকতা দেখে। মহৎ সাহিত্যপাঠের এ সৌভাগ্যে বাঙালী ধন্য। হামসুনের 'আইজাক' এবং শোলোখভের 'গ্রেগর'-এর সমকক্ষ চরিত্র সৃষ্টি তারাশঙ্করের 'বানোয়ারী'—বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়শীল, আবার পরিবর্তনেও ভীত নয় এবং সব চাইতে বড়ো কথা সান্তায়নের ভাষায়—not awed by destiny. এক-একটা গোটা অঞ্চল তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে যে নিপুণতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে তাতে তারাশঙ্কর যথার্থই বাংলা উপন্যাসকে Russian standard-এ উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছেন বলা যায়।

অন্যান্য প্রধান কথাশিল্পিগণ—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৯৬) তাঁর অসাধারণ 'রাণুর প্রথম ভাগ' নিয়ে বাংলা সাহিত্যের আসরে উপস্থিত হয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে এ একটা নতুন সুর—বিশ্বসাহিত্যেও ঠিক এরকমটি বেশি নেই। টলস্টয়ের Twenty three Tales-এ যে দু' একটি বাল ও কিশোর কাহিনী আছে তা' ও এতো সার্থক নয়। বিভূতিভূষণ লিখেছেন প্রচুর। পরিবেশনের নিপুণতায় তাঁর হাস্যরস Woodhouse, Jerome বা Zangwill অপেক্ষা অধিকতর উপভোগ্য এবং নির্মল। রাণুর প্রথম ভাগ, আশা, মধুলিড় এবং হৈমন্তী (গল্প) এবং নীলাঙ্গুরীয়, নয়ান-বৌ ও কাঞ্চন-মূল্য বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য।

মনোজ বসুর (জন্ম ১৯০১) নানা গল্প ও উপন্যাস অবশ্যই আমাদের ভাষার বিশেষ আদরের বস্তু। এবং তাঁর ছোট গল্প-বন-মর্মর, মাথুর, কুম্ভকর্ণ ও উপন্যাস '**জলজঙ্গল**' বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ের রচনা। **জলজঙ্গল**-এর পাঠকের যে রসানুভূতি লাভ হয় তা হুগোর 'টয়লার্স অব দি সী', হেমিংওয়ের 'ওল্ড ম্যান এণ্ড দি সী', কিংবা লোতির 'এ্যান আইসল্যাণ্ড ফিশারম্যান' অপেক্ষা কোনদিকেই নিকৃষ্ট নয়।

বিংশ শতাব্দীর বাংলা কথাসাহিত্যের একজন প্রথম শ্রেণীর লিপিকুশলী শিল্পী হলেন **প্রমথনাথ বিশী** (জন্ম ১৯০২)। প্রকৃতির রহস্যময়তা,

মানুষের অন্তর ও বাহিরের বিভিন্নতা সম্বন্ধে ধারণা তাঁর ভাষার যাদুতে নানা গল্প ও উপন্যাসে প্রকাশিত। 'কেরী সাহেবের মুন্সী'তে অত্যধিক ইতিহাস-নিষ্ঠার জন্য ঈষৎ রসহানি ঘটলেও এ একখানা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। প্রমথনাথে ফকনারের দুর্বোধ্যতা নেই, কিন্তু সম্ভবতঃ ফকনার অপেক্ষা তিনি পরিবেশ ও পটভূমি সৃষ্টিতে অধিকতর দক্ষ ('সারটোরিস দ্রষ্টব্য')।

কাব্যধর্মী ও বিশ্লেষণাত্মক গদ্যরীতির গল্প ও উপন্যাসের লেখক হিসেবে **অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত** (জন্ম ১৯০৩)-এর আসন বাংলা সাহিত্যে শীর্ষারোহী কয়েকজনের মধ্যেই। তবে তাঁর পরিণত বয়সের সৃষ্টি 'পরমপুরুষ' এবং 'অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ'-এর জীবনাশ্রয়ী রচনার মধ্যে বাংলা ভাষায় তিনি সাহিত্যের যে নতুন দিগন্তের পথ দেখিয়েছেন, হয়ত পরিণামে তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় হয়ে দাঁড়াবে। অচিন্ত্যকুমারের এ রচনাগুলি টমাস মান-এর জোসেফ সিরিজের উপন্যাসগুলির সমকক্ষ বলেই মনে হয়। তাঁর 'অন্তরঙ্গ' উপন্যাসে মানের 'দি ম্যাজিক মাউণ্টেন'-এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়—অবশ্য বক্তব্য বিভিন্ন। এগুলি বাদেও ওঁর 'বেদে', 'ইতি', 'দুইবার রাজা' বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ের সৃষ্টি।

অসমাপিকা, আগুন নিয়ে খেলা, পুতুল নিয়ে খেলা প্রভৃতির false start-এর পরে **অন্নদাশঙ্কর রায়** (জন্ম ১৯০৪) তাঁর ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ সুদীর্ঘ উপন্যাস "সত্যাসত্য"-এ বাংলা সাহিত্যে নূতন দিগন্তের সৃষ্টি করেছেন বলা যায়। প্রধানতঃ সমসাময়িক নানা 'বাদ' ও সমস্যাসমূহের আলোচনা-ভিত্তিক এ উপন্যাসের লিপিকুশলতা মেরেডিথ বা ওয়েলস্ এর সঙ্গে তুলনীয়। কেবল তাই নয়, হাক্সলির 'পয়েন্ট কাউণ্টার পয়েন্ট' অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এই সুদীর্ঘ উপন্যাসে 'ফরসাইট সাগা' কিম্বা 'দি ইয়ার্স'-এর (ভার্জিনিয়া উল্ফ) সূক্ষ্ম শিল্পানুভূতি না থাকলেও আলোচিত বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা অনেক বেশি।

নগ্ন বাস্তব এবং তীব্র রোমান্সধর্মী লেখক **প্রবোধকুমার সান্যালের** (জন্ম ১৯০৭) শিল্পচাতুর্য প্রথম শ্রেণীর সন্দেহ নেই। আজকের সেরা উপন্যাসগুলির পাশে স্থান পাবার মতো ওঁর কোনো রচনা না থাকলেও ওঁর একাধিক ছোট গল্প বিশ্বসাহিত্য পর্যায়ের সৃষ্টি (আগ্নেয়গিরি, অঙ্গার, অবৈধ, অপরাহ্নে, ক্যামেরাম্যান, কল্লান্ত)। জাত উপন্যাস লিখতে না পারলেও তাঁর একাধিক দীর্ঘায়তন বড়গল্প মধুর; যেমন আঁকাবাঁকা,

প্রিয় বান্ধবী ও বনহংসী। প্রবোধকুমারের অন্তরে মনে হয় প্রথম যৌবন থেকেই মাঝে মাঝে বৈরাগ্যের প্রতি একটা আকর্ষণ উঁকি দিত, তাঁর সাহিত্যেও তার প্রকাশ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় এবং তার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল Gil Blas ও শ্রীকান্তধর্মী রচনা 'মহাপ্রস্থানের পথে'। পরিণত বয়সে ওঁর 'দেবতাত্মা হিমালয়ে'র মধ্যে যেন ঐ জিনিসটিই আরও মূর্ত হয়ে উঠেছে।

প্রধানতঃ রোমান্সধর্মী হলেও **সুবোধ ঘোষ** (জন্ম ১৯০৯)-এর গল্প ও উপন্যাসে নানা ধরনের আইডিয়ার মেলাও পাঠককে ভাবিত করে তোলে। সুবোধ ঘোষের অন্ততঃ কয়েকটি গল্প (ফসিল, পরশুরামের কুঠার, অযান্ত্রিক, জতুগৃহ, কর্ণফুলির ডাক, ন তস্থৌ, উচলে চড়িনু, গোত্রান্তর) নিঃসন্দেহে বিশ্বসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। তাঁর উপন্যাসে (ত্রিযামা, তিলাঞ্জলি, শতকিয়া, শ্রেয়সী, জিয়া ভরলি, নাগলতা) পটভূমিকার বৈচিত্র্য, নিপুণ চরিত্রচিত্রণ ও সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করে।

বিমল মিত্র (জন্ম ১৯১২)-এর গল্প-উপন্যাসের সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তি, বাকসংযম, লিপিকুশলতা—সবই অসাধারণ। কিন্তু যৌন মনোদর্শনের প্রাবল্যে অনেক সময় তাঁর পাঠক বিরক্তবোধ করেন। নিতান্ত স্বল্পায়তনের গল্প থেকে সুবৃহৎ 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' পর্যন্ত তিনি লিখেছেন; তবে 'সাহেব বিবি গোলাম'-এ তাঁর আর্ট যতটা বিষন্ন-মধুর সার্থকতায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে ততোটা বোধ হয় আর কোনো লেখায় নয়; তাঁর এ সৃষ্টি সত্যি বিস্ময়কর। নিঃসন্দেহে বিশ্বসাহিত্য পর্যায়ের তাঁর এ সৃষ্টি কোথাও লরেন্স, কোথাও মোরাভিয়া, কোথাও হথর্ণের সঙ্গে তুলনীয়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (জন্ম ১৯১৮)—যুগপৎ ছোট গল্প ও উপন্যাস রচনায় মৌলিক শক্তির অধিকারী। তাঁর ছোট গল্প—টোপ, আইসক্রীম, পূর্বরাগ—অনবদ্য এবং বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ের সৃষ্টি। উপন্যাসগুলির মধ্যে সুবৃহৎ উপনিবেশ, শিলালিপি, সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী, মহানন্দা, লালমাটি প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে রাজনৈতিক সচেতনতাই সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৬০)—এ শতাব্দীর বাংলা কথা-সাহিত্যের এক অদ্বিতীয় এবং নূতন লক্ষ্যের দিশারী লেখক ছিলেন। তাঁর অনেক প্রথম শ্রেণীর ছোট গল্পের মধ্যে অন্ততঃ একটি, 'প্রাগৈতিহাসিক'

এবং বহু উপন্যাসের মধ্যে 'পদ্মানদীর মাঝি' ও 'শহরতলী' নিঃসন্দেহে বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ের রচনা।

বর্তমান বাংলা সাহিত্য নানা দিকে যেমন খুবই উন্নত, তেমনি আবার অনেক দিকে প্রচুর অস্বাস্থ্যকর লক্ষণও মনোযোগী এবং রুচিবান পাঠকের মনে হতাশা ও বিরক্তির সঞ্চার করে। অনেক তরুণ লেখকের মধ্যে নতুন নতুন চিন্তা এবং নবতর দিগন্তের পর্দা উন্মোচন ও শিল্পানুভূতির প্রকাশ দেখে যেমন আমরা চমৎকৃত হই, তেমনি অনেক সময় অনেক বিখ্যাত লেখকের কলমে একঘেয়ে নূতনত্বহীন, শুধুই লেখার জন্য লেখা বা তাগিদে পড়ে দায়সারা প্রয়াস দেখে আমরা ক্ষুব্ধ হই। প্রসঙ্গতঃ মনে এসে গেলো এক মহামনীষীর কথা। প্রায় পঁচিশ বছর আগে উনি যা লিখে গিয়েছিলেন, দু'একটি শব্দের এদিক ওদিক করে তার ভাবার্থ গ্রহণ করতে পারলে আমাদের সাহিত্যস্রষ্টাগণের অনেকেই আজও উপকৃত হবেন বলে মনে হয়:

"এই দেশের Decadent সাহিত্যকে পরিহার করা অবশ্য প্রয়োজন। গোলামী ও পরাজিত মনোবৃত্তিপ্রসূত এই সাহিত্য মনস্তত্বকে অস্বীকার করিয়াই চলিতেছে। মানব মনস্তত্ব, সামাজিক মনস্তত্ব, কিছুরই বালাই নাই এই সাহিত্যে। ইহাতে স্ত্রীলোককে তাহার সম্মান প্রদান করা হয় না। শিক্ষিতা মহিলা.........থেকে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দুঃস্থা নারী পর্যন্ত সকলেই যেন ইন্দ্রিয়ের দাস। স্ত্রীলোক যেন কেবল পুরুষের ভোগার্থ সৃষ্টি!...এই সাহিত্যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের দৌর্বল্যই কেবল অঙ্কিত হয়। নায়ক-নায়িকার প্রেমই এই সাহিত্যের প্রতিপাদ্য। ইহাতে সামাজিক মনস্তত্বের কোন সংবাদ নাই।...যে সাহিত্যে জাতির মন ক্ষুণ্ণতা এবং হতাশাকে ঢাকিবার যৌন সম্বন্ধের অস্বাভাবিক গল্প, বুর্জোয়া রোমান্সের চাঞ্চল্যকর প্রেম-কাহিনী ও জাতীয়তাবাদের ছদ্মবেশে শ্রেণীস্বার্থের কথা ভরপুর হইয়া আছে···তাহা পরিত্যাজ্য।'

—(ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সাহিত্যে প্রগতি, ২৫৪-৫৫)

কেবল ছোট গল্প বা উপন্যাসই নয়, বাংলা গদ্যের বিভিন্ন দিকে এ শতাব্দীতে এখন পর্যন্ত এ রকম অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যশোত্তীর্ণ রচনা হিসেবে যেগুলি শুধু বাংলা ভাষারই গৌরব বৃদ্ধি করেছে তা নয়, এই গ্রন্থগুলি বিশ্বসাহিত্যের আসরে বাংলার আসন স্থির নির্দিষ্ট রাখছেও

সাহায্য করছে এবং করবে—এ কথাও সত্য। এ রকম গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখনীয় হলো—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের **সিঁদুর কৌটা**; বীরবলের শ্লেষ-বিদ্রূপের চমক-লাগানো **নীললোহিতের আদি প্রেম**; উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস **রাজপথ**; শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **জাতিস্মর** ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের **দিন-মজুর**-এর গল্পগুলি; অনুরূপা দেবীর **মন্ত্রশক্তি, মহানিশা** ও **মা**; নিরুপমা দেবীর **দিদি** ও **অন্নপূর্ণার মন্দির**; মনীন্দ্রলাল বসুর **রমলা**; সরোজকুমার রায় চৌধুরীর **সোমলতা, শতাব্দীর অভিশাপ** ও **অনুষ্টুপ ছন্দ**; পরশুরামের অবাক-করা বিশিষ্ট ব্যঙ্গ গল্পসংগ্রহ **গড্ডালিকা** ও **কজ্জলী**; রমেশচন্দ্র সেনের **শতাব্দী**; অমরেন্দ্র ঘোষের **দক্ষিণের বিল**; রবীন্দ্র মৈত্রের বিষাদ মধুর গল্পসংগ্রহ **উদাসীর মাঠ**; প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর **মহাস্থবির জাতক**; গজেন্দ্র কুমার মিত্রের বিরাট পটভূমিকার উপন্যাস **কলকাতার কাছেই**; যাযাবরের নতুন দিগন্তের দিশারী **দৃষ্টিপাত**; প্রাণতোষ ঘটকের পুরনো কলকাতার অভিজাত শ্রেণীর অবক্ষয়ের বিরাট পটভূমিকার চিত্র **আকাশ পাতাল**; সতীনাথ ভাদুড়ীর **ঢোঁড়াই চরিত মানস**; সৈয়দ মুজতবা আলীর অনবদ্য **পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরপঙ্খী, দেশে-বিদেশে**; জরাসন্ধের **লৌহকপাট**; ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মননসমৃদ্ধ **আবর্ত**; বাংলা ভাষায় জেমস জয়েস-পন্থী লেখকত্রয় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ ও রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসত্রয়, যথাক্রমে **বার ঘর এক উঠোন, কিনু গোয়ালার গলি** এবং **বনপলাশীর পদাবলী**; গোপাল হালদারের বিশ্লেষণধর্মী উপন্যাস **একদা**; সমরেশ বসুর উচ্চ সাহিত্যরসসমৃদ্ধ দু'খানা উপন্যাস **গঙ্গা** ও **অচিনপুরের কথকতা**; নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **রস** (গল্প) ও **দেহমন**; দীপক চৌধুরীর রাজ-নৈতিকবৈদগ্ধ্যপূর্ণ উপন্যাস **পাতালে এক ঋতু**; হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের সমাজের নিম্নতম স্তরের মানুষের জীবন-কেন্দ্রিক উপন্যাস **মুমূর্ষু পৃথিবী**; আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নবযুগের কর্মোদ্যোগে উদ্দীপিত নতুনতর রসের উপন্যাস **পঞ্চতপা**; অবধূতের **মরুতীর্থ হিংলাজ** ও **দাবানল**; সঞ্জয় ভট্টাচার্যের **সৃষ্টি**; অদ্বৈত মল্লবর্মণের **তিতাস একটি নদীর নাম**; অমিয়ভূষণ মজুমদারের **গড় শ্রীখণ্ড**; সুবোধকুমার চক্রবর্তীর **রম্যাণি বাক্যের খণ্ডগুলি**; হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের **ইরাবতী**; দীপেন্দ্রকুমার সান্যালের **বার্ধক্যে বারানসী**; শক্তিপদ রাজগুরুর **কেহ ফেরে নাই**;

ধনঞ্জয় বৈরাগীর **এক মুঠো আকাশ**; আশাপূর্ণা দেবীর **আংশিক** ও **প্রথম প্রতিশ্রুতি**; প্রতিভা বসুর **মেঘের পর মেঘ**; মহাশ্বেতা দেবীর **নটী** ও **অমৃত সঞ্চয়**; বাণী রায়ের **শ্রীলতা** ও **শম্পা**; প্রফুল্ল রায়ের **পূর্ব পার্বতী**; নারায়ণ সান্যালের **বল্মীক**; শঙ্করের **চৌরঙ্গী**; বিবেকানন্দ ভট্টাচার্যের **বন্দরের কাল**; চাণক্য সেনের **রাজপথ জনপথ** প্রভৃতি।

বাণীর প্রার্থনা—পৃথিবী আজ যথার্থই একটা যুগ-সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেচে। ধর্ম-নেতারা এযুগে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছেন না—এটা তাঁদের ভাবের দৈন্য হতে পারে, আবার জনসাধারণের গ্রহণের অক্ষমতাও হতে পারে। দার্শনিক বলতে আজকের দিনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপকদের বোঝায় (যাঁরা কদাচিৎ মৌলিক চিন্তার অধিকারী), তাঁরা সম্ভবতঃ আমাদের অন্তরের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবেন না। রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ অধিকাংশই দলীয় স্বার্থসিদ্ধিতে নিমগ্ন। এ অবস্থায় জাতির ভবিষ্যৎ কি? আমাদের বিশ্বাস কবি-সাহিত্যিকগণ পথ দেখাতে পারেন। এখনো সে সময় আছে, বাঙালী হিসেবেই হোক আর ভারতবাসী হিসেবেই হোক। একদা বাংলা সাহিত্য গোটা ভারতের মুক্তির পথ দেখিয়েছিল, সেদিন ত প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যস্রষ্টার সংখ্যা যথেষ্ট ছিল না, আজকের সাহিত্যের নানা দিকে এতো অসংখ্য প্রথম শ্রেণীর শক্তিধর নারী ও পুরুষ সাহিত্যসাধক বর্তমান থাকতে আমরা কি আশা করতে পারি না যে আবার তাঁরা নতুন প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে জাতির এই সঙ্কট কালে মুক্তির পথ দেখাবেন? আবার যুগোপযোগী মরণজয়ী বাণী (message) শোনাবেন?